বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্রঃ ১৫শ খন্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্রঃ পঞ্চদশ খণ্ড

সাক্ষাৎকার

সম্পাদকঃ হাসান হাফিজুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়

প্রাক কথন

১৯৭৭-৭৮ থেকে শুরু করে সুদীর্ঘ আট বছরব্যাপী একদল গবেষকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হচ্ছে প্রথম পর্যায়ে ১৫ খণ্ডে মুদ্রিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ ঃ দলিলপত্র'। এই পর্যায়ে প্রকল্পটির সমাপ্তিকাল হচ্ছে ১৯৮৫ সালের ৩০শে জুন। এরপরও এই প্রকল্পের সমাপ্তিকরণ সংক্রান্ত কাজের জন্য আরও কয়েক মাস সময়ের প্রয়োজন হয়েছে। অবশেষে প্রথম পর্যায়ে ১৫ খণ্ডে মুদ্রিত স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিল-ভিত্তিক এই বইগুলো গবেষক ও পাঠকদের সমীপে উপস্থাপনা করতে পেরে আমরা আজ গর্ব অনুভব করছি।

'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ ঃ দলিলপত্র'--এই নামকরণ থেকেই আমরা একটা কথা স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, আমাদের এই প্রচেষ্টা ও উদ্যম কোন দিক থেকেই স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস লেখার জন্য নয়। আমরা যেটুকু করেছি, তা' হচ্ছে ভবিষ্যতে গবেষক ও ইতিহাসবিদরা যাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস প্রণয়ন করতে সক্ষম হন, সেই লক্ষ্যে যুদ্ধ সংক্রান্ত সংগৃহীত দলিলপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বহু সংখ্যক ব্যক্তির সাক্ষাৎকারগুলো সন্নিবেশিত করা। এক কথায় বলতে গেলে আমাদের সংগৃহীত দলিলপত্র এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার ও বিবৃতিগুলো স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস রচনার জন্য কেবলমাত্র একটা রূপরেখা হিসেবে বিবেচিত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এখানে আরও একটি বিষয়ের অবতারণা করা বাঞ্ছনীয় হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষক ও ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মফিজুল্লাহ্ কবীরের নেতৃত্বে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি কঠোর পরিশ্রম করে প্রতিটি দলিল, সাক্ষাৎকার ও বিবৃতি অনুমোদন করার পর আমরা সেসব এই ১৫ খণ্ডে সন্নিবেশিত করেছি। অর্থাৎ প্রামাণ্যকরণ কমিটির অনুমোদন ছাড়া কোন দলিল, সাক্ষাৎকার কিংবা বিবৃতি এর অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

সংক্ষেপে এই প্রকল্পের কথা বলতে গেলে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার প্রায় ছয় বছর পর সরকার এ ব্যাপারে তৎপর হলে ১৯৭৭-৭৮ সালে তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় স্বাধীনতাযুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্পের সূচনা হয়। বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক কবি হাসান হাফিজুর রহমানের পরিচালনায় এই প্রকল্পের গবেষক ও কর্মীরা সীমিত সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও অমানুষিক পরিশ্রম করে একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রামাণ্য দলিলপত্র, আলোকচিত্র, পত্র-পত্রিকা, প্রচার-পুস্তিকা, সংবাদপত্রের কাটিং, গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র, স্মারকলিপি, সাক্ষাৎকার, বিবৃতি এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্র সংগ্রহে লিপ্ত হন। এরপর শুরু হয় নথিপত্রের সংরক্ষণ, বাছাই এবং গ্রন্থণার কাজ।

॥ চার ॥

এখানে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে হচ্ছে যে, প্রকল্পের কাজ সামগ্রিকভাবে সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিচালক কবি হাসান হাফিজুর রহমানের মতো প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব ইহ জগত থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি যে শুধু কয়েকটি খণ্ডের মুদ্রণ সমাপ্ত করেছেন তাই-ই নয়, প্রস্তাবিত ১৫ খণ্ডের সমস্ত পাণ্ডুলিপি তৈরী ও অনুমোদন করানো (১৫নং-খণ্ড ব্যতীত) ছাড়াও তিনি এসব মুদ্রণের প্রারম্ভিক ব্যবস্থা পর্যন্ত করে গেছেন। তাই স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্রের এই ১৫ খণ্ডই হচ্ছে কবি হাসান হাফিজুর রহমানের স্মৃতি বিজড়িত এবং তিনিই হচ্ছেন এসবের মূল কৃতিত্বের দাবীদার।

এরপর একটা অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা অব্যাহত থাকায় প্রকল্পের কাজ কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। উপরন্তু সরকারী মুদ্রণালয়ের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ ছাপাখানাও মুদ্রণ ও বাঁধাই কাজে নানা অজুহাতে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। অবশেষে সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে স্বাধীনতাযুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্প (প্রথম পর্যায়) ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বছরে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এসময় আরও ৭৩টি ফর্মা মুদ্রণ ছাড়াও শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ কপি বাঁধাই-এর কাজ অসম্পূর্ণ ছিলো। এছাড়াও ছিলো গুদামজাতকরণ এবং বিক্রয় ও বিতরণ সংক্রান্ত দুরূহ কাজ। এজন্য স্বাভাবিকভাবেই আরও কয়েক মাস সময়ের প্রয়োজন হয়েছে।

এখানে বিভিন্ন খণ্ডে মুদ্রিত তারিখ সংক্রান্ত জটিলতার কথা উল্লেখ নিতান্ত অপরিহার্য বলে মনে হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, সুদীর্ঘ ৮ বছর কাল ধরে প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ অব্যাহত ছিল। ফলে ১ নং থেকে ৬ নং এবং ১২ নং ও ১৩ নং খণ্ডে মুদ্রণের সময়কাল নভেম্বর ১৯৮২ রয়েছে। এছাড়া ৭ নং থেকে ১১ নং এবং ১৪ নং খণ্ডে মুদ্রণের সময়কাল জুন, ১৯৮৪ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত সময়ে এসবের পাণ্ডুলিপি অনুমোদনের পর মুদ্রণের কাজ অনেকাংশে সমাপ্ত হলেও আবারও উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, ১৫ নং খণ্ডসহ বাকী অংশ মুদ্রণ এবং শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ বাঁধাই-এর কাজ অসম্পূর্ণ ছিলো।. এই সমস্ত কাজই অত্র প্রকল্পের সমাপ্তিকরণ পর্যায়ে করা হয়েছে। এজন্যই সমস্ত কর্মকাণ্ড শেষ হওয়ার পর সর্বসাধারণের মধ্যে খণ্ডগুলো বিক্রয় শুরু করার তারিখ ডিসেম্বর ১৯৮৫-কেই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের সময়কাল হিসেবে গ্রহণ করা সমীচীন হবে।

তবুও এক কথায় বলতে গেলে স্বাধীনতাযুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্পের গবেষক ও কর্মীরা সুদীর্ঘ আট বছরকাল (১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৮৪-৮৫) একনিষ্ঠভাবে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং নানা প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তারই ফসল হচ্ছে আজকের এই "বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ : দলিলপত্র"। তথ্য মন্ত্রণালয়ের তত্বাবধানে এজন্য সরকারের সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ৭২ লাখ ৪৪ হাজার টাকা।

॥ পাঁচ ॥

সমাপ্তিকালীন পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে প্রকল্পের পক্ষ থেকে প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া স্বাধীনতাযুদ্ধের দিনগুলিতে শত্রুকবলিত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার পূর্ণাংগ বিবরণও সন্তোষজনকভাবে উপস্থাপিত করা যায়নি। এরই পাশাপাশি সেসময় দুর্বিসহ অবস্থায় পাকিস্তানে বসবাসকারী বাঙ্গালীদের সম্পর্কেও উল্লেখ-যোগ্য তথ্য এই ১৫ খণ্ডে সন্নিবেশ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বলা দরকার, দলিল ও তথ্যের অভাবই এই অপূর্ণতার কারণ।

প্রসঙ্গত আরও একটা বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন বলে মনে হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মাটিতে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানের তৎকালীন হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন এলাকায় যেসব উল্লেখযোগ্য যুদ্ধে মোকাবেলা করেছেন, সেগুলির দিন, তারিখ এবং বিস্তারিত বিবরণ ও ধারাবাহিক তালিকা আরও ব্যাপকভিত্তিক হওয়া দরকার বলে বিবেচিত হয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে স্বাধীনতাযুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্প, দ্বিতীয় পর্যায়ে, নতুন কয়েকটি খণ্ডে এসব অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে কাজে হাত দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র সংবলিত বিরাটাকার ফটো এ্যালবাম প্রকাশের উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। এই কারণে প্রথম পর্যায়ে পরিকল্পিত ষোড়শ খণ্ডটির মুদ্রণের কাজ স্থগিত রাখা হয়েছে। দুই পর্যায়ে মুদ্রিত সকল খণ্ডের নির্ঘণ্ট এবং কালপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জিসহ এই খণ্ডটি প্রকাশিত হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের সর্বশেষ খণ্ড হিসেবে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য বাংলা-দেশ সরকার ৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। আশা করা যায় ১৯৮৬-৮৭ সাল নাগাদ দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ সম্পূর্ণ হবে!

পরিশেষে বলতে চাই যে, আমাদের যেটুকু ত্রুটি রয়েছে তা' আমরা অকপট চিত্তে স্বীকার করলেও আমাদের ক্ষুদ্র একদল গবেষক ও কর্মী সুদীর্ঘ আট বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল সফরের পর যে তিন লক্ষাধিক দলিলপত্র ও সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করেছেন, সেটাও তো কম কথা নয়। এসবের কথা চিন্তা করে ত্রুটিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে নিরীক্ষা করার অনুরোধ করতে সাহসী হচ্ছি। ভবিষ্যতে গবেষক ও ইতিহাসবিদরা বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস প্রণয়নকালে আলোচ্য ১৫ খণ্ডে সন্নিবেশিত দলিলপত্র ও সাক্ষাৎকারগুলোকে তথ্য নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহারে সক্ষম হলে পরিশ্রম সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

এম আর আখতার
পরিচালক
স্বাধীনতাযুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্প (২য় পর্যায়)

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের নয় সদস্য বিশিষ্ট প্রামাণ্যকরণ কমিটির তরফ থেকে এই দলিল সংগ্রহের প্রকাশনা সম্পর্কে দুটি কথা নিবেদন করছি। এ প্রকল্পের উৎপত্তি ও গঠন, এর মূল উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব হাসান হাফিজুর রহমান বিস্তারিত বলবেন।

বিপুলায়তন ও সংগৃহীত উপাত্ত থেকে প্রকাশিতব্য দলিলসমূহ নির্বাচনে কমিটির সদস্যবৃন্দ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দলিলাদির পাণ্ডুলিপি ধৈর্য ধরে পরীক্ষা করেছেন, বিস্তারিত আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সংযোজন ও সংশোধনের জন্য মূল্যবান উপদেশ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন। আমাদের কোন মন্তব্য ছাড়াই দলিলগুলো সরাসরি পাঠক ও গবেষকদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে। দলিলপত্র যথাসম্ভব মূলসূত্র থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকাশিত দলিলগুলো প্রামাণ্যকরণ কমিটি অনুমোদন করে দিয়েছেন।

প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠাব্যাপী দলিল থেকে প্রাথমিক নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রকল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন গবেষকবৃন্দ। তাঁরা জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এ দায়িত্ব যথাযথ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে পালন করেছেন।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সকল সদস্যকে এবং প্রকল্পের গবেষকবৃন্দকে তাঁদের প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই। সেই সংগে প্রকল্পের প্রধান বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে নিরলস ও অকাতর কর্মপ্রচেষ্টার জন্য জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন।

বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত ও সুবিবেচনার সাথে নির্বাচিত দলিলগুলো থেকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সার্বিক, প্রামাণ্য ও নিরপেক্ষ চিত্র বেরিয়ে আসবে, আমরা এ আশা পোষণ করছি। সংগৃহীত সমুদয় দলিল একটি স্থায়ী আর্কাইভস্ গঠনে সহায়তা করবে। অনুদঘাটিত ও অনাবিষ্কৃত দলিলগুলো ভবিষ্যতে সংগৃহীত হলে পরিশিষ্টের মাধ্যমে সেগুলি মূল দলিলের সংগে সংযোজিত হতে পারে।

প্রকাশিত দলিলগুলো পাঠক সমাজ ও গবেষকদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

মফিজুল্লাহ কবীর
চেয়ারম্যান
প্রামাণ্যকরণ কমিটি
বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্প

১৪ সেপ্টেম্বর
১৯৮২

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়সীমা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে সম্পর্কিত সারা বিশ্বে যা কিছু ঘটেছে তার তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ এবং সেসবের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পিত হয় মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের ওপর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ইতিহাস রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর কারণ, সমকালীন কোন ঘটনার বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো একটি যুগান্তকারী ঘটনার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা এবং বিকৃতির সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া বস্তুত অত্যন্ত দুরূহ। এ জন্যই আমরা ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। এর ফলে দলিল ও তথ্যাদিই কথা বলবে, ঘটনার বিকাশ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, ঘটনা পরম্পরার সংগতি রক্ষা করবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কয়েকটি খণ্ডে সংগৃহীত দলিলসমূহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সামনে একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় দেখা দেয় এই যে, দলিলপত্র সংগ্রহের সময়সীমা স্বাধীনতা যুদ্ধকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও এ সত্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের পশ্চাতে বিরাট পটভূমি রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধকে এই পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। এই পটভূমির ঘটনাবলী—যাকে মুক্তিসংগ্রাম বলে অভিহিত করা যায়—তার অনিবার্য পরিণতিই স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তাই মুক্তিসংগ্রামের স্বরূপ জানা ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধকে তুলে ধরা সম্ভবই নয়। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল প্রকাশের সংগে এর পটভূমি সংক্রান্ত দুখণ্ড দলিলসংগ্রহ প্রকাশের সিদ্ধান্তও প্রকল্প গ্রহণ করে। এর ফলে প্রকল্পের দলিল প্রকাশের পরিকল্পনা নিম্নরূপে দাঁড়ায় :

প্রথম খণ্ড	:	পটভূমি (৯০৫—১৯৫৮)
দ্বিতীয় খণ্ড	:	পটভূমি (১৯৫৮—১৯৭১)
তৃতীয় খণ্ড	:	মুজিব নগর : প্রশাসন
চতুর্থ খণ্ড	:	মুজিব নগর : প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা
পঞ্চম খণ্ড	:	মুজিব নগর : বেতারমাধ্যম
ষষ্ঠ খণ্ড	:	মুজিব নগর : গণমাধ্যম

সপ্তম খণ্ড	:	পাকিস্তানী দলিলপত্র : সরকারী ও বেসরকারী
অষ্টম খণ্ড	:	গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসংগিক ঘটনা
নবম খণ্ড	:	সশস্ত্র সংগ্রাম (১)
দশম খণ্ড	:	সশস্ত্র সংগ্রাম (২)
একাদশ খণ্ড	:	সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)
দ্বাদশ খণ্ড	:	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : ভারত
ত্রয়োদশ খণ্ড	:	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র
চর্তুদশ খণ্ড	:	বিশ্বজনমত
পঞ্চদশ খণ্ড	:	সাক্ষাৎকার
ষোড়শ খণ্ড	:	কালপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘণ্ট

মূল পরিকল্পনায় ৭২০০ পৃষ্ঠা মুদ্রণের পরিকল্পনা থাকলেও সংগ্রহের পরিমাণ বিপুল হয়ে যাওয়ায় আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি খণ্ড প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠা, সর্বমোট ১৫০০০ পৃষ্ঠার মধ্যে সংগ্রহগুলির মুদ্রণ সম্পন্ন করার বাজেট বরাদ্দ অনুমোদিত হয়। এই ভিত্তিতে আমাদের কাজ এগিয়ে যায়।•

দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে নীতিমালা আমরা ব্যাপক ও খোলামেলা রেখেছি। তবে পটভূমি সম্বন্ধে দলিল ও তথ্যাদি গ্রহণে কিছুটা সংযত দৃষ্টিভংগী অবলম্বন করি। আমরা শুধু সেইসব তথ্য ও দলিলই পটভূমি খণ্ডে সন্নিবেশিত করার সিদ্ধান্ত নেই যা বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্য ও এখানে বসবাসকারী জনগণের আশা-আকাংক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অর্থাৎ, যেসব ঘটনা, আন্দোলন ও কার্যকারণ এই ভূখণ্ডের জনগণকে মুক্তিসংগ্রামের দিকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করেছে, প্রধানত সেসব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যই এই খণ্ডে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বাংলাদেশের অতীত ঘাঁটতে বহু দূর-অতীতে প্রত্যাবর্তন করিনি। ১৯০৫ সালের বংগভংগ থেকেই পটভূমি সংক্রান্ত দলিল-তথ্যাদির সন্নিবেশন শুরু করি। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাখ্যায় এই শুরুর সীমাটি বাহুল্যবর্জিত, প্রত্যক্ষ এবং যুক্তিগ্রাহ্য।

• ১৯০৫-এর বংগভংগ এবং তা রদ-এর পর ১৯৪০ সাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী এ দীর্ঘ সময়ের আর কোন দলিল এ খণ্ডে সন্নিবেশ করা হয়নি। কারণ ১৯১১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত এই ভূখণ্ডে অনুষ্ঠিত সকল রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বভারতীয় বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তারূপে বাংলার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত ছিল। আর তা উত্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশেরই সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা এ, কে, ফজলুল হক। ১৯৪৬ সালে নিতান্ত অবৈধভাবে দিল্লী কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের যে সংশোধনী করা হয়, তাতে বাংলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয়রূপের প্রশ্নকে পরিহার করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়,

কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং যেভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। এরই পরিণতিতে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জনগণের সম্মুখে স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে মূর্ত করে তুলেছে এমন সমস্ত দলিলই এ খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পটভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্র দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি শেষ হয়েছে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের সময়সীমায়। এখানে কাল বিভাজন করা হয়েছে একান্তই খণ্ড পরিকল্পনার পৃষ্ঠাসংখ্যার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে—কোন বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

পটভূমির বেলায় যে ধরনের দলিল ও তথ্যাদি আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলো হলো গেজেট বিজ্ঞপ্তি, পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী, কোর্টের মামলা সম্পর্কিত রিপোর্ট ও রায়, কমিশন রিপোর্ট, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ও প্রস্তাব, জনসভার প্রস্তাব, আন্দোলনের রিপোর্ট, ছাত্রদলের প্রস্তাব ও আন্দোলন, গণপ্রতিক্রিয়া, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রামাণ্য সমীক্ষা ও প্রবন্ধ, রাজনৈতিক পত্র, সরকারী নির্দেশ ও পদক্ষেপ ইত্যাদি। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদির বেলায় সংগ্রহের ধরন বিস্তৃততর হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কারণ এই যুদ্ধের সংগে সারা বিশ্ব জড়িত হয়ে পড়েছিল। ফলে কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয়, সারা বিশ্বের বিষয়াদি যোগাড় করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় এবং প্রকল্প সেভাবেই অগ্রসর হয়। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ডায়েরী, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা, সরকারী নথিপত্র, রণকৌশল ও যুদ্ধ সংক্রান্ত লিপিবদ্ধ তথ্যাদি, মুক্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক তৎপরতা, জনসাধারণের সক্রিয় অংশ গ্রহণ, কমিটি গঠন, বিবৃতি, বিশ্বজনমত, বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী প্রভৃতি নানা ধরনের তথ্য ও দলিল এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ-ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে নজর রেখেছি যাতে সর্বসাধারণের মনোভাব প্রতিফলনে কোন ফাঁক না থাকে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে গণসহযোগিতার প্রতিস্তরের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডে যতদূর সম্ভব মূল দলিল সন্নিবেশিত করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তবে যেসব দলিল ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং যেগুলি বাদ দিলে ঘটনার ধারাবাহিকতা বঞ্চিত হয় না সেগুলি আমরা প্রকাশিত সূত্র থেকে গ্রহণ করেছি।

এ-কাজে একটিই আমাদের প্রধান বিবেচ্য ছিল, সঠিক ঘটনার সঠিক দলিল যেন সঠিক পরিমাণে বিন্যস্ত হয়। আমাদের কোন মন্তব্য নেই, অঙ্গুলি সংকেত নেই, নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও নেই। আমরা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি আগাগোড়া বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। এই মূল লক্ষ্য সামনে রেখেই দলিল-তথ্যাদি বাছাই, সম্পাদনা এবং বিন্যাস করা হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে আমরা শুধু এইটুকু

॥ দশ ॥

সর্তকতা আটুট রেখেছি যাতে কারো প্রতিনিধিত্ব ক্ষুণ্ণ না হয়। দলিলের যথার্থতাই যার যা ভূমিকা ও গুরুত্ব তা যথাযথভাবে তুলে ধরবে। বস্তুত জনসাধারণই এ ধরনের ঘটনার প্রকৃত মহানায়ক। জনসাধারণের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা যখন পরিণত ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে, কেবল তখনই জনগণের মধ্য থেকে যোগ্যতম নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের বেলাতেও তাই ঘটেছে। আর তাই এমন সব দল বা সংগঠনের দলিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যে দল বা সংগঠন আমাদের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো মুখ্য ভূমিকা বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি। তবু একাত্তরের অনেক আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার চিন্তা একটা দেশের একটা জাতির নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী অন্ত:স্রোতকেই সামনে তুলে ধরে। আসলে মহীরুহের চারপাশে জেগে ওঠা অজস্র গাছপালা নিয়েই বনের গঠন কাঠামো। বনকে জানতে হলে এর সবটাই জানা দরকার।

তবে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সবটুকু হয়তো প্রতিফলিত নাও হয়ে থাকতে পারে। এর দুটো কারণ, প্রথমত গ্রন্থের সীমিত পরিসরে স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্ন, দ্বিতীয়ত অনেক তথ্য ও দলিল হাতে না আসা যা বহু ক্ষেত্রে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি, কিছু ক্ষেত্রে যোগাযোগেরও সুযোগ ঘটে নি। সবাইকে আমরা জায়গা দিতে চেয়েছি এবং ভূমিকা অনুযায়ী গুরুত্ব দিবানো দিকেও লক্ষ্য রেখেছি—এটাই মূল কথা। এই নীতি পটভূমি ও অন্যান্য খণ্ডে একইভাবে অনুসৃত হয়েছে।

সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার মতো দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহ-সংখ্যার দিক থেকে বিপুল বলতে হবে। তবু আমাদের ধারণা এই যে, বহু দলিল ও তথ্য এখনো সংগ্রহের বাইরে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকই কোন না কোন ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে জড়িত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, বহু বীরত্ব-গাথা, বহু ত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন। তাছাড়া সারা বিশ্ব জুড়েও ছিল এ-সম্পর্কে সমর্থন ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রবাসী বাঙালীদের ব্যাপক তৎপরতা। তাই সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে তা বলা যায় না। দেশ ও বিদেশের তথ্য সংগ্রহের কাজ তাই কেবল বাড়তে পারে, শেষ সীমায় পৌঁছানোর ঘোষণা দেয়া এখনই সম্ভব নয়। এর জন্য দীর্ঘ পরিক্রমা ও সক্রিয়তার প্রয়োজন।

সীমিত সময়ের জন্য আমাদের প্রকল্পের আয়ু, তদুপরি আমাদের লোকবলও মাত্র চারজন। এই অবস্থায় এই বিশাল কাজের কতখানি বাস্তবায়ন সম্ভব তা ভাববার বিষয়। তবু আমরা অসাধ্য সাধনের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং যতদূর সফল হয়েছি তাতে স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্য ও দলিলের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে, নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায়। এখন এর বিকাশ ও উন্নয়নের অপেক্ষা রাখে মাত্র। তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এ-কথা বলা যায়।

॥ এগার ॥

দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক এবং খোলামেলা। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও এ-উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পত্রপত্রিকার দপ্তর, গ্রন্থাগার এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রেরণ করেছি কয়েক হাজার প্রশ্নমালা কিন্তু দুঃখজনকভাবে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। প্রতিটি রাজনৈতিক, ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনের সাথেই যোগাযোগ করা হয়েছে—কিন্তু দলগতভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ দিয়ে গেছেন নিজস্ব সংগ্রহের দলিলপত্র। আবেদনের জবাবে আশানুরূপ সাড়া না পাবার কারণ হিসাবে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করেছি: প্রথমত, ইতিহাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা, যার ফলে খুব কম সংখ্যক মানুষই দলিলপত্র সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করে থাকেন এবং দ্বিতীয়ত, ভিত্তিহীন সংশয়—বিশেষ করে কারো কারো প্রতিক্রিয়ায় আমাদের মনে হয়েছে যে, ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টাটি সরকারী হওয়ায় এর সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁরা যথেষ্ট সন্দিহান এবং ফলে দলিলপত্র প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পিত ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে অপূর্ণাংগতার সম্ভাবনাকেই যেন তারা মেনে নিয়েছেন। ব্যাপক ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এই সমস্যা আমরা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। সরকারী উদ্যোগের কারণে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে আশংকা, তা আমাদের দলিলগুলি নিরসন করবে বলে আমরা মনে করি।

এছাড়াও আমরা লক্ষ্য করেছি, এমন অনেকের কাছেই দলিল ও তথ্যাদি রয়েছে যা তাঁরা হাতছাড়া করতে রাজী নন। অনেকেই কিছু ছেড়েছেন, কিছু হাতে রেখে দিয়েছেন। আবার কারো কারো প্রত্যাশা, দলিলাদি পুরানো হলে সেগুলি অনেক বেশী লাভের উৎস হয়ে উঠতে পারে। আমরা মূল দলিলের ফটোকপি রেখে অনেককেই তাঁর মূল কপি ফেরত দিয়েছি। এ-ক্ষেত্রেও অনেকেই ফটোকপি রাখারও সুযোগ দিতে রাজী হননি—অর্থাৎ তাঁর হাতের দলিলটি তিনি রেখেই করেননি ভবিষ্যতের আশায়। সরকার দলিল সংগ্রহের ব্যাপারে কোন অর্ডিন্যান্স পাস করেননি। ফলে দলিল পাওয়ার জন্য আমরা ব্যক্তিগত অনুরোধ ও প্রয়াস চালাতে পারি, আইনগত চাপ সৃষ্টি করতে পারি না। অথচ এ কথাও সত্যি যে, স্বাধীনতা সংক্রান্ত দলিল মাত্রই জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ; তাকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে কুক্ষিগত করে রাখা উচিত নয়।

এইসংগে আমরা দুঃখের সংগে উল্লেখ করি যে, এই প্রকল্প শুরু হবার আগেই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ট নেতাদের অনেককে আমরা হারিয়েছি। ফলে তাঁদের কাছে রক্ষিত দলিলপত্র পাওয়ার কিংবা তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

এইসব বাধাবিঘ্নের মধ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হয়েছে। ফলে আমাদের এতদ্‌সংক্রান্ত যে বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে তা অতীতের ত্রুটি সংশোধনে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সহায়ক হতে পারে। যে তথ্যগত ফাঁক থেকে যাচ্ছে

তা পূরণ হওয়া দরকার। সম্ভব হলে অপ্রকাশিত দলিলপত্র থেকে কিংবা ভবিষ্যতে আরো দলিলপত্র সংগৃহীত হলে তা থেকে নির্বাচন করে অতিরিক্ত খণ্ড প্রকাশ করে এই ফাঁক পূরণের চেষ্টা করা যাবে। দেশে-বিদেশের দুষ্প্রাপ্য দলিল সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখা একান্ত জরুরী বলেই আমরা মনে করি। এ ধারা ক্ষুণ্ন হলে এ কাজ দুরূহতর হবে, এমনকি এটা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। এ-ব্যাপারে স্থায়ী কর্মসূচী সুফলদায়ক হবে সন্দেহ নেই।

দলিল এবং তথ্য প্রামাণ্যকরণের জন্য সরকার নয় সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি গঠন করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর এই প্রামাণ্যকরণ কমিটির চেয়ারম্যান।

কমিটির সদস্যরা হলেন :

ড: সালাহ্উদ্দীন আহমদ, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ড: আনিসুজ্জামান, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ড: সফর আলী আকন্দ, পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী।

ড: এনামুল হক, পরিচালক, ঢাকা যাদুঘর।

ড: কে, এম, করিম, পরিচালক, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার।

ড: কে, এম, মহসীন, সহযোগী প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ড: শামসুল হুদা হারুন, সহযোগী প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জনাব হাসান হাফিজুর রহমান, সদস্য-সচিব।

প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ নির্দিষ্ট গ্রন্থের জন্য দলিলাদি বাছাই করে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সামনে পেশ করেন। প্রামাণ্যকরণ কমিটি সেগুলি নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য কিনা তা পুংখানুপুংখরূপে যাচাই করেন। কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী যে-সকল দলিল ও তথ্য প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়, কেবলমাত্র সেগুলিই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থের জন্য পেশকৃত দলিলাদির কিছু কিছু কমিটি নাকচ করেন; কিছু নতুন দলিল ও তথ্য যা গ্রন্থের উৎকর্ষের জন্য নেহাৎ জরুরী তা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাঁদের এই নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করা হয়েছে। তবে এ-ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকল্পকে বেশ দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একেই লোকবল নগণ্য, তার ওপর স্বাভাবিক কাজ সেরে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য দলিলের সন্ধানে প্রকল্পের কর্মীদের হিমশিম খেতে হয়েছে। তবুও কর্মীরা লেগে থেকেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলও হয়েছেন। তবে সংগ্রহ যথাসময়ে হয়তো হয়নি, অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। ফলে খণ্ডবিশেষে সংযোজন অধ্যায় যোগ করতে হয়েছে। বিশেষভাবে পটভূমি খণ্ড সংকলনে এই পরিস্থিতি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯০৫ সালের মূল গেজেট বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাচ্ছিল না। পটভূমি খণ্ডের জন্য আমরা প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে

এই বিজ্ঞপ্তিটি উদ্ধৃত করি। কিন্তু প্রামাণ্যকরণ কমিটি যতদূর সম্ভব মূল দলিল সংকলনের পক্ষপাতী। তাই মূল দলিল সংগ্রহের চেষ্টা নতুনভাবে নেয়া হয়। ঢাকা গেজেটে এই বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়নি। কোলকাতা গেজেটেও নয়। ইতিমধ্যে পটভূমি খণ্ডটি প্রেসে চলে যায়। এই গেজেটের ফাইল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, হঠাৎ অন্য কাগজের স্তূপের ভেতর ধূলিধূসরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তমিজুদ্দিন খানের রীট আবেদনের মূল দলিল খুঁজতে গিয়ে অপরিসীম পরিশ্রমের পরও তা পাওয়া যায়নি। এর মূল কপি সিন্ধু হাইকোর্টে রয়েছে। আনা সম্ভব হয়নি। সুতরাং তা উদ্ধৃতির আকারেই গিয়েছে। এ-থেকে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সংকলনের কাজ নিখুঁত ও সুষ্ঠু করার জন্য প্রবল আগ্রহ ও আন্তরিকতাই ব্যক্ত হয়। প্রকল্পের কর্মীরাও তাঁদের এই অনুভূতির যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন; তাঁদের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে কসুর করেননি, প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। পটভূমি খণ্ডে দলিলসমূহ কালানুক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। অন্যান্য খণ্ডের দলিলের বেলাতেও কমবেশী এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডে নির্ঘণ্ট ও কালপঞ্জী দেয়া হয়েছে। শেষ খণ্ডে গ্রথিত হচ্ছে সকল খণ্ডের নির্ঘণ্ট এবং কালপঞ্জী; ফলে পাঠকদের পক্ষে কোন্ খণ্ডে কী আছে তা [illegible]।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল দলিলসমূহ মূল যে ভাষায় আছে তাতেই ছাপা হবে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কিছু বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়। বাংলা ও ইংরেজী ভাষার মূল দলিলগুলি আমরা সংকলনে স্থান দিয়েছি। তাছাড়া, উর্দু, হিন্দী, আরবী ও রুশ ভাষার বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল অনুবাদসহ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্কান্ডেনেভীয়, ফরাসী, জার্মান, জাপানী ও ইন্দোনেশীয় প্রভৃতি ভাষায় বেশ কিছু দলিল ও তথ্য পাওয়া গেলেও তার অনুবাদ করা এবং গ্রন্থে সেসবের স্থান দেয়া এখনও সম্ভবপর হয়নি। এগুলো ভবিষ্যতের জন্যে জমা রইল। প্রাসঙ্গিকতা ও পরিসরের কথা বিবেচনা করে কোন কোন দলিল সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তবে সেক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি যাতে মূলের বিকৃতি না ঘটে।

বর্তমানে আমাদের সংগ্রহে প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার দলিল ও তথ্যাদি জমা হয়েছে। এর ভেতর ১৫ হাজার পৃষ্ঠা ছাপা হচ্ছে। বাকি দলিল ও তথ্যাদি ছাপার বাইরে রয়ে যাবে। এছাড়া সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় আরও দলিলপত্র সংগৃহীত হবে। এগুলির গুরুত্বও কম না। অর্থাৎ, এগুলির ওপর গবেষণা করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প-প্রকাশিত খণ্ডগুলির বাইরেও নতুন তথ্য সংবলিত মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতাযুদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা অবারিত থেকে যাবে। এ সুযোগ সম্প্রসারিত করা দেশ ও জাতির স্বার্থেই একান্ত অপরিহার্য। কারণ এ সম্পর্কে যত বেশী বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি জাতি জানতে পারবে আমাদের অগ্রযাত্রা তত বেশী নির্ভুল ও সচ্ছল হবে। তাছাড়া এ আমাদের অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস; তাই এ সম্পর্কিত প্রতিটি ছিন্ন পত্র পরম যত্ন, দায়িত্ব ও আগ্রহে সংরক্ষিত করা দেশ ও সরকারের নৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত প্রায় প্রতিটি আত্মসচেতন দেশই তাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে

জড়িত ঘটনাবলী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য স্থায়ী আর্কাইভস প্রতিষ্ঠা করে থাকেন এবং এ-সংগ্রহের কাজ ও এর ওপর গবেষণার কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতাযুদ্ধের ব্যাপারে এ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি সমানভাবে দরকার—বিশেষভাবে এ-কারণে যে, এ সংগ্রামে এদেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিলেন, যত দিন যাবে তাদের সংগে যোগাযোগ তত বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন তথ্য আর্কাইভস-এর সংগ্রহ সমৃদ্ধতর করতে থাকবে। এ সুযোগ বিনষ্ট করা দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।

প্রকল্পের বিপুল পরিমাণ দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে যাঁরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ পর্যায়ে কিছু প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তি ও কর্মীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা যাদুঘর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ অবজারভার লাইব্রেরী, দৈনিক বাংলা লাইব্রেরী, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী এবং জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর এবং দিনাজপুর কালেকটরেট হতেও আমরা কিছু দলিল ও তথ্যাদি পেয়েছি। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় গ্রন্থাগার এবং সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর (ডি, এম, আই)-এর সৌজন্যে বহুসংখ্যক দলিল-দস্তাবেজ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেকে দলিলপত্র দিয়ে প্রকল্পকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু নাম এখানে উল্লেখ করা খুবই সংগত মনে করছি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কিছুসংখ্যক মূল্যবান দলিল প্রকল্পকে দিয়েছেন। বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মার্কিন কংগ্রেসের বহুসংখ্যক দলিল এ, এম, এ, মুহিতের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলনের সংগে জড়িত অনেকে তাঁদের দলিলপত্র প্রকল্পকে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মরহুমা রাশীদা রউফ, আজিজুল হক ভূঁইয়া, ডঃ এনামুল হক, আমীর আলী, সাখাওয়াত হোসেন ও জহিরউদ্দীন আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদেশ হতে কিছু মূল্যবান দলিল পাঠিয়েছেন মাহমুদুল হক এবং খোন্দকার ইব্রাহিম মোহাম্মদ। মুজিব নগর সরকার এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে যাঁদের সাহায্য-সহযোগিতার কথা আমরা বিস্মৃত হব না তাঁরা হলেন হাসান তৌফিক ইমাম, মওদুদ আহমদ, মাঈদুল হাসান, আবদুস সামাদ, দেবব্রত দত্তগুপ্ত, শামসুল হুদা চৌধুরী ও আলমগীর কবীর। পটভূমি পর্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল দিয়ে সাহায্য করেছেন বদরুদ্দীন উমর, কাজী জাফর আহমদ, অজয় রায়, ইসমাইল মোহাম্মদ, যতীন সরকার, শেখ আবদুল জলিল, ডঃ সাঈদ-উর রহমান এবং আমিনুল হক। ইসমত কাদির গামা, শামসুজ্জামান মিলন, উৎপল কান্তি ধর, স্বপন চৌধুরী ও রেজা

মোস্তাক স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদি দিয়েছেন। উল্লিখিত সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া আমাদের বিপুল সংগ্রহের বিরাট কর্মকাণ্ডের সংগে জড়িত রয়েছেন আরও অনেকে। এই স্বল্প পরিসরে তাঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমাদের আর্কাইভস-এর দলিল সংরক্ষণ খাতায় তাঁদের সকলের নাম দলিলাদির উৎস হিসেবে লিখিত রয়েছে। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ।

দলিল ও তথ্যাদির সত্যতা যাচাই-এর ক্ষেত্রে প্রামাণ্যকরণ কমিটির অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। কমিটির সদস্যগণ পরম ধৈর্য, যত্ন ও আগ্রহ সহকারে দলিলাদির প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্য বিচার করেছেন। তাঁরা শুধু দলিলাদির সত্যতা যাচাই করেননি, প্রকল্পের উন্নয়ন এবং বিশেষ করে খণ্ডসমূহের তথ্যসমৃদ্ধি ও সৌকর্য বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীরের কথা আন্তরিকতার সংগে স্মরণ করছি।

দলিল সংগ্রহ খণ্ডগুলোর প্রকাশনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই। এই সংগে বাংলাদেশ সরকারের মুদ্রণ বিভাগ এবং দি প্রিন্টার্স-এর প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

সবশেষে আরও কয়েকজনের কথা বলতে হয়—স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলসংগ্রহ খণ্ডগুলোর পেছনে রয়েছে যাঁদের অক্লান্ত শ্রম ও নিরলস সাধনা। তাঁরা এই প্রকল্পের চারজন গবেষক—সৈয়দ আল ইমামুর রশীদ, আফসান চৌধুরী, শাহ আহমদ রেজা এবং ওয়াহিদুল হক। শুধুমাত্র চাকরির দায়িত্বে নয়- গবেষণার স্পৃহা ও প্রকল্পের কাজের সংগে একাত্মতায় তাঁরা দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ হতে শুরু করে দলিল-সমূহের সংগ্রহ, বাছাই, সম্পাদনায় সহায়তা, প্রেসকপি তৈরীকরণ, মুদ্রণ তত্ত্বাবধান - সর্ববিধ কাজ সীমিত ও সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেন। এছাড়া সুকুমার বিশ্বাস ও রতনলাল চক্রবর্তীর শ্রম ও নিষ্ঠার কথা উল্লেখযোগ্য। প্রশাসনিক দিক থেকে আবদুল হামিদের গভীর দায়িত্ববোধ এবং নিরলস তৎপরতা প্রকল্পের স্বাভাবিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন, যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশে যাঁরা দেশপ্রেমের দীপ-শিখা অমলিন রেখেছেন, যাঁরা আমাদের কর্মের পথে প্রতি মুহূর্তের প্রেরণাস্বরূপ তাঁদের সকলের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের এই সংগ্রহ আমরা দেশের মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি।

হাসান হাফিজুর রহমান

দলিল প্রসঙ্গ ঃ সাক্ষাৎকার

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের মুদ্রিত দলিলপত্র খণ্ডসমূহের সম্পূরক হিসেবে এই খণ্ডটির পরিকল্পনা করা হয়েছে। [illegible] এক দশক পরে স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস সংকলনের উদ্যোগে নিয়োজিত এ প্রকল্পের সামনে একটি প্রধান সমস্যা ছিল পর্যাপ্ত দলিল ও তথ্য হাতে পাওয়া। এ প্রসঙ্গে ভূমিকায় বিশদভাবে বলা হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ সম্পর্কিত বিপুল সংখ্যক দলিলপত্র প্রকল্পে সংগৃহীত হয়েছে এবং সেগুলো থেকে [illegible] চতুর্দশ খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে। তাসত্ত্বেও এমন অনেক [illegible] ঘটনার [illegible] লিখিত দলিল নেই। আবার প্রাপ্ত দলিল ও তথ্যাদি [illegible] অপর্যাপ্ত রয়ে গেছে সেসব ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত ঘটনার সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট [illegible] যাঁরা সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল তাঁদের মৌখিক বিবরণই [illegible]। [illegible] নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ— যাঁরা স্বাধীনতাসংগ্রামে [illegible] তাঁদের তৎপরতার নানা কথা একমাত্র সাক্ষাৎকারের [illegible] স্বাভাবিকভাবেই প্রকল্পের দলিলপত্র খণ্ডসমূহের [illegible]

প্রকল্প সংগৃহীত [illegible] দলিলপত্র খণ্ডসমূহের তিনটি পর্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। [illegible] নির্যাতনের বিবরণ অষ্টম খণ্ডে; সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী [illegible] ৯ম ও ১০ম খণ্ডে এবং রাজনৈতিক নেতা, [illegible] শিল্পী [illegible] সাংবাদিক, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও জনপ্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার দিয়ে এ খণ্ডটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রকল্পের সাক্ষাৎকার [illegible] গুরুত্বপূর্ণ [illegible] নাম ছিল। কিন্তু সাক্ষাৎকার গ্রহণের [illegible] প্রকল্পের সীমিত সময়সীমা ও গবেষকদের স্বল্পতার [illegible] সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে, সাক্ষাৎকারদাতাগণের পক্ষ থেকে প্রকল্পের [illegible] সম্পর্কে সংশয় এবং এক দশক আগের স্বাধীনতাযুদ্ধকালের [illegible] বলবার বা লিখবার জন্য উপযুক্ত সময় ও প্রস্তুতির অভাবে অনেকে সাক্ষাৎকার দিতে সমর্থ হননি। আবার অনেকে প্রকল্প কর্মীদের [illegible] ঘুরিয়ে অবশেষে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। [illegible] কয়েকজনের কাছ থেকে আমরা অত্যন্ত পরিশ্রমলব্ধ সুদীর্ঘ বিবরণ পেয়েছি এবং [illegible] মুদ্রিত হয়েছে। এগুলোর অধিকাংশই অন্যান্য খণ্ডে মুদ্রিত দলিলপত্র দ্বারা সমর্থিত।

প্রকল্পের গৃহীত সময়সীমার মধ্যে সাক্ষাৎকারদাতার মূল বক্তব্য আমরা ছাপাবার প্রয়াস পেয়েছি। প্রত্যেকটি বিবরণের শেষে তারিখও মুদ্রিত হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় বিবরণদাতাকে প্রকল্পের সাধারণ কিংবা বিশেষ প্রশ্নমালা দেয়া হয়ে-

ছিল। তিনি কখনো সেটি পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করেছেন কখনো আংশিকভাবে। কয়েকটি বিবরণ তাঁরা নিজেরাই লিখে দিয়েছেন কোন প্রশ্নমালা ছাড়া। এই সবগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য প্রশ্নসমূহ বাদ দিয়ে শুধু বক্তব্য মুদ্রিত করা হয়েছে।

সাক্ষাৎকারসমূহের ক্রমবিন্যাস বিবরণদাতার নামের আদ্যাক্ষর অনুসারে করা হয়েছে। এসবের মধ্যে সংসদ সদস্যদের সাক্ষাৎকারসমূহ বাংলা একাডেমী কর্তৃক স্বাধীনতালাভের অনতিপরে (১৯৭৩-৭৪ সালে) গৃহীত হয়েছিল। তথ্যাদির স্বল্পতা সত্বেও স্থানীয় এলাকার প্রতিনিধিত্বশীল হিসেবে এগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলি বাছাই করা হয়েছে বিবরণীতে উল্লেখিত তথ্য ও ঘটনাদির গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে।

উল্লেখ্য যে, সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও মুদ্রণের কাজ যুগপতভাবে করতে হয়েছে এবং এ কারণেই অপেক্ষাকৃত পরে গৃহীত একটি সাক্ষাৎকার সবশেষে সন্নিবেশিত হয়েছে আদ্যাক্ষর ক্রম ব্যতিক্রমে।

এই খণ্ডে মুদ্রিত সাক্ষাৎকারসমূহ বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ আন্দোলনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও তথ্য উদ্‌ঘাটিত করবে বলে আমরা আশা করি।

পরিশিষ্ট

[এক]

The Bangladesh Gazette, Part II, September 1, 1971, Page 51.
Ministry of Information & Broadcasting.

* * * * * * * * *

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৩শে আগস্ট, ১৯৭১

নং-তথ্য / ৪ই-২৫/৭১/৪১৪৮১ — স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে দৈনিক বাংলার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদে ১৯৭১ সনের ১লা জুলাই হইতে জনস্বার্থে এক বৎসরের জন্য চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইল।

২। চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি তাঁহার বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে—
আবদুস সোবহান
উপ-সচিব।

পরিশিষ্ট

[দুই]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
DACCA.

No. 51/2/78-Dev/231 Dated 18-7-1978.

RESOLUTION

In connection with the Writing and Printing the History of Bangladesh War of Liberation the Government have been pleased to constitute an Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members :

1.	Dr. Mafizullah Kabir,	Pro-Vice Chancellor, Dacca University.
2.	Professor Salahuddin Ahmed,	Chairman, Department of History, Jahangir Nagar University.
3.	Dr. Safar Ali Akanda,	Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.
4.	Dr. Enamul Huq,	Director, Dacca Museum.
5.	Mr. K. M. Mohsin,	Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University.
6.	Dr. Shamsul Huda Harun,	Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University.
7.	Dr. Ahmed Sharif,	Professor and Chairman, Deptt. of Bengali, Dacca University.
8	Dr. Anisuzzaman,	Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University.
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman,	O. S. D., History of Bangladesh War of Liberation Project.

The following shall be the terms of reference of the Committee :

(a) To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

(b) To determine validity and price of documents are required for the purpose.

Syed Asgar Ali
Section Officer.

পরিশিষ্ট

[তিন]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

DACCA

No. 51/2/78-Dev/10493/(25) **Dated : 13. 2. 1979.**

RESOLUTION

In partial modification of Resolution issued under No. 51/2/78-Dev/231, dated 18. 7. 78 Govt. have been pleased to reconstitute an Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members :

1. Dr. Mofizullah Kabir, Pro-Vice Chancellor, Dacca University — Chairman.
2. Prof. Salahuddin Ahmed, Chairman, Deptt. of History Jahangir Nagar University. — Member.
3. Dr. Anisuzzaman, Prof. Deptt, of Bengali, Chittagong University. — Member.
4. Dr. Safar Ali Akanda, Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi. — Member.
5. Dr. Enamul Huq, Director, Dacca Museum. — Member.
6. Mr. K. M. Mohsin, Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University. — Member.
7. Dr. Shamsul Huda Harun, Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University. — Member.
8. Dr. K. M. Karim, Director, National Library and Archive, Dacca. — Member.
9. Mr. Hasan Hafizur Rahman, O. S. D., History of Bangladesh War of Liberation Project. — Member-Secy.

2. The following shall be the terms of reference of the Committee :

To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

To determine validity and price of documents required for the Committee.

M. A. Salam Khan
Section Officer.

সূচীপত্র

অধ্যাপক আজিজুর রহমান মল্লিক

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে সমগ্র দেশবাসীর মতো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারীরা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয়। ৭ই মার্চে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ বেতার মারফত আমাদের শোনার সুযোগ হয় ৮ই মার্চ সকালে। ঐদিনই আমার পরামর্শ অনুসারে শিক্ষকেরা একটি সভায় মিলিত হয়ে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করবেন বলে অংগীকার করেন। এই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, অধ্যাপক আব্দুল করিম, অধ্যাপক মুহম্মদ রশিদুল হক, ডঃ আনিসুজ্জামান ও জনাব ফজলী হোসেন প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

তখন থেকে ২২শে মার্চ পর্যন্ত স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য আমরা এক ধরণের প্রস্তুতি নিই। চট্টগ্রাম সেনানিবাসের সন্নিহিত স্থানে অবস্থিত Council of Scientific & Industrial Research-এর ডক্টর আব্দুল হাইয়ের সংগে অধ্যাপক রশিদুল হক ও অধ্যাপক শামসুল হককে যোগাযোগ করতে নির্দেশ দেই। কারণ তিনিও আমাদের মতই প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বলে আমার জানা ছিল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরীতে হাত বোমা, গ্রেনেড ইত্যাদি তৈরী করা যায় কিনা সে বিষয়ে Experiment করতে অধ্যাপক শামসুল হককে* গোপনীয় মৌখিক নির্দেশ দেই। কিছু কিছু ছাত্রকে সামরিক ট্রেনিং দেবার চেষ্টা করা হয় ডঃ হাইয়ের উদ্যোগে। ইউ, ও, টি, সি-র ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ডক্টর এস, এম, আতহারকে আমি নির্দেশ দেই UOTC-র ডামী রাইফেলগুলো সক্রিয় করার চেষ্টা করতে। চট্টগ্রাম শহরে আয়োজিত সংস্কৃতিকর্মীদের প্রতিবাদ-সভা ও বিক্ষোভ-মিছিলে অন্যান্য অনেকের মধ্যে অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান ও ডঃ আনিসুজ্জামান সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। আরো আগে চট্টগ্রাম শহরে অবস্থিত বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী সংঘর্ষে আহতদের জন্য আমার সঙ্গে শিক্ষক-ছাত্ররা রক্ত দান করে।

২৩শে মার্চ সকালে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয় যে, ঐদিন বিকেলে চট্টগ্রাম শহরে সকল পর্যায়ের শিক্ষক ছাত্র ও জনসাধারণের প্রতিবাদ মিছিল বের হবে এবং তারপরে প্যারেড গ্রাউণ্ডে আমার সভাপতিত্বে শিক্ষক-জনতার সভা হবে। যদিও এ সম্পর্কে আমি আগে কিছু জানতাম না, তবু এই মিছিল ও সভায় আমি শিক্ষক ছাত্রসহ যোগ দিই। মিছিল বেশ বড় হয়, সভায় জনসমাবেশও হয় প্রচুর। পলো গ্রাউণ্ডের এই জনসভায় তিল ধারণের স্থান ছিলনা তাছাড়া মাঠের চারদিকে বাড়ীর ছাদেও অনেক নারী পুরুষ জড়ো হয়। এই সভায়

---

*তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

আমি জনতার সংগ্রামের সঙ্গে আমার একাত্মতা ঘোষণা করি। বাঙ্গালীর ন্যায্য অধিকার অর্জন করা পর্য্যন্ত সংগ্রামের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকবো সে অঙ্গীকারও করি। এ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আব্দুল করিম, অধ্যাপক আর আই চৌধুরী ও স্থানীয় নেতা মরহুম জহুর আহমদ চৌধুরী। উল্লেখ্য যে এই সভা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে যাঁরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আমার প্রাক্তন ছাত্র এবং তৎকালে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমদ। সভা চলাকালে সংবাদ আসে যে অস্ত্র বোঝাই 'সোয়াত' জাহাজ থেকে অস্ত্র নামাতে বাধা দেবার জন্য প্রায় ১০/১৫ হাজার মানুষ বন্দর এলাকায় বেষ্টনী সৃষ্টি করেছে এবং শহরের বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড স্থাপন করা হচ্ছে। সভায় উত্তেজনা বাড়ে। এমত অবস্থায় সভা মুলতবী করে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করি। কিন্তু ক্যান্টনমেন্টের কাছে ব্যারিকেড দেখে আবার ফিরে আসি এবং রাঙ্গুনিয়া হয়ে গ্রাম্য পথ ধরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ফিরি অনেক রাতে। অচিরেই যে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সঙ্গে নিরস্ত্র জনসাধারণের মুখোমুখি সংঘর্ষ হতে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে তখন আর আমার ও আমার সহকর্মীদের মনে কোন সংশয় থাকে না।

এই পরিস্থিতিতে প্রতিরোধের একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা আশু প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। ২৪শে মার্চ সকালে UBL* এর আঞ্চলিক ম্যানেজার জনাব কাদের এবং চট্টগ্রামের পুলিশ সুপার জনাব শামসুল হকের** সঙ্গে টেলিফোনে আমার কথাবার্তা হয়। সেই আলাপের ভিত্তিতে হাট হাজারী ও রাউজান থানার সঙ্গে আমি টেলি যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করি এবং শত্রুসৈন্য পথে বেরিয়ে পড়লে স্থানীয় জনসাধারণের সাহায্যে যাতে তাদের প্রতিরোধ করতে পারি তার জন্যও পরিকল্পনা প্রস্তুত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করি।

২৫শে মার্চ সারাদিন খুব উদ্বেগের মধ্যে কাটে। শহরের বিভিন্ন স্থানে সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে, এসব খবর টেলিফোনে পাই। যেমন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ জনাব ইউ, এন, সিদ্দিকীর বাড়ীতে এসে কিছু লোক তাঁর আগ্নেয়াস্ত্র চাইলে তিনি আমাকে ফোন করেন পরামর্শের জন্য। আমি তাঁকে অস্ত্র দিয়ে দিতে বলি। বিরাজমান অস্থিরতা ও উত্তেজনার ঢেউ বিশ্ববিদ্যালয়েও এসে লাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ও শিক্ষকদের নিয়ে আমার অফিসঘরে বসে আমরা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করি।

---

*তৎকালীন ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেড।

*উভয়েই মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় শহীদ হন।

২৫শে মার্চ রাত দশটার পরে আমার বাসায় টেলিফোন করে কেউ ঢাকা থেকে খবর দেন যে, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ট্যাংক ঢাকার পথে বেরিয়ে গেছে, সম্ভবতঃ সান্ধ্য আইন জারি হয়েছে এবং শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই খবর পেয়েই আমি শিক্ষকদের কয়েকজনকে আমার অফিসে আসতে বলি। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, ডঃ আর, আই, চৌধুরী, অধ্যাপক করিম, অধ্যাপক মুহম্মদ আলী, ডঃ আনিসুজ্জামান, জনাব মাহবুব তালুকদার, ওসমান জামাল ও রেজিস্ট্রার খলিলুর রহমান ছিলেন। আমরা প্রথমে চট্টগ্রামের সাংবাদিকদের কাছে পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নিই। তাঁরা কিছুই বলতে পারলেন না। এই সময় আমার আত্মীয় কুমিল্লার ডি, সি, শামসুল হক খান এর সঙ্গে ফোনে কথা হয়। তিনি জানান, যেকোন মুহূর্তে তাঁর জীবন বিপন্ন হতে পারে। কারণ তিনি বঙ্গবন্ধুর ডাকে ক্যান্টনমেন্টে গাড়ীর জ্বালানি সরবরাহ আগেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আমি তাঁকে অবিলম্বে কুমিল্লা সার্কিট হাউস থেকে সরে গিয়ে গ্রামের দিকে আশ্রয় নিতে বলি। এর পর তাঁর সঙ্গে আমার আর কোন যোগাযোগ হয়নি। তাকে সামরিক বাহিনী ধরে নিয়ে হত্যা করেছিল সে খবর অনেক দিন পরে পাই।

কুমিল্লার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর অনেক চেষ্টায় ঢাকায় 'পূর্বদেশ' ও 'ইত্তেফাক' অফিসে এবং আমার আত্মীয় ঢাকাস্থ নরউইচ ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স এর তৎকালীন প্রধান কর্মকর্তা জনাব আবদুল মান্নান খানের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে সক্ষম হই। কেউ কেউ সেখান থেকে বললেন যে, একটা কিছু ঘটেছে, কেউ কেউ বললেন কোন মারাত্মক ঘটনার খবর তাঁদের জানা নেই। তবে শহরে কারফিউ ঘোষণা করা হয়েছে এবং ট্যাংক ও সিপাহীরা রাস্তায় টহল দিচ্ছে। এ সময় চট্টগ্রামের একজন সাংবাদিক জনান যে, শেখ মুজিব আত্মগোপন করেছে বলে শোনা যাচ্ছে। আমরা যখন ঢাকার কথা বলছি, তখন ঢাকার সঙ্গে টেলিফোন সংযোগ হঠাৎ ছিন্ন হয়ে যায় অনুমান রাত সাড়ে এগারোটার দিকে। আমরা আরো-দু-তিন ঘন্টা বসে থেকে আলাপ-আলোচনা করি এবং সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। ঢাকাতে সাংঘাতিক কিছু ঘটতে পারে এই যুক্তির ওপর আমি বার বার জোর দিই। এর প্রেক্ষিতে আমাদের প্রস্তুতি জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেই এবং সেই রাত থেকেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের অফিস আমাদের স্থানীয় সংগ্রাম প্রচেষ্টার সদর দপ্তরে পরিণত হয়। নেতৃত্বের দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই আমার ওপরে বার্তায়। সারা রাত অফিসে কাটিয়ে ভোর সাড়ে চারটায় বাসায় ফিরে এসে সবে মাত্র গোছল করতে বাথরুমে গিয়েছি তখন চট্টগ্রাম শহর থেকে কোষাধ্যক্ষ সিদ্দিকী সাহেবের ফোন পাই। তিনি জানান যে তাঁর বাড়ীতে কয়েকজন তাদানিন্তন ই বি আর-এর যুবক অস্ত্র সহ উপস্থিত হয়েছে। তারা এই বাড়ীতে ঘাটি স্থাপন করবে

শত্রু পক্ষের মোকাবেলার জন্য। আমি ফোনে সেই উত্তেজিত যুবকদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি যে তারা জীবন নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট থেকে অস্ত্র সহ বেরিয়ে এসেছে এবং আরও অনেক দল বের হয়ে গেছে। তাদের সঙ্গে অস্ত্র ও গুলি-গোলা আছে। তারা সিদ্দিকী সাহেবের বাড়ী থেকে ক্যান্টনমেন্ট এর সঙ্গে যুক্ত শহরের রাস্তার ওপর নজর রাখবে এবং পাকিস্তানী সৈন্য রাস্তায় বের হলেই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। এ বাড়ী তাই তাদের দরকার। আমি সিদ্দিকী সাহেবকে পরিবারেব সবাইকে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে কাছাকাছি অন্য বাড়ীতে যেতে বলি এবং এদের খাবার দাবারের ব্যবস্থা করতে বলি। তখন শহরে স্থানে স্থানে খণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। টেলিফোনে গোলাগুলির আওয়াজ পাচ্ছিলাম এবং ছেলেরাও জানাল তাদের দক্ষিণদিকের একটা বাড়ী থেকে এ বাড়ী লক্ষ্য করে গোলা ছোঁড়া হচ্ছে এবং বিদ্যুতের তারের খুঁটিতে আঘাত লেগে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। পরে আমরা জানতে পারি দক্ষিণের ঐ অবাঙ্গালী বাড়ীতে আগেই প্রস্তুতি হিসেবে শত্রু সৈন্য মোতায়েন ছিল।

২৬শে মার্চ সকালে এখবর আসার পর আওয়ামী লীগের জনাব এম, আর, সিদ্দিকী ও জনাব এম, এ, হান্নানের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে ঢাকা ও চট্টগ্রামের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আরও খবর জানতে পারি। কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে ক্যাপ্টেন রফিক সি, আর, বির টিলায় অবস্থান নিয়েছিলেন। আনিসুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর টেলিফোনে কথা হয় এবং পারস্পরিক এলাকার সংবাদ বিনিময় হয়। চট্টগ্রাম ডাকবাংলোতে অথবা রেলওয়ে রেস্ট হাউসে সংগ্রাম পরিষদের একটি অফিস কাজ করছিল। সেখান থেকে একজন টেলিফোন করে অনিসুজ্জামানকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করে শোনান এবং তা লিখে নিয়ে সবাইকে জানাতে বলেন। এরপর চট্টগ্রামের বেতার তরঙ্গে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ঘোষণা শুনতে পাই। জনাব এম, এ, হান্নান বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা পাঠ করেন এবং পরে সকলকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লালদিঘি ময়দানে জমায়েত হতে নির্দেশ দেন। আমি টেলিফোন করে কালুরঘাটে এবং ডাকবাংলোতে বলি যে, এই ঘোষণা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা দরকার, কেননা, ওরকম জমায়েতের ওপর বিমান থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা আছে। পরে তাঁরা এই সমাবেশ বাতিল করার ঘোষণা দেন। এ ব্যাপারে আমার যে আশঙ্কা ছিল পরবর্তী সময়ে তা সত্যে পরিণত হয়। পাকিস্তানের কয়েকটি জঙ্গী বিমান চট্টগ্রাম শহর প্রদক্ষিণ করার পর কালুরঘাটে বোমা বর্ষণ করে।

২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় রাঙ্গামাটি থেকে জিলা প্রশাসক জনাব হাসান তৌফিক ইমাম টেলিফোনে আমাকে জানান যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং উত্তর চট্টগ্রাম থেকে ই পি আর এর জওয়ানদের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এসে জমায়েত হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন তাদের দায়িত্ব নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ

করি। রাতে প্রায় আড়াইশ জওয়ান ক্যাম্পাসে এসে পৌঁছোন। আমরা তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করি। আলাওল হল ও এ, এফ, রহমান হলে তাদের থাকবার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তখন থেকে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব আমরা শিক্ষক ও অফিসারদের মধ্যে ভাগ করে দেই। যেমন, কেউ খাবারের তত্ত্বাবধান করেন, যানবাহনের দায়িত্ব নেন কেউ, পেট্রোলের জন্য পাম্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে স্লিপ দেবার দায়িত্ব দেয়া হয় কাউকে, ছাত্রদের স্বেচ্ছাসেবার নেতৃত্ব নেন কেউ। আমি অফিসে থাকি এবং আমাকে সর্বক্ষণ সহায়তার ভার দেয়া হয় আনিসুজ্জামানকে।

ই, পি, আর-এর জওয়ানদের প্রতিরোধ কার্যক্রমে তাৎক্ষণিকভাবে নেতৃত্ব দেবার জন্য পেয়েছিলাম সুবেদার আব্দুল গণিকে। সেই রাতেই আমার অফিস থেকে সি, এস, আই, আর-এ ডঃ হাইকে ফোন করে ক্যান্টনমেন্টের যতটুকু খবর আঁচ করা সম্ভব, তা জেনে নিই এবং ই, পি, আর-এর জওয়ানদের দিয়ে ক্যান্টনমেন্টের উত্তর দিক (হাটহাজারী রাস্তার পূর্বদিকের এলাকা) ঘিরে রাখার কৌশল স্থির করা হয়। ক্যান্টনমেন্টের উত্তরাঞ্চলে ছিল পাহাড় ও জংগল এবং সামান্য জনগোষ্ঠির বাস। বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্যাপগ্রাফিক ম্যাপ ছিল। আমার অফিসে বসে ম্যাপ দেখে ট্রেঞ্চ কাটার জায়গা নির্দিষ্ট হয় এবং ক্যাম্পাসে কনট্রাকটরদের শ্রমিক দিয়ে রাত্রেই পরিখা খনন করা হয়। পরদিন জওয়ানদের নির্দিষ্ট জায়গায় পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং তাদের প্রত্যেককে প্যাকেট লাঞ্চ দেয়া হয়। এব্যাপারে গ্রাম্য জনসাধারণ আমাদের আবেদনে সাড়া দেন এবং যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাঁরা সাধ্যমত চাল-ডাল-তরকারী, আটা, ময়দা, গরু, ছাগল, মুরগী আমাদের কাছে পৌঁছে দেন দান হিসেবে। তবে তাঁদের কাছ থেকে কোন অর্থ আমরা গ্রহণ করিনি। সৈন্যদের পথ দেখানোর কাজেও তাঁরা যথেষ্ট সাহায্য করেন। উল্লেখ্য যে, ই, পি, আর দের সাহায্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের এক মাইল দূরে রেল লাইনের পূর্ব দিকে বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগের জন্য ওয়ারলেস সেট স্থাপন করা হয়েছিল।

২৭শে মার্চ বেতারে মেজর জিয়ার প্রথম ঘোষণা প্রচারিত হয়। তা শুনেই আমি হান্নান সাহেবকে টেলিফোনে বলি যে, ঘোষণায় বঙ্গবন্ধুর নাম যোগ করা আবশ্যক। নইলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিষয় বিবেচিত হবে না। মেজর জিয়া পরবর্তী ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধুর নাম করে, তাঁর পক্ষ থেকে।

২৭শে ও ২৮শে মার্চ ই, পি, আর এর আরও কিছু জওয়ান এবং চট্টগ্রাম সেনানিবাস থেকে আত্মরক্ষা করে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছু সৈন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসে। সব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত এদের সংখ্যা দাঁড়ায় চারশ'র বেশী। কিন্তু ই, পি, আর ও ই, বি, আর-এর জওয়ানদের একসঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়। এস, পি, শামছুল হক, মেজর জিয়া ও ক্যাপ্টেন ভুঁইয়ার সঙ্গে আমার

টেলিফোনে যোগাযোগ ছিল। পরস্পরের কাছে পরিচিত হবার জন্য আমরা ভিন্ন কিন্তু নির্দিষ্ট নাম ব্যবহার করতাম। আমাকে দেয়া নাম ছিল 'ড্যানিয়েল'। যোগাযোগ করা ক্রমশঃ কঠিন হয়ে উঠছিল, কেননা ক্রমেই তাঁদের অবস্থান এমন জায়গায় হচ্ছিল যেখানে টেলিফোনে কথা বলা যাচ্ছিল না। যাহোক, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থানরত জওয়ানদের যুদ্ধ ব্যাপারে নেতৃত্ব দেবার জন্য আমি সেনাবাহিনীর একজন অফিসার ক্যাপ্টেন রফিক-এর মারফত চেয়ে পাঠাই। তাঁরা পাঠান একজনকে। (পরে দেখি তিনি আমার পূর্ব পরিচিত ও আমার বড় ছেলের বন্ধু)। তাকে নিয়ে একটা ভুল বুঝা-বুঝি হয়। তিনি সরাসরি আমার অফিসে এসে জওয়ানদের দায়িত্ব গ্রহণ না করে, ক্যাম্পাসে আমার সংগৃহীত অস্ত্র শস্ত্র দেখে আরো অস্ত্র সংগ্রহের জন্য বর্ডারে যাবার কথা বলেন এবং এ ব্যাপারে কর্তব্যরত অধ্যাপকের কাছে একটি গাড়ী চান। অধ্যাপক একথা আমাকে ফোনে জানান। ক্যাপ্টেন ভুঁইয়া কিংবা মেজর জিয়া যে তাকে পাঠিয়েছেন তা তিনি জানালেও আমরা সরাসরি কোন খবর কালুরঘাট থেকে পাইনি বলে উক্ত অফিসার সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহের উদ্রেক হয়। তখন তাকে আমি আমার অফিসে ডেকে পাঠাই এবং জিজ্ঞাসাবাদ করি। তাতেও সন্দেহ নিরসন না হওয়াতে ই. পি, আর-এর এক নায়েক এবং দুই সিপাহীর সাহায্যে তাকে এবং তার দুজন সহচর ছাত্রকে নিরস্ত্র করি এবং ভাইস চ্যান্সেলরের ভিজিটরস রুমে পাহারাধীন রাখি। তাদের উদ্দেশে আমি বলি যে দেশ এক সংকটময় পরিস্থিতিতে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত। এ অবস্থায় কারও চালচলনে সন্দেহের উদ্রেক হলে তাকে এভাবে বন্দী রাখতে হয়। মেজর জিয়ার ক্যাম্প থেকে তাদের সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করে তার পর সিদ্ধান্ত নেব। ক্যাপ্টেন ভুঁইয়াকে ফোনে যোগাযোগ করি। তিনি বলেন যে, উক্ত অফিসারকে দুজন ছাত্র সহ পাঠিয়েছি। আমার বক্তব্য, তাই যদি হয়, তবে আমার সংগে দেখা না করে এলাকার দায়িত্ব না নিয়ে চলে যাচ্ছিল কেন। যাহোক, তখন ঐ অফিসারকে মুক্ত করে আমি জিয়ার ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিই এবং অন্য কোন সিনিয়র অফিসার পাঠাতে অনুরোধ করি। সঙ্গের দুজন ছাত্রকেও তার সঙ্গে পাঠাই কারণ এটা প্রমাণিত হয় যে, তারা প্রতিরোধ সংগ্রামে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দিতে মেজর জিয়ার ক্যাম্পে গিয়েছিল। ক্যাপ্টেন ভুঁইয়ার নির্দেশে অফিসারকে নিয়ে আমাদের এখানে আসে। তারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত নয়। ছাত্রদের পরিচিতি সম্বন্ধে স্থানীয় নেতাদের কাছ থেকে* খবর নিয়ে জানতে পারি যে, তাদের বক্তব্য সত্য। তখন ঐ দুটি ছাত্রকে দিয়ে উক্ত অফিসারকে কালুরঘাট পাঠানো হয় ক্যাপ্টেন রফিকের নিকট। ছাত্র দুটি যখন ফিরে আসছিল তখন তারা পাক বাহিনীর গুলিতে নিহত হয়। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে ক্যাম্পাস থেকে সংগ্রাম পরিচালনার সময় আমাদের ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দুইজন সদস্য আব্দুর

---

* জনাব আখতারুজ্জামান তাদের মধ্যে একজন।

রব (তৎকালীন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক) এবং ফরহাদ কাপ্তাই রোডের ওপর এক গেরিলা অপারেশনে মৃত্যু বরণ করে।

২৯শে মার্চ সেনাবাহিনী ও পুলিশের অফিসারদের সংগে আমাদের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। মনে হয় তারা অবস্থান পাল্টেছেন, কিন্তু আমাদের খবর দেবার সময় পাননি।

পক্ষান্তরে আমরা চট্টগ্রাম শহরের পতনের সংবাদ পাই। ইতিমধ্যে শত্রুর গুলিতে পশ্চিমে অবস্থানরত আমাদের কয়েকজন জওয়ান আহত হয়। এমতাবস্থায় প্রতিরোধ এখান থেকে জোরদার করা সম্ভব নয় বলে জওয়ানদের পক্ষ থেকে আরও উত্তরে চলে যাবার প্রস্তাব আসে। আমরা একমত হই। তারা নাজিরহাটে যাবে সিদ্ধান্ত হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের সংগে অবস্থানকারী জওয়ানরা গন্তব্যস্থলের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্রে ডাঃ আবুল বশর ও ডাঃ আখতারুজ্জামানের চিকিৎসাধীন কয়েকজন আহত যোদ্ধা ছাড়া তার প্রায় কোন যোদ্ধাই আমাদের হাতে রইলনা। এর পরে শহর থেকে গ্রাম্য পথ ঘুরে যোদ্ধবেশে কিছু আওয়ামী লীগ কর্মী ও নেতা এবং ইউ, ও, টি, সির কিছু প্রশিক্ষণরত ছাত্র ও অফিসার বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পৌছোন, কিন্তু ক্যান্টনমেন্ট অবরোধ করে রাখা অসম্ভব দেখে তারাও অন্যত্র চলে যান। এদিকে ক্যাম্পাস থেকে উত্তর চট্টগ্রাম বা রাঙ্গামাটির রাস্তায়ও স্থানীয় জনসাধারণ ব্যারিকেড স্থাপন করতে শুরু করে। এই অবস্থায় আমরা স্থির করি যে ৩০শে মার্চ ক্যাম্পাস থেকে সব শিশু বৃদ্ধ ও নারীকে স্থানান্তরিত করা হবে। কয়েকটি বাসে করে কিছু পরিবার নাজির হাটে পাঠিয়ে দেয়া হয়, অন্যেরা গিয়ে আশ্রয় নেন কুণ্ডেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ের হোস্টেলে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের বেতন বন্ধ ছিল কারণ হাতে টাকা ছিল না এবং ব্যাংক বন্ধ ছিল। কিছু কর্মচারী ব্যাংকের দরজা ভেঙ্গে টাকা নেয়ার প্রস্তাব করে। আমি তাদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিই এবং ব্যাংক লুঠ করা চলবেনা বলে দিই। আমার বাসায় যে ব্যক্তিগত টাকা ছিল* সেখান থেকে চার হাজার টাকা নিয়ে এবং অধ্যাপক আর, আই, চৌধুরীর কাছে যে ২/৩ হাজার বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসের টাকা ছিল তা নিয়ে নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের বাড়ী যাবার ভাড়া তাৎক্ষণিকভাবে দিয়ে দিই এবং তাদের যার যার বাড়ীতে চলে যেতে বলে তাদের কাছ থেকে আমি বিদায় নিই। ৩১শে মার্চ রাতে ক্যাম্পাস প্রায় খালি হয়ে যায়। ডাক্তার দুজনের হাতে চিকিৎসাধীন চার পাঁচজন যোদ্ধাকে রেখে ১লা এপ্রিল সন্ধ্যায় আমার পরিবার, রেজিস্ট্রারের পরিবার এবং আনিসুজ্জামানকে** নিয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করলাম। আমি স্ব-পরিবারে

---

*উল্লেখ্য, আমার ব্যক্তিগত গাড়ী বিক্রয়ের দশ হাজার টাকা ব্যাংক বন্ধ থাকায় বাসায় ছিল।

**তার পরিবার আগেই কুণ্ডেশ্বরীতে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

রাউজানে আশ্রয় নিলাম। ক্যাম্পাসে ভি, সির বাসগৃহ ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় আমার সেক্রেটারী ইনস্যুরেন্স পলিসি, শেয়ার সার্টিফিকেট ইত্যাদির কিছু কাগজ-পত্রের ব্যক্তিগত ফাইল আমার পাসপোর্ট সহ আমার সামনে এনে হাজির করে সঙ্গে নেবার জন্য। আমি ওই পাসপোর্ট সবার সামনে ছিঁড়ে ফেলেছিলাম কারণ, তখন আমি আর পাকিস্তানী নই, তাই পাকিস্তানী পরিচয়ে কোন পাসপোর্ট সঙ্গে রাখতে চাইনি। অন্যান্য কাগজপত্রের ফাইলটিও ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল, যতক্ষণ না দেশ স্বাধীন হচ্ছে ততক্ষণ কোন বীমা, কোন শেয়ার সার্টিফিকেটের দরকার নেই। পরবর্তীকালে দেশ স্বাধীন হবার পর আমার সেক্রে-টারী ঐ ছুঁড়ে ফেলে দেয়া ফাইলটি আমার ড্রাইভারকে দিয়ে আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

রাউজানে আমি সপ্তাহখানেক ছিলাম। ইতিমধ্যে সার্বিক পরিস্থিতি আমাদের প্রতিকূলে চলে যায়। সকলেই নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করতে থাকে। কুণ্ডেশ্বরীতে যারা আশ্রয় নিয়েছিলেন, তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েন। সেখানে আশ্রয় দাতা নূতনচন্দ্র সিংহের পরিবারও স্থান ত্যাগ করেন। নূতন বাবু শূন্য গৃহে রয়ে যাবার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। পরে ১৩ই এপ্রিল, হানাদার বাহিনী তাকে হত্যা করে।

সম্ভবতঃ ৮ই এপ্রিল আমি রাউজান থেকে নাজিরহাটে চলে যাই। ওখানে তখন আমাদের সহযোগী জওয়ানরা ছিলেন। সেখানে এক রাত তাদের সঙ্গে থেকে রামগড়ের পথে রওয়ানা হই। সপরিবারে অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, অধ্যাপক রশিদুল হক ও ডঃ মাহমুদ শাহ কোরেশী আমার সঙ্গে আসেন। উল্লেখ্য নাজিরহাট থেকে আমার সঙ্গে যায় মুক্তিযোদ্ধা কয়েকজন, তাদের সঙ্গে কালুর ঘাট থেকে সরিয়ে আনা ট্রান্সমিটার সেট ছিল। এদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের একজন ছাত্র-মুক্তিযোদ্ধাও ছিল।

১০ই এপ্রিলে হানাদার বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দখল করে। ১১ই থেকে ১৪ই এপ্রিলের মধ্যে রামগড়ে স্বপরিবারে এসে পৌঁছোন অধ্যাপক শামসুল হক, ডঃ আনিসুজ্জামান, ওসমান জামাল, অন্য শিক্ষকদের মধ্যে সরিৎকুমার সাহা, নূরুল ইসলাম খোন্দকার প্রভৃতি; এবং বেশ কিছু ছাত্র। ছাত্রেরা অনেকেই সাবরুম হয়ে ভারতে প্রবেশ করে এবং এদের মধ্যে কেউ কেউ দু'চার দিনের সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরে এসে শত্রুর মোকাবিলা করে। আমাদের ছাত্র শহীদ ইফতিখার ছিল তেমন একজন।

রামগড়ে এসে মেজর জিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক পুনরায় স্থাপিত হয়। সেখান থেকেই তিনি তখন যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মেজর শামসুদ্দীন (ই পি আর), ক্যাপ্টেন রফিক, ক্যাপ্টেন আফতাব (গোলন্দাজ বাহিনী,)

ক্যাপ্টেন ভুঁইয়া প্রমুখ। রাঙ্গামাটি থেকে হাসান তৌফিক ইমাম ও এস, পি বজলুর রহমান আমাদের আগেই এখানে এসে যোগ দিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের কিছু নেতৃস্থানীয় কর্মী তাঁদের কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ঢাকা থেকে সাদেক খানও সেখানে এসে পৌঁছোন। রামগড়ে মুক্তিযুদ্ধের কাজে এবং আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সর্বাত্মক সাহায্য করেন সেখানকার চা বাগানের ম্যানেজার জনাব আব্দুল আউয়াল। রামগড় অবস্থানের শেষ দিন ভোরে ক্যাপ্টেন কাদের আমার সঙ্গে দেখা করে তাঁর উপর জিয়া কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে যান পার্বত্য চট্টগ্রামে। তিনি এই অপারেশনে নিহত হন।

এপ্রিলের মাঝামাঝি রামগড় থেকে আগরতলায় গিয়ে পৌঁছাই। দেশের মাটি ছাড়ার সময় আমরা যারা চলে যাচ্ছিলাম এবং আমাদের যেসব বন্ধু তখনও দেশে রয়ে গেলেন, সকলেরই চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। আমি আনিসুজ্জামানকে তখন বলেছিলাম, মন খারাপ করোনা, এই বছর শেষ হবার আগেই আমরা স্বদেশে ফিরে আসব। আমি জানিনা, সেই দুরবস্থার সময়ে এ প্রত্যয় কি করে আমার মনে জন্মেছিল। তবে মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টাতে একথা আমি বহুজনকে বহুবার বলেছিলাম। এমনকি জুন মাসেই সিদ্ধার্থ সঙ্কর রায়কে বড়দিন উপলক্ষে চট্টগ্রামে আসার জন্য অগ্রিম নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম।

আগরতলায় একটি পরিত্যক্ত বাসগৃহে আমার ও পরিবারের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। অদূরে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজের একটি পরিত্যক্ত হোস্টেলে সৈয়দ আলী আহসান, রশিদুল হক ও কোরেশীর স্থান হয়। পরে এই হোস্টেলেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুল হক, আনিসুজ্জামান, ওসমান জামাল, চা বাগানের আব্দুল আউয়াল এবং মেজর শামসুদ্দীন, মেজর শওকত ও মেজর শফিউল্লার পরিবার আশ্রয় লাভ করেন। এক-একটি কক্ষে এক-একটি পরিবার থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

আগরতলায় আমার অনেক আগেই এসে পৌঁছেছিলেন জনাব এম, আর, সিদ্দিকী ও জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে কর্মপন্থা স্থির করার চেষ্টা করি। কিন্তু তাৎক্ষণিক কিছু করার ছিলনা। তখন আমরা সকলেই স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার অপেক্ষা করছি। স্রোতের মতো শরণার্থী আসছে। ঢাকা থেকেও অনেক বন্ধু, পরিচিত, স্বজন সেখানে এসে পৌঁছাচ্ছেন। এখানে একদিনের দুপুরের খাবারের কথা আমার মনে পড়ে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খাবারের আয়োজন ছিল বেশ উন্নতমানের। আমরা খেতে বসেছিলাম। এই কদিন আমাদের সঙ্গে যেসব ছেলে কাজ করছিল তাদের যে দুরবস্থা আমি দেখেছি তা ভেবে আমার বিবেক নাড়া দিল, আমি খেতে পারলামনা। সৈয়দ আলী আহসান ও অন্যান্য সহযোগীদের বলে আমি উঠে এলাম এবং একটি সস্তা হোটেলে গিয়ে রুটি ও নিরামিষ খেলাম। প্রতিরোধ

যুদ্ধে পিছু হটলেও সীমান্তের কাছাকাছি তখনও যুদ্ধ চলছে। মেজর খালেদ মোশাররফ এসে ২/৩ রাত আমাকে যুদ্ধ ক্ষেত্রের কাছে নিয়ে যান। অচিরেই তাঁকে সদলে পিছু হটতে হয়। সঙ্গী অফিসারদের নিয়ে মেজর খালেদ মোশাররফ ও মেজর জিয়া আগরতলায় চলে আসেন। কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে আমার আগরতলায় পরিচয় হয়। ট্রান্সমিটার সমেত স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রও উঠে আসে আগরতলায়। কিন্তু এর প্রচার শক্তি এত সীমাবদ্ধ ছিল যে, কর্মীদের আপ্রাণ প্রচেষ্টার ফল ঘরে ঘরে পৌঁছোতে পারেনি। পরে ডঃ ত্রিগুনা সেন যখন আগরতলা সফরে আসেন, তখন তাঁকে আমরা অনুরোধ জানিয়েছিলাম আমাদের বেতারের জন্য শক্তিশালী ট্রান্সমিটার সরবরাহ করতে।

আগরতলায় থাকতে একদিন দৈনিক 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় খবর দেখলাম যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরকে পাওয়া যাচ্ছেনা। ব্যাপারটা ছিল এই যে, এপ্রিল মে মাসে কাঠমুণ্ডু বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে আমার প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেবার কথা ছিল। নেপালী কর্তৃপক্ষ তাই পাকিস্তান সরকারকে আমার বিষয়ে লিখেন। পাকিস্তান সরকার জানান যে, আমাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। কাঠমুণ্ডুর কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে খবরটা ঐভাবে প্রকাশ পায়। পরে পাকিস্তান সরকার অনেক শরণার্থী সম্পর্কে ভারত সরকারকে লিখেছিলেন যে, দুষ্কৃতকারীরা তাঁদের ধরে ভারতে নিয়ে গেছে, এসব ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে পাকিস্তান সরকারের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হোক। এই তালিকায় অবশ্য আমার নাম ছিলনা।

মে মাসের প্রথম দিকে জনাব আবদুল মালেক উকিল কলকাতা থেকে এক সন্ধ্যায় আগরতলায় আমার বাসায় আসেন। তিনি বললেন, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে দিল্লী যাবার জন্য। উকিল সাহেব আমার কলকাতা যাবার বিমানের টিকিটও নিয়ে এসেছিলেন। পারিবারিক ব্যবস্থা সাঙ্গ করে কলকাতায় পৌঁছুতে আমার দুই দিন বিলম্ব হল। তাজউদ্দীন সাহেব দিল্লী চলে গিয়েছিলেন, আমার আর তখন যাওয়া হল না। এখানে উল্লেখ করতে চাই, মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে অবস্থানকালে সপরিবারে আমার ব্যয় নির্বাহের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আমাকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু আমি তা গ্রহণ করিনি। দেশের বাইরে অবস্থানরত আত্মীয়স্বজন, ছাত্র-ছাত্রী ও বন্ধু বান্ধবদের নিকট হতে প্রাপ্ত সাহায্য সামগ্রী দিয়েই আমি সংগ্রামের দিনগুলি কাটিয়েছি।

কলকাতা পৌঁছে বাংলাদেশ মিশন অফিসে আমাকে নেয়া হয়। হোসেন আলী সাহেব তখন বাংলাদেশ সরকারের আনুগত্য প্রকাশ করে এই মিশনের অস্থায়ী প্রধানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, বিদেশে অবস্থানরত বিচারপতি আবু সায়ীদ চৌধুরীকে টেলিফোনে বাংলাদেশ সরকারের

পক্ষে কাজে যোগদানের অনুরোধ জানাতে। কলকাতায় তাঁদের ধারণা ছিল, বিচারপতি চৌধুরী এখনো দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে আছেন। টেলিফোন বুক করা হল। কিন্তু লাইন পাওয়া গেলনা। শেষে তাঁর কাছে পাঠানোর জন্য আমি ম্যাসেজ রেখে গেলাম যে, আমি এসে গেছি উনি যেন বাংলাদেশের সমর্থনে কাজ করতে নেমে যান।

কলকাতায় এসে আমার প্রথম কাজ হয় Bangladesh Liberation Council of Intelligentsia গঠন করা। দেশের যেসব বুদ্ধিজীবী, শিল্পী ও অন্যান্য সংস্কৃতি-কর্মী ততদিনে কলকাতায় শরণার্থী হয়েছেন, তাঁদের সংগঠিত করে মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে কাজ করা ছিল এর উদ্দেশ্য। আমি সভাপতি নির্বাচিত হই, জহির রায়হান নির্বাচিত হন সাধারণ সম্পাদক। সৈয়দ আলী আহসান, সারওয়ার মুর্শিদ, ব্রজেন দাশ, ফয়েজ আহমদ, কামরুল হাসান প্রমুখ এই কমিটিতে ছিলেন। প্রথম দিকে এই কমিটির কর্মকর্তাদের কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয় আমার প্রাক্তন ছাত্রী, সে সময়ে লরেটো কলেজের অধ্যাপিকা ডঃ পি সি ঘোষ-এর বাস ভবনে। তিনি এবং তাঁর স্বামী কমল ঘোষ ব্যক্তিগতভাবেই কমিটির কর্মকর্তাদের আপ্যায়ন এবং সভার অন্যান্য আনুসংগিক খরচাদির ব্যয়ভার বহন করতেন। এই বুদ্ধিজীবী সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে নেতাজী রিসার্চ ইনস্টিটিউটে বাংলাদেশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। এখানে আমার দুই মেয়ে এমি ও রানা তথ্য সংগ্রহের ব্যপারে সেচ্ছাসেবিকা হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটভূমি, মুক্তিযুদ্ধের গতি, শরণার্থীদের অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগৃহীত হয়। অরুপ চৌধুরীর অফিসও এই পরিষদের কাজে এবং পরবর্তিতে স্থাপিত শিক্ষক সমিতির কাজে ব্যবহার করা হয়। পরে বাংলাদেশের শিল্পীদের দিয়ে বিভিন্ন স্থানে সংগীতানুষ্ঠান ও প্রচারমূলক অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থাও হয় পরিষদের উদ্যোগে। এর কাজে কলকাতার মৈত্রেয়ী দেবী, গৌরী আইয়ুব, বিচারপতি মাসুদ এবং অধ্যাপক আবদুল ওয়াহেদ মাহমুদ খুব সাহায্য করেছিলেন।

ইতিমধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেনকে সভাপতি করে ও দিলীপ চক্রবর্তীকে সাধারণ সম্পাদক করে গঠিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করা এবং বাংলাদেশের শরণার্থী শিক্ষকদের নানাভাবে সাহায্য করা। আমি কলকাতা এলে এঁদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়। আলাপক্রমে স্থির হয় যে বাংলাদেশের শিক্ষকদের একটা সংগঠন থাকলে উভয় পক্ষেই কাজের সুবিধে হবে। আমি তখন এই কাজের উদ্যোগ নিই। আনিসুজ্জামানকে আগরতলা থেকে ডেকে পাঠাই এবং কয়েকদিনের প্রস্তুতির পর দ্বারভাঙ্গা হলে বাংলাদেশের সকল পর্যায়ের শিক্ষকদের এক সভা আহ্বান করি। কয়েক হাজার শিক্ষক এই সভায় যোগদান করেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে জনাব কামরুজ্জামানও বক্তৃতা দেন। সভার সভাপতিরূপে আমি যে ভাষণ দিয়ে-

ছিলাম তা পরে কলকাতা বেতার থেকে প্রচারিত হয়। এই সভায় আমাকে সভাপতি ও আনিসুজ্জামানকে সাধারণ সম্পাদক করে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি গঠিত হয়। সহ-সভাপতিদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান, সারওয়ার মুর্শিদ ও জনাব কামরুজ্জামান (এম পি)।

'লিবারেশন কাউন্সিল অব ইনটেলিজেন্টসিয়া' গঠন করা নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। কেউ কেউ সরকারকে এমন ধারণা দিয়েছিলেন যে সরকারী উদ্যোগের বাইরে যেভাবে আমরা এই পরিষদ গঠন করেছি তাতে সরকারের সঙ্গে অসহযোগের সম্ভাবনাই বেশী থাকবে। আমাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ এমন ধারণা করেছিলেন যে সরকার এক ধরণের দলীয় নিয়ন্ত্রণ আমাদের ওপরে অরোপ করতে যাচ্ছেন। শিক্ষক সমিতি গঠনের পূর্বমুহূর্তেও আবার এ-ধরণের একটা ভাবের সৃষ্টি হয়। ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম এম পি ও জনাব কামরুজ্জামান এম পি র মাধ্যমে প্রধান-মন্ত্রী তাজউদ্দীন এক সন্ধ্যায় আমাকে ও আনিসুজ্জামানকে ডেকে পাঠান। তিনি বলেন যে আনিসুজ্জামান প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে যুক্ত থাকলে তাঁর কাজে সুবিধে হবে অতএব তাঁকে যেন শিক্ষক সমিতিতে বড় দায়িত্ব না দেয়া হয়। আমিরুল ইসলামও এই বক্তব্য সমর্থন করেন। কিন্তু আমরা আগে থেকে যেভাবে ভেবে এসেছিলাম তার ফলে এই প্রস্তাবে সম্মত হইনি। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকার পরিকল্পনা সেল গঠন করলে ডঃ মুজাফফর আহমদ, ডঃ সারওয়ার মুর্শিদ, ডঃ মোশাররফ হোসেন ও ডঃ স্বদেশ বসুর সঙ্গে ডঃ আনিসুজ্জামানকে তার সদস্য করা হয়। তখন আনিসুজ্জামান শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পা-দকের দায়িত্ব ত্যাগ করেন এবং সেই ভার অর্পিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ অজয় রায়ের ওপরে।

শিক্ষক সমিতির কাজ ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির সঙ্গে মিলে বাংলাদেশের শরণার্থী শিক্ষকদের সাহায্য করা, শরণার্থী শিবিরে প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্যালয় চালানো, প্রচার পুস্তিকা প্রণয়ন করা, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিক্ষকদের কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন চেয়ে পত্র লেখা ও পুস্তিকা প্রেরণ করা এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি প্রচারা-ভিযান চালানো। বহু শিক্ষককে আমরা সহায়ক সমিতির তহবিল থেকে সাহায্য করতে পেরেছিলাম, শরণার্থী শিবিরে কিছু কিছু বিদ্যালয় খুলে বালক-বালিকা-দের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা রাখার ও শিক্ষকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা গিয়ে-ছিল। কয়েকটি পুস্তিকা আমরা প্রকাশ করেছিলাম ইংরেজিতে। তার মধ্যে 'পাকিস্তানবাদ ও বাংলাদেশ' সম্পর্কে ওসমান জামালের লেখা একটি পুস্তিকা এবং বাংলাদেশে গণহত্যা সম্পর্কে একটি সচিত্র পুস্তিকা উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষকদের কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমরা

চিঠি লিখি এবং আশাব্যঞ্জক ও সমর্থনসূচক উত্তর পাই। অস্ট্রেলিয়া ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ এল বাসামকে লেখা আমার চিঠি, তিনি আমার অনুমতি নিয়ে সাইক্লোস্টাইল করে সে দেশের প্রধান মন্ত্রী ম্যালকম ফ্রেজার সহ অনেক নেতাকে পাঠান এবং আমাদের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দিতে অনুরোধ করেন। আমেরিকা ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পরিচিত অধ্যাপকের কাছে লিখা আমার চিঠি মোটামুটি একইভাবে ব্যবহার করা হয়।

ভারতে আমরা যে প্রচারাভিযান চালাই, তার প্রথম পর্বের সম্পূর্ণ উদ্যোগ ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির। এই সমিতির দিলীপ চক্রবর্তী, সৌরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অনিল সরকার* ডঃ অনিরুদ্ধ রায় ও বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীকে নিয়ে আমি ও আনিসুজ্জামান এলাহাবাদ, আলীগড়, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা ও দিল্লী সফর করি। এসব শহরের বিশ্ববিদ্যালয় অংগন ছাড়াও আমরা বিভিন্ন জনসভায় বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ওপর বক্তৃতা দেই। আমাদের সংগে সুবিদ আলী (এম, পি, এ) যোগ দেন। তিনি প্রয়োজনমতো উর্দুতে আমার ইংরেজী বক্তৃতার অনুবাদ জনসমাবেশে পেশ করতেন। বিষ্ণুকান্ত বলতেন হিন্দীতে। আনিসও আমার মতো ইংরেজীতেই বলতেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু আমাকে বক্তৃতা করতে দেয়া হয়। সেখানকার পরিবেশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনুকূল ছিল না। বক্তৃতা করতে ওঠার আগে সেসম্পর্কে আমি সচেতন ছিলাম। আমার বক্তৃতার পরে শ্রোতাদের অনেকেই কেঁদে ফেলেছিলেন। বক্তৃতা নাকি মর্মস্পর্শী হয়েছিল, একথা অনেকে বলেছেন।

দিল্লীতে সাহিত্য একাডেমির প্রাংগনে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সভায় ভাষণ দিই এবং বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে আনিসুজ্জামান বক্তৃতা দেন।

বক্তৃতা দেয়া ছাড়াও দিল্লীতে আমরা বেশ কয়েকটি ঘরোয়া আলোচনায় যোগ দিই। কলকাতায় আসার পরে ডক্টর বরুণ দের মাধ্যমে সিদ্ধার্থ সঙ্কর রায়ের সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা হয়। আমার মনে হয়েছিল, তিনি তখনও আমাদের সংগ্রামের তীব্রতা অনুভব করতে পারেন নি। দিল্লীতে আবার তাঁর সঙ্গে এবং শিক্ষামন্ত্রী ডঃ নুরুল হাসানের সঙ্গে শুধু আমার সাক্ষাৎ হয়। তাছাড়া আমরা অশোক মিত্র (আই, সি, এস), ডঃ অশোক মিত্র

---

*বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সাহায্য-সহায়তায় অনিলের গভীর আবেগ নিয়ে জড়িয়ে পড়ার একটি উদাহরণ আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। এক পর্যায়ে শরণার্থী শিক্ষকরা যখন আর কোথাও আশ্রয়ের স্থান পাচ্ছেননা তখন তিনি নিজ বাসগৃহ তাঁদের থাকার জন্য ছেড়ে দিয়ে শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে ওঠেন এবং তাঁর স্ত্রী প্রতিদিন ভোরে ওই বাড়ীতে এসে রান্না-বান্না ও তাঁদের খাওয়ানোর কাজ সেরে রাত ন'টার পর তাঁর পিতার বাসায় ফিরতেন।

পি, এন, ধর ও পি, এন হাকসারের সঙ্গে আলাপ করি। বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নিয়ে মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে একটি কমিটি গঠন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের বিবেচনা করা উচিত, একথা হাকসার বেশ জোর দিয়ে বলেছিলেন। তাঁর কথা পরে আমরা আমাদের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধান-মন্ত্রীকে জানিয়েছিলাম।

দিল্লীতে আমরা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সংগে সাক্ষাৎ করি। তিনি ধৈর্য্য সহকারে বাংলাদেশ সম্পর্কে আমার বক্তব্য শোনেন এবং ভারতীয় সরকার ও জনগণের সংগে কিভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে আমরা মুক্তিসংগ্রামকে এগিয়ে নিতে পারি সে সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত মত বিনিময় করেন। পরে মিসেস গান্ধী ও শিক্ষামন্ত্রী ডঃ নুরুল হাসানের সংঙ্গে এব্যাপারে আমার বিস্তারিত আলাপ আলো-চনা হয়। এরপরে প্রতিমন্ত্রী কে, আর গণেশ আমাদের এক নৈশ ভোজে আপ্যায়িত করেন। সেখানে ব্রহ্মানন্দ রেড্ডী ও নন্দিনী শতপথীর মতো রাজনীতিবিদরা ছিলেন অনেক সাংবাদিকও ছিলেন। প্রধানতঃ সাংবাদিকেরাই মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বহুবিধ প্রশ্ন করেন, রাজনীতিবিদেরাও কিছু কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। আমার উত্তর দেয়া শেষ হলে আমি কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ পাই। আমার প্রশ্ন ছিল ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশে, তবে আমি তা সাধারণভাবে উত্থাপন করেছিলাম। ঐ আলোচনা থেকে আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম যে, মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য ছাড়া শরণার্থী সমস্যার সমাধানের যে কোন সম্ভাবনা নেই একথা ভারতীয় নেতারা বোঝেন। তবে তাঁরা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ভাবছেন। চীন যে পাকিস্তানের হয়ে যুদ্ধ করবে না, এ ধারণাও তাঁদের হয়েছে। মনে হল তবু তাঁরা ঐ মুহূর্তে ঝুঁকি নিতে চান না এবিষয়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কি হবে, এসম্পর্কে তাঁরা খুবই সন্দিহান। সুতরাং ভালো করে আটঘাঁট না বেঁধে তাঁরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে কিংবা বাংলাদেশের পক্ষে বড় রকম সংঘর্ষে লিপ্ত হতে চান না।

সমস্ত পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমার এবং আমাদের এসব সাক্ষাৎকারের ফলাফল ও আমার নিজের ধারণা আমি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনকে কলকাতা ফিরে এসেই জানাই। এর পর আমি পাটনা, বোম্বাই, নাসিক, পুনা, কেরালা, জয়পুর, আজমীর ও হায়দরাবাদে জনসভায় বক্তৃতা দিতে যাই। পাটনায় যে বিশাল জনসভায় আমি বক্তৃতা দিই সে সভায় সভাপতিত্ব করেন জয় প্রকাশ নারায়ণ, এবং অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা দেন বিহার প্রদেশের গভর্ণর ডঃ বড়ুয়া।

বোম্বের বিশ্ববিদ্যালয় প্রাংগনেও আমি ছাত্র শিক্ষকদের সমাবেশে বক্তৃতা দিই। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। এখানে বাংলাদেশের দুর্গত শরণার্থীদের সাহায্যে আনুমানিক ষাট/সত্তর হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়। এই সাহায্য এবং একইভাবে ভারতের বিভিন্ন জনসভায় সংগৃ-হীত অর্থ আমরা দাতাদের পক্ষ থেকে সরাসরি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ

সহায়ক সমিতির তহবিলে জমা দেবার ব্যবস্থা করি। কোন অর্থ আমরা নিজ হাতে গ্রহণ করিনি। বিহারে আমাদের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে জনসমর্থন যোগানোর ব্যাপারে তৎকালীন বিহার সরকারের বিরোধীদলের নেতা কর্পোরী ঠাকুর* আমাদের সংগে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ভারতের সকল রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের ব্যাপারে আমাদের সংগে ও তাদের সরকারের সংগে সহযোগিতা করেছে। প্রধানমন্ত্রীর সবচে কট্টর বিরোধী নেতা রাজ নারায়ণও আমাদের সমর্থনে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আমার এলাহাবাদ সফরকালে তিনি তাঁর রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এক বিরাট জনসমাবেশের আয়োজন করেন এবং সমাবেশের তোরণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরাট এক প্রতিকৃতি স্থাপন করেন। দলের কর্মকর্তা ও কর্মীদের আগ্রহে আমি ঐ সমাবেশে তাদের উদ্দেশে একটি ভাষণ দিই। সে সময় ভারতে বাংলাদেশের সমর্থনে এমন একটি জোয়ার এসেছিল যে সব জায়গায়, এমনকি দুর্গাপূজা মন্ডপের প্রবেশ দ্বারেও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি টানানো দেখেছি।

বোম্বেতে অবস্থানকালে মহারাষ্ট্রের গভর্ণর নবাব ইয়ার আলী জংগ-এর সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়। বাংলাদেশের সমর্থনে আয়োজিত সভায় তিনি উপস্থিত হন এবং আমার বক্তৃতা শোনেন। বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রচুর অর্থ, গেরিলাদের জন্য পোষাক পরিচ্ছদ ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ মুক্ত হবার পর আমি যখন দিল্লীতে বাংলাদেশের হাই কমিশনার ছিলাম তখন প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যে একদিন হঠাৎ নবাব ইয়ার আলী জংগ আমার বাসায় এসে উপস্থিত হন এবং বলেন যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যের জন্য আমি যে তহবিল খুলেছিলাম তাতে প্রচুর টাকা জমা হয়েছে। যেহেতু এটাকা আমাদের জনসাধারণ কর্তৃক বাংলাদেশকে দেয়, তাই এটি আপনাকে নিতে হবে। মহারাষ্ট্রে তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। সুতরাং এ বিষয়ে আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগে কথা বলি। মহারাষ্ট্রের গভর্ণর সাহায্য তহবিলের যে চেক প্রদান করেন তা আমি বঙ্গবন্ধুকে পাঠিয়ে দিয়ে সমপরিমান টাকা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রতীকী সাহায্য হিসেবে মহারাষ্ট্রের জনগণকে দেবার জন্য পরামর্শ দিই। অতঃপর তাই করা হয়।

শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে সৈয়দ আলী আহসানকে একবার বাঙালোরে এবং মযহারুল ইসলামকে কেরালাতে বক্তৃতা দিতে পাঠানো হয়। সৈয়দ আলী আহসান, মযহারুল ইসলাম, আনিসুজ্জামান মাঝে মাঝে স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্রের অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন। আমিও দুবার অংশ নিয়েছিলাম।

---

*পরবর্তীকালে ইনি মুখ্যমন্ত্রী হন।

সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে (১৮ থেকে ২০ তারিখ) দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন। "World Meet on Bangladesh" নামে এটি পরিচিত হয়। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। সেখানে ২৪টি দেশের ১৫০ জন প্রতিনিধি সমবেত হন। বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতারূপে আমি এই সম্মেলনে যোগ দিই। অন্যান্যদের মধ্যে সৈয়দ আলী আহসান, মওদুদ আহমদ ও আবিদুর রহমান প্রতিনিধিদলের সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীও এ উপলক্ষে আয়োজিত হয়। আমি তা উদ্বোধন করি। এই সম্মেলন খুব সফল হয় এবং বিশ্বজনমত গঠনে আনুকূল্যও সৃষ্টি করে। এ সম্মেলনের সাফল্যের পিছনে গান্ধী ফাউণ্ডেশনের বেশ অবদান আছে। এখানে অমরেশ সেন এর ভূমিকা ও তৎপরতা উল্লেখযোগ্য। এখানে একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বি, পি কৈরালা অমরেশ সেনের বাসায় গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং আমাদের মুক্তি সংগ্রামে গুর্খাদের সেচ্ছাসেবী হিসেবে অংশ গ্রহণের প্রস্তাব দেন। সে সময়ে তিনি ভারতে আশ্রিত ছিলেন বলে তাঁর এই প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব নয়, একথা তাঁকে জানাই। তবে তাঁর এই অগ্রহের কথা আমি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে জানাবার আশ্বাস দিই। পরবর্তীকালে একথা জানালে তাজউদ্দীন আহমদও এব্যাপারে আমার সঙ্গে ঐক্যমত প্রকাশ করেন যে, ভারতে আশ্রিত কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সহায়তা আমাদের নেয়া উচিত হবেনা।

দিল্লীর আন্তর্জাতিক সম্মেলন শেষ করেই আমি নিউ ইয়র্কের পথে রওয়ানা হয়ে যাই। বাংলাদেশের পক্ষে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে প্রচারকার্য চালানো ও আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের জন্য বাংলাদেশ সরকার তখন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৫ জন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। আমি এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, শিক্ষকদের মধ্যে রেহমান সোবহানও ছিলেন। রাজনীতিবিদদের মধ্যে আবদুস সামাদ আজাদ, এম আর সিদ্দিকী, ফণি মজুমদার, সিরাজুল হক, আর ছিলেন সৈয়দ আবদুস সুলতান, ডাঃ আসহাবুল হক এবং ফকির সাহাবুদ্দিনের মতো সংসদ সদস্য; এস, এ, করিম, আবুল ফাতাহ ও এ, এম, এ মুহিতের মতো বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণাকারী প্রাক্তন পাকিস্তানী কূটনীতিবিদ। আমাদের এই প্রচেষ্টার সাফল্য সম্পর্কে অনেকেই অবহিত আছেন।

জাতিসংঘের অন্যান্য কয়েকটি রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতি পর্তুগালের সহানুভূতি ও সমর্থন আদায়ও আমার কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। একদিন আমি জাতিসংঘ ভবনে পর্তুগীজ দূতের সঙ্গে বাংলাদেশ সম্পর্কে আলাপ করছি, তাঁকে আমাদের সংগ্রামের পটভূমি বিশদভাবে বুঝচ্ছি ঠিক সে সময় আমাদের সামনে দিয়ে হলের ভেতরে যাচ্ছেন পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের সদস্য শাহ আজিজুর রহমান,

মাহমুদ আলী, রাজিয়া ফয়েজ প্রমুখ। এঁরা যাবার সময় পর্তুগীজ দূত আমাকে আঙ্গুলের ইশারায় বললেন, ঐ দেখুন, আপনাদের প্রতিপক্ষরাও যাচ্ছেন। রাজিয়া ফয়েজ আমার পূর্ব পরিচিতা ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে আমার কাছে এসে হোটেলে আমার ঠিকানা জানতে চাইলেন এবং রাত দশটার পর আমার সঙ্গে দেখা করবেন, বললেন। নির্দ্ধারিত সময়ে তিনি জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি আমাকে এই বলে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, আপনার মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ যাঁদের সঙ্গে কাজ করছেন তাঁদের নেতা হলেন তাজউদ্দীন প্রমুখ ব্যক্তি। আমি বলেম ম তাঁরা জনগণের প্রতিনিধি। গণ-প্রতিনিধিরা আমার চাইতে বেশী সম্মানের দাবিদার। সব দেশে তাঁরাই সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। আমাদের বেলায়ও তাই হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা লিপ্ত আছি। কে বেশী সম্মানিত কে কম সম্মানিত এ প্রশ্ন এখানে ওঠেনা। তাঁকে আমি বলি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দেশ স্বাধীন হবে এবং তার আর বেশীদিন বাকী নেই। বাংলাদেশে গেরিলাদের হাতে প্রতিদিন যত পাক সৈন্য মারা যাচ্ছে তার সংখ্যা পাকিস্তান সরকার গোপন করতে চাইলেও বিদেশী সাংবাদিকরা তাদের হতাহতের যে সংবাদ দিচ্ছেন তাতে বাংলাদেশের জয়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। তখন তিনিও অধিক হারে পাক সৈন্য ক্ষয়ের কথা স্বীকার করলেন। আমি তাঁকে আবার প্রশ্ন করি, আপনার এই শারীরিক অবস্থায় আপনি কিভাবে এসেছেন? উল্লেখ্য যে তিনি তখন সন্তান সম্ভবা ছিলেন। তিনি জানান, ইয়াহিয়ার সামরিক সরকারের চাপে আমাকে অনিচ্ছা ও অসুবিধা সত্ত্বেও আসতে হয়েছে। সন্তান ধারণের ৭ মাস অতিবাহনের মেডিক্যাল সার্টিফিকেট প্রদান করা সত্ত্বেও আমাকে অব্যাহতি দেয়া হয়নি। দেশ স্বাধীন হবার পর অন্যান্যদের সঙ্গে যখন তাঁকেও বাংলাদেশের বিরোধিতা করার কারণে জেলে পাঠানো হয়েছিল তখন তাঁর স্বামী ও তাঁর বোন আমার কাছে আসেন তাঁর মুক্তির ব্যাপারে বলার জন্য। আমি বঙ্গবন্ধুর কাছে তাঁর সম্পর্কে একথার ওপর জোর দিয়ে বলি যে, তিনি ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিউইয়র্ক গিয়েছিলেন, অতঃপর অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও জেল থেকে মুক্তি পান।

জাতিসংঘে দায়িত্বপালনের সঙ্গে সঙ্গে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ সম্পর্কে শিক্ষক, ছাত্রদের সমাবেশ ও জনসভায় বক্তৃতা করি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এ সময়ের ১০ বৎসর পূর্বে আমেরিকার এক বিখ্যাত ও প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছিলাম* এবং তার আগে ও পরে আমেরিকাতে বিভিন্ন সেমিনার ও কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলাম। এর ফলে ঐ দেশের বহু শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ আমার পরিচিত ছিলেন। অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন উদ্যোগী হয়ে আমার জন্য এ রকম বিশেষ প্রোগ্রাম এর ব্যবস্থা করেন। এতে বাংলাদেশ সরকারের কোন অর্থ ব্যয়

*পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষিণ এশীয় ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর।

হয়নি। তবে আই, আর, সি নামক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থাও এখানে কিছুটা সহায়কের ভূমিকা পালন করেছিল।

যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত আমার প্রাক্তন ছাত্র জে, আর খান এ-সময়ে আমার সচিবের কাজ করেন। আমি বক্তৃতা দিই নিউইয়র্ক, কলাম্বিয়া, পেনসিলভানিয়া, স্টানফোর্ড, বার্কলে লংবীচ, শিকাগো, বাফেলো, প্রিন্সটন, মিশিগান, নর্থ ক্যারোলাইনা, হার্ভার্ড, বস্টন, ইয়েল প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে মোটামুটিভাবে আমার কর্মসূচী হতে স্থানীয় রেডিও টি ভি সাংবাদিকদের কাছে সাক্ষাৎকার প্রদান, মধ্যাহ্নে ফ্যাকাল্টি সদস্যদের সমাবেশে বক্তৃতা দেয়া এবং অপরাহ্নে উন্মুক্ত স্থানে ছাত্র সমাবেশে বাংলাদেশের ওপর বক্তৃতা দিয়ে সমর্থনের আহবান জানানো। উল্লেখ্য যে, এরূপ অনেক ক্ষেত্রে আমার বক্তৃতার পর শ্রোতারা মার্কিন সরকারের নীতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতেন। সেটি আমাদের জন্য একটা অত্যন্ত উৎসাহব্যাঞ্জক পরিস্থিতি বলে বিবেচিত হতো। আমার সঙ্গে প্রায়ই থাকতেন ডাঃ আসহাবুল হক। তাছাড়া আমার অনুরোধে ও আয়োজনে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, সৈয়দ আবদুস সলতান, ডাঃ আসহাবুল হক, সিরাজুল হক প্রত্যেকে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন। সংসদ সদস্য সিরাজুল হককে আমি পাঠিয়েছিলাম টেক্সাসে। তিনি বক্তৃতা দিয়ে আসার পর পরই সেখানে পাকিস্তানের পক্ষে বক্তৃতা দিতে যান ডক্টর ফাতেমা সাদেক। তারপর সেখানকার বাঙ্গালীরা আমাকে সত্বর টেক্সাসে গিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে বক্তৃতা করার জন্য তাগাদা দেন। আমি ছোট্ট একটি প্রাইভেট বিমানে টেক্সাসে যাই এবং এক ছাত্র শিক্ষক সমাবেশে বক্তৃতা দেই। এখানে অনেক পাকিস্তানী ছিলেন যাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর তাৎক্ষণিক-ভাবে দিতে হয়েছে। আমি যখন বাংলাদেশে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর বর্বরতার নজীরগুলি একের পর এক উল্লেখ করতে থাকি তখনই প্রশ্ন করা বন্ধ হয়ে যায়। এই সভায় ২/৩ জন আমেরিকানও আমাদের সপক্ষে বক্তৃতা দিয়েছিলেন বলে আমার মনে পড়ছে।

ফিলাডেলফিয়াতে গভীর ঔৎসুক্য ছিল বাংলাদেশ সম্পর্কে। তার প্রধান কারণ পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক থাকা কালীন আমার যারা ছাত্র বা গুণগ্রাহী ছিলেন তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয় বা ঐ এলাকার বিভিন্ন কলেজে শিক্ষক ছিলেন। আমার সময়কার অনেক অধ্যাপকও সেখানে তখন কর্মরত ছিলেন। এসব কারণে বাংলাদেশ লবি ওখানে খুবই শক্তিশালী ছিল। ফলে পাকিস্তানের জন্য মার্কিন সমরাস্ত্রবাহী জাহাজ সেখানে প্রতিবাদকারীরা ঘেরাও করেছিলেন ছোট ছোট স্পীড বোট নিয়ে। এখানে আমার অনেক প্রাক্তন সহকর্মী অধ্যাপকদের সংগে দেখা হয় এবং যোগাযোগ স্থাপিত হয়। যেমন অধ্যাপক নর্মান ব্রাউন, অধ্যাপক হোলডেন ফারভার, রিচার্ড ল্যামবার্ট প্রমুখ। হার্ভার্ডে ডক্টর কিসিঞ্জারের এক সহকারী আমার বক্তৃতার পর পাকিস্তানের পক্ষ

নিয়ে খুব তর্ক করেছিলেন, কিন্তু শ্রোতাদের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। মার্কিন জনমত তখন বাংলাদেশের অনুকূলেই ছিল, যদিও মার্কিন সরকারের মনোভাব ছিল এর উল্টো। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বক্তৃতায় ছাত্র, শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের লোক উপস্থিত থাকতেন এবং বেতার-টেলিভিশনে তা প্রচারিত হত। তাছাড়া বিভিন্ন শহরে স্থানীয় রেডিও-টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রের লোকজন আমার সাক্ষাৎকারও গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া কয়েকটি কলেজেও আমি বাংলাদেশের ওপর বক্তৃতা দিই।

সময় সংক্ষেপ করার জন্য আমার যাতায়াতের ব্যবস্থা হয় প্রধানতঃ উড়োজাহাজে। প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়েই আমি প্রথমে ফ্যাকাল্টি ক্লাব এবং পরে ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশে ভাষণ দিই। উড়োজাহাজে ভ্রমণসূচী এমন ভাবে প্রণীত হয় যে, আমি প্রায় প্রত্যেক দিনই একটা না একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে হাজির হতে পেরেছি। এ কর্মসূচী প্রণয়নে জে, আর, খান অত্যন্ত পারদর্শিতার প্রমাণ রেখেছেন। এসব অনেক প্রোগ্রামে কুষ্টিয়া প্রতিরোধ সংগ্রামের নেতৃত্ব দান-কারী ডাঃ আসহাবুল হক আমার সঙ্গে ছিলেন।

নিউইয়র্কে অবস্থানকালে কয়েকজন আইনজ্ঞ ও অস্ত্র ব্যবসায়ী গোপনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্র সরবরাহের প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবিত অস্ত্রশস্ত্রের মূল্য পরে পরিশোধ করলেও চলবে বলে তাঁরা আমাকে জানান। তাঁরা আবো প্রস্তাব দেন যে, অনুমতি দেয়া হলে, তাঁরা বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানী কারাগার হতে কমাণ্ডো অভিযানের মাধ্যমে মুক্ত করার চেষ্টা করবেন। আমার সংশয় ছিল এটি পাকিস্তানী ষড়যন্ত্রের কোন অংশ হতে পারে। যদি তারা তাদের কথায় খাঁটি হয় তাহলেও গোপনভাবে অস্ত্র সরবরাহের সময় অস্ত্র শত্রুর হাতে পড়তে পারে। আর কমাণ্ডো অভিযানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করতে গেলে তাঁর জীবনের ওপরে ঝুঁকি আসার আশঙ্কা অধিক। এসব ভেবে আমি তাঁদের জানালাম এটি আমার এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়। আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম দরকার হলে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার আপনাদের কাছ থেকে অস্ত্র নেবে। এর-পর অল্পকালের মধ্যে দেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ায় এ ব্যাপারে আর অনুসন্ধান করার প্রয়োজন হয়নি।

যেসব মার্কিন সিনেটর বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলতেন, আমি তাঁদের কয়েক-জনের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করি। সিনেটর কেনেডির সঙ্গে আমার কলকাতায় সাক্ষাৎ হয়েছিল, তবু আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানাই। সিনেটর স্যাক্সবী ও সিনেটর চার্চের সঙ্গেও বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করি। স্যাক্সবীর এক ছেলে (স্যাক্সাবী জুনিয়র) আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনের ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সফররত অবস্থায় আমার সঙ্গে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থপতি ডঃ ফজলুর রহমান খানেরও শিকাগোতে সাক্ষাৎ

হয়। তিনি বাংলাদেশের পক্ষে সেখানে এক বলিষ্ঠ ছবির সৃষ্টি করেন। বাংলাদেশ আন্দোলনের পচার কার্যে তাঁর আর্থিক অবদানও ছিল বিরাট। আমি এক রাতের জন্য তাঁর অতিথি ছিলাম। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার এক বন্ধু অধ্যাপক ডিমকও বাংলাদেশ আন্দোলনের পক্ষে সহায়ক শক্তি হিসেবে প্রচুর কাজ করেছিলেন।

লংবীচে, আমার মনে পড়ে, একটি সমাবেশে ভাষণ দেবার পর বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সেতার বাদক রবি শঙ্কর-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে যান এবং যে যন্ত্র সংগীতের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছিলেন তার একটি রেকর্ড আমাকে উপহার দেন।

বষ্টন ও হার্ভার্ডে বিমানবন্দরে আমাকে রিসীভ করার জন্য উপস্থিত ছিলেন আমাদের কয়েকজন সিভিল সার্ভিসের সদস্য। তাঁরা আমার সঙ্গে বিভিন্ন জনসভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচিত জনাব খুরশিদ আলম একটি সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। ডঃ মহিউদ্দীন আলমগীরও যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পক্ষে জনসমর্থনের উদ্দেশ্যে আয়োজিত বিভিন্ন সভা ও অনুষ্ঠানের একজন বিশেষ উদ্যোক্তা ছিলেন। আমার জন্য তাঁর সযত্ন আতিথ্যের কথাও আমার মনে আছে।

নভেম্বরের শেষের দিকে নিউ ইয়র্ক থেকে কলকাতায় ফেরার পথে লণ্ডনে বাংলাদেশীদের সমাবেশেও আমি বক্তৃতা দিই। সেখানে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এবং প্রবাসী বাঙ্গালীদের বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সেখানকার বাঙ্গালীরা যথেষ্ট মনোবল নিয়ে কাজ করছিলেন। বস্তুতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র এবং লণ্ডনে বাঙ্গালী সমাজের মধ্যে ঐক্যের যে বোধ, সংগ্রামের যে সংকল্প এবং ত্যাগস্বীকারের যে মনোভাব আমি লক্ষ্য করি, তাতে মুক্তিযুদ্ধের পরিণাম ও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলিষ্ঠ আশার সঞ্চার হয়। লণ্ডন ছাড়া বৃটেনের লিভারপুল, অক্সফোর্ড, ক্যামব্রীজ ইত্যাদি স্থানে এবং ইউরোপের বিভিন্ন শহরে গিয়ে আমার বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। কিন্তু এটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, আমরা সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি এবং বাংলাদেশ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে পাকিস্তান শীঘ্রই ভারতের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়বে। পাকিস্তানের পক্ষে এর একটি কৌশলগত ধারণা ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে পাক-ভারত যুদ্ধ হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিপন্ন করতে পারলে বাংলাদেশ প্রশ্ন চাপা পড়ে যাবে। পরবর্তীকালে নিরাপত্তা পরিষদে ভুট্টোর বক্তৃতা (হাজার বছর ধরে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের অঙ্গীকার) আমার এই ধারণা যে সঠিক ছিল তার প্রমাণ বহন করে। যাহোক উপমহাদেশে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার আসন্ন

অবস্থার দরুণ আমার উক্ত সফরসূচী বাতিল করে দিল্লী হয়ে আমি কলকাতা ফিরে আসি।

কলকাতায় ফেরার অল্পকাল মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধের সর্বশেষ পর্য্যায় শুরু হয়ে যায়। ঐ সংকট মুহূর্তে ইন্দিরা গান্ধী কলকাতার জনসভায় যে বক্তৃতা করেন, তা আমি বেতারে শুনি ঘরে বসে। সত্যি বলতে কি, সে বক্তৃতা শুনে আমি একটু আশাহত হয়েছিলাম। কেননা আমার আশা হয়েছিল যে, ঐ সময় হয়তো বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বিষয়ে তিনি কিছু বলবেন। তারপর সেই রাতেই আকস্মিকভাবে ভারতের ওপর পাকিস্তানী হামলার সংবাদ শোনা গেল। এর পরপরই ভারতীয় সৈন্য ও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মিলিত বাহিনীর দ্রুত অগ্রগতি সত্ত্বেও মনে হচ্ছিল আরো তাড়াতাড়ি এরা ঢাকায় পৌঁছোতে পারছেনা কেন। তারপর যেদিন পাকিস্তানীদের আত্মসমর্পণের সংবাদ এলো সেদিন দেখলাম বড়দিনের আরো কিছু দেরী আছে। উল্লেখ্য, সিদ্ধার্থ সংকর রায়কে আমি খ্রীস্টমাসে স্বাধীন বাংলাদেশে আসার অগ্রিম আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম গত জুন মাসে।

মুক্তিলাভের এই আনন্দ দ্রুত ম্লান হয়ে গেল ঢাকায় বুদ্ধিজীবী হত্যার সংবাদে। আমার কত আপনজনই না দেশদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রে অকালে শহীদ হয়েছেন। তবু বারবার নিজেকে বলেছি, এত শহীদ, এত আত্মত্যাগীর মর্যাদা যেন আমরা রক্ষা করতে শিখি স্বাধীন বাংলাদেশে।

দখলদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ আমাকে বলেন যে, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষাবিদ; ছাত্র-যুবক, মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অনেকেই আপনার প্রত্যক্ষ ছাত্র। তারা আপনার কথা শুনবে। বিজয়ের পর প্রত্যেকে যাতে আইন নিজের হাতে তুলে না নেয় এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা না ঘটে সেজন্য স্বাধীন বাংলা বেতারে আপনি একটা বক্তৃতা দিন। দালাল, রাজাকার এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধাচরণ যারা করেছে বাংলাদেশ সরকার তাদের শাস্তি প্রদান করবে বিশেষ আদালতে। তাজউদ্দিন সাহেবের এই পরামর্শে উপরোক্ত আহবান জানিয়ে আমি স্বাধীন বাংলা বেতারে বক্তৃতা দেই। এরপর আমি যশোরে বহু আকাঙ্খিত স্বাধীন বাংলার ভূখণ্ড পরিদর্শন করি। অবশেষে '৭২-এর ৪ঠা জানুয়ারী আমি সপরিবারে দেশে ফিরে আসি।

—আজিজুর রহমান মল্লিক
এপ্রিল, ১৯৮৪।

আফিসার আলী আহমেদ*

অসহযোগ আন্দোলন চলা কালে আমরা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিই। ২৫শে মার্চের পর আমি ঐক্যবদ্ধভাবে

*এন-ই-১২, রংপুর-১২।

পাক-বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য নিদেশ প্রদান করি। আমি নিজ এলাকায় আত্মগোপন করে যুদ্ধ পরিচালনা করি এবং ভারতে যাওয়ার আগে ইপিআর ও পুলিশদের একত্রিত করে যুদ্ধের জন্য সংগঠিত করি। যুদ্ধে বহু পাক-সেনা নিহত হয়।

২৮শে মর্চ আমি ভারতে চলে যাই এবং জলপাইগুড়িতে অবস্থান করতে থাকি। তখন জলপাইগুড়ির ডি,সি আমাকে অপ্রত্যাশিতভাবে গ্রেফতার করেন। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ আমাকে মুক্ত করার জন্য অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তারপর ২৯শে মচ স্কর্ট করে আমাকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হয়। দিল্লীর সাথে যোগাযোগ করে রাজ্য সরকার গ্রেফতারকৃত অবস্থায়ই আমাকে দিল্লী পাঠান। সেখানে আমাকে মুক্তভাবে রখা হয়। মুজিবনগর সরকারের প্রধান-মন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এর সাথে দিল্লীতে আমার সাক্ষাৎ হয়। এরপর আমাকে কলকাতা পাঠিয়ে দেয়া হয়। এবং ভারতের দেওয়ানগঞ্জ ক্যাম্পের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করা হয়।

এপ্রিল-মে মাসের দিকে আমি আনসার এবং পুলিশদের আমার এলাকায় অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করার নির্দেশ প্রদান করি। ই, পি, আর, আনসার এবং পুলিশদের সংগঠিত করে বাংলাদেশের ভেতরে অপারেশন করার জন্য পাঠাই। এরূপ বিভিন্ন অভিযানে তাঁরা কতক মহন এবং বহু দালাল হত্যা করেন।

আমার এলাকায় দীর্ঘ নয়মাস অনবরত যুদ্ধ চলতে থাকে পাক-সেনাদের সাথে। প্রায় এক লক্ষ টাকা আমার এলাকা থেকে সংগ্রহ করে আমি বাংলাদেশ সরকারের তহবিলে জমা দিই।

আমার এলাকায় আনুমানিক দেড় হজার লোক পাক সেনাদের দ্বারা নিহত হয়। এই হত্যাযজ্ঞে সৈয়দপুরের বিহারীদের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। এই এলাকায় প্রায় এক হাজার নারীকে নির্যতন করা হয়। উল্লেখ্য যে, এখানে ২২শে মার্চ তারিখে এই অত্যাচারের হাত থেকে স্থানীয় জনগণকে রক্ষা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। পরে বিহারীরা বিশ্বাসঘাতকতা করে বহু লোককে হত্যা করে। সৈয়দপুরে শতকরা ৯৯ ভাগ ঘর-বাড়ী ও বিষয়-সম্পত্তি বিনষ্ট ও লুটপাট হয়। উল্লেখ্য যে, ব্যাঙ্কের টাকা পয়সাও পুড়িয়ে দেয়া এবং লুট-পাট করা হয়। সীমান্তে সৈয়দপুরের বিহারীরা ভারতে যাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ট্রেনের মধ্যে আটকিয়ে প্রায় চার শত লোককে হত্যা করে। এই ঘটনাটি ঘটে সৈয়দপুর থেকে এক মাইল দূরে। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ব্রজেন্দ্রলাল ঘোষ নামক এক ব্যক্তি ও তার দুই ছেলেকে আলবদররা হত্যা করে এবং তাঁর দুই মেয়েকেও অপহরণ করে। প্রতিবেশী সালাউদ্দীন নামে এক ব্যক্তি এই ঘটনার প্রতিবাদ করলে তাকে তারা প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করে। মাহফুজুর রহমান চৌধুরী নামক একজন দুঃসাহসী মুক্তি যোদ্ধাকেও তারা নৃশংসভাবে হত্যা করে।

স্বাক্ষর/
আফসার আলী আহমেদ
২৬-১০-৭২

আব্দুর রাজ্জাক (মুকুল মিয়া)

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে আন্দোলনে সক্রিয় হই। ১০—১৫ই মার্চ থেকে বকুল সাহেবের নেতৃত্বে গোপালপুর জেলা স্কুল মাঠে ছাত্র-জনতাকে নিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয় এবং তিনি নিজে প্রায় ১৫০/২০০ জন ছেলের হাতে বাঁশের লাঠি ও ডেমি রাইফেল দিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ দেন আমি আরো ৫/৭ জন ছেলে সহ স্থানীয় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর ওয়ার্কসপ থেকে কাঠের বন্দুক তৈরী করে আমাদের ক্যাম্পে সরবরাহ করি। বকুল ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মী ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য জনাব মরহুম বগা মিয়ার (আব্দুর রব) নেতৃত্বে পাবনা শহরে বেশ কয়েকটি জনসভা হয়। হাজার হাজার সরকারী বেসরকারী কর্মচারী ও জনতা উক্ত জনসভায় যোগদান করেন।

২০শে মার্চ জনাব বকুলের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে চারটি দলে বিভক্ত করা হয় এবং চারজন ছাত্রনেতার উপর চারটা দলের দায়িত্ব দিয়ে তাদেরকে বকুল সাহেবের নির্দেশে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয় যাতে পাকবাহিনী পাবনা শহরে প্রবেশ না করতে পারে।

একটা দলের ভার শহীদ ছিদ্দিকের উপর অর্পণ করা হয় এবং তার দলকে পাঠানো হয় নগরবাড়ী—পাবনা রোডে। একটি দলের ভার আমি নিজে নিয়ে পাবনা—রাজশাহী রোডে থাকি। একটি দলের ভার ইকবালের উপর দেয়া হয় এবং তারদল পাঠানো হয় শালগাড়িয়া রোডে। আর একটি দলের ভার দেয়া হয় বাবুর উপর এবং তাকে পাঠানো হয় পাকশী-পাবনা রোডে। বকুল সাহেব কিছু যোদ্ধা নিয়ে শহরের কন্ট্রোলরুমে থাকেন।

২৩শে মার্চ আমরা সমস্ত পাবনা শহরে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করি। ঐদিন নক্সালদের সাথে আমাদের নুরুল খন্দকারের বাড়ীতে সংঘর্ষ হয় এবং নক্সালেরা পালিয়ে যায়।

২৪শে মার্চ পাক-বাহিনী নগরবাড়ী হয়ে পাবনা শহরে প্রবেশ করে। তাদের ভারী হাতিয়ারের সামনে টিকতে পারবেনা বলে আমাদের বাহিনী বাধা সৃষ্টি করেনি। পাক-বাহিনী পাবনা শহরে প্রতিটি অফিস আদালতে বাংলাদেশের পতাকা দেখে শহরে কার্ফু দিয়ে কয়েক রাউণ্ড গুলি ছুঁড়ে এবং রাতের বেলা অনেক মহিলার উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। এদিকে আমরা কয়েকটি দল যোগাযোগ করে একত্রিত হই এবং ডি সি ও এসপি সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে পাক সেনাদের আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিই। আমরা শহরের আশেপাশের গ্রাম গুলোতে জানিয়ে দিই যে আগামী কাল আমরা পাক-বাহিনীকে আক্রমণ করবো এবং তারা যেন তাদের যা কিছু আছে তা নিয়ে আমাদের সাথে যোগ দেয়। ঘোষণা দেয়ার

সাথে সাথে হাজার হাজার জনতা ঢাল শুরকী, ফালা, তীর ধনুক, রামদা, বর্শা, ইত্যাদি নিয়ে ঢোল থালা পিটিয়ে 'জয়বাংলা' শ্লোগান দিতে দিতে চর আশুতোষপুরে এসে জমায়েত হয়।

২৪শে মার্চ ভোর রাত ৪টার সময় পাক-বাহিনী পুলিশ লাইন আক্রমণ করে। পুলিশ বাহিনী পূর্ব হতেই ডিফেন্সে ছিল। পাক-বাহিনী আক্রমণ করার সাথে সাথে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

২৫শে মার্চ সকাল ৭টার সময় আমরা বকুলের নেতৃত্বে হাজার হাজার জনতাকে নিয়ে "জয়বাংলা" শ্লোগান দিতে দিতে শহরে ঢুকে পড়ি এবং পাক-বাহিনীকে আক্রমণ করি। তুমুল যুদ্ধ চলছে এর মধ্য দিয়ে হাজার হাজার জনতা রুটি, ডাব, ভাত ইত্যাদি নিয়ে আমাদের খাদ্য দ্রব্য যোগান দিচ্ছে। জয়বাংলা শ্লোগান শোনার সাথে সাথে পাক-বাহিনী ৪/৫টি দলে ভাগ হয়ে যায়। পরে একত্রিত হয়ে সিনেমা হলের নিকট এসে জমায়েত হয়। এদিকে পুলিশ লাইনে পাক সেনাদের একটি দলের ৮/১০ জন নিহত হয়। বাণী সিনেমা হলের কাছে আমরা পাক-বাহিনীর সদস্যদেরকে চারি দিক থেকে ঘিরে ফেললে উপায় না দেখে তারা আত্মসমর্পণ করে। সাথে সাথে হাজার হাজার জনতা এসে তাদেরকে পিটিয়ে হত্যা করে।

পাক সেনাদের ১০/১৫ জনের একটি দল শিল্প এলাকাতে ছিল। তারা উক্ত সংবাদ শোনার সাথে সাথে হাতিয়ার ফেলে রেখে পাবনা থেকে বের হয়ে আরিফপুর গোরস্থানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। জনতা এই সংবাদ শোনার সাথে সাথে উক্ত গোরস্থানে গিয়ে ঘেরাও করে। তারপর অনেক খোঁজাখুজির পর কয়েকটি কবর থেকে ৫/৭ জন পাক সেনাকে টেনে বের করে তাদেরকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে। ৪/৫ জন পাক সেনা গোপালপুর মিলের কাছে গিয়ে জনতার হাতে ধরা পড়লে তাদেরকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। অতঃপর পাবনা শহর সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যায়। এবং আমরা সেখানে আবার বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করি। সেখানকার অফিস আদালত আমাদের নিয়ন্ত্রনে চলতে থাকে।

২৫শে মার্চের পর পাক-বাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করে। পাবনাতে পাক-বাহিনী যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য আমরা রাজশাহী—পাবনা রোড, পাবনা—ঈশ্বরদী রোড, পাকশী—পাবনা রোডে ১৫/২০ জনের এক একটি দল প্রতিরোধ করার জন্য পাঠাই। আর আমরা বকুলের নেতৃত্বে নগরবাড়ী ঘাটে গিয়ে অবস্থান নেই। আমরা সেখানে গিয়ে দেখতে পাই বগুড়া থেকে ক্যাপ্টেন হুদা ৫০/৬০ জনের একটি ইপিআর ও আর্মি বাহিনী নিয়ে নগরবাড়ীতে পৌঁছেছেন। আমরা তাঁর বাহিনীর সাথে যোগ দিই।

১২ এপ্রিল পাক-বাহিনী বিমান থেকে নগরবাড়ীতে আমাদের উপর বোমা বর্ষণ করে। ঐদিন ১০টার সময় ২/৩টি ফেরী ভর্তি পাক সেনা আরিচা থেকে

নগরবাড়ী চলে আসে। এসেই তারা শেলিং করে এবং মেশিনগান থেকে আমাদের দিকে এলোপাথারী গোলাবর্ষণ করতে থাকে। ২/৩ ঘণ্টা তুমুল যুদ্ধ চলার পর আমরা তাদের ভারি অস্ত্রের সামনে টিকতে না পেরে ক্যাপ্টেন হুদার নির্দেশে দল তুলে নিয়ে পাবনার দিকে চলে যাই।

পাক-বাহিনী নগরবাড়ী প্রবেশ করে। তাদের এক কোম্পানী শাহজাদপুরে চলে আসে আর এক কোম্পানী পাবনার দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। পথে কাশিনাথপুরে পাক-বাহিনী আমাদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেখানে ২/৩ ঘণ্টা সংঘর্ষের পর আমরা পাবনা হয়ে মুলাডুলি গিয়ে ডিফেন্স গ্রহণ করি। সেখানে ৩/৪ ঘণ্টা যুদ্ধের পর ৬/৭ জন ই, পি, আর, ও ১০/১৫ জন লোক নিহত হয়।

১৫/১৬ই এপ্রিল আমরা বোনপাড়া যাই। সেখানে পাক সেনাদের সাথে যুদ্ধে আমাদের ৫/৭ জন ই, পি, আর, শহীদ হন। সেখান থেকে আমরা রাজশাহী জেলার সারদাতে পৌঁছি এবং সেখানে পাক-বাহিনীর সাথে যুদ্ধে আমাদের ২জন মেশিনগান চালক পাক-সেনার গুলিতে আহত হয়। আমি তাদেরকে উদ্ধার করতে গেলে পাক-সেনাদের একটি শেলের কণা এসে আমার বুকের বাম পাশে লাগলে আমি আহত হই। তারপর তাদেরকে রেখে কোনরকমে আমার বাহিনীর সাথে রাজশাহী জেলার নওগাঁ গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হই। তারপর সেখান থেকে হাসপাতালের নিজস্ব গাড়ীতে করে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি হই। প্রায় দেড়মাস চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে উঠি। তারপর কলকাতা চলে যাই। সেখানে গিয়ে বকুল সহ পাবনা জেলার অনেক মুক্তিযোদ্ধার সাথে দেখা হয়। তাদেরকে নিয়ে বকুলের নেতৃত্বে আমরা প্রথমে শিকারপুরে ক্যাম্প করি। সেখানে ১০/১৫ দিন থাকার পর আমরা কেচুয়াডাঙ্গায় ক্যাম্প করি।

সেখানে প্রায় ১৫০ জন ছেলে বকুলের অধীনে প্রাথমিক সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। জুন মাসে ৪৪ জন ছেলেকে নিয়ে মুজিব বাহিনীর সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য দেরাদুন যাই। দেরাদুনে সাপ বিচ্ছুর দারুন প্রকোপ ও নানা অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় আমরা চাকার্তা চলে যাই। সেখানে আমরা মোট ৪৫ দিন বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র-শস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি।

আগষ্ট মাসের ২/৩ তারিখে আমরা জলপাইগুড়ি চলে আসি। সেখানে ৮/১০ দিন থাকার পর জলঙ্গী বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে প্রবেশ করি এবং পাবনা-পাকশী ব্রীজের নিকটে এসে পাক-সেনা দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হলে আমরা ভারতে চলে যাই।

১৭ই আগষ্ট আমরা কুষ্টিয়ার বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করি এবং সাথিয়া থানার সোনদহ ব্রীজে রাজাকারদের আক্রমণ করি। এতে ৩ জন

রাজাকার নিহত হয় এবং একজন রাজাকার জীবিত ধরে নিয়ে আসি। অতঃপর আমরা পাবনা জেলার বোনাইনগর, ফরিদপুর থানায় প্রবেশ করি।

সেপ্টেম্বর মাসে আমরা সাথিয়া থানা ও রাজাকার ঘাটি আক্রমণ করি। সেখানে ১২ জন রাজাকার নিহত হয়। ১১ জনকে ধরে নিয়ে আসি এবং অনেক গোলাবারুদ উদ্ধার করি।

অক্টোবর মাসে পাক-সেনারা দিঘলিয়া রতনপুরে আমাদের ক্যাম্প আক্রমণ করে। ৩/৪ ঘন্টা তুমুল যুদ্ধ চলার পর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে যে আমাদের আরো দু'টি বাহিনী ছিল তাদেরকে খবর দেয়া হয়। সাথে সাথে তারা এসে তিনদিক থেকে ঘিরে পাক-বাহিনীকে আক্রমণ করে। এতে ২৫ জন পাক-সেনা নিহত হয়। যুদ্ধ শেষে আমরা ফরিদপুর চলে যাই।

নবেম্বর মাসে আমরা গাঙ্গাহাটি ব্রীজে রাজাকারদের আক্রমণ করি। সেখানে আমাদের দু'জন যোদ্ধা আহত হয় এবং ছয়জন রাজাকার নিহত হয়। এর পর আমরা বোনাইনগর, ফরিদপুর এলাকাতে পোস্টার লাগিয়ে দিই। তাতে লিখা থাকে, উক্ত মাসের মধ্যে যদি রাজাকার হাতিয়ার নিয়ে আত্মসমর্পণ করে তাহলে তাদেরকে কিছু বলা হবেনা। আর যারা আত্মসমর্পণ করবেনা তাদেরকে ক্ষমা করা হবেনা।

এই সংবাদ রাজাকারদের কানে পৌঁছার সাথে সাথে নভেম্বর মাসের মধ্যে ফরিদপুর থানার সমস্ত রাজাকার হাতিয়ার নিয়ে এসে আত্মসমর্পণ করে। তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।

১০/১২ ডিসেম্বর আমরা বাঘাবাড়ী ঘাটে পাক-সেনাদেরকে আক্রমণ করি এবং আমাদের বিমান বাহিনী বিমান হতে তাদের উপর বোমা বর্ষণ করে। সেখানে পাকসেনাদের সাথে আমাদের ৪/৫ ঘন্টা যুদ্ধ হয়। এতে আমাদের একজন আহত হয়।

সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় আমরা গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিই। পার্শ্ববর্তী আরো মুক্তি-যোদ্ধারা এসে যায়। পরদিন সকালে আমরা পাক-সেনা আক্রমণ করার জন্য বাঘাবাড়ী ঘাটে যাই। কিন্তু সেখানে কাউকে দেখতে পাইনি। জানা গেল তারা রাতে তাদের গাড়ী ও হাতিয়ারে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পাবনার দিকে চলে গেছে। আমরা বাঘাবাড়ী ঘাটে গিয়ে দেখতে পাই ১৫/২০টি গাড়ী পড়ে আছে এবং অস্ত্র-শস্ত্রে আগুন জ্বলছে।

আমরা শাহজাদপুর ফিরে এসে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করি এবং বেসরকারী শাসন ব্যবস্থা চালু করি।

স্বাক্ষর/
মুকুল মির্জা
১৮-১১-'৭৩

আবদুল করিম খন্দকার

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠ আসন বিজয়ী আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে জেনারেল ইয়াহিয়া এক পর্যায়ে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলেও অভিহিত করেন। সেই পরিস্থিতিতে মহা সমারোহে ২৩শে মার্চ প্রজাতন্ত্র দিবস পালনের কর্মসূচী গৃহীত হয়। তখন আমি ঢাকায় পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত বাঙ্গালী অফিসারদের মধ্যে সবচাইতে সিনিয়র। সুতরাং সম্মিলিত সশস্ত্র বাহিনীর প্যারেডে অধিনায়কত্ব করার দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হয়। আর প্রধানতঃ সে কারণেই প্রজাতন্ত্র দিবস অনুষ্ঠানের আয়োজনে আমাকে সমন্বয়ের কাজ করতে হয়েছিল। কর্মসূচী ছিল বিপুল। আর তার সাথে তাল মিলিয়ে ব্যস্ত প্রস্তুতি পর্ব।

ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে একদিন জোনাল আর্মী হেড-কোয়ার্টার (বর্তমানে এয়ার হেড-কোয়ার্টার) থেকে জনৈক কর্নেল আমাকে ফোন করে জানালেন যে ২৩শে মার্চের পরিকল্পিত প্যারেড বাতিল করা হয়েছে। প্যারেড বাতিলের সিদ্ধান্তের আকস্মিকতায় বিস্মিত হলাম। প্রায় সাথে সাথেই ব্রিগেড হেড-কোয়ার্টার অফিস কক্ষে প্রবেশ করে দেখি ডজন খানেক পদস্থ পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক অফিসার আলোচনারত। আমার আকস্মিক ও অনভিপ্রেত উপস্থিতি তাদের মধ্যে একটা অপ্রস্তুত ও কিছুটা বিরূপ ভাবের সঞ্চার করলো। তাদের এ মনোভাব বুঝতে আমার অসুবিধা হলনা। আমি বিশেষ আর কোন আলোচনা না করে ফিরে এলাম।

১লা মার্চ। শাহীন স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পূর্ব পাকিস্তানের এয়ার অফিসার কমান্ডিং এয়ার কমোডর মাসুদের সভাপতিত্ব করার কথা। আগে দেখেছি এ ধরণের অনুষ্ঠানে তার উপস্থিতি সব সময়ই ছিল সাগ্রহ। কিন্তু সেদিন দেখলাম তার ব্যতিক্রম। এয়ার কমোডর আমাকে বল্লেন আমি যেন তার পরিবর্তে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করি। দুপুর একটায় জেনারেল ইয়াহিয়া পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ৩রা মার্চে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল ঘোষণা করলেন। বিদ্যুৎ গতিতে ঢাকার চেহারা পাল্টে গেল। চারিদিকে বিক্ষোভ। শাহীন স্কুল প্রাঙ্গণ থেকেই দেখলাম বিক্ষুব্ধ জনতার এক বিশাল মিছিল অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে শ্লোগান দিতে দিতে মহাখালি থেকে শহরাভিমুখে ধাবমান।

ঘটনা দুটোর উল্লেখ করলাম এজন্য যে এগুলো থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে ১লা মার্চে জেনারেল ইয়াহিয়ার পরিষদ অধিবেশন স্থগিত কোন আকস্মিক ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ঘোষণার প্রস্তুতি আগে থেকেই চলছিল এবং এ কারণেই এয়ার কমোডর মাসুদ আমাকে পুরস্কার বিতরণী সভার দায়িত্ব

দিয়ে নিজে ইয়াহিয়ার ঘোষণা পরবর্তী সম্ভাব্য পরিস্থিতি সম্পর্কিত কাজে ব্যাপৃত ছিলেন।

ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনে আমাকে প্রায়ই ঢাকা বিমান বন্দরে যেতে হত। ফেব্রুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই লক্ষ্য করলাম যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বোয়িং ভর্তি করে সৈন্য ঢাকায় আনা হচ্ছে। তাদের সাথে আর্মীর স্পেশাল কমাণ্ডো সেনারাও আসছে এবং তাদের ব্যাগ-ব্যাগেজ নামছে। আমি বুঝতে পারছিলাম যে এটা দেশের দু'অংশের মধ্যে সৈন্য বদলী ও যাতায়াতের একটা সাধারণ ঘটনা নয়। যারা আসছিল তাদের ক্রম বর্দ্ধমান সংখ্যা আমার সন্ধিগ্ধ হওয়ার কারণকে আরও জোরদার করছিল। তদানিন্তন ডি, এফ, আই ডাই রেক্টরেটের একজন উচ্চ পদস্থ বাঙ্গালী অফিসারকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেও সঠিক উত্তর পাইনি।

মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহের পর থেকেই পরিষ্কার ভাবে অনুভব করলাম যে আমাকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য কায-কলাপ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। উপর মহল থেকে এ ধরণের আচরণ অপ্রত্যাশিত হলেও এর কারণ আমার নিকট অবোধগম্য ছিলনা।

সারা পূর্ব পাকিস্তান তখন প্রতিবাদ মুখর। মানুষ তাদের নিজ নিজ পন্থায় এ অন্যায়ের মোকাবেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। দেখলাম ইকবাল হলের ছাত্ররা কয়েকটি মাত্র পুরোনো ৩০৩ রাইফেল নিয়ে নিজেদের তৈরী করছে শত্রুর মোকাবেলার জন্য। এ ঘটনায় আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তাদের প্রস্তুতির ধরণ দেখে আমার মনে হল যে কতবড় শত্রুর মোকাবেলা তারা করতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা পর্যন্ত তাদের নেই। অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একটা নিয়মিত বাহিনীর মোকাবেলায় ৩০৩ রাইফেল নিয়ে বেসামরিক লোকদের পক্ষে কতটুকু কি করা সম্ভব! কিন্তু তবু সেদিন আমি ওদের প্রাণের আবেগ ও চিত্তের দৃঢ়তায় মুগ্ধ হয়েছিলাম।

পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত পাকিস্তান বিমান বাহিনীর টেকনিশিয়ানদের অধিকাংশই ছিলেন বাঙ্গালী। সংরক্ষণ, সরবরাহ ও যোগাযোগ ইত্যাদি কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এদের হাতে ন্যাস্ত ছিল। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা সে সময় আমি ভেবেছি। কিন্তু এ ধরণের পদক্ষেপ নেবার আগে রাজনৈতিক অনুমোদন সমিচীন মনে হওয়ায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একটা কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করি। এই সূত্রে দু'জন আওয়ামী লীগ এম, পি আমার বাসায় আসেন। আমি তাদেরকে বল্লাম যে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের তৎপরতা ও প্রস্তুতি দেখে আমার ধারণা হচ্ছে যে, তারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। এ অবস্থায় কি করণীয় জানতে চাইলাম এবং তাদের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীতে বাঙ্গালীদের

ভূমিকা সম্পর্কে পার্টির নেতাদের মনোভাব জানবার ইচ্ছাও তাদের নিকট ব্যক্ত করলাম। সে মুহূর্তে তারা আমাকে সুনির্দিষ্ট কিছুই বলতে পারেননি।

২৫শে মার্চ সন্ধ্যার দিকে এয়ারপোর্ট যাই। দেখলাম অতি গোপনে সতর্ক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় একটি বিমানে মাত্র একজন কিংবা দু'জন যাত্রী সহ জেনারেল ইয়াহিয়া করাচীর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করলেন। আমি এই সংবাদ টেলিফোনে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে জানিয়ে দিই। আমার মনে আছে, এয়ারপোর্ট থেকেই আমি ক্যান্টনমেন্টে এয়ার ফোর্সের সব বাঙ্গালী অফিসারদেরকে খবরটা দেয়ার চেষ্টা করেছি। পরে বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাঁদেরকে আবার খবরটা বিস্তারিত দিই। বলেছি, পরিস্থিতি গুরুতর, একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে যাচ্ছে। আমি তাদের সবাইকে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিতে বলি এবং আমার পরিবারকে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে পাঠিয়ে দিই।

রাত এগারটার দিকে কানে আসে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণের আওয়াজ। পায়ের আওয়াজের পর পরই ট্যাঙ্ক চলার শব্দ। বুঝতে পারলাম যা এক... আশঙ্কা করেছিলাম তা বাস্তবে পরিণত হতে শুরু করেছে। রাতভর সারা শহর জুড়ে যে তাণ্ডব চলছিল, আগুনের আলোতে এবং গুলির আওয়াজে ক্যান্টনমেন্ট থেকেই ঘটনার ভয়াবহতা সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা হচ্ছিল। কিন্তু তাণ্ডবের ভয়ঙ্কর রূপটা যে কল্পনার সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গেছে না দেখা পর্যন্ত সেটা সঠিক বোঝা যায়নি।

২৫শে মার্চ সন্ধ্যা থেকে মাঝ রাতের ভেতরেই জন-সাধারণ জায়গায় জায়গায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে পাক সেনাদের চলাচলে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করে। কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে এসব ব্যারিকেড কোন বাধাই ছিলনা।

২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় এয়ার ফোর্স মেসে গেলাম। মেসের পাশে যে পুকুর তার পূর্ব দিক থেকেই নাখাল পাড়া এলাকা শুরু। এটা অত্যন্ত গরীব ও নিম্নবিত্ত লোকের এলাকা। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম পাক-বাহিনীর লোকেরা অগ্নিসংযোগকারী যন্ত্র নিয়ে পুরো এলাকাটি ঘিরে ফেলেছে এবং তাদের সাথে মেশিনগানধারী সৈন্যরা পজিশন নিয়েছে।

অল্পক্ষণ পরেই দেখলাম সারা এলাকায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আতঙ্কগ্রস্থ অসহায় মানুষ প্রাণের ভয়ে আর্ত চীৎকার করে বেরিয়ে আসছে বাইরে। সারা শহরে তখন কার্ফু এরা কার্ফু ভঙ্গ ক.রছে এই অজুহাতে সঙ্গে সঙ্গে মেশিনগানধারী সৈন্যরা নির্বিচারে গুলি চালাল।

পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষেব মাঝে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে এই সব গরীব ও নিম্নবিত্ত লোকেরাই আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ভিত্তি—সুতরাং এদেরকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে। মেসে জনৈক পাকিস্তানী ফ্লাইট

লেফটেনান্ট যিনি আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং জানতেন যে, আমি একজন বাঙ্গালী গ্রুপ ক্যাপ্টেন, আমার সামনেই মন্তব্য করলেন—"This is the way to deal with the bastards."

এরই মধ্যে মুক্তিবাহিনীতে কিভাবে যোগদান করা যায় সে কথা ভাবতে শুরু করি। কিন্তু কিভাবে যাবো? আমার বাসায় কয়েকজন গার্ড নিয়োগ করা হয়েছিল নিরাপত্তার জন্য। কিন্তু তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল আমার গতি-বিধির ওপর নজর রাখা।

কিন্তু তা সত্বেও দেশ ত্যাগের ব্যাপারে আমি অন্যান্য বাঙ্গালী অফিসার, বিশেষ করে বৈমানিকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করি। তখনকার উইং কমাণ্ডার বাশারের সাথেও আমি যোগাযোগ স্থাপন করি এবং তার মাধ্যমে অন্যান্য অফিসারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করি।

আলাপ আলোচনার পর আমরা এয়ার ফোর্সের কতিপয় অফিসার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিই যে যেমন করেই হোক পাক বাহিনীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতেই হবে। আমাদের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য আমরা মাঝে মাঝে বিভিন্ন চাইনিজ রেস্টুরেন্টে আলোচনায় বসতাম। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো যে একদিনে একযোগে সবাই পাক বাহিনী ত্যাগ করবোনা। কারণ তাতে ধরা পড়লে সবারই একসাথে ধরা পড়ার সম্ভাবনা। সিদ্ধান্ত হল ফ্লাইট লেফটেনান্ট নূরুল কাদের প্রথমে সীমান্ত অতিক্রমের বিভিন্ন পথ আগে সরেজমিনে জরিপ করে আসবেন এবং পরে তাঁর রিপোর্ট অনুসারে আমরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথে সীমান্ত অতিক্রম করবো। কথামত নূরুল কাদের পথের খবর নিতে যান। কিন্তু কাজ শেষে ফিরে আসার সময় তিনি পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। পরে অবশ্য নানা অজুহাত দেখিয়ে তিনি মুক্তি পেয়ে আসতে পেরেছিলেন এবং আমাদের সাথে যোগ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অন্যান্য অফিসারদের সাথে মিলে দেশ ত্যাগের এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে ২৮শে মার্চ আমি এ ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ নেই। বেড়াতে যাবার কথা বলে স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে সহ আমার নিজের গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। ডেমরা ঘাট পর্যন্ত গিয়ে গাড়ীটি ভেতরে চাবি সহ ফেলে রেখে অনির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানের উদ্দেশে বের হই। ফ্লাইট লেফটেনান্ট মারগুব (পরে বাংলাদেশ বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান) আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং তিনিই পথ দেখিয়ে আমাদের গ্রামের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু আমাদের সে প্রথম প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ভাড়া করা লঞ্চে কিছুদূর যাবার পর নদীতে অল্প পানির জন্য আটকে পড়ি এবং শেষ পর্যন্ত ভৈরব বাজা-রের কাছ থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হই।

এপ্রিল মাসের ১০ কি ১১ তারিখে রাজশাহী সীমান্ত অতিক্রমের লক্ষ্যে আমরা কয়েকজন মিলে আবার ঢাকা ত্যাগ করি। কিন্তু আরিচা এসে পাক বাহিনীর সমাবেশ দেখে আবার ঢাকা ফিরে আসি।

সীমান্ত অতিক্রমের পরবর্তী চেষ্টা চালাই ১০ই মে তারিখে। এবার লক্ষ্য ছিল কুমিল্লার পথে সীমান্ত অতিক্রম করা। কিন্তু নবীনগর পর্যন্ত গিয়ে পাক-বাহিনীর সমাবেশ দেখে ফিরে আসি এবং নরসিংদীর কাছে এক জুট মিলের রেস্ট হাউজে আশ্রয় নেই। মিলের ম্যানেজার ছিলেন ফ্লাইট লেফটেনান্ট রেজা এবং তিনিও আমাদের সাথে সীমান্ত অতিক্রমকারীদের দলে ছিলেন।

১২ই মে রাতে কুমিল্লার কালির বাজারে জনৈক কৃষকের বাড়ীতে রাত কাটানোর ঘটনার স্মৃতি এখনো আমার স্মরণে অম্লান। কৃষকটির বাড়ীতে আমরা বেশ কয়েকটি পরিবার আশ্রয় নিয়েছিলাম। রাত ২/৩ টার দিকে হঠাৎ দরজায় করাঘাত। পাক সেনারা হবে ভেবে কেউ কেউ দরজা খুলতে দ্বিধাবোধ করছিলেন। বললাম, পাক সেনারা এসে থাকলে দরজা না খুললেও তারা ভেঙ্গে ঢুকবে। যারা দ্বিধা করছিলেন তাঁরাও একমত হলেন যে, দরজা খোলাই সংগত। দরজা খুলে দেখি বাইরে দাঁড়িয়ে গৃহস্বামী স্বয়ং। তিনি আমাদের জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করেছেন এবং বিনয় ও আন্তরিকতার সাথে আমাদেরকে খাবার দাওয়াত দিতে এ. েন। দরিদ্র কৃষকের বাড়ী। এতরাতে এতগুলো লোকের জন্য এত ভাল ভাল খাবারের ব্যবস্থা দেখে আমরা সবাই বিস্মিত। একদিকে আমরা যেমন বিব্রত বোধ করছিলাম অন্যদিকে তেমনি এই গ্রাম্য কৃষকের আন্তরিকতায় অভি-ভূত হই। পরে জেনেছিলাম যে আমাদের আশ্রয়দানের অপরাধে আমরা চলে যাবার পর পাক সেনারা উক্ত কৃষকের বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়।

আমাদের আশ্রয়দাতা উক্ত কৃষক ও স্থানীয় অন্যান্য কতিপয় লোকের সহায়তায় পরদিন আমরা সীমান্ত অতিক্রম করে মতিনগর বি-এস-এফ ক্যাম্পে উপস্থিত হই। এখানেই ক্যাপ্টেন আবুর সাথে আমাব প্রথম দে । তিনি পরে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন।

আমাদের প্রায় সাথে সাথে বিমান বাহিনীর প্রায় তিন শত জুনিয়র টেকনি-শিয়ান ভারতে যায়। এখানে বলা অপ্রাসংগিক হবেনা যে, বিমান বাহিনীর যারা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়েছিলেন তাঁরা স্বেচ্ছায় স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্যই তা'করেছিলেন। তাঁদের বেশীর ভাগের সাম-নেই দেশে তেমন কোন বিপদ ছিলনা। বিমান বাহিনীর যারা ভারতে গিয়ে-ছিলেন একান্তরে তাদের সামনে অন্যান্য পথ খোলা ছিল। তাঁদের ভারতে যাবার উদ্দেশ্য ছিল একটাই, তাহল দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা।

আগরতলা পৌঁছেই আমি মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর শওকত আলী প্রমুখের সঙ্গে যোগাযোগ করি। পরদিন জেনারেল কালকাত সিং এবং আমি মেজর শাফায়েত জামিলসহ কোলকাতায় যাই। ওখানে পৌঁছে আমি কর্নেল ওসমানীর (পরে জেনারেল) সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। কোলকাতায় তাঁর সঙ্গে দুইদিন থাকার পর তিনি আমাকে উর্দ্ধতন ভারতীয় সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা-

দের সাথে আলাপ আলোচনার জন্য দিল্লী যাওয়ার নির্দেশ দেন। আমি তখন ভারতীয় বিমান বাহিনীর জনৈক পদস্থ কর্মকর্তার সাথে দিল্লী যাই। ইতি-মধ্যে আমার সাথে যে সব অফিসার সীমান্ত অতিক্রম করেছিলেন তাঁরাও দিল্লী এসে পৌঁছান।

দিল্লী থেকে কোলকাতা ফেরার পর কর্নেল ওসমানী আমাকে জানালেন যে, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আমাকে সরকারের সম্মিলিত সশস্ত্র বাহি-নীর ডেপুটি চীফ অব ষ্টাফ নিযুক্ত করেছেন। সংসদ সদস্য কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) রবকে রাজনৈতিক কারণে চীফ অব ষ্টাফ নিয়োগ করা হয়েছে। একজন এম, পি হিসেবে কর্নেল রব আগরতলায় মুজিব নগর সরকারের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়েই বেশী ব্যস্ত থাকতেন। ফলে যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়গুলোর বেশীর ভাগ দায়িত্ব আমার ওপরই ন্যস্ত ছিল।

মুক্তিযুদ্ধের সমরিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সমগ্র এলাকাকে বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ করে সেক্টর কমাণ্ডার নির্দ্ধারণ করা হয়। হেড কোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগের ব্যাপারে আমাদের নিজস্ব কোন শক্তিশালী মাধ্যম না থাকায় আমরা ভারতীয় সেক্টরগুলোর সহায়তায় যোগাযোগ রক্ষা করতাম। কমাণ্ডার-ইন-চীফ-এর তরফ থেকে সেক্টর কমাণ্ডারদের দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হয়। পরে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে সেক্টর কমাণ্ডারই নির্দ্ধারণ করতেন কোন্ দায়িত্ব তিনি কেমন করে সম্পন্ন করবেন। সমগ্র এলাকাকে বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ করার ফলে যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা অধিকতর সমন্বয় সাধনে সক্ষম হই।

ডেপুটি চীফ অব ষ্টাফ হিসেবে ট্রেনিং ও অপারেশনের দায়িত্ব ছিল আমার। মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য যে সব যুবক সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করতো তাদের জন্য বর্ডার এলাকাতেই ক্যাম্প খোলা হয়েছিল। এইসব যুব-ক্যাম্প থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুট করা হত। এই রিক্রুটমেন্টের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যদের ভূমিকাই ছিল অগ্রণী এবং মূলতঃ তাঁরাই নতুন মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়োগ করতেন।

আমি বিশ্বাস করতাম যে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণে সকলের সমান অধিকার রয়েছে এবং এ ব্যাপারটিকে সকল প্রকার দলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে রাখা প্রয়োজন। এ জন্যই দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্য থেকে আমি মুক্তিযোদ্ধা নিয়োগের চেষ্টা করেছি।

মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়োগের ব্যাপারে পেশাদারী মনোভাবের প্রয়োজন ছিল। যুবকদের মানসিক ও শারীরিক যোগ্যতা, মনোবল, দৃঢ়তা ইত্যাদি গুণাবলী নিয়োগ লাভের মানদণ্ড হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু নিয়োগের ক্ষেত্রে ভিন্নতর নীতি অনুসৃত হওয়ায় কিছু কিছু অনভিপ্রেত ফল পরিলক্ষিত হয়। আমি ছাত্রলীগ, যুবলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি জনমতের সদস্যদের সাথে বহু-

বার আলোচনায় মিলিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধকে সকল প্রকার কোন্দলের উর্দ্ধে রেখে সবাইকে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে কাজ করার আহবান জানিয়েছি। রিক্রুটমেন্টের ব্যাপারে আমি সব সময় কর্ণেল ওসমানীর সাথে আলোচনা করতাম এ সব বিষয় নিয়ে।

মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার বেশ কিছুদিন পরে মুজিব বাহিনী নামে একটা আলাদা সশস্ত্র গ্রুপ গঠনের কথা আমি জানতে পারি। কর্ণেল ওসমানী আলাদা নাম ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই বাহিনী গঠনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। আর আমিও এ ব্যাপারে তাঁর সাথে সম্পূর্ণ একমত ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সকল শক্তি ও সম্পদ একই লক্ষ্যে এবং একই কমাণ্ডে সমন্বিত হওয়া উচিৎ এবং এটাই আমরা চেয়েছিলাম। একজন রাজনীতি নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসেবে আমি অনুভব করতাম যে মুক্তিযুদ্ধ কোন একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের সংগ্রাম নয়—এটা একটা জাতীয় জনযুদ্ধ।

একাত্তরের আগষ্ট মাসের শেষ দিকে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর তিনটি ব্যাটেলিয়ন গঠন করা হয়—এগুলোকে 'জেড-ফোর্স' 'এস-ফোর্স' এবং 'কে-ফোর্স' নামে অভিহিত করা হয়। এগুলো গঠন করার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যে ক্রমাগত গেরিলা আক্রমণের ফলে পাক-বাহিনী যখন দুর্বল ও হতোদ্যম হয়ে পড়বে তখন এই ব্যাটালিয়নগুলোর দ্বারা চূড়ান্ত আঘাত হেনে বাংলাদেশের একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ এলাকা সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত করা হবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে ঐ এলাকা থেকেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং যুদ্ধ দুই-ই চালিয়ে যাওয়া হবে।

এই ব্যাটেলিয়নগুলো সেনাবাহিনী, বি, ডি, আর এবং পুলিশ বাহিনীর যে সব নিয়মিত সৈনিক মুক্তিবাহিনীতে ছিল তাদের ভেতর থেকে গুণাগুণ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বাছাইকরা যুবকদের নিয়ে গঠন করা হয়। তিনটি ব্যাটেলিয়নে নেয়ার পর নিয়মিত বাহিনীর বাদবাকী সদস্যদের নিয়ে 'সেক্টর ট্রুপস' গঠন করা হয়। ব্যাটেলিয়ন এবং সেক্টর ট্রুপসের সদস্যরাই সাধারণভাবে 'মুক্তিফৌজ' নামে অভিহিত হত। বাকী সকল নিয়মিত ও অনিয়মিত গেরিলা যোদ্ধাদের মুক্তিযোদ্ধা বা 'ফ্রিডম ফাইটার' নামে অভিহিত করা হত।

ব্যাটেলিয়ন এবং সেক্টর ট্রুপস গঠন করার ফলে এই বাহিনীর বাইরে একান্তভাবে গেরিলা তৎপরতা চালিয়ে যাওয়ার জন্য যারা রয়ে গেলেন তাদের বেশীর ভাগই ছিলেন অপেশাদার, অনভিজ্ঞ ও অতি সামান্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। ফলে গেরিলাদের ছোট ছোট গ্রুপ গুলোকে সঠিকভাবে নেতৃত্ব প্রদানের অসুবিধা হয়ে পড়ে। এ'ছাড়া ভারত যে পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতো প্রয়োজনের তুলনায় তা'ছিল একান্তই অপ্রতুল। ফলে সাময়িকভাবে গেরিলা বাহিনীর কার্যকারিতা বেশ কিছুটা হ্রাস পায়।

গেরিলা যুদ্ধের ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণার অভাব এবং পরে উদ্ভূত এই পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য একটা কার্যকর পরিকল্পনা তৈরী অপরিহার্য

হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে কর্ণেল ওসমানীর অনুমতি নিয়ে আমি যে প্ল্যান তৈরী করি তাতে যুদ্ধ পরিচালনায় দক্ষ একটা কমাণ্ড গঠন, মুক্তিযোদ্ধা নিয়োগের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নীতি অবলম্বন, প্রশিক্ষণ ও পরিবেশের উন্নতি এবং সমন্বয় ও যোগাযোগের ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছিল।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সরকারেব এক কেবিনেট মিটিংএ জেনারেল অরোরা এবং ডি, পি, ধর সহ বহু শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধাদেব জন্য অধিকতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং যুদ্ধোপকরণ সরবরাহের দাবী জানানো হয়। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ মুক্তিযুদ্ধে সর্বিক সহযোগিতা দানের পূর্ব শর্ত হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে জাতীয় চরিত্র আরোপ এবং এর অর্থনৈতিক দিক-গুলো তুলে ধরার পরামর্শ দেন।

বাংলাদের সশস্ত্র বাহিনীর তিনটি ব্যাটেলিয়ন গঠন কবার কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। একটা স্বাধীন দেশের পূর্ণাংগ সশস্ত্র বাহিনী গঠনের প্রস্তুতিকে সামনে রেখে আমরা তখন বাংলাদেশের বিমান বাহিনী গড়ে তোলার কথাও চিন্তা করি। বিমান বাহিনীর প্রয়োজনীয়তাও তখন অনুভূত হচ্ছিল। আমি বিমান বাহিনী গঠনের ব্যাপার নিয়ে প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দিন ও কর্ণেল ওসমানীব সাথে আলোচনা করি। এই আলোচনার ফলশ্রুতি হিসেবে পবে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন-এর উপস্থিতিতে ভারতীয় প্রতিরক্ষা সচিব মি, কে, বি, লাল এবং বিমান বাহিনীর এয়ার মার্শাল দেওয়ানেব সাথে আমার আলোচনা হয়। তাঁবা বল্লেন যে, আমাদের বৈমানিকদের ভারতীয় স্কোয়াড্রনের সাথেই অপারেট করতে হবে এবং স্বভাবতঃই ভারতীয় নিয়ম কানুন আমাদের ওপর প্রযোজ্য হবে। আমি এই প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করে বিকল্প প্রস্তাব হিসেবে আমাদেরকে বিমান এবং আনুসংগিক সুবিধাদি প্রদানেব অনুরোধ জানাই যাতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী তার নিজস্ব পৃথক সত্ত্বা নিয়ে অপারেট করতে পারে। কারণ আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বৈমানিক ও টেকনিশিয়ানের কোন অভাব ছিলনা।

এর কিছুদিন পর কলকাতায় ভারতীয় বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল পি, সি, লালের সাথে আবার আমার এ ব্যাপারে আলোচনা হয়। এই আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা ভারতীয় বিমান বাহিনী থেকে অটার এয়ার ক্রাফট, হেলিকপ্টার এবং একটি ডাকোটা বিমান পাই। এই বিমানগুলো নিয়েই সম্পূর্ণভাবে আমাদের নিজস্ব পাইলট ও টেকনিশিয়ানদের নিয়ে ১৯৭১ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর ভার-তের নগাল্যাণ্ডের ডিমাপুর বিমান ঘাটিতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গঠিত হয়। সে সময় উইং কমাণ্ডার বাশার ৬নং সেক্টরের কমাণ্ডার ছিলেন এবং ফ্লাইট লেঃ লিয়াকত ও ফ্লাইট লেঃ নুরুল কাদের তখন ৪ এবং ৫ নং সেক্টরে সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে অংশ নিচ্ছিলেন। এরা ছাড়া বাকী সকল বৈমানিক বিমান বাহিনীর সাথে যুক্ত থাকে।

স্কোয়াড্রন লীডার সুলতান মাহমুদ (বর্তমানে বিমান বাহিনী প্রধান) তখন ১নং সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আমি তাঁকে সেখান থেকে ডিমাপুর নিয়ে আসি এবং বিমান বাহিনীর প্রশাসনিক ও 'অপারেশনের' দায়িত্ব তাঁর ওপর দিই।

যেহেতু আমাদের সম্পদ ও জনবল খুবই সীমিত ছিল সেহেতু বিমান যুদ্ধের কৌশল হিসেবে আমরা দুটো পন্থা অবলম্বন করি। প্রথমতঃ কেবল মাত্র রাতের বেলায় অপারেশন পরিচালনা করা এবং দ্বিতীয়তঃ আমরা যাতে পাক-বাহিনীর রাডারে ধরা না পড়ি সেজন্য খুব নীচু দিয়ে উড্ডয়ন করা।

নাগাল্যাণ্ড এক বিস্তীর্ণ জংগলাকীর্ণ পার্বত্য এলাকা। সুতরাং লক্ষ্যবস্তু ঠিক-করে নিয়মিত অনশীলন করা আমাদের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক ছিল। তাই একটা পাহাড়ের ওপর সাদা প্যারাসুট ফেলে সেটাকে লক্ষ্যবস্তু ধরে আমরা অনুশীলনের ব্যবস্থা করি যাতে রাতের বেলায়ও দেখা যায়।

৩রা ডিসেম্বর সার্বিক যুদ্ধ শুরু হলে আমাদের এই ক্ষুদ্র বিমান বাহিনী চট্টগ্রাম ও গোদনাইলে প্রথম আঘাত হানে এবং পাক বাহিনীর মারাত্মক ক্ষতি সাধনে সক্ষম হয়।

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ডেপুটি চীফ অব স্টাফ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক প্রত্যক্ষ করার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমা-দের তরুণেরা প্রায় বিনা অস্ত্রে অথবা অতি সাধারণ অস্ত্র নিয়ে কেমন করে অতি আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একটা বাহিনীর সাথে অসীম সাহস নিয়ে মোকা-বেলা করেছিল এবং কেমন করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল তার বহু ছোট্ট ছোট ঘটনা আজও আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে। এখানে আমি বহু ঘটনা থেকে একটা মাত্র ঘটনার উল্লেখ করছি।

যুদ্ধ চলাকালে পাকবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু-সামগ্রী বিশেষ করে অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে আমরা চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরকে অকেজো করে দেয়ার একটা পরিকল্পনা নিই। আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে-ছিলাম যে, যদি নৌ-কমাণ্ডো পাঠিয়ে পাকিস্তানী বা তাদের মিত্রদের কিছু সংখ্যক জাহাজ ডুবিয়ে দিতে পারি তবে এতে চমৎকার ফল পাওয়া যাবে। ডুবে যাওয়া জাহাজ একদিকে বন্দরের প্রবেশ পথকে বন্ধ করে দেবে এবং মানসিক দিক থেকেও অন্য কোন জাহাজ সেপথে যেতে সাহসী হবেনা।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে জুন মাস থেকে প্রায় ১৫০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে মুর্শিদাবাদের পলাশীতে নৌ-কমাণ্ডোর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই পরিকল্পনার আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৩/১৪ বছর বয়সের একটি কিশোর ডুব-সাঁতার দিয়ে চালনা বন্দরের একটি পাকিস্তানী জাহাজে মাইন ফিট করতে যায় কিন্তু ভ্রান্তি বশতঃ সে একটি চায়নীজ জাহাজের কাছে চলে যায় এবং ওদের হাতে ধরা

পড়ে। পরে বহু জিজ্ঞাসাবাদের পর তারা তাকে মুক্তি দেয়। ফিরে এসে অবলীলায় সে তার মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসার বর্ণনা দিয়েছিল সবার কাছে। মুক্তিপাগল এই কিশোরের সাহস, দৃঢ়তা ও দেশপ্রেমের দৃষ্টান্তে সেদিন আমরা সবাই বিস্মিত হয়েছিলাম। এই ঘটনা একটা একক বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়—এরকম হাজার হাজার নজীর সেদিন আমাদের ছেলেরা স্থাপন করেছে।

মে মাসে পরিস্থিতি বিশ্লেষণের পর আমার পরিষ্কার একটা ধারণা হয়েছিল যে, ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ দেশ পুরোপুরি শত্রুমুক্ত হবে। আমার ঐ ধারণার পেছনে প্রধানতঃ তিনটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ যে বিপুল পরিমাণ শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল তারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে ভারতের পক্ষে একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব এর একটা সমাধানের পথ বের করার জন্য ভারত উদ্‌গ্রীব ছিল।

দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তানের দুই অংশকে আলাদা করে দেয়ার যে কামনা ভারতের ছিল তাকে সফল করে তোলার এটাই ছিল সব চেয়ে উপযুক্ত সময়। সুতরাং ভারত এ সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার করবে। তৃতীয়তঃ ভারত এটা বুঝতে পেরেছিল যে বাইরের, বিশেষ করে চীনের তরফ থেকে হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায়না। সুতরাং যুদ্ধে যদি ভারতকে নামতেই হয় তাহলে এমন একটা সময় বেছে নিতে হবে যাতে চীনের পক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ভারত-চীন এলাকায় প্রচণ্ড শীত ও তুষারপাতের ফলে চীনা সৈন্যদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং কৌশল হিসেবে ঐ বিশেষ সময়টাকেই বাংলাদেশের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা করে নেয়ার ব্যাপারে ভারতের চেষ্টা করাই স্বাভাবিক।

কেবল ভারতীয় সাহায্যের কথা চিন্তা করেই আমি এ ধারণা পোষণ করিনি। ইতিমধ্যে দেশের জন-সাধারণের অকুণ্ঠ সমথন ও সহযোগিতা পেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল একদিকে যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল তেমনি শত্রুকে চরম আঘাত হানার শক্তিও তাদের দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্রমাগত গেরিলা আক্রমণে এবং দেশের ভেতরে কোটি কোটি বৈরীভাবাপন্ন মানুষের অসহযোগিতা ও প্রতিরোধ পাকবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে হতোদ্যম ও পরিশ্রান্ত করে তুলেছিল।

অবশেষে আমাদের সেই বহু কাঙ্খিত সময়, শত্রুর পূর্ণ আত্মসমর্পণের সময় ঘনিয়ে এল। ১৬ই ডিসেম্বরের সকাল বেলা। পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্তের কথা ইতিমধ্যে এসে গেছে। এমন সময় খবর পেলাম বাংলাদেশ সরকারের পূর্ণ কেবিনেটের মিটিং বসেছে এবং আমাকে ওখানে জরুরী কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য খোঁজ করা হচ্ছে। কর্ণেল ওসমানী তখন সীমান্তের অগ্রবর্তী এলাকা পরিদর্শনের জন্য সিলেটে ছিলেন। সুতরাং সেই অল্প সময়ে তাঁর সঙ্গে চেষ্টা করেও যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়ে উঠেনি।

আমাকে প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দিন জানালেন যে বিকেলে ঢাকায় পাক-বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করবে এবং কর্ণেল ওসমানীর অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সবচেয়ে সিনিয়র অফিসার হওয়ায় উক্ত অনুষ্ঠানে আমাকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। তদনুসারে জেনারেল অরোরার সঙ্গে বিমানে আগরতলা, এবং ওখান থেকে হেলিকপ্টারে ঢাকা এসে পৌঁছলাম। জেনারেল অরোরা ছিলেন সম্মিলিত বাহিনীর কমাণ্ডার।

আত্মসমর্পণের দলিলে কেবল মাত্র দু'জনের স্বাক্ষর দানের ব্যবস্থা ছিল—একজন পাক-বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার প্রধান এবং অন্যজন ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ বাহিনীর অধিনায়ক।

অনুষ্ঠানে পাক-বাহিনীপ্রধান বিষন্ন, ভগ্নপ্রায় ও অশ্রুসিক্ত জেনারেল নিয়াজীকে দেখলাম। যথা সময়ে উভয় পক্ষের স্বাক্ষর হয়ে গেল। চূড়ান্ত বিজয়ের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের।

আব্দুল করিম খন্দকার
(এয়ার ভাইস মার্শাল, অবসর প্রাপ্ত)
আগস্ট, ১৯৮৪।

আব্দুল খালেক

উনিশ শত সত্তুরের মার্চ মাসে আমি সারদা পুলিশ একাডেমির প্রিন্সিপাল ছিলাম। অনেক আগে থেকেই দেশের রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহের প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে পূর্ববঙ্গ/পূর্ব পাকিস্তানকে কোণঠাসা করে রাখার ঘটনাবলী আমার চেতনায় আঘাত দিয়েছিল। লিয়াকত আলী খান, সরদার আব্দুর রব নিশতার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করবেন তা আমি মেনে নিতে পারিনি। রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও খাজা নাজিমউদ্দিন যে সকল কথা বলেছেন তাতে উর্দুভাষার প্রতি আমার বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিসে যোগদান করেও আমার মনোভঙ্গির কোন পরিবর্তন ঘটাইনি, উর্দুভাষা শেখার কোন চেষ্টা করিনি যদিও পুলিশ বিভাগে উর্দুভাষার প্রচলন ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৬ সালের সংবিধানের সংখ্যা-সাম্য নীতি এবং ১৯৫৮ সালের সামরিকবাদকে আমি মোটেও সমর্থন করিনি। অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ক্ষমতা দখল করাকে আমি নিছক বর্বরতা বলে গণ্য করেছি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের এবং ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদেরকে আমি আজও শ্রদ্ধাকরি, ২১শে ফেব্রুয়ারী-রক্তস্নাত পূর্ববঙ্গে যারা

পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন তাঁরা আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ।

১৯৬৯ সালের সামরিক কর্তাদের আদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে পুলিশি তল্লাসি চালানো হয়। উক্ত তল্লাসির বিরোধিতা করে কিছু কথা বলার জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষ আমার উপর ক্ষেপে যায়। ঐ বছর ঢাকা বিভাগের ডি, আই, জি থাকা কালে প্রায় সময় সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমার মত বিরোধ ঘটতো। প্রশাসনের সঙ্গে মত বিরোধ অনেক আগেও হয়েছিল। ১৯৫৪ ও ১৯৬৫ সালের নির্বাচনে আমি নিরপেক্ষ থেকে মহা বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলাম। সে সময় আমার উপর কড়া নজর রাখা হতো। ১৯৬৯ এর শেষভাগে ঢাকার জনসাধারণ মওলানা মওদুদীকে পল্টন ময়দানে বক্তৃতা দিতে দেয়নি। গোলমালের দায়ে ঢাকার পুলিশ সুপার মামুন মাহমুদ (শহীদ) কে ময়মনসিংহে বদলী করা হয় এবং তাঁর পদোন্নতি ছয় মাস পিছিয়ে দেয়া হয়। এই প্রসঙ্গে ঘোরতর আপত্তি জানালে মাস তিনেক পরে আমাকে ঢাকা থেকে সারদায় বদলী করা হয়। কিন্তু ঢাকার ঝামেলা থেকে সরে গিয়ে আমি খুব খুশী হই।

১৯৭০-এর নির্বাচনের ফলাফল আমি লণ্ডনে বসে শুনতে পাই। পাকিস্তান হাই কমিশনের কর্মকর্তারা হতবাক। দু'চার জনের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারি যে, ফলাফল কার্যকর হতে দেয়া হবে না। দেশে ফিরে শেখ মুজিবর রহমান সাহেবকে একথা বলতে তিনি তা হেসে উড়িয়ে দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ ১৯৭১-এর জানুয়ারী মাস থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার কথা উত্থাপন করতে শুরু করেছিল। ৭ই মার্চের ঘোষণা ও অসহযোগ আন্দোলনের ফলে আসন্ন সামরিক আঘাতের মোকাবেলা করার কোন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রস্তুতি আমাদের ছিল কিনা জানিনা। আওয়ামী লীগ নেতারা ইয়াহিয়া খানের সংগে সংলাপের রাজনীতিতে উঠেপড়ে লেগেছিলেন। সামরিক কর্মকর্তারা বহুদেশে সংলাপের নামে রাজনীতিবিদদেরকে বোকা সাজিয়েছে এ খবর হয়ত বা তাঁদের জানা ছিলনা। মার্চের মাঝামাঝি সময়ে সারদা একাডেমিতে কর্মরত ও প্রশিক্ষণরত কয়েকশত পুলিশ খুব অস্থির হয়ে উঠে। দেশের আসন্ন সামরিক পরিস্থিতিতে তারা জীবন দিবে—এই প্রতিশ্রুতি রেখে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশদল নিজ নিজ কর্মস্থলে চলে যায়। একাডেমির স্টাফকে সে সময় স্থানীয় লোকজনদের গুলিবন্দুক বিষয়ক প্রশিক্ষণের কাজে নিয়োজিত করা হয়। সারদা একাডেমির খবর পেয়ে রাজশাহীতেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মামুন মাহমুদ (শহীদ) এর কথা আগেই বলেছি তিনি তখন ময়মনসিংহ থেকে বদলী হয়ে রাজশাহীর ডি, আই, জি। পুলিশ সুপার শাহ আব্দুল মজিদ (শহীদ) মাত্র মাস দু'এক আগে সারদা থেকে রাজশাহীতে বদলী হন। সারদা ও রাজশাহী পুলিশ লাইনে তখন পরিখা তৈরী করা হয় এবং পুলিশের নেতৃত্বে বিবিধ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। রাস্তাঘাট কেটে সামরিক যাতায়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়।

২৩শে মার্চ সারদা একাডেমিতে পাকিস্তানের পতাকা উঠানো হয়নি। এ খবর পেয়ে রাজশাহী গ্যারিসনের লোকজন এমনকি জেলা প্রশাসনের কেউ কেউ সারদা এসেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কর্মসূচীর সংগে সংগতি রেখে সারদায় কালো পতাকা উঠানো হয় এবং পাকিস্তানী পতাকা নিশ্চিহ্ন করা হয়। গ্যারিসনের ধারেকাছেই আমরা এত কিছু করে যাচ্ছি অথচ তখন আমাদের কোন ভয়ভীতি ছিলনা।

২৬শে মার্চের সকালে খবর পেলাম যে ইয়াহিয়া খানের সামরিক অভিযানে রাজারবাগ পুলিশলাইন, পিলখানা ই পি আর হেড কোয়ার্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা শহরের অনেক অংশ বিধ্বস্ত হয়েছে। হাজার হাজার পুলিশ ও ই পি আর লড়াই করে প্রাণ দিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু শিক্ষককে হত্যা করা হয়েছে। এসব খবর পাওয়ার সংগে সংগে আমাদের অস্ত্রাগারের তালা খুলে দেয়া হয়। সারদা একাডেমির পুলিশ পরিবারগুলো কোন দিকে সরে যেতে পারেনি। কেননা স্থানীয় লোকজন কাউকে সেই অঞ্চল ছেড়ে যেতে দিচ্ছিলনা। সামরিক যানবাহন চলাচলের প্রতিবন্ধকতা আগে থেকে তৈরী করা হয়েছিল। সরকারী আদেশে পদ্মায় নৌকা চলাচল বন্ধ। কাজেই সারদায় বসেই প্রতিরক্ষা/প্রতিরোধের জন্য তৈরী হওয়াই ছিল আমাদের একমাত্র উপায় ও লক্ষ্য।

৩১শে মার্চের শেষ রাতে খবর পেলাম যে একাডেমির পাশ দিয়ে রাতের অন্ধকারে কিছু সংখ্যক সৈন্য চলাচল করেছে। মিনিটকাল বিলম্ব না করে পরিবার সহ সেই অন্ধকারে আমার নিজস্ব গাড়ীতে করে একাডেমির বাইরে চলে আসি। সঙ্গে ব্যবহারের জন্য কাপড় চোপড় ও টাকা পয়সা কিছুই নিয়ে আসার সময় পাইনি। একাডেমিতে এই নির্দেশ রেখে আসি যে এবার যেন প্রত্যেকে নিজ নিজ নিরাপত্তার পথ বেছে নিতে বিলম্ব না করে। বেলা উঠার সঙ্গে সঙ্গে পুটিয়া থানায় এসেও সেনাবাহিনীর গতিবিধির খবর পেলাম। থানার প্রাঙ্গণে আমার গাড়ীটি ফেলে টমটম নিয়ে নওগাঁ-এর দিকে এগুতে থাকি। আমার স্ত্রী (সেলিনা) মেয়ে (সামিনা) এবং ছেলে (ইনান) আর বাবুরচি রহিমুদ্দিনকে টমটমে দেখে কে বা কাহারা গুজব রটিয়ে দেয় যে, সারদার একজন পাঞ্জাবী অফিসার পালিয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটি স্কুলের পাশে উপস্থিত হই এবং স্থানীয় একজন প্রিন্সিপালের বাসায় উঠি। সেখানে হাজার হাজার লোক এসে উপস্থিত। তারা বিশ্বাস করতে চায়না যে আমি বাঙ্গালী। প্রিন্সিপাল আমাদেরকে স্কুলের প্রাঙ্গণে নিয়ে আসেন। এমন সময় পার্লামেন্ট সদস্য সরদার আমজাদ হোসেন সেই পথে যাচ্ছিলেন। আমাদের বিপদের কথা শুনে তিনি লোকজনকে বুঝালেন যে আমি বাঙ্গালী। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক দাবী করে যে, আমাকে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে আমি বাঙ্গালী। আমজাদ হোসেনের পরামর্শে অগত্যা বক্তৃতা দিয়ে রেহাই পেলাম। কিন্তু সেখানে রাত কাটাতে সাহস হলোনা। অন্ধকারে গরুর গাড়ীতে নওগাঁ-এর দিকে এগুতে

শুরু করি। রাত এগারটায় পথিমধ্যে বাগমারা থানাঘরে ওঠে দেখি সেখানে কেউ নেই। কিছুক্ষণ পর একজন সিপাহীব দেখা পেলাম। ও, সি বা অন্যান্য পুলিশ কোথায় সে জানেনা। ও, সির পরিবারের কাছে পরিচয় দিয়ে বৈঠকখানায় বসি। গভীর রাতে তিনি আমাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেন। সিপাহীটি খবর দিল যে, ঐ জায়গায় আমাদের থাকা নিরাপদ হবে না। সিপাহী বহু কষ্টে একটি গরুর গাড়ীর বন্দোবস্ত করে দেন এবং আমরা ঐ রাতেই নওগাঁ-র দিকে এগিয়ে চলি। ভোর হতে না হতেই দাও, লাঠি, বল্লম ইত্যাদি হাতিয়ার সজ্জিত হাজার হাজার লোকের বেড়াজাল ভেদ করে চলতে হয়। বেলা নয়-টার দিকে একটি বাজারে এসে পেঁছি। সেখানেও আমাকে পাঞ্জাবী বলে সন্দেহ করা হয় এবং আমার বাঙ্গালীত্বের পরিচয় দিতে হয়। পরিবার সহ নওগাঁয় আমাদের আত্মীয় পুলিশ ইনসপেক্টর লোদীর বাসায় যাচ্ছিলাম। লোদীকে ডেকে আনার জন্য তিনি লোক পাঠালেন এবং আমাদের জন্য খাবার বন্দোবস্ত করলেন। ঘন্টা চারেক পর লোদী সাহেব এসে আমাদেরকে নওগাঁয় নিয়ে গেলেন। কোত্থেকে কিভাবে এখানে এসেছি এ খবর শুনে লোদী পরিবার মর্মাহত। কিন্তু আমরা এতদিন পর নিরাপত্তা বোধ ফিরে পেলাম।

এই সময় সান্তাহারে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালীদের মধ্যে হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করার কাজে লোদী ব্যতিব্যস্ত। ম্যাজিস্ট্রেট আজিজুর রহমান ও মেজর নাজমুল হক মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। রাজশাহী জিলার জন্য প্ল্যান বানানো হলো। আমি সারদা অঞ্চলের ভার নিই। সঙ্গে থাকেন সারদা ক্যাডেট কলেজের ক্যাপ্টেন রশীদ এবং অধ্যাপক আজিমুদ্দিন।* ব্যবস্থা করা হলো যে, পাক-সেনাবাহিনীর আক্রমণে নওগাঁর নিরাপত্তা বিপন্ন হলে ইনসপেক্টর লোদীর পরিবার আমার স্ত্রী, মেয়ে এবং ছেলেকে নিয়ে ধামুরহাট বর্ডার দিয়ে ভারতে আশ্রয় নেবে। ১২ই এপ্রিল আমি সারদায় ফিরে আসি। তখন একাডেমি প্রায় জনশূন্য। ভাইস প্রিন্সিপাল শৈলেন্দ্র কিশোর চৌধুরীর স্ত্রী সন্তান সম্ভবা ছিলেন বলে নিরুপায় হয়ে তাঁরা সারদায় রয়ে গেছেন। পি এস পি ট্রেইনী অফিসারদের মধ্যে বাঙ্গালীরা নিজ নিজ বুদ্ধি খাটিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছুবার আশায় বের হয়ে গিয়েছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানীদেরকে পদ্মার অপর পারে ভারতে পৌঁছিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে। আরো জানতে পারলাম যে, তারা ভারতীয় বর্ডার নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে রিপোর্ট করেছে**। জনশূন্য একাডেমিতে থাকার কোন যৌক্তিকতা নেই

* আজিমুদ্দিন পাক বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে শহীদ হন, আর নাজমুল-হক সীমান্তের ওপারে যুদ্ধ প্রস্তুতির সময়ে জীপ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। ক্যাপ্টেন রশীদ আজ আর বেঁচে নেই।

** উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তাদেরকে ভারতে আটক রাখা হয়। যুদ্ধের পরবর্তী কোন এক সময়ে তাদের পাকিস্তানে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করা হয়।

দেখে রশীদ ও আমি ঠিক করি যে, ১৪ই এপ্রিল সন্ধ্যায় চারঘাট হয়ে কুষ্টিয়ার পথে ভারতে প্রবেশ করব। এদিকে ঢাকা থেকে মাঠ-ঘাট পুড়িয়ে জ্বালিয়ে পাক বাহিনী নাটোরে এসে পৌছেছে। গুপ্তচরেরা আমাদের অবস্থান ওদেরকে জানিয়ে দেবে এই বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ ছিলনা। দুটি রাত সারদার বাইরে চারঘাট থানাঘরে কাটাই। থানায় কেউ ছিলনা। শুধু আমি এবং সারদার একজন বাঙ্গালী সিপাহী। ১৪ই এপ্রিল বিকাল চারটায়, সঙ্গে কিছু কাপড় চোপড় নিয়ে সারদা থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্য তৈরী হচ্ছি ঠিক এমনি সময় মেশিনগানের বিকট শব্দ শুনতে পেলাম। মিনিট খানেকের মধ্যে খবর পেলাম যে পাক বাহিনী তিন দিক থেকে একাডেমি ঘেরাও করেছে এবং অফিসার্স মেসে পৌছেছে। মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে সব কিছু ফেলে পদ্মার দিকে দৌড়ে পালাই। পানির ধারে কিছু সংখ্যক স্থানীয় লোক সামরিক বাহিনীর দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে আছে। নদী পার হবার কোন যানবাহন অনেকদিন আগে থেকেই সেখানে নেই। সাঁতরিয়ে পার হবার জন্য পানিতে নেমেছি, পিছনে তাকিয়ে দেখতে পাই নিকটবর্তী চরের নালায় একটি ছোট ঘাসের নৌকায় কয়েকজন লোক উঠবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঐ সময় নদীতে এগোলেই মাঝি গুলি খেয়ে মরবে এই ভয়ে বুড়া মাঝি কাউকে নৌকাতে উঠতে দিচ্ছেনা। ঘাস ভর্তি ছোট নৌকাটিতে বড়জোর দু'জন উঠতে পারে। আমি চরে ফিরে আসি এবং নৌকার কাছে গিয়ে মাঝিকে অনুরোধ জানাই আমাকে ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে চরের ধার বেয়ে কিছুদূর নিয়ে যাবার জন্য। সৈন্যদের চোখে ধুলি দিয়ে পালাবার আর কোন বুদ্ধি সে সময় মাথায় আসেনি। আমাকে ঘাসের নীচে লকিয়ে নৌকাটি ধীর গতিতে নদীর চরের ধার বেয়ে চলেছে তাতে কারো সন্দেহ হয়নি যে নৌকাটিতে আমি পালাচ্ছি। এভাবে একাডেমির গন্ডির বাইরে এসে নৌকাটি সরাসরি নদী পার হবার পথে এগিয়ে চলে এবং দ্রুত বেগে অনেক দূরে এসে পৌছে। এসময় সামরিক হেলিকপ্টার থেকে আগুন ছেড়ে গ্রামগুলি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। দিশেহারা হাজার হাজার লোক পালিয়ে পদ্মা নদীর চরে এসেছে কিন্তু নদী পার হতে পারছেনা। এদের মধ্যে প্রায় দেড় হাজার লোককে নদীর ধারে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে মাত্র চার/পাচ শত গজ দূরে উক্ত ঘাসের নৌকা ও আমি। সৈন্যরা ভাবতে পারেনি যে, আমি সেই নৌকায় লুকিয়ে আছি। ঘন্টা খানেক পর পদ্মার অপর পারে পৌছি। সঙ্গে কিছু নেই, ভেজা প্যান্ট ও সার্ট। নওগাঁয়ে ফেলে আসা পরিবারের কি অবস্থা ভাবতেই পারছিলামনা। হাজারো দুশ্চিন্তায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ি। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আজো স্মরণ করছি যে সারদায় গিয়ে আমি একটি ৬০০ পৃষ্ঠাব্যাপী বই-এর পাণ্ডুলিপি তৈরী করেছিলাম। এই পাণ্ডুলিপি সারদা একাডেমির স্টেনোগ্রাফার শহীদ মোস্তফার হাতেই তৈরী হয়। আমি যেদিন সারদা ছেড়ে পালিয়ে যাই সেদিনই মোস্তফাকে পাক সৈন্যরা গুলি করে হত্যা করে। আমার বাড়ীঘর, পাণ্ডুলিপি সর্বকিছু লুন্ঠিত হয়।

১৪ই এপ্রিলের সকাল বেলা সারদা একাডেমির ভাইস-প্রিন্সিপাল শৈলেন্দ্র কিশোর চৌধুরীকে পরিবার সহ পদ্মার ওপারে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করা হয়। অনেক অনুরোধের পর স্থানীয় লোকজন তাঁর সন্তান সম্ভবা স্ত্রীর প্রতি সদয় হয়ে কোন ক্রমে একটি নৌকা যোগাড় করে দেয়। নদীর ওপারে পৌঁছে চৌধুরী চরেই পরিবার সহ বসে থাকে। তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এগুতে সাহস পায়না। সন্ধার পরক্ষণেই আমরা ভারত সীমান্তে ডাক্তার নরেন্দ্র নাথের বাড়ীতে আশ্রয় নেই। সেই বাড়ীতে কয়েকশত লোক ইতিমধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। ডাক্তার আমাদেরকে যথাসম্ভব যত্ন সহকারে রাখেন। পরের দিন ব্লক ডেভেলাপমেন্ট অফিসার আমাকে বহরমপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। আমার পরিবারের পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁকে জানাই। তিনি আমার বালুরঘাট যাবার ব্যবস্থা করেন। সেখানে নাটোরের এস ডি ও কামালউদ্দিনের সঙ্গে দেখা হয়। কয়েকদিন আগে তিনি এখানে পালিয়ে আসেন।

বহরমপুরে সারদা একাডেমির পুলিশ ইনসপেক্টর ক্ষিতিশের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়। তাকে সঙ্গে করে বালুরঘাট নিয়ে যাই। বহরমপুরে মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপারের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করি। বালুরঘাট বাস টার্মিনালে কংগ্রেস কর্মী উৎপল আমাকে খুঁজে বের করে এবং তাদের বাসায় নিয়ে যায়। জানতে পেলাম বহরমপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমার খবর বালুরঘাট পাঠিয়েছেন। উৎপলদের পরিবার দেশ বিভাগের পূর্বে ঢাকা শহরের বাসিন্দা ছিল। উৎপলদের সঙ্গে পরামর্শ করে পরের দিন ভোরে ক্ষিতিশ ও আরো কয়েকজনকে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করে আমার পরিবারের তল্লাসে সীমান্তের এপারে পাঠানো হয়। প্রত্যেক দলের সঙ্গে আমার হাতের লেখা একটি চিঠি আমার পরিবারের জন্য দেই। নওগাঁয়ে সামরিক বাহিনীর উপস্থিতিতে সেখানকার লোকজন ভারত সীমান্তের দিকে পালিয়ে যায় এবং বিভিন্ন বাড়ীতে আশ্রয় নেয় এই খবর বালুরঘাটে পৌঁছে। বর্ডারের মাইল পাঁচেক ভিতরে ধামুইর হাট থানা অঞ্চলে এক হাজী বাড়ীতে অনেকলোক আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের সঙ্গে লোদী পরিবার ও আমার পরিবার সেই বাড়ীতে পৌঁছে। কিন্তু তারা নিরুপায়। সীমান্তের অপর পারেই বা কোথায় যাবে। এদিকে আমার কোন খোঁজ খবর তাদের জানা নেই। ক্ষিতিশ কয়েকটি আশ্রয়স্থল খুঁজে হাজী বাড়ীতে গিয়ে তাদের সন্ধান পায়। অতঃপর আমার পরিবার জীবনের চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার পথ বেছে নিয়ে ক্ষিতিশের সঙ্গে উৎপলদের বাড়ীতে এসে পৌছে। এখানেই আমাদের জীবনের আরেক অধ্যায়ের সূচনা। উৎপলের বাবা-মা-ভাই-বোন সবাই আমাদেরকে আপন বলে গ্রহণ করে। পশ্চিম দিনাজপুরের পুলিশ সুপার ঢাকা জেলার দোহার-নবাবগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। আমার শ্বশুরালয়ের এলাকার খৃষ্টান পরিবারের এই অফিসার ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের সদস্য। তিনি অভাবনীয়

সৌজন্য দেখিয়ে আমাদেরকে একটি জীপে কলকাতা পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। এবং পথে আমাদের সকলের খরচ বাবৎ একশত টাকা হাতে তুলে দেন।

১৮ই এপ্রিল সন্ধ্যার প্রাক্কালে কলকাতায় কীড স্ট্রীটের এম, পি হোস্টেলে বালুরঘাটের কংগ্রেস দলীয় এম, পি জয়নাল আবেদিনের অতিথি হিসেবে আশ্রয় নিই। খাওয়া-দাওয়ার খরচ আমাদের নিজেদেরকে বহন করতে হয়েছিল। আমার বা আমার স্ত্রীর সঙ্গে কোন টাকা পয়সা ছিলনা। সামান্য গহনা ছিল মাত্র। আমাদের ছোট ছেলে ইনান তার জন্মদিনে পাওয়া চার শত টাকা সঙ্গে নিয়ে সারদা থেকেই বেরিয়েছিল। পালাবার দিন রাতে ঐ টাকা তার সঙ্গে ছিল। এখন ইনান তার টাকা খরচ করতে চায়না। তার হিসেব হলো এতজন লোক মিলে এই টাকা খেয়ে শেষ করার পর আমাদের অবস্থা কি হবে। এম, পি হোস্টেলের কোণে পান-বিড়ি দোকানের বেচাকেনা দেখে সে নিজে একটি পান বিড়ির দোকান করতে চায়। তার হিসেব অনুযায়ী দৈনিক ৭/৮ টাকা লাভ হবে এবং তাতে আমাদের খাওয়ার খরচ কোনক্রমে হয়ে যাবে। ঐ সময় আমাদের পাঁচ জনের (বাবুরচি সহ) জন্য দৈনিক ৫/৬ টাকার বেশী খাওয়া খরচ করতে পারিনি।

কীড স্ট্রীটে পৌঁছে ১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়ার আম বাগানে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সনদ পাঠের কথা শুনতে পাই। সোহরাব হোসেন, মমিনউদ্দিন প্রমুখ কয়েকজন কলকাতায় এম, পি হোস্টেলেই ছিলেম। কামরুজ্জামানের সঙ্গে দু'মিনিটের জন্য দেখা হলো। আমাদের বড় বড় নেতারা কে কোথায় আছেন জানতে চাইলে তিনি কাণে কাণে বললেন যে, আগামী দিন সে খবর আমাকে দেয়া হবে। সেমুহূর্তে আমাদের নেতাদের অবস্থান সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে চায়নি।

পরদিন হাই কমিশনে গিয়ে ডেপুটি হাই কমিশনার হোসেন আলী ও পদস্থ অফিসার রফিকুল ইসলাম চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। রফিকের ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রী তখন ঢাকায়। তাদের জন্য দুশ্চিন্তায় এবং কিছু পেশাগত দুর্বিপাকে রফিক দিশেহারা। হাই কমিশনে খন্দকার আসাদুজ্জামান, নুরুল কাদের খান ও আরো কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হলো। তাদের কাছে শুনতে পেলাম যে, সৈদয় নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, মনসুর আলী, খন্দকার মোস্তাক আহমেদ, আব্দুল মান্নান ও কর্ণেল ওসমানীকে বালিগঞ্জের একটি বাসায় থাকতে দেয়া হয়েছে। সেখানে কয়েকজন ভারতীয় তাঁদের দেখাশুনা করছেন। কামরুজ্জামান অন্যত্র থাকেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা করে অনেক কথা জানতে চেয়েছি। সকলের মুখে একই কথা যে, তাঁরা নিজ নিজ সিদ্ধান্তে ভিন্ন ভিন্ন পথে কলকাতায় এসেছেন। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র দেখতে চেয়েছি। কিন্তু কেউ দেখাননি। বালিগঞ্জের সেই বাসস্থানে তাঁদের আর্থিক অনটন ও দুরবস্থা

দেখে খুবই খারাপ লেগেছে। পাশেই মহিশের বাথান, দুর্গন্ধে টিকা যায়না। নিরাপত্তার অভাবে তাঁরা ঘরের বাইরে যাচ্ছেন না। শুধু কামরুজ্জামান ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছেন। কলকাতায় লেখাপড়া করেছেন বলে তাঁর জানাশুনা অনেক লোক সেখানে ছিল। নজরুল ইসলাম ও মনসুর আলীর পরিবারের কোন খবর নেই। পরিবার উদ্ধারের চিন্তায় তাঁরা দিশেহারা। সারদার ইনস্পেক্টর গাজী গোলাম রহমানকে মনসুর আলীর পরিবার পাবনা জিলার কাজীপুর অঞ্চলে খুঁজে বের করে কলকাতায় আনার জন্য ঠিক করা হলো। পথের খরচ বাবদ একশত টাকা চাওয়া হলো। কিন্তু সে টাকা ১০/১২ দিনেও যোগাড় হয়নি।

খন্দকার আসাদুজ্জামান, নুরুল কাদের ও আমি একসঙ্গে নেতাদের সঙ্গে দেখা করে একটি প্রবাসী প্রশাসন গড়ে তোলার উপদেশ দেই। আমাদের মতে স্বাধীনতা ঘোষণা করে ঘরে বসে দিশেহারা হয়ে থাকলে চলবে না। আমাদেরকে সংঘবদ্ধ হতে হবে এবং যুদ্ধের জন্য সম্ভাব্য প্রস্তুতি নিতে হবে এবং সে জন্যে চাই একটি প্রশাসন যন্ত্র। আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে আমাদেরকেই যথোচিত বিধিব্যবস্থা তৈরী করার ভার দেয়া হলো। ইতিপূর্বে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট পদে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধান মন্ত্রী পদে তাজউদ্দিন আহমদ, পররাষ্ট্র মন্ত্রী পদে খন্দকার মোস্তাক আহমদ, অর্থমন্ত্রী পদে মনসুর আলী এবং স্বরাষ্ট্র ও রিলিফ মন্ত্রী পদে কামরুজ্জামান অধিষ্ঠিত হন। ১৭ই এপ্রিলের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে মুজিব নগর সরকার গঠিত হয়। কিন্তু সরকারের কোন প্রশাসনিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শুধু কর্ণেল ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল। মুজিব নগর সরকারের খসড়া প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার ভার আমাদেরকে দেয়া হয়। পাবনার ডেপুটি কমিশনার নুরুল কাদের খান এককালে বিমান বাহিনীর অফিসার হিসেবে কাজ করেছেন। তাছাড়া পাবনায় তিনি পাক-বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করেছেন। প্রশাসনিক খসড়া তৈরীতে নুরুল কাদেরের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশী। আসাদুজ্জামান, নুরুল কাদের ও আমি অফিসার্স ইনচার্জ পদবীতে প্রশাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করি। আমাদের কোন সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং ছিলনা। কয়েকটি চেয়ার টেবিলেই আমরা সকলে মিলেমিশে বসে কাজ করেছি। আর আমাদের সঙ্গে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁরাও একই সঙ্গে বসেছেন। কয়েকমাস পর যখন অন্যান্য অফিসার এসে যোগ দেন তখন আমরা সচিব, উপসচিব ইত্যাদি পদের সৃষ্টি করি। আমি স্বরাষ্ট্র সচিব এবং উপরন্তু আই জি পুলিশের দায়িত্বে ছিলাম। নুরুল কাদের খান পাবনা ট্রেজারির যে কয়েক কোটি টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন সেই টাকাই ছিল মূলতঃ মুজিব নগর সরকারের আর্থিক সম্বল। আগরতলা অঞ্চলেও আমাদের কিছু টাকা এসে পৌঁছেছিল। হাই কমিশনে আমাদের ট্রেজারি খোলা হয় এবং নিয়ম কানুন মোতাবেক টাকা পয়সার কড়াক্রান্তি হিসাব নিকাশ

দেয়া হয়। আসাদুজ্জামান অর্থ সচিব, নুরুল কাদের খান সংস্থাপন সচিবের কাজ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে নুরুল কাদের খান অভাবনীয় প্রতিভার পরিচয় দেন। সেক্টর, সাব-সেক্টর ইত্যাদি বেসামরিক ও সামরিক প্রতিষ্ঠান মুখ্যতঃ তাঁরই ধ্যান ধারণা। ১৭০০ মাইল বর্ডারে এই সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজ কিরূপ কঠিন হতে পারে তা হয়ত অনেকের ধারণায় আসবে না।

বিভিন্ন সেক্টর থেকে মুক্তিযুদ্ধের অভিযান পরিচালনা করেছেন আমাদের সেক্টর কমাণ্ডারগণ। তাদের মধ্যে মেজর জিয়াউর রহমান ছিলেন সবচেয়ে সিনিয়ার। কমাণ্ডারদের অধীন অফিসার, জোয়ান, ই, পি, আর ও পুলিশ বাহিনীর লোকজন এবং সদ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ শিক্ষক, ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক ও সমস্ত পেশার বাঙ্গালী বীর সন্তানেরা কাজ করেছেন। তাঁরা পাক-বাহিনীর ওপর হানা চালিয়েছেন। তাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়েছেন। ঘাটি থেকে বিতাড়িত করে সেখানে মুক্তিবাহিনীর ঘাটি স্থাপন করেছেন. ১৭০০ মাইল স্থল সীমান্তে এই অভিযান একাধারে চালানো হয়। তাতে পাকিস্তানের সামরিক ব্যবস্থাপনা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত লোকদের মধ্যে অগণিত মুক্তিবাহিনী ও মুক্তিকামী মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিরোধ ও আক্রমণে পাক-বাহিনী কোথাও দাঁড়াতে পারেনি বলে অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পালাতে বাধ্য হয়। পলায়নপর পাক-বাহিনীকে ধাওয়া করেছে বাঙ্গালী কৃষক, শ্রমিক, যুবক, ছাত্র, শিক্ষক সবাই মিলে। এই দৃশ্য সবাই দেখেছে। প্রচার মাধ্যমের অভাবে তা অধিকাংশ সময় প্রচার করা সম্ভবপর হয়নি।

২৫শে মার্চের পর থেকে বাংলাদেশের মানুষ নিরাপত্তা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু যাবে কোথায়? যারা সামরিক সরকারের চিহ্নিত শত্রু তাদের বেঁচে থাকার কোন সম্ভাবনা ছিলনা। এই সাধারণ বিষয়টি অনেকে চিন্তা করতে পারেনি। বাংলাদেশের লোকালয়ে আমার পক্ষে পালিয়ে থাকা সম্ভবপর ছিলনা বলেই সারদার এত সব কর্মকাণ্ডের পর আমি দেশত্যাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেই। ভারতীয় ক্যাম্পে লক্ষ লক্ষ মানুষ হতাশা ও দুর্দশার বোঝা নিয়ে প্রতিদিন এসেছে। তাদের মধ্যে প্রথম দিকে অমুসলমান বাঙ্গালীর সংখ্যাই ছিল বেশী। কিন্তু পরবর্তীকালে পরিস্থিতি হয়েছে ভিন্নতর। ক্যাম্পে সকলেই মিলে দিন কাটিয়েছে। ধর্মীয় ভেদাভেদ আমাদের নজরে পড়েনি।

পাকিস্তানের বর্বর অভিযানের মোকাবেলা করার মত অস্ত্রবল আমাদের ছিলনা। এপ্রিল-মে-জুন মাসগুলোয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ভারতীয় মনোভাব আশাব্যঞ্জক ছিলনা। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য আমাদেরকে সামরিক সাহায্য দেবে এ কথা আমরা ভাবতে পারিনি। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মনোভাব যাঁচাই করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে—যদিও এটা ছিল স্বাভাবিক কিন্তু আমাদের কাছে সেটি ছিল বেদনাদায়ক ও হতাশাব্যঞ্জক। প্রায় এক কোটি বাঙ্গালী ভারতে যেভাবে আশ্রয় নিয়েছিল তাতে ভারতবাসীরা শংকিত হয়ে উঠে। তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে আমরা

উদ্বেগজনক সমস্যা সৃষ্টি করেছিলাম বৈকি। ঐ দুর্দিনে আমরা ছিলাম নক্সাল-পন্থীদের ভয়ে ভীত। চলাফেরায় বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় ছিলনা। বিশেষ করে আমাদের নেতাদের নিরাপত্তা নিয়ে আমরা খুব বিব্রত ছিলাম। সে জন্য তাঁদের আবাস স্থলে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। সি, আই,টি রোডের একটি তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলে এক এক রুমে আমাদের মন্ত্রী ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে পরিবারসহ বসবাস করতে হয়েছে। এই হোটেলকে নিয়েই আমাদের শত্রুরা অপপ্রচারের ডামাডোল বাজিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে আমাদের দু'চারজন আত্মীয় স্বজন ছিলেন। তাঁদের কাছে আশ্রয় চেয়ে হতাশ হয়েছি। তাঁরা বড়জোর একদিন দুদিন থাকতে দেবার পর অন্যত্র চলে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁরা মনে প্রাণে চাননি যে পাকিস্তান দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যাক। হাই কমিশনের পদস্থ কর্মচারী রফিকুল ইসলাম চৌধুরী আমাদেরকে তাঁর বাসায় রাখেন। তাঁর বাসায় আরো তিরিশ জন লোক ছিলেন। এতজনকে প্রায় তিন মাস খাইয়ে দাইয়ে তিনি ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তবু তিনি ও তাঁর স্ত্রী আমাদেরকে বাড়ী ছাড়তে দিবেন না। বহু বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে রাজী করেছি। অতঃপর গোবরা কবর খানার নিকটবর্তী একটি বাড়ীতে বসবাসের ব্যবস্থা করি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মেঘালয়, মিজোরাম এবং আসামের কোন কোন অঞ্চলে আমাদের লোকজন যখনই প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছে তখনই বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, এমনকি স্থান বিশেষে বন্দী জীবন কাটিয়েছে। তাদেরকে উদ্ধার করার কাজে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কিছু সংখ্যক লোককে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও উদ্ধার করতে হয়েছে। কংগ্রেস বিরোধী ভারতীয় রাজনৈতিক মহল আমাদের সহায়তায় খুব বেশী আগ্রহ দেখায়নি। পশ্চিম বঙ্গে ১৯৪৭ সালের পর থেকে বহু পূর্ববঙ্গবাসী বসবাস করছে বলে সেখানে স্বভাবতঃ আমরা এককালীন প্রতিবেশী সুলভ ব্যবহার পেয়েছি।

পাকিস্তান সরকার রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস ইত্যাদি বাহিনীকে অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত করে যে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল তার কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা আমরা ভারত থেকে গ্রহণ করতে পারিনি। এই বাহিনীগুলোর সহায়তায় গণহত্যা, নারীনির্যাতন অভিযান চালানো হয়েছে। এই বর্বরতার খবরাখবর আমাদেরকে মরিয়া হয়ে ইতিহাসের সংক্ষিপ্ততম সময়ে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জনে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমাদের মত যারা দেশের বাইরে যেতে পারেননি তারাই সব চেয়ে বেশী ত্রাস ও নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়েছেন—একথা অস্বীকার করার যো নেই। যুদ্ধের সেই ভয়াল মাসগুলোয় অহরহ খবর পেয়েছি যে যশোর, নোয়াখালী,পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং আরো কোন কোন অঞ্চলে আমাদের বিপ্লবধর্মী লোকজন সুযোগ পেলেই মুক্তিযুদ্ধ সমর্থক জোতদার শ্রেণীর মানুষকে

হত্যা করেছে। সে সময় খবর পেতাম যে, যেহেতু রাশিয়া জাতিসংঘে আমাদের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন দিয়েছে সেহেতু রাশিয়া বিরোধী রাজনৈতিক মহল মুক্তি-সংগ্রামকে রাশিয়ার চক্রান্ত বলতেও দ্বিধাবোধ করেনি। অভ্যন্তরে সংগ্রামরত মুক্তি-যোদ্ধারা আমাদের এই অভ্যন্তরীণ চক্রকে দাবিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। নিয়মিত, অনিয়মিত এবং নিয়মবহির্ভূত মুক্তিযোদ্ধারা বাংলার আপামর জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তান বাহিনীকে রুখে দাঁড়িয়েছিল বলেই ভারতীয় সাহায্য সহানুভূতিকে সম্বল করে আমরা এত অল্প সময়ে এত বড় বিজয় লাভে সমর্থ হয়েছি। কাজেই চিহ্নিত শত্রুদেরকে গুণে গুণে বাদ দিয়ে বাকী প্রতিটি বাঙ্গালী ছিল আমাদের মুক্তিযোদ্ধা এবং বিজয় গৌরবের অংশীদার। এত অগণিত মানুষের 'লিষ্ট' বানাবে আজ কে বা কারা ?

মুক্তিযুদ্ধের কতক দিক রয়েছে যে সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য রাখার লোভ সংবরণ করতে পারছিনা। একাত্তুরের ৭ই মার্চের ঘোষণায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার শর্তসম্পক্ত মর্মবাণী খুঁজে পেয়েছি কিন্তু ঘোষণাটিকে স্বাধীনতার ভাষায় লিপিবদ্ধ বলে মেনে নিতে পারিনি। অসহযোগ আন্দোলন ও আওয়ামী লীগের নির্দেশে প্রশাসনিক পরিস্থিতি যে পর্যায়ে এসেছিল তাতে আমি ভাবতে পারিনি যে সামরিক পরাজয় ছাড়া পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বাধীন হতে দেবে। বে-সামরিক জন-গোষ্ঠীকে একটি সুস্পষ্ট আসন্ন সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে অস্ত্রেশস্ত্রে সংঘবদ্ধ করার কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী না থাকায় ২৫শে মার্চের হত্যাকাণ্ডের পর দিশেহারা ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক, পুলিশ, ই, পি, আর ও বাঙ্গালী সেনারা কারো আদেশ ছাড়াই পাকিস্তানের সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। ২৫শে মার্চের অব্যবহিত পরেই আমাদের প্রতিটি গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে "পশ্চিমা হটাও" অভিযান গড়ে উঠে। ১৯৫২ সালের একুশের পর থেকে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় সরকার মুসলিম লীগের বিরোধিতা করে যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল আইয়ুব আমলের মাঝামাঝি সময়ে নেতৃত্বের অভাবে তা প্রায় নিস্প্রাণ হয়ে এসেছিল। ১৯৬৬ সালের ছয়-দফা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান শেখ সাহেবকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক শীর্ষমণি হিসেবে চিহ্নিত করে। তাঁর অসাধারণ ত্যাগ তিতিক্ষা ও জনদরদী মন মানসিকতার জন্যে ১৯৭০ সালের ইলেকশনে আওয়ামী লীগের যে বিজয় সূচিত হয়েছিল তাতে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দলের কথা কেউ ভাবতে পারেনি। এ কারণেই স্বাধীনতা যুদ্ধের শীর্ষমণি হিসেবে রাজনৈতিক দিক থেকে আওয়ামী লীগকে মেনে নিতেই হবে।

আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ কোন কেন্দ্রীয় আদেশে দেশত্যাগ করেছেন বলে আমার জানা নেই। ২৫শে মার্চের পর তারা যখন কলকাতা বা আগরতলায় সমবেত হন তখন

তাদের মধ্যে যে শূন্যতা পরিলক্ষিত হয় তাতে বুঝা গিয়েছে যে কোন পরিকল্পনা মোতাবেক তাঁরা দেশ ত্যাগ করেছেন। কর্ণেল ওসমানীও তাই করেছেন। এই পূর্ব পরিকল্পনাহীনতার জন্য আমরাও বুঝতে পারিনি যে আমাদেরকে কখন কি করতে হবে। এমনকি আগরতলায় যারা পৌঁছেছিলেন তাঁদের কার্যকলাপের সঙ্গে কলকাতায় অবস্থানরত নেতৃবর্গের কোন সংযোগ ছিলনা অনেকদিন। এজন্যে ভিনদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রথম দিকে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের দু'টি ধারা সূচিত হয়েছিল। মুজিব নগর সরকারের প্রশাসন সংগঠিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধকে একটি কেন্দ্রীয় প্রশাসনের আওতায় আনা হয় এবং যথারীতি প্রশাসনিক বিধি নিষেধের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই সকল জটিল কাজ আমরা গুটি কতেক কর্মচারীরা সম্পন্ন করেছি; মাহবুব আলম চাষী (মরহুম), হাসান তৌফিক ইমাম, জহুর আহমদ চৌধুরী (মরহুম), মোস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ আগরতলায় মুক্তিযুদ্ধের প্রশাসনিক কাঠামো বানাবার প্রথম পর্বের সূচনা করেন। পরে তাঁরা কলকাতা কেন্দ্রিক প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন।

মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার কিছুটা অভাব ছিল। কিন্তু এই অভাব.ক কোন ক্রমে ঢেকে রাখার চেষ্টা প্রশাসন থেকে অতি সতর্কতার সাথে করা হয়। আপামর মুক্তিযোদ্ধারা যে অসীম সাহসিকতা, দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয় ও মনোবল নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাতে কোন মহলের অন্তর্দ্বন্দ্ব ঠাঁই পায়নি। পার্লামেন্টের প্রায় সকল সদস্য ভারতে আশ্রয় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। দেশবাসীর কাছে তাঁদের দায় দায়িত্ব পালনে তাঁরা সব সময় সতর্ক ছিলেন। কিন্তু এমন এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধ চালাতে হয়েছিল যে শুধু তাঁদের প্রজ্ঞার ওপর সব কিছু ছেড়ে দেয়া সম্ভবপর ছিলনা। সে জন্যে আমাদের সামরিক অফিসারদের প্রজ্ঞাকেই সম্বল করে আমাদের এগুতে হয়েছে। আমাদের প্রধান সেনাপতি কর্ণেল ওসমানীর পক্ষে এত বিশাল এবং বিস্তৃত মুক্তিবাহিনীর সব কিছু দেখাশুনা করা সম্ভবপর ছিলনা। কাজেই সেক্টর কমাণ্ডারদেরকে নিজ নিজ পরিকল্পনানুসারে অনেকাংশে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়েছে। পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দ প্রশাসনে অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ পরিচালনায় তাঁদেরকে অনেক সময় পাশ কাটিয়ে এগুতে হয়েছে। তাতে কেউ কেউ অস্বস্তি বোধ করেছেন। এই পরিস্থিতি এড়াবার জন্য তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে আমরা বিভিন্ন অঞ্চলে বেসামরিক কমাণ্ড কাউন্সিল গঠন করেছিলাম। কার্যতঃ এই সকল কাউন্সিল যুদ্ধ চালনার কাজে উল্লেখ-যোগ্য ভাবে জড়িত ছিলনা। যুদ্ধ সেক্টর-কমাণ্ডারদের কলাকৌশল ও পরিকল্পনা-নুসারে পরিচালিত হয়েছে।

জুলাই মাসের দিকে পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দকে একত্রিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পারস্পরিক সমালোচনা, অভিযোগ ইত্যাদি যেন দানা বেঁধে

উঠতে না পারে সেজন্যে রাষ্ট্রপতির কাছে এক প্রস্তাব পেশ করি। তিনি তাতে সম্মতি দেন। কিন্তু কোথায় কিভাবে এই সমাবেশ ঘটানো সম্ভবপর হবে তা ছিল ভাবনার বিষয়। ভারতীয় সরকারের সহায়তায় ও সৌজন্যে মেঘালয় ও দার্জিলিং এর মধ্যবর্তী বাগডোগরা নামক এক নির্জন স্থানে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দ ও মন্ত্রী মহোদয়গণ দু'দিন বহু তর্ক বিতর্কের সম্মুখীন হন। ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার পথ সুগম হয়। বাগডোগরা সমাবেশকে মুজিবনগর সরকারের পার্লামেন্টারী অধিবেশন বলা যেতে পারে। এই সমাবেশের খবর আমরা প্রচার করিনি।

স্বাধীনতাযুদ্ধের দিনগুলোয় আমরা যখন আমাদের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলেছি তখন তাদেরকে সমাজতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। যে অন্যায়, অবিচার ও শোষণকে লক্ষ্য করে মুক্তিকামী বাঙ্গালীরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল তার অবসান ঘটাতে হলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই যে আদর্শস্থানীয় তার ব্যতিক্রম কিছু বলার ছিলনা। ধনতন্ত্রের কাঠামো ও ভিতকে দুর্বল করতে হলে জনসাধারণকে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিতে হবে—এই ছিল আমাদের বাণী। এই দুর্গম পথের পাথেয় যে ত্যাগ তিতিক্ষা তার নাম ছিল স্বাধীনতাযুদ্ধ। ত্রিশ লক্ষ লোকের জীবন দান আর মা-বোনদের ইজ্জত হানি—এই আমাদের ত্যাগ তিতিক্ষা। ফসল হলো—বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ স্বাধীন করব এ বিষয়ে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। ৭১-এর নভেম্বর মাসে আমরা ভাবতে শুরু করেছিলাম স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো বা নীতিমালা এখান থেকেই তৈরী করে নিতে হবে। যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক ধ্বংসাবশেষের ওপর বিজয়ের গৌরব নিয়ে প্রশাসন চালাতে হলে যে প্রজ্ঞা, ধৈর্য্য ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন তা হয়ত রাজনৈতিক মহলে এককভাবে আশা করা সম্ভবপর হবেনা এই ভেবে আমাদের উদ্যোগেই প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক মৌল কাঠামো তৈরী করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত সরকারী, আধাসরকারী বা সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থাসমূহ এবং কলকারখানার শ্রমিক কর্মচারীদের ব্যাপারে এটা ধরে নিতে হবে যে তাঁরাও ছিলেন আমাদের মত মুক্তিযোদ্ধা। এই ছিল আমাদের নীতিগত সিদ্ধান্ত। শুধু ব্যতিক্রম ছিল এইটুকু যে, যারা প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতা করে দেশবাসীর কাছে জঘন্য শত্রু বলে চিহ্নিত হয়েছেন তাদের জন্য একটি স্ক্রীনিং কমিটি গঠন করা হয়। একজন বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য এবং সরকারের একজন সচিবকে নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির রায়কে সরকার চূড়ান্ত বলে মেনে নেবে। তারপর আরো কিছু সংখ্যক চিহ্নিত কর্মচারীর কাছ থেকে আনুগত্যের একটা শপথ নেয়া হবে এর বেশী কিছু নয়। আমাদের মতে এতেই দেশবাসী সন্তুষ্ট থাকবেন এবং প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থায় তেমন কোন ওলট পালট হবেনা।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য বিবরণীর অভাবে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সুবিবেচিত না হলেও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটা ধারা-প্রবাহ আমরা নির্দ্ধারণ করেছিলাম। অবাঙ্গালী মালিকানা শিল্প বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান পরিত্যক্ত হয়ে যাবে এই ভেবে পরিত্যাক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যবস্থা করা হবে। দেশী মালিকানায় শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যেগুলো দীর্ঘদিন যাবত বৈষম্যের শিকার হয়েছিল তাদেরকে সকল সুযোগ-সুবিধা দিয়ে চাঙ্গা ও তেজী করে তুলতে হবে। এই ছিল আমাদের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত। এ ছাড়া, বিরাট মুক্তিবাহিনীকে যথাশীঘ্র কি করে কৃষি বা অন্যান্য ক্ষেত্রে ফিরিয়ে নেয়া যায় তারও ব্যবস্থা করা হবে। অগণিত ছাত্র-শিক্ষক যারা মুক্তিযুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়েছে তাদেরকে শান্তিময় জীবনের অভীষ্ট মন-মানসিকতায় কিভাবে রূপান্তরিত করা যায় সে দায়িত্ব শিক্ষাবিদদের হাতেই ছেড়ে দেয়া হবে। স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ হিসেবে ছাত্র-জীবন থেকে একটি বছর বাদ দেবার কথাও তখন চিন্তা করা হয়েছিল যাতে শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন মহা সংকটের উদ্ভব না ঘটে।

অর্থনৈতিক পুনর্বাসন এবং সামাজিক শৃঙ্খলার বিধানকল্পে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা আইন সংগত উপায়ে গৃহীত হবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক কোন নতুন সংস্কারে সঙ্গে সঙ্গে হাত দেয়া হবেনা। মুজিব নগর সরকার একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেছিল। এই কমিশনে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী ও তাঁদের নির্বাচিত আরো কয়েকজন। যতটুকু মনে পড়ে একটা যুদ্ধোত্তর গরীব দেশের জনসাধারণের খাদ্য-গৃহ ও বস্ত্র সংস্থান ছিল এই পরিকল্পনার মৌল বিষয়।

স্বাধীনতা যুদ্ধের মাসগুলোয় পাকিস্তানী একশত টাকার বিনিময়ে একশত চুয়াল্লিশ ভারতীয় টাকা পাওয়া যায়নি। সমান সমান মূল্যে মুদ্রা বিনিময় হতো। মুজিব নগর সরকারের কর্মকর্তাদের সর্ব্বোচ্চ বেতন ছিল চারশত পাকিস্তানী টাকা। এই টাকা দিয়ে বাড়ী ভাড়া, খাওয়া অফিসে যাতায়াত, ঔষধ ইত্যাদি বাবৎ যাবতীয় খরচ মেটানো হতো। অর্থ ছিলনা বলে ব্যয় বহুল নিয়মিত বাহিনী বড় আকারে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। রিফিউজি ক্যাম্পে খেয়েদেয়ে অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন সেক্টরে অভিযান চালিয়েছে। কি অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে দিন কাটিয়েছি তা ভাবলে অবাক হতে হয়। ঢাকা থেকে লোক মারফত কিছু টাকা পয়সা নেবার ব্যবস্থা শেষ পর্য্যন্ত করতে হয়েছে। আমার শ্বশুর মরহুম হাফি-জুদ্দিন সাহেব এই টাকা দেন। আমার বন্ধু অধ্যাপক মোস্তফা নুরুল ইসলাম বিলেতে ছিলেন তিনিও কিছু পাউণ্ড দিয়ে সাহায্য করেন। তাঁদেরকে এই টাকা ফেরত দিতে হয়নি। লক্ষ লক্ষ মানুষ কি অভাবনীয় কষ্টে দিন কাটিয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না।

কামরুজ্জমান স্বরাষ্ট্র ও রিলিফের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে সীমান্তের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন। অধিকাংশ সময় আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। আমি বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়ে সেক্টর কমাণ্ডারদের সঙ্গে আলাপ করে তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছি। ভারতীয় প্রশাসনের কাছে ক্যাম্পের বিবিধ সমস্যা তুলে ধরেছি। মুক্তিযোদ্ধা বেশে পাকিস্তানী চরদের অনুপ্রবেশ প্রতিহত করার কাজে আমাদের পুলিশ ও অন্যান্য কর্মচারীদেরকেও স্থানে স্থানে খবর সংগ্রহ করতে হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের বিশাল আবর্তে আমার কাজের কোন ধরা-বাঁধা পরিধি ছিলনা বলা চলে। স্থানে স্থানে জোরালো বক্তৃতা দিয়েছি। সমাজ-তন্ত্রের মর্মবাণী ব্যাখ্যা করে মুক্তিবাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করার কাজে কামরুজ্জামান ও তাজউদ্দিন ছিলেন সোচ্চার। স্বদেশী গান গেয়ে দেশপ্রেমিক শিল্পীরা স্বাধীনতা-যুদ্ধকে দেশবিদেশে প্রচার করেছেন। মাত্র কয়েকজন শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবা-দিক, বেতারকর্মী যে প্রচারকার্য চালিয়েছেন তা অভাবনীয়। মুকুলের "ঠেটা মালিক্কা" (গভর্ণর ডঃ আব্দুল মোত্তালিব মালিক) নামক প্রোগ্রাম ও "চরম পত্র" ছিল সে সময়ের বেতার জগতের অবিস্মরণীয় আলেখ্য। কামরুল হাসান, জহীর রায়হান, হাসান ইমাম, আব্দুল জব্বর, মুকুল এবং আরো অনেককে আমি আগে থেকে খুব ভালভাবে জানতাম। তাঁদেরকে অনেক খবর দিয়েছি যা নিজ নিজ পদ্ধতিতে তাঁরা ব্যবহার করেছেন। যুদ্ধের বিভিন্ন অঙ্গনের দৈনিক খবর সংগ্রহের ব্যবস্থা আমরা করেছিলাম। আমাদের লোকজন ঢাকা প্রশাসনের সব গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সেক্রেটারিয়েট থেকে সংগ্রহ করে কলকাতায় আমাদের কাছে পৌছে দিত। রিলে সিস্টেমে এই সব খবর পাঠানো হতো। সপ্তাহ কালের মধ্যে কলকাতা থেকে আমাদের গোয়েন্দারা ঢাকা ও অন্যান্য শহরের অফিসের গোপনীয় কাগজপত্র, পাকিস্তান সরকারের আদেশ নির্দেশ ইত্যাদি সংগ্রহ করে ফিরে আসতো। অফিসের লোকজন গোপনে গুরুত্বপূর্ণ খবর সরবরাহ করে আমাদেরকে সাহায্য করেছে। মুক্তিকামী ছিল বলেই তারা একাজ করেছে। আমাদের গোয়েন্দা বাহিনী বিভিন্ন অঞ্চলে দেশপ্রেমিক মানুষের বাড়ীতে লুকিয়ে পালিয়ে রাত কাটিয়েছে। যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল তারাও পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধ করেছে। আর যারা আমাদের গোয়েন্দাদেরকে খবর দিয়ে সাহায্য করেছিল তাদেরকে কি আমরা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা বলবো না? স্টেট ব্যাংকের যে সব সিরিজের নোট খোয়া গিয়েছিল সে সব সিরিজের তালিকাও আমাদের লোকজন সংগ্রহ করেছিল। এই সব গোয়েন্দার কাজে প্রধানতঃ পুলিশ, ছাত্র ও বেসামরিক সরকারী কর্মচারীরা নিয়োজিত ছিল।

দেশত্যাগী প্রায় সাত হাজার পুলিশ, এবং পাঁচ হাজার ই পি আর স্বাধীনতা-যুদ্ধে বিশেষ অবদান রেখেছে। পুলিশদেরকে ১৭০০ মাইল সীমান্তের আশ্রয় ক্যাম্প ও অন্যান্য জায়গা থেকে খুঁজে বের করে সংঘবদ্ধ করার কাজ আমাকে করতে হয়েছে। ই পি আর-এর প্রায় সকলেই নিয়মিত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুলিশের

উল্লেখযোগ্য অংশ প্রত্যক্ষ যুদ্ধে নিয়োজিত ছিল। সীমান্তের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিল বলে ই পি আর ছিল আমাদের অভিযানের সেরা সৈনিক। ই পি-আর ও পুলিশ অকাতারে যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দিয়েছে। প্রায় ষোলশত পুলিশ এবং এক হাজার ই পি আর মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছে। পংগু হয়েছে অনেকে। পরিবার পরিজন গ্রামে গঞ্জে ফেলে ই পি আর, পুলিশ ও বাঙ্গালী সৈনিকরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেজন্যে তাদের পরিবারের উপর বহুরকম নির্যাতন চালিয়েছে পাক-বাহিনী। বাংগালী সৈনিক ও অফিসারদের অনেককেই যুদ্ধের আগে থেকে পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল বলে মুক্তিযুদ্ধে পেশাগত সৈন্যের সংখ্যা খুব বেশী ছিলনা। পশ্চিম পাকিস্তানে যারা আটক ছিলেন বন্দী শিবির থেকে তাদের কেউ কেউ পালিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় ভুমিকা কারো কারো কাছে ছিল বিতর্কিত। নিজস্ব শক্তিতে শুধু ত্যাগ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও মনোবলকে সম্বল করে সুদক্ষ পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করা সম্ভবপর হবে কিনা এই প্রশ্নে আমাদের সামরিক মহলে মতভেদ ছিল। কর্ণেল ওসমানীর ধ্যানধারণাব সঙ্গে আমাদের তরুণ সামরিক অফিসারদের কিছুটা গরমিল ছিল। বাইরের কারো নেতৃত্বের গুরুভারে মুক্তিবাহিনীর গৌরব ক্ষুন্ন হবে এ ধারণা অনস্বীকার্য হলেও আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে দীর্ঘকালীন করার বিপক্ষে প্রশাসনিক মতামত ছিল সুস্পষ্ট। পাক-বাহিনীর দীর্ঘকালীন নির্যাতনে দেশবাসী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এই ভয়ে যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করার বিপদকে দেখা হয়েছে বাস্তবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে। মুক্তি-যোদ্ধাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করব সম্ভাব্য ষড়যন্ত্রকে আমরা ভয় করেছি। মুজিব বাহিনীব সৃষ্টিতে মুক্তিযোদ্ধাদেব মধ্যে বিভেদের দানা গড়ে উঠেছিল প্রায়। ছাত্র নেতারাও ইতিমধ্যে মতবিরোধের শিকার হয়েছিল। কাজেই সংক্ষিপ্ততম সময়ে বিজয় অর্জন করতে হবে—এই ছিল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। এ ব্যাপারে ভারত আমাদেরকে সাহায্য করেছে। মুক্তিবাহিনীকে যথাসম্ভব সঙ্গে নিয়ে চূড়ান্ত অভিযান চালানো হয়। পশ্চিম রণাংগণের পাক-ভারত যুদ্ধে আমাদের তেমন আকর্ষণ ছিলনা। পাকিস্তান পারজিত হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিলনা। কিন্তু বাংলাদেশের রণাংগণে কতশীঘ্র পাকিস্তানকে পরাজিত করা যাবে এটাই ছিল আমাদের এক মাত্র কাম্য।

ভারতীয় যুদ্ধ বিশারদরা 'বাই পাস' সিস্টেম-এ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি যথাসম্ভব ন্যূনতম সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। 'বাই পাস' সিস্টেম-এ পাক-বাহিনীকে কোন সম্মুখ যুদ্ধের সুযোগ দেয়া হয়নি। লক্ষলক্ষ মুক্তিবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর নেতৃত্বে পাক বাহিনীকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলে। দিশেহারা পাক বাহিনী অস্ত্রশস্ত্র যেখানে সেখানে ফেলে ঢাকায় এসে আত্মসমর্পণের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়। বাংলাদেশের কোথাও লুকিয়ে জীবন

বাঁচাবার পরিস্থিতি তাদের ছিলনা। সপ্তম নৌ-বহরের পাঁয়তারা সত্ত্বেও প্রায় একলক্ষ পাক বাহিনীর এত নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ।

বিজয় যখন দিবালোকের মত স্পষ্ট, তখন আত্মসমর্পণ উৎসবে আমাদের যোগদান সম্পর্কে যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তাতে স্থির করা হয়েছিল ১৬ই ডিসেম্বর কর্ণেল ওসমানী, রুহুল কুদ্দুস ও আমি হেলিকপ্টারে ভারতীয় কমাণ্ডারকে নিয়ে ঢাকায় পৌঁছুব। দমদম এয়ার পোর্টে পৌছুবার জন্য আমাদের যে সময় দেয়া হয়েছিল তার ঘন্টা খানেক পূর্বে আমাদের প্রশাসনে কি যেন একটা হাস হাস পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। আমি তার কিছুই আঁচ করতে পারিনি। রুহুল কুদ্দুস শুধু জানালেন যে, কর্ণেল ওসমানীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। কাজেই ডেপুটি কমাণ্ডার ইন-চীফ এ কে খন্দকারকে খুঁজে বের করা হয়েছে। শুধু তিনি ঢাকায় যাবেন। আমরা দু'জন যাবোনা। কর্ণেল ওসমানীর সঙ্গে কার কি মতভেদ ঘটেছিল তা আর জানতে পারিনি ' ঠিক করা হলো ১৭ই ডিসেম্বর শেখ সাহেবের ছেলে জামালকে ঢাকা রেডিও চালাবার মতো যন্ত্রপাতি দিয়ে পা'ঠা'' হবে। ১৮ তারিখ রুহুল কুদ্দুস, নুরুল কাদের, আসাদুজ্জামান ও আমি ঢাকায় আসব। পরিবারকে সঙ্গে আনা যাবে না। কাজেই আমার পরিবার ও ছেলে মেয়েকে কলকাতায় রেখে আসি। প্রায় ১২ দিন পর তাদেরকে ঢাকায় নিয়ে আসি। ঢাকার মাটিতে পা দিয়ে সেদিন জীবনের সব কিছু পেলাম। হেলিকপ্টার থেকে নামার আগে শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করি। এয়ারপোর্টে হাজার হাজার লোকের ভীড়ে কারো সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করিনি। জানিনা তাঁরা কি ভেবেছেন। শুধু হাত উঠিয়ে সালাম জানিয়েছি। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব কে কোথায় কি ভাবে আছেন—জীবিত কি শহীদ, এই চিন্তায় সেই মুহূর্তে এত অভিভূত হয়েছিলাম যে, স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসার আনন্দে যুগপৎ নেমে আসে অব্যক্ত বিষাদের ছায়া। এই বিষাদ থেকে আজও মুক্ত হতে পারিনি।

—আব্দুল খালেক
সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪।

আব্দুল বাছিদ সিদ্দিকী*

২৬শে মার্চ আমরা টাঙ্গাইল সংগ্রাম পরিষদ গঠন করি। পুলিশ এবং আনসারের সহযোগিতায় কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করি এবং টাঙ্গাইলে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করি। তারপর টাঙ্গাইল, কালিহাতী, নাটিয়াপাড়াতে অগ্রবর্তী ঘাঁটি স্থাপন করি। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে আমি ও হুমায়ুন খালিদ কালিহাতীতে অবস্থান করি।

* পি ই-১৩২, টাঙ্গাইল-৩

সেখান থেকে আমরা নাটিয়াপাড়া আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ পাই। এই সংবাদ পেয়ে আমরা কালিহাতী থেকে ঘাটাইল চলে যাই এবং সেখানে ক্যাম্প স্থাপন করি। ই, পি, আর, বি, ডি, আর বাহিনী মধুপুরে ঘাঁটি স্থাপন করতে চলে যায়। ঘাটাইল থেকে আমরা ময়মনসিংহ যাই। এখানে সিটি স্কুলে মুক্তি-বাহিনীর ক্যাম্প ছিল এবং রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া সাহেবের বাসায় ছিল মুক্তি-বাহিনীর অফিস। সেখান থেকে ঘাটাইল পাহাড়ী অঞ্চলের ধলাপাড়া গ্রামে চলে যাই। এখান থেকে মধুপুর পতনের সংবাদ জানতে পারি। ধলাপাড়া হাস-পাতালে আমরা রিলিফ ক্যাম্প স্থাপন করি। কাদের সিদ্দিকীর সহযোগিতায় সর্ব প্রথম মুক্তিবাহিনী গঠন করি। সখীপুরে মুক্তিবাহিনীর কেন্দ্র স্থাপন করি। চারান, বাসাইল, কাউলাজানি, কাসুটিয়া, বল্লা, দেওপাড়া, ভূয়াপুর, গোপালপুর, বৈলারপুর প্রভৃতি স্থানে আমরা পাক-বাহিনীর মোকাবেলা করি।

অতঃপর আমি নূরুন্নবী ও নূরুল হক প্রমুখ ভারতে অস্ত্র সংগ্রহের জন্যে গমন করি। মেঘালয় থেকে বেশ কিছু সংখ্যক অস্ত্র সংগ্রহ করে আমরা আবার ফিরে আসি। ইতিমধ্যে আমরা টাঙ্গাইলে মুক্তিবাহিনীর বেসামরিক প্রশাসন চালু করি। এর প্রধান কেন্দ্র ছিল সখীপুর। আমি ছিলাম বিচার বিভাগের প্রধান। কাদের সিদ্দিকী ছিলেন সর্বাধিনায়ক। এই সময় ধলাপাড়ায় যে যুদ্ধ হয় তাতে কাদের সিদ্দিকী আহত হন।

লাউহাটি, নাগরপুব, বাঐখোলা, দেওপাড়া, ধলাপাড়া, মাকরাই প্রভৃতি স্থানে পাক-বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালিয়ে আমরা পাক-বাহিনীর বিপুল ক্ষতি সাধন করি। এ সময় টাঙ্গাইল মূল শহর, আশেপাশের কতগুলো এলাকা ছাড়া, মুক্তি-বাহিনীর বেসামরিক প্রশাসন চালু করি। ১১ই ডিসেম্বর টাঙ্গাইল মূল শহর দখলদার মুক্ত হয়।

স্বাক্ষর/
আব্দুল বাছিদ সিদ্দিকী
২৫-৭-৭৩।

আব্দুল মালেক উকিল

১৯৭১ সালে আমি নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের (লক্ষীপুর ও ফেণী জেলাসহ) সভাপতি ছিলাম। একজন নির্বাচিত এম, এন, এ হিসেবে আমিই '৭১ সালে জিলা সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হই। ইতিপূর্বে আমি ১৯৫৬, ৬২ এবং '৬৫ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্য আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি ও সম্মিলিত বিরোধী দলের নেতা হিসেবে কাজ করেছি। নিখিল পাকিস্তান বার কাউন্সিল এর নির্বাহী কমিটির নির্বাচিত সদস্য হিসেবে

ও নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্য হিসেবে ১৯৬৬ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী লাহোরের গুলবর্গে নিখিল পাকিস্তানের বিরোধী দলীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে আমি সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতিত্ব করি এবং ঐ অধিবেশনেই বঙ্গবন্ধু মুজিব তাঁর ঐতিহাসিক ছয় দফা প্রস্তাব পেশ করেন। ঐ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন, অধ্যাপক ইউসুফ আলী সহ আমরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ছয়-জন প্রতিনিধি ছিলাম। তারপরের ইতিহাস খুবই করুণ হলেও বাঙ্গালী জাতির মুক্তিসনদ হিসেবে শুধু পূর্ব পাকিস্তানে নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের জি, এম সৈয়দ হারিনেতা কাজী ফয়জুল্লাহ, সীমান্ত ও বেলুচিস্তান প্রদেশের আরবাব সেকান্দার হায়াত খান, মানকি শরিফের পীর আতাউল্লাহ খান মঙ্গল, গাউস বক্স বেজেঞ্জো, রেয়াছুনী, শেখ মঞ্জুরুল হক, খলিল তিরমিজি সহ সকলেই প্রকাশ্যে ছয় দফা সমর্থন দিয়েছিলেন।

১৯৭১ সালের ১লা মার্চ থেকেই আমরা একই সাথে ঢাকায় দিনের পর দিন আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির বৈঠক ও ৬ দফার ভিত্তিতে একটি শাসনতন্ত্র রচনার কার্যে নিয়োজিত ছিলাম। ১৫ই মার্চ ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানে আসার পূর্ব পর্যন্ত, বিশেষ করে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের জরুরী অধিবেশন কখনও কখনও সারা রাত্রি ধরে চলতো। পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলনের সময় এবং সংলাপের সময় আমরা দৈনন্দিন অগ্রগতি সম্পর্কে আমাদের মতামত ব্যক্ত করতাম। কিন্তু ২৪শে মার্চ বঙ্গবন্ধু হঠাৎ আমাদেরকে অবিলম্বে ঢাকা ত্যাগ করার নির্দেশ দেন এবং তদনুযায়ী আমি ২৪শে মার্চ নোয়াখালীতে (মাইজদী) চলে যাই। স্মরণ করা যেতে পারে, ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার ও 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ার' নির্দেশ দিয়েছিলেন। কাজেই আমাদের নিজ নিজ এলাকায় চলে যেতে এবং নির্দেশের গুরুত্ব উপ-লব্ধি করতে কোন অসুবিধা হয়নি। ২৫ মার্চ রাত ১১টা। আমার মাইজদীস্থ বাসভবনে আমার নিজস্ব টেলিফোনে আমি বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর ৩২ নম্বর বাড়ীর বিখ্যাত ৪২৫১ টেলিফোনে যোগাযোগ করি। একবার ঐ বাড়ীতে অবস্থানরত হাজী গোলাম মোর্শেদ (পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী) টেলিফোনে আমার সাথে কথা বলেন এবং তিনিও সতর্ক করে দেন যে, "যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে"। বঙ্গবন্ধু শুধু চীৎকার করে বলেছিলেন, "এখনও বসে আছ? সর্বা-ত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে"।

২৬ মার্চ সকালেও আমরা বিভিন্ন সূত্রে স্বাধীনতা ঘোষণার কথা এবং হানাদার বাহিনীর গণহত্যার কথা অবহিত হই। এসময় নোয়াখালী জেলার ডেপুটি কমিশনার ছিলেন জনাব মনযুর উল করীম (বর্তমানে অতিরিক্ত সচিব)। আমি তাঁর মারফতে জেলা ও দায়রা জজ গাজী শামসুর রহমান (বর্তমানে প্রেস

কাউন্সিলের সভাপতি) এবং পুলিশ সুপার শহীদ আব্দুল হাকিম সহ মহকুমা প্রশাসক ও সকল সরকারী কর্মচারী, ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারকে নোয়াখালী সার্কিট হাউসে ২৬ তারিখে ১০টার মধ্যে সমবেত হওয়ার জন্য আহবান জানাই। আওয়ামী লীগের সমস্ত এম পি এ, এম এন এ ও বিশিষ্ট নাগরিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকেও ঐ সমাবেশে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করি। নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সমস্ত সার্কিট হাউজ এবং সম্মুখের ময়দান জনসমুদ্রে পরিণত হয়। উক্ত সমাবেশে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি হিসেবে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম করার জন্য দলমত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে আহবান জানাই। উপস্থিত সর্বস্তরের জনগণ এবং জিলা ও দায়রা জজ সহ সকল স্তরেব কর্মচারী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর আহবানে স্বাধীন বাংলার পক্ষে সংগ্রাম করার শপথ গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে আকস্মিকভাবে ডেপুটি কমিশনার জনাব মনযুর উল করিম বঙ্গবন্ধু মুজিব কর্তৃক ঘোষিত একটি ইংরেজীতে টাইপ করা স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র আমার হাতে দেন। সেটি ছিল ঃ To the people of Bangladesh and also the world : —

Pakistan Armed Forces suddenly attacked the EPR Base at peelkhana and police line at Rajarbag at ·0) hrs. of 26-3 71, killing lots of People. Fierce fighting is going on with the EPR and police forces in the streets of Dacca. People are fighting gallantly with the enemy forces for the cause of Freedom of Bangladesh. Every sector of Bangladesh is asked to resist the enemy forces at any cost in every corner of Bangladesh.

May Allah bless you and help you in your struggle for freedom.

"Joy Bangla".

Sk. Mujibur Rahman.

এটি হুবহু বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চের রাতে অয়ারলেস মাধ্যমে ঘোষণা করেছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই সমবেত জনতা সর্বোচ্চ কণ্ঠে জয়বাংলা ধ্বনি দিয়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে এবং আমার নেতৃত্বে একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলে সর্বস্তরের জনগণ অংশ গ্রহণ করে। ঐ মিছিলের শ্লোগান ছিল "ইয়াহিয়ার ঘোষণা মানিনা"। "বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর" ইত্যাদি ইত্যাদি। এর মধ্যে সর্বস্তরের নাগরিক ও কর্মচারীগণ শুধু শপথ করেই ক্ষান্ত হননি তারা পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করে এবং আমার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। এমনকি রিজার্ভ পুলিশের ভারপ্রাপ্ত অফিসার মিঃ খান অস্ত্রাগারের চাবি আমার হাতে অর্পণ করে বলেন যে, আজ থেকে আমরা আপনাদের হুকুমে পরিচালিত হবো এবং বাংলাদেশের প্রতি পূর্ণ অনুগত থাকবো। ("From now onwards we are under your command")। ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম থেকে আমার নিকট কয়েকটি জরুরী টেলিগ্রাম আসে।

জনাব মরহুম জহুর আহমদ চৌধুরী ও জনাব আখতারুজ্জামান চৌধুরী (বর্তমানে চট্টগ্রাম জেলা, দক্ষিণ (আওয়ামী লীগের সভাপতি) টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে নিশ্চয়তার জন্য। যেহেতু আমি ই, পি, আর-এর অয়ারলেস-এর মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণার কপি ছাড়াও বঙ্গবন্ধুর সাথে সরাসরি আলোচনা করেছি এবং যেহেতু সে সময় ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর বাড়ীর ও অন্যান্য জরুরী টেলিফোন যোগাযোগ চট্টগ্রামের সাথে বিচ্ছিন্ন ছিল, সেজন্য আমাকে টেলিফোনে বারবার নিশ্চয়তা দিতে হয়েছিল। সকল সরকারী ও আধা সরকারী কর্মচারী সেদিনই আমাদেরকে তাদের এক দিনের বেতন দিয়ে যুদ্ধ তহবিলে চাঁদা প্রদান করেন। নোয়াখালী টাউন হলে আমরা কন্ট্রোল রুম স্থাপন করি এবং মাইজদীর রৌশন বাণী সিনেমা হলে আমাদের খাদ্য ও সাহায্য সামগ্রী রাখার ব্যবস্থা করি। পুলিশ লাইন ও জিলা স্কুলে তৎক্ষণাৎ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়।

নোয়াখালীর সর্বস্তরের জনগণ পুলিশ, ই, পি, আর, আনসারসহ ১৯৭১ সালের ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত সম্পূর্ণ নোয়াখালী জেলা হানাদার মুক্ত রাখে। এসময়ে আমরা সামরিক পোশাকে বেলুনিয়া ও নোয়াখালী সীমান্তে অবস্থিত পাক বি, ও, পি হতে আগত অস্ত্রশস্ত্র সহ হাজার হাজার ই, পি, আর ও আনসারকে সংগঠিত করি ৪০/৫০ জন পাকিস্তানী সৈন্যকে বন্দী অবস্থায় রাখি, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়স্থল, শিক্ষাকেন্দ্র ও রসদ সরবরাহের ব্যবস্থা করি। বেলুনিয়া বর্ডারে অবস্থিত পাক বি,ও,পি থেকে উদ্ধারকৃত মেশিন গান সহ অনেক অস্ত্রশস্ত্র, গোলা বারুদ আমাদের হস্তগত হয় যা আমরা পরে ২ নম্বর সেক্টরে এবং নোয়াখালী, ফেণী, লক্ষ্মীপুর ও বিশেষ করে শুভপুরের যুদ্ধে কাজে লাগাই।

২রা এপ্রিল চাঁদপুর থেকে মিজান চৌধুরী রায়পুর হয়ে নোয়াখালী আসেন। আমি, মিজান চৌধুরী এবং ফেণীর এম, এন, এ মরহুম খাজা আহমেদ সহ ছোতাখোলা হয়ে ভারতীয় বি, এস, এফ এর মেজর প্রধান এর সহায়তায় প্রথম সীমান্ত অতিক্রম করি। প্রথমে রামগড় ও পরে উদয়পুর হয়ে আগরতলায় যাই। উল্লেখ্য যে, রামগড়ে আমরা মেজর জিয়া, ক্যাপ্টেন রফিক সহ কয়েকজন সামরিক অফিসার ও তদানিন্তন পার্বত্য চট্টগ্রামের ডি, সি জনাব তৌফিক হমামের সঙ্গে আলোচনা করি। ঐ দিনই সন্ধ্যায় আগরতলা পৌঁছার পর পরই অমৃতবাজার পত্রিকার শ্রী অনিল বিশ্বাসের বাসভবনে বি বি সি ও ভয়েস অব আমেরিকার প্রতিনিধিসহ অনেক সাংবাদিক আমাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন এবং আমাদের কথা টেপ করেন। সম্ভবত বাংলাদেশে গণহত্যা এবং সর্বাত্মক যুদ্ধ সম্পর্কে এটাই বহির্বিশ্বের প্রথম প্রচারিত বাণী। কারণ আমরা (আমি এবং মিজান চৌধুরী) যে সাক্ষাৎকার প্রদান করি তা শুনেই আমেরিকায় নিযুক্ত তদানিন্তন রাষ্ট্রদূত (মিনিস্টার ও পরে পররাষ্ট্র সচিব) জনাব এনায়েত করিম, তাঁর এক ভাগ্নে এবং অন্য একজনকে কলকাতায় কিড্ স্ট্রীটে সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন

যে, অন্ততঃ বাংলাদেশের দুইজন আওয়ামী লীগ নেতা জীবিত আছেন এবং তাদেরকে আগরতলা বা কলকাতায় পাওয়া যাবে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নোয়াখালী বোধ হয় একক ও অনন্যভাবে সরকারী কর্মচারী ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে unified command এর মাধ্যমে প্রায় একমাস যুদ্ধ করে সমগ্র এলাকা হানাদারমুক্ত রেখেছিল। তারপর আমরা নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বরিশাল ও ফরিদপুরের বেশ কিছু সংখ্যক নির্বাচিত এম, পি ও এম, এন, এ আগরতলায় একত্রিত হই। এসময়ে আমাকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে আগরতলার মুখ্যমন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য প্রধান লিয়াজোঁ নির্বাচিত করা হয়। সেসময় কর্ণেল ওসমানী, লেঃ কর্ণেল আব্দুর রব এম, এন, এ সহ কয়েকজন সামরিক অফিসারের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর একটি বিপ্লবী প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠনের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। আমরা আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে একমত হই। ত্রিপুরার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শচীন বাবু এবং বিখ্যাত স্বদেশী নেতা কলকাতার ১৪নং ক্ষুদিরাম বোস লেনের শ্রী পান্না লাল দাস গুপ্ত আমাদেরকে এই কাজে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। অতঃপর ১০ই এপ্রিল জনাব ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি এবং (মেজর জেনারেল) আব্দুর রবকে ডেপুটি চীফ করে, বঙ্গবন্ধু মুজিবকে রাষ্ট্রপতি এবং নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, জনাব তাজউদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী করে একটি অস্থায়ী মন্ত্রীসভা ও সরকার গঠন করা হয়। অতঃপর শ্রী পান্নালাল দাসগুপ্ত আমাকে ও কয়েকজন এম, এন, এ ও এম, পিকে তাঁর কর্মস্থল ও পত্রিকা অফিস কলকাতার ১৪নং ক্ষুদিরাম বোস লেনে নিয়ে যান। ওখান থেকে আমরা বি, এস, এফ-এর হেড কোয়ার্টার ২/এ লর্ড সিনহা রোডে গিয়ে জনাব নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন, মনসুর আলীসহ বিপ্লবী সরকারের সব মন্ত্রীর সাক্ষাৎ পাই। পরবর্তীকালে আমরা 'তালায়' অবস্থিত আন্দামান ফেরত বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ শ্রী অমর গাঙ্গুলি ও মনি গাঙ্গুলির বাড়ীতে অবস্থান করে মুক্তিসংগ্রামের বিভিন্ন বিষয়ে মতামত বিনিময় করি। কিছুদিন পর ওখান থেকে আমরা উত্তর কলকাতায় অবস্থিত ৩০নং-মদন মোহন তালা স্ট্রীটে শ্রী শ্যামাপদ সাহা, শ্রী বাদল সেন, শ্রী অমল সেন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে পরিচিত হই। পরবর্তীতে তাদেরই প্রেরণা ও সহায়তায় আমরা শিয়ালদহ সল্টলেকসহ বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত লক্ষ লক্ষ অসহায় বাস্তহারাকে দেখাশুনা করি। অতঃপর আমার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নড়াইলের তৎকালীন এম, পি, এ মিঃ শহীদ ও তদানীন্তন পাকিস্তান ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব হোসেন আলীর বিশেষ সহকারী মিঃ জাকির আহমদ এর সহায়তায় আমি হাই কমিশনারকে বাংলাদেশের পক্ষে Defect করার প্রস্তাব করি। তিনি প্রায় সব বাঙ্গালী কর্মচারী সহ Defect করতে রাজী হন। তবে তিনি সমস্ত কর্মচারীর নিরাপত্তা, ভরন পোষণ ও অন্যান্য বিষয় আলোচনার জন্য সরাসরি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার জন্য একটি প্রস্তাব করেন। সেমতে আমি তাঁর পক্ষে

এই প্রস্তাব নিয়ে ২/এ লর্ড সিনহা রোডে গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করে একটি তৃতীয় স্থানে বৈঠকের ব্যবস্থা করি। ঐমতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং যবতীয় আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে পার্ক সর্কাসের ৯নং-সার্কাস এভিন্যুতে অবস্থিত পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনার অফিস বাংলাদেশ মিশন হিসাবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ইতিমধ্যে ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলায় দেশী বিদেশী প্রায় শতাধিক সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার-এর উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু মুজিবকে রাষ্ট্রপতি ও সুপ্রীম কমাণ্ডার অফ আর্মড ফোর্সেস্, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিনকে প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য তিনজনকে মন্ত্রী, জনাব ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি ও নয়জনকে সেক্টর কমাণ্ডার করে বিপ্লবী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। ঐদিন রাতেই আমরা কলকাতায় ফিরি। তার পূর্ব থেকেই আমাকে কেন্দ্রীয় ত্রাণ ও পুনর্বাসনের এম, এন, এ ইনচার্জ করে বিধান রায়ের বাড়ী ৪৭ প্রিন্সেপ স্ট্রীটে দফতরের ভার দেয়া হয়। অধ্যাপক ইউসুফ আলীকেও পরে যুক্তভাবে এই পদে একই জায়গায় নিয়োগ করা হয়। পরে পরিচয় পত্র প্রদান ইত্যাদি ব্যাপারে কাজের চাপ অসম্ভব বেড়ে যাওয়ায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব কামরুজ্জামান তাঁর মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আমাকে যুক্ত করে নেন। সাহায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের আরো দুইটি অতিরিক্ত অফিস নেয়া হয়। একটি ৩/১ কামাক স্ট্রীটে এবং অন্যটি ১নং বালিগঞ্জে। শ্রী জি, এস ভৌমিক Defected জিলা ও দায়রা জজকে রিলিফ কমিশনার হিসেবে আমার অধীনে ন্যস্ত করা হয়। জনাব কাওসার আলী সহ অনেকে যুক্তভাবে আমাকে সহায়তা করেন। প্রবাসী মুজিব নগর সরকার ৯মাস যুদ্ধ কালে আর কোন মন্ত্রী নিয়োগ করেন নি। আমাদের এম, এন, এ ইনচার্জদের মন্ত্রীর স্ট্যাটাস দেয়া হয়। ৩/১ কামাক স্ট্রীটে বিদেশ হতে প্রাপ্ত টাকা, চেক ইত্যাদি গ্রহণ করা হতো। এখানে জনাব কামরুজ্জামান, ইউসুফ আলী এবং আমি ছাড়া আর কোন লোকের প্রবেশাধিকার ছিলনা।

পরে মাননীয় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আমাকে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি (Personal envoy) হিসেবে মনোনীত করেন এবং জুন মাসে বিভিন্ন রণাঙ্গনে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে, ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ও নেপালে সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে প্রেরণ করেন। পালাটোনায় ক্যাপ্টেন সুজাত আলী, এম-এন-এ ও ভারতীয় ক্যাপ্টেন ধর আমাকে নিয়ে প্রায় দুই হাজার মুক্তিযোদ্ধার শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। মেলাঘরে প্রায় ৪ হাজার মুক্তিযোদ্ধা আমার হাতে শপথ গ্রহণ করে। মেজর খালেদ মোশাররফ, ক্যাপ্টেন হুদা, মেজর হায়দার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অনুরূপভাবে আমি রাজনগর, ধর্মনগর, ছোতাখোলা, বিলোনিয়া, বেগুলা, মাঝদিয়া, চরিলাম, সাবরুম, পূর্বাঞ্চলীয় প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ও করিমপুর, শিকারপুর, ইছামতি ও ভাগিরথীর তীরে অবস্থিত বহু ক্যাম্পে গমন করি এবং বিভিন্ন সেক্টর কমাণ্ডার ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সাহায্য সহযোগিতা, অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা করি। উল্লেখ্য যে, আমাদের বহু খ্যাতনামা মুক্তিযোদ্ধা

দেশের অভ্যন্তরে থেকেই সম্মুখ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। জনাব রুহুল আমিন ভুঞা, খালেদ মোহাম্মদ আলী এম এন এ, মাহমুদুর, রহমান, বেলায়েত ও আমার দুই ছেলে গোলাম মহিউদ্দিন ও বাহার উদ্দিন সহ এরা প্রায় ৯ মাস দেশের অভ্যন্তরেই ছিলেন।

১৭ই এপ্রিল মুজিব নগর সরকার গঠন করার পরই আমি কিছু নগদ টাকা ও দুই ট্রাক ত্রাণ সামগ্রী যথা রেইন কোট, কিটস ইত্যাদি নিয়ে আগরতলায় এসে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিতরণ করি। জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীকে আনুষ্ঠানিকভাবে ১৬৩ জন এম পি এ, এম এন এ-র উপস্থিতিতে আমার সভাপতিত্বে পূর্বাঞ্চলীয় সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ইতিপূর্বে এ পদ নিয়ে খুব দলাদলি ও দ্বন্দ্ব ছিল। ইতিমধ্যে আমি নিজের কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী আনয়ন ও পরিবারের স্ত্রী, মাতা, ৫মেয়ে ও ২ছেলে সকলের খোঁজ খবর নেয়া এবং নোয়াখালী জেলার সংগ্রাম পরিষদের সভাপতির দায়দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়ার জন্য ২৪শে এপ্রিল বেলুনিয়া হয়ে নোয়াখালী প্রবেশ করি। মাইজদী গিয়ে দেখি বাসা ফাঁকা, সব মালপত্র আছে কিন্তু বাড়ীতে কোন মানুষ নেই। অনুরূপভাবে জিলা প্রশাসক, জজ, পুলিশ সুপার সকলেই নিজ নিজ বাসস্থান ছেড়ে গ্রামে আশ্রয় নিয়েছেন। কারণ হানাদার বাহিনী লাকসাম হয়ে রেল লাইন ধরে দ্রুত নোয়াখালির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। গভীর রাতে আমি জেলা প্রশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করি। পরে শুধু ঘন্টা খানেকের জন্য আমার স্ত্রী, বড় মেয়ে ও শশুর বাড়ীর লোকজনদের সাথে দেখা করি। সঙ্গে সঙ্গেই একটি জীপ ঐ বাড়ীতে আসে এবং রিজার্ভ পুলিশের ইন্সপেক্টর মিঃ খান এসে বলেন স্যার, এখনই আপনাকে চলে যেতে হবে, কাল আর বর্ডার ক্রস করতে পারবেন না। হানাদার বাহিনী মাইজদী টাউন হতে মাত্র ১০/১৫ মাইল দূরে চৌমুহনীর উত্তরে অবস্থান নিয়েছে। কাজেই ঐ মুহূর্তে হতভম্বের মত আবার নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করলাম। সঙ্গে ছিল আমার ল্যাণ্ড রোভার জীপ আর ড্রাইভার মাহমুদ, চৌমুহনী বিদ্যামন্দিরের হেড মাষ্টার সালাউদ্দিন এবং সোনাইমুড়ীর গোলাম মোস্তফা। সামান্য কিছু টাকা নিয়ে আঁকা বাঁকা পথে ২৫শে এপ্রিল বর্ডার ক্রস করে বেলুনিয়া পৌঁছি। আসার সময় স্ত্রীকে বলে আসি "খোদা হাফেজ, চরাঞ্চলে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে চেষ্টা করো।" বর্ডারের কাছে এসে এক নিরাপদ স্থানে জানাব সালাউদ্দিন এবং গোলাম মোস্তফাকে নামিয়ে দেই। স্কর্ট পার্টি হিসেবে মিঃ খানের জীপে ৩/৪ জন পুলিশ বর্ডার পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ছিল। যুদ্ধের শেষদিন পর্যন্ত এই বিশ্বস্ত ড্রাইভার মাহমুদ বাবা মা ছেড়ে আমার সঙ্গে ছিল। ২৬ এপ্রিল তারিখে নোয়াখালীর পতন হয়। সমগ্র শহর হানাদার বাহিনী দখল করে নেয়। আগর তলায় এসে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ও বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এবং অন্যান্যের সঙ্গে বিশেষ করে ২নং সেক্টরের মেজর খালেদ মোশাররফ-এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অস্ত্র ও বিস্ফোরক প্রেরণের ব্যবস্থা করি।

ইতিমধ্যে মুজিব নগর থেকে জরুরী ভিত্তিতে কলকাতা গমনের জন্য আমার ডাক আসে। আমি পূর্বেই সব কিছু জহুর আহমদ চৌধুরীকে বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাই। ৯নং সার্কাস এভিনিউ অর্থাৎ "বাংলাদেশ মিশনে" দেশী বিদেশী অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি, বিশেষ করে পিটার হেজেল হার্স্ট, New York Times & Christian Science Monitor এর প্রতিনিধি Henry Haward এবং Mark Gayan এর সঙ্গে আমি বাংলাদেশের গণহত্যা এবং প্রাসংগিক বিষয়ে আলোচনা করি। এখানে প্রয়াত ডঃ মুজাফফর আহমদও উপস্থিত ছিলেন। কখনও পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদও উপস্থিত থাকতেন।

ইতিমধ্যে খবর পেলাম আমার গ্রামের বাড়ী (রাজাপুর), শশুর বাড়ী (আবদুল্লাহপুর) এবং দুই বোনের বাড়ী (যথাক্রমে করিমপুর ও বারইপুর) হানাদাররা আক্রমণ করেছে। আমার মাইজদীর পাকা দ্বিতল বাড়ী অগ্নি সংযোগ করে পুড়িয়ে দিয়েছে। আমার শশুর বাড়ীতে সৌভাগ্যবশতঃ আমার স্ত্রী ও বড় দুই মেয়ে সেদিন উপস্থিত ছিলনা। ঐদিনই সন্ধ্যা রাতে তারা অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছিলো। ছোট দুই মেয়ে লিলি ও মায়া (১০ বৎসর, ৭ বৎসর) সহ বাড়ীর সমস্ত স্ত্রী পুরুষকে বন্দী করে বাহির বাড়ীতে উঠিয়ে নেয় এবং সমস্ত পুরুষকে ট্রাকে করে মাইজদী ক্যাম্পে নিয়ে আসে। দীর্ঘ ৪ মাস কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে রেখে তাদের উপর নির্যাতন করে, এবং গায়ের চামড়া পুড়িয়ে দেয়। ৪জনকে গুলি করে হত্যা করে। পরে অবশ্য তারা বাড়ীর সমস্ত মহিলা ও শিশুকে এক বেলুচ ক্যাপ্টেনের নির্দেশে ছেড়ে দেয়। ভাগ্যক্রমে আমার বড় ছেলে গোলাম মহিউদ্দিন (লাতু) পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণে বেঁচে কচুরী পানার নীচে দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। হানাদাররা দুই বোনের সমস্ত ঘর বাড়ী পুড়িয়ে দেয়। ছোট বোনটির মৃত্যু এর পূর্বেই হয়েছিল এবং তার স্বামীও জীবিত ছিল না। একমাত্র ভাগ্নে মফিজ তখন সামরিক বিভাগের চাকুরীতে পশ্চিম পাকিস্তানের কোহাটে আটক। ভাগ্নী জামাই মমিন উল্লাহ এবং তার বড় ভাইয়ের কলেজে পড়ুয়া দুই ছেলে নূরউদ্দিন, শাহাবুদ্দিন সহ নয় জনকে লাইনে দাঁড় করিয়ে হানাদার বাহিনী ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলী করে হত্যা করে। এই মর্মান্তিক খবর আমাকে জানানো হয়নি। যেমন জহুর আহমদ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ ছেলের মৃত্যু সংবাদও তাঁর নিকট গোপন রাখা হয়েছিলো। আ স ম আব্দুর রব ও অন্যান্যের চেষ্টায় আমার স্ত্রী, কন্যা ও মৃত ভগ্নীর ছেলে মনজু এবং আমার ছোট ভাই এনায়েত জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে বেলোনিয়ায় পৌঁছে। এসময় মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় তীব্রভাবে সাম্প্রদায়িক দাংগা দেখা দেয়। স্মর্তব্য, কলকাতা সহ পশ্চিম বঙ্গ এবং আলীগড়সহ ভারতের উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ মুসলমান যুদ্ধের প্রথম দিকে তীব্রভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। তাদের ধারণা ছিল পাকিস্তান ভেঙ্গে গেলে তাদের নিরাপত্তা

বিস্মিত হবে। তাদের ভ্রমাত্মক ধারণা দূর করার জন্য মুজিব নগর সরকার বিশেষ করে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও মনসুর আলী আমাকে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি রক্ষার জন্য রাষ্ট্রপতির বিশেষ দূত হিসেবে নদিয়া, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর সহ বিভিন্ন জায়গায় পাঠান। এসময় ফরিদপুর থেকে লক্ষাধিক তপশীলী সম্প্রদায়ের লোক উপরোক্ত এলাকাগুলোতে আশ্রয় নিয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে বহরমপুর সীমান্তে একদিনেই প্রায় ১০ হাজার নমশুদ্র চাল সড়কি নিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো। আল্লাহর রহমতে আমি, মরহুম গোলাম কিবরিয়া এম এন এ, আজিজুর রহমান আক্কাছ এম এন এ ও অন্যান্য এম পি এবং বহরমপুরের তরুণ আই এ এস অফিসার মিঃ ডি কে ঘোষ-এর সহযোগিতায় প্রত্যেক মুসলমানের বহিঃ বাড়ীর ঘর, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা সমস্তই বাস্তুহারাদের আশ্রয়ের জন্য ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে সফলকাম হই। এমনকি সরকারী নির্দেশে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মারওয়ারীদের বিরাট বিরাট পাটের খালি গুদাম বাস্তুহারাদের জন্য খালি করে দেয়া হয়। মিসেস সুভদ্রা যোশী এম, পি ও তদানিন্তন কংগ্রেসের মহা সচিব হেনরি অস্টিনসহ আমরা উত্তরাঞ্চলের আলীগড়, মীরাট ও অন্যান্য স্থানের সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী কাজে বিভিন্ন স্থানে জনসভা ও গণসংযোগ করি। এসময় আমার নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল নেপালে যাওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি সরকারী নির্দেশ দেন। অপর দুই সদস্য ছিলেন শ্রী সুবোধ মিত্র ও আব্দুল মমিন তালুকদার এম, এন, এ। আমরা নেপাল যাওয়ার পূর্বে দিল্লীস্থ পাকিস্তান হাই কমিশন হতে যে দু'ইজন ডিপ্লোমেট কে, এম সাহাবুদ্দিন এবং জনাব আমজা'দুল হক ডিফেক্ট করেছিলেন তাঁদের সাথে যোগাযোগ রেখে প্রায় দু'সপ্তাহ দিল্লীতে অবস্থান করি। এসময় আমরা সর্ব ভারতীয় সংগ্রামী নেতা শ্রী আচার্য কৃপালনি এবং শ্রীমতি কৃপালনিসহ প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরাগান্ধী এবং আরো কয়েকজন বিপ্লবী—বীণাদাস (যিনি কলকাতার কনভোকেশনে গভর্ণরকে গুলি ছুঁড়ে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে আন্দামান হতে ফিরছিলেন), শ্রী পান্নালাল দাসগুপ্ত ও শ্রী অমর সাহার সঙ্গে যোগাযোগ ও আলোচনা করে অনেক তথ্য ও মূল্যবান উপদেশ লাভ করি।

এরপর আমরা নেপাল যাই। নেপাল তখন ছিল পাকিস্তানের খুব ঘনিষ্ঠ ও সহযোগী রাষ্ট্র। সৌভাগ্যের বিষয় এই সময় কাঠমুণ্ডুতে তিনজন পাকিস্তানী কূটনীতিকের মধ্যে দুজনই ছিলেন বাঙ্গালী। জনাব মোস্তাফিজুর রহমান সি, এস, পি এবং জনাব মোখলেছউদ্দিন সি, এস, পি ছিলেন। সচিবালয়ের একজন প্রবীন লোক ছিলেন তিনিও ছিলেন ভোলার অধিবাসী। এই সফরে আমরা নেপালের সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী ঋষিকেশ সাহা ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী থাপা ও অন্যান্য বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাঁরা সকলেই "বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি" নাম দিয়ে বাস্তুহারাদের সাহায্য এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে জোরালো সমর্থন দেন। তাঁরা

কয়েকটি ছাত্র-যুব সমাবেশের এবং একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্তমান নেপালের রাজার পিতা শ্রী বীরেন্দ্র তখন জীবিত ছিলেন। বর্তমান রাজার আপন মামা ছিলেন প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও জাতিসংঘে নেপালের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী ঋষিকেশ সাহা। তাঁদের মাধ্যমে আমরা রাজ দরবারে মুজিব নগর সরকারের ছবি ও কাগজপত্র প্রদান করি।

নেপাল হতে প্রত্যাবর্তন করে আবার ১নং বালিগঞ্জে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে যোগদান করি। ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত উক্ত কাজেই নিয়োজিত ছিলাম। ১৬ ডিসেম্বর-এর পরে আমি আগরতলা হয়ে নোয়াখালী চলে যাই। ইতিপূর্বে ৬ ডিসেম্বর হতেই নোয়াখালী হানাদার মুক্ত হতে থাকে। কাজেই আগরতলা, উদয়পুর এবং বেলোনিয়ায় অবস্থানরত হাজার হাজার শরণার্থী ও প্রায় অধিকাংশ বাস্তুহারা এবং এম পি এ, এম এন এ ও অন্যান্য প্রায় সব নেতৃবৃন্দ এবং তাদের পরিবার-বর্গ নোয়াখালী প্রত্যাবর্তন করেন। এমনকি আমার দুই ছেলেও তখন নোয়া-খালীতে। কাজেই আমার স্ত্রী ও পাঁচ কন্যা শুধু আমার অপেক্ষায় উদয়পুরে অধীর আগ্রহে এবং উদ্বিগ্ন হয়ে বসে ছিল।

ইতিপূর্বে পূর্বাঞ্চলের চেয়ারম্যান আমাকে সমগ্র নোয়াখালী (ফেণী ও লক্ষ্মী-পুরসহ) জেলার প্রশাসনিক দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং আমার মন্ত্রিসভায় যোগদানের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমি উক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম।

এখানে অত্যন্ত গর্বের সাথে উল্লেখ করতে পারি যে নোয়াখালী জেলা হানাদার মুক্ত হবার ও আমাদের প্রশাসনিক দায়িত্বে নেয়ার পরে কোনস্থানে কোন হত্যা-কাণ্ড বা লুটতরাজ অথবা রাহাজানি হয়নি। এমনকি ইতিপূর্বে যুদ্ধচলার সময়েও মুক্তিযোদ্ধারা যাদের হত্যা করেছিলো তাদেরও কোন মালামাল বা ঘরবাড়ী লুট-পাট করেনি। আমি মুজিব বাহিনী, মুক্তি বাহিনী এবং শ্রমিক সংগঠনের বিভিন্ন বাহিনীকে নোয়াখালী জেলা স্কুল, হরিনারায়নপুর স্কুল ও অন্যান্য স্থানে অস্ত্রশস্ত্র সহ শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের নির্দেশ দেই। ফেণী, লক্ষীপুর, রামগতি, কোম্পানীগঞ্জ সহ বিভিন্ন ক্যাম্পে ৪/৫ হাজার করে নগদ টাকা এবং নোয়াখালী সেন্ট্রাল স্টোরে রক্ষিত কাপড় কম্বল চাউল গম ডাল ইত্যাদি সরবরাহ করি। বিশেষ করে ডেলটা জুট মিলের ও দোস্ত মোহাম্মদ টেক্সটাইল মিলের শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে চাল সরবরাহ করি। সৌভাগ্যের বিষয় রাজাকার তহবিলে গচ্ছিত প্রায় ৮০ লাখ টাকা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে এবং ছাত্র শ্রমিক ও বিভিন্ন বাহিনীর নেতৃ-বৃন্দের তত্ত্বাবধানে বিলি বণ্টন করি। পরে তদানিন্তন কুমিল্লা গ্যারিসনের কমাণ্ডার মেজর জিয়াকে নোয়াখালীর মাইজদীতে নিয়ে ১০ই জানুয়ারীর পূর্বেই মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট থেকে অনেক আগ্নেয়াস্ত্র আমাদের নিকট প্রত্যর্পণ করার আহবান জানাই এবং জমা নেই।

—আব্দুল মালেক উকিল
১ জুলাই, ১৯৮৪।

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী

মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে আমি জেনেভায় উপস্থিত ছিলাম। আমি তখন বিশ্ব মানবাধিকার সংস্থার সদস্য। এই সম্মেলন চলাকালে ২৬শে মার্চ, ১৯৭১ সালে বিবিসি'র মাধ্যমে আমি জানতে পারি যে, বাংলাদেশের অবস্থা ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। ঢাকায় সাংঘাতিক কিছু হয়েছে কিন্তু বাইরের পৃথিবী থেকে ঢাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলে সঠিক কিছু জানা যাচ্ছে না। এই খবর শুনে আমি অত্যন্ত মর্মাহত, চিন্তিত এবং ব্যাকুল হয়ে উঠি। অধিবেশন চলা অবস্থায় মানবাধিকার সংস্থার তৎকালীন সভাপতি আঁদ্রে আগিলাকে আমি জানাই যে আমার দেশ সংক্রান্ত গভীর দুঃখজনক সংবাদ আমি জানতে পেরেছি এবং এ সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আমার পক্ষে অধিবেশনে অংশ গ্রহণ আর সম্ভব নয়। আমি মধ্যাহ্নে জেনেভা ত্যাগ করি এবং বিকেলের দিকে লণ্ডন এসে পৌঁছি।

আমি যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র দপ্তরের দু'জন কর্মকর্তাকে চিনতাম, একজন হচ্ছেন ইয়ান সাদারল্যাণ্ড। তিনি ছিলেন দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের প্রধান এবং অপরজন হচ্ছেন এন, জে, ব্যারিংটন। তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড হিউমের ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

পরের দিন যদিও ছুটির দিন ছিল তবুও আমি উভয়কে তাদের অফিসে আসতে অনুরোধ জানাই। এবং দু'জনই তা রক্ষা করেন। পররাষ্ট্র ভবনে উপস্থিত হলে তাঁরা আমাকে জানান, ঢাকা থেকে এখনো সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যাচ্ছেনা। এসময় আমাকে কফি খেতে অনুরোধ করা হয়। আমরা কফি খাচ্ছি এমন সময় মিঃ সাদারল্যাণ্ডের একান্ত সচিব খবর দেন যে ঢাকা থেকে একটি টেলেক্স আসছে। মিঃ সাদারল্যাণ্ড তথ্য সম্পূর্ণ হলে সেটি নিয়ে আসতে বলেন। সচিব একটি বিশাল টেলেক্স নিয়ে আসেন এবং সাদারল্যাণ্ড গোটা জিনিসটা পাওয়ার পর আমাকে বলেন জাস্টিস চৌধুরী, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, ঢাকার সংবাদ খুবই খারাপ। বহু ছাত্রকে হত্যা করা হয়েছে এবং আমরা ভীত যে, শিক্ষকরাও এই হত্যাযজ্ঞ থেকে বাদ পড়েনি। নগরে মৃত্যুর সংখ্যা খুবই বেশী।

আমি আরো জানতে পারি যে, বৃটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার জানিয়েছেন তাঁর পক্ষে আর টেলেক্স করা সম্ভব নয় এবং তিনি বৃটিশ নাগরিকদের ফেরত নেবার অনুরোধ জানিয়েছেন। সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো যে, গোটা বাংলাদেশ একটি বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থায় আমার পক্ষে পাকিস্তান সরকারের সাথে কোন রকম সম্পর্ক রাখা অপমানজনক। যারা আমার ছাত্রদের মেরে ফেলেছে আমি কিভাবে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারি। আমার মনে পড়ল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের কথা। আমি তখনই লর্ড হিউমের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। কিন্তু সে সময় তিনি স্কটল্যাণ্ডে তাঁর দেশের বাড়ীতে ছিলেন। আমি অবিলম্বে কমনওয়েলথ সচিবালয় সাধারণ সম্পাদক

আর্নল্ড স্মিথের সঙ্গে দেখা করি এবং ঢাকায় হত্যা বন্ধ এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য চেষ্টা করতে বলি। এখানে একজনের নাম বিশেষ করে বলতে হয়, তিনি হচ্ছেন উইলিয়াম পিটার'স। এই ভদ্রলোক একান্তর সালে কমনওয়েলথ সচিবালয়ে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ষাটের দশকে তিনি ঢাকায় যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনে ফার্স্ট সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেছিলেন। তিনি আমাদের আশা আকাঙ্খার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। এবং তাঁর সাথে আমি সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করি।

জেনেভা থেকে লণ্ডনে আসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে বসবাসরত বাঙ্গালীদের সাথে আমার দেখা হয় এবং মিঃ সাদারল্যাণ্ডের সাথে টেলিফোনে কথা বলি। আমি আগেই বলেছি, পরের দিন তাঁর সাথে দেখা করি এবং ঢাকা থেকে পাঠানো টেলেক্স-এ খবর পাই। হাবিবুর রহমান, সুলতান শরীফ এবং অন্য কয়েকজন আমার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। মিঃ হাবিবুর রহমান আমাকে পররাষ্ট্র দপ্তরে নিয়ে যান। পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে ফিরে এসে আমার স্ত্রীকে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানাই। সে অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে আমার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ইতিমধ্যে বহু বাঙ্গালী জড় হতে থাকে। সবার নাম মনে রাখা সম্ভব নয়। তবে বিশেষভাবে আমি কয়েকজন ডাক্তারের কথা বলতে চাই যাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। নয় মাস ধরে যে আন্দোলন চলে তাতে কিছু কিছু কর্মীর কাছ থেকে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় কিন্তু ডাক্তার কর্মীরা কোনদিন কোন অসুবিধা করেননি বরং তাদের ত্যাগ, কর্মনিষ্ঠা এবং কষ্ট সহিষ্ণুতা অন্যদের জন্য আদর্শ হিসেবে প্রজ্জলিত ছিল। ডাঃ আব্দুল হাকিম, ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী এবং মোশারফ হোসেন জোয়ারদার সারাক্ষণ পরিশ্রম করতেন।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমগ্র গ্রেট বৃটেনে বাঙ্গালীদের মধ্যে এই আন্দোলন গড়ে ওঠে। প্রায় প্রতিটি বাঙ্গালী এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয় এবং বিভিন্ন এলাকায় কমিটি গঠন করে। কিন্তু একটি সংগঠনের সাথে অন্য সংগঠনের যোগাযোগ ছিল কম যার ফলে নেতৃত্বের প্রশ্নে বিরোধ দেখা দেয়, এবং নিজেদের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক দলই আমাকে তাদের দলে যোগ দেয়ার জন্য চাপ দেয় কিন্তু আমি একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত না হলে কোন দলেই যোগ দেবনা বলে জানাই।

লর্ড হিউমের সাথে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়। এই মধ্যবর্তী সময় আমি বিভিন্ন একাডেমিসীয়ান এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে থাকি। এছাড়া বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের সঙ্গেও দেখা করি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার এ্যালেন

বুলক এবং ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য লর্ড জেমস এর সঙ্গে দেখা করি। তাঁরা আমাকে স্যার হিউ স্প্রিংগার এর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। তিনি ছিলেন কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মুখপাত্র।

ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড জেমস একটি মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা করেন এবং প্রায় বিশজন বিভাগীয় প্রধানকে ঐ ভোজে দাওয়াত করেন। আমি তাদের কাছে বাংলাদেশের অবস্থা বর্ণনা করি এবং তাঁরা গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তা শোনেন। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকা কালে লর্ড জেমস ঢাকায় এসেছিলেন। তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করেন যে, ছয় মাসের মধ্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। পূর্ব পাকিস্তানকে কলোনী হিসেবে ব্যবহার করা আর সম্ভব হবে না। এর পরে আমি স্যার হিউ স্প্রিংগার এর সাথে দেখা করি। তিনি বলেন, "হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করা আমার নৈতিক দায়িত্ব"। তিনি আরো বলেন, তিনি তখনি ইয়াহিয়া খানকে একটি টেলিগ্রাম করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করার জন্য।

তারপর আমি আন্তর্জাতিক জুরিস্ট কমিশনের সাধারণ সম্পাদককে টেলিফোন করে সমস্ত ব্যাপার জানাই। তিনি পাকিস্তান সরকারের কাছে একটি তারবার্তা পাঠান। তাতে তিনি হত্যাযজ্ঞ বন্ধ এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য অনুরোধ জানান।

বাংলাদেশ আন্দোলনে তৎপর বিভিন্ন সংগঠন একত্রীকরণ করার জন্য আমরা সকলেই চেষ্টা করি। এই কাজটি ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। রাত দু'টা তিনটা পর্যন্ত মিটিং চলতো এবং বাড়ী ফিরে নিজের কাছে শপথ করতাম যে পরদিন আর যাবোনা। কে কোন্ দলের নেতা হবেন তা নিয়ে মতবিরোধ ছিল। কিন্তু পরদিন আবার ঠিকই যেতাম।

১০ই এপ্রিল লর্ড হিউম এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। সাদারল্যাণ্ড এবং ব্যারিংটন আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যান। লর্ড হিউম আমাকে দেখার সাথে সাথেই বলেন যে তিনি পাকিস্তানের হাই কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছেন। অবস্থা ঠিকই আছে, চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি বলি শুধু মাত্র একজনের কথাতেই প্রমাণ হয়না যে অবস্থা ঠিক আছে। আমি আমার সম্পূর্ণ বক্তব্য পেশ করি এবং শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন বাঁচানোর জন্য অনুরোধ জানাই। তিনি বলেন, সুনির্দিষ্ট খবর আছে শেখ মুজিব ভালোই আছেন। এই সাক্ষাৎকারে লর্ড হিউমকে আমি জানাই, আমরা শান্তি ও শৃঙ্খলার সাথে আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাব। তিনি তাতে কোন আপত্তি করেননি। সে দিক থেকে এটা অত্যন্ত সাফল্যজনক সাক্ষাৎকার ছিল। সেদিনই আমি চারটার সময় বিবিসিতে যাই। মিঃ পিটার গিল সেখানে আমার একটি একক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এই সাক্ষাৎকারে আমি পাকিস্তানের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার

কথা ঘোষণা করি। বিবিসিতে কর্মরত দু'জন বাঙ্গালী সিরাজুর রহমান এবং শ্যামল লোধ আমার বিবৃতি নেন এবং প্রচার করেন।

আমি বি, বি, সিতে বিবৃতি দিয়ে বের হবার সময় পাকিস্তানী হাই কমিশনের মিঃ মহিউদ্দিন আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে তিনি কি করবেন। আমি তাঁকে বলি, আমি যথাসময়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করব। কেননা তখনও মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়নি। এ অবস্থায় আমার পক্ষে এক সরকারী কর্মচারীকে সেই মুহূর্তে পদত্যাগ করতে বলা উচিত হোতনা। পরে অবশ্য আমরা মিঃ মহিউদ্দিনকে পদত্যাগ করতে এবং তিনি তা করেন।

আমি যে জায়গায় থাকতাম সেখানে পাকিস্তান হাইকমিশন থেকে বার বার টেলিফোন করে আমাকে হাইকমিশনারের বাড়ীতে নিমন্ত্রন জানানো হয়। আমি বারবারই তা প্রত্যাখান করি। অতঃপর আমি বাসা পাল্টাবার সিদ্ধান্ত নিই। কয়েকদিন পরে গোছগাছ করে যখন আমি রওয়ানা হচ্ছি ঠিক তখনই একটি টেলিফোন আসে। জানতে পারি টেলিফোনটি কলকাতা থেকে করা হয়েছে এবং অপরপারে কথা বলছেন টাংগাইল থেকে সংসদ সদস্য জনাব আব্দুল মান্নান এবং ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম। এই টেলিফোন সরকার গঠনের কয়েকদিন আগে আসে। তাঁরা আমাকে জানান যে, তাঁরা আমার সিদ্ধান্তে অত্যন্ত খুশী হয়েছেন এবং তাঁরা চান যে, সরকার গঠনের পর আমি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করি।

অস্থায়ী বাসস্থানে যাবার পর আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে একটি টেলিফোন পাই। কিভাবে তাঁরা আমার নতুন ঠিকানার খবর জানলো ঠিক বুঝতে পারিনি। তাঁরা আমার সঙ্গে দেখা করে জানান যে, পাকিস্তান সরকার আমাকে অপহরণ করার জন্য কিছু পাকিস্তানী লোক নিয়োগ করেছে এবং আমাকে অনুরোধ করেন অত্যন্ত সতর্কভাবে চলাফেরা করতে। তাঁরা আরো জানান, সরকারী পর্যায়ে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে যুক্তরাজ্যে থাকাকালে আমার জন্য ছদ্মবেশী কর্মচারীদ্বারা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। তাঁরা বিশেষভাবে চলাফেরার ব্যাপারে আমাকে সতর্ক করে দেন এবং ভূগর্ভ রেলে ভ্রমণ করতে বারণ করেন। কেননা এগুলি বিদ্যুৎ চালিত এবং ধাক্কা দিয়ে বিদ্যুৎপিষ্ট করার সম্ভাবনা বেশী, বাসে চলা অধিক নিরাপদ এবং পায়ে হেটে চলা আরো নিরাপদ। কারণ এতে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পক্ষে চোখ রাখা সহজ। তারা বলেন যে, যদিও সবসময় আমার ওপর তাদের নজর থাকবে তবু যেকোন বিপদে একটি বিশেষ টেলিফোন নাম্বারে যেন যোগাযোগ করি। সব শেষে তারা বলেন যে, এইসব নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে তা বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সমর্থন হিসেবে নয়। তারা চান না যে, যুক্তরাজ্যের মাটিতে এমন কিছু ঘটুক যাতে যুক্তরাজ্যে সরকারের সম্মান ক্ষুন্ন হয়।

এই ঘটনার কিছু পরে বৃটেনে বসবাসরত বাঙ্গালীরা কভেনট্রিতে একটি সভার আয়োজন করে। প্রকৃতপক্ষে এই অনুষ্ঠানে যাবার আমার খুব একটা উৎসাহ ছিল না। কারণ, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কলহ এতো বেশী হতো যে আমি খুবই বিমর্ষ বোধ করতাম। এছাড়া আমি অনুভব করছিলাম যে আমার কোন আনুষ্ঠানিক ক্ষমতাও ছিলনা। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই জনাব রুকিবউদ্দিন আমাকে মুজিব নগর সরকারের নিয়োগ পত্রটি দেন এবং আমি কভেনট্রিতে উপস্থিত হই। সভায় তুমুল হট্টগোল চলছিল। আমরা বেগম লুলু বিলকিস বানুকে অনুষ্ঠানের সভাপতি করে কাজ শুরু করি। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে এই সভা পরিচালনা করেন। এই অনুষ্ঠান চলাকালে জনাব রকিব আমার নিয়োগপত্রটি পড়ে শোনান। কিন্তু আঞ্চলিক নেতৃত্ব নিয়ে কোন্দল থাকায় আমি মর্মাহত অবস্থায় হল ত্যাগ করতে উদ্যত হই। এসময় জনাব মিনহাজ উদ্দিন নামে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলেন যে বহু কলহ হয়েছে, এই কলহে আমাদের অনেক ক্ষতিও হয়েছে। আমরা আর কলহ চাইনা। আপনি যাবেন না। এরপর আরো আধঘন্টা ধরে আলাপ আলোচনা হয় এবং গউস খান প্রস্তাব করেন যে, পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি ষ্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হোক। এর নামকরণ করা হয় 'ষ্টিয়ারিং কমিটি অফ এ্যাকশান'স কমিটি অফ পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ'। আমি সভাপতির পদ গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করি। কারণ আমার ভয় ছিল এই সংগঠন আবার ভেঙ্গে যাবে। দ্বিতীয়তঃ আমি ভাবছিলাম, আমার মূল দায়িত্ব হচ্ছে বিশ্ব জনমত গঠন করা এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করার ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। যাহোক শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় যে, ষ্টিয়ারিং কমিটি তার কর্মকাণ্ড চালাবে আমার উপদেশ মতো।

১১নং গোরিং ষ্ট্রীটে এই কমিটির জন্য অফিস নেয়া হয়। অফিস ঘরটি ছিল জনাব হারুনুর রশীদের। তাঁর পাটের ব্যবসা ছিল। কমিটির সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শেখ আব্দুল মান্নান, শামসুর রহমান, মিঃ কবীর চৌধুরী, আর মিঃ আজিজুল হক ভুইয়া ছিলেন আহ্বায়ক। এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য নির্দ্ধারিত হয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠন এবং অস্ত্র সরবরাহ ও সাংগঠনিক কাজের জন্য মূলতঃ বাঙ্গালীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ। পরে যখন দেখা গেল অস্ত্র সরবরাহে নানা বাধা তখন আর অর্থ সংগ্রহের জন্য তেমন প্রচারণা চালানো হয়নি।

মুজিব নগর সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী অর্থ সংগ্রহের জন্য একটি বোর্ড অব ট্রাষ্টি গঠন করা হয়। এই বোর্ডের সদস্য ছিলেন মিঃ ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ, প্রাক্তন মন্ত্রী মিঃ ষ্টোন হাউস এবং আমি। এ কমিটিতে কয়েকজন বাঙ্গালীর সদস্য হবার কথা ছিল। কিন্তু কোন্ কোন্ বাঙ্গালী নিয়ে ফাণ্ড হবে ঠিক করতে না পারায় আপাতত এই তিনজনকে নিয়ে বোর্ড গঠিত হয়। পরে আরো নেবার

কথা ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন হওয়ায় সংগৃহিত অর্থ বাংলাদেশ সরকারের নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং বোর্ডের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়।

পাকিস্তানী দূতাবাস এই অর্থ সংগ্রহ অভিযানের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার চালাতে থাকে এবং বহুলাংশে সফল হয়। কোন ব্যাংকই একাউন্ট খুলতে দিতে রাজী হচ্ছিলনা। শেষ পর্যন্ত হ্যামব্রোজ ব্যাংক রাজী হয় এবং সেখানে এ্যাকাউন্ট খোলা হয়।

কিন্তু পাকিস্তান হাইকমিশন চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখে যার ফলে হঠাৎ করে একদিন হ্যামব্রোজ ব্যাংক আমাদের জানায় তারা এই এ্যাকাউন্ট চালাতে দেবে না এবং আমাদের সমুদয় অর্থ উঠিয়ে নিতে হবে। বাংলাদেশ বলে কোন দেশ নেই। অথচ ফাণ্ডের নাম বাংলাদেশ ফাণ্ড। এই ঘটনাটি ঘটে জুন মাসে। তখন আমাদের এ্যাকাউন্টে এক লক্ষ পাউণ্ড সংগৃহিত হয়েছিল। ব্যাংকের এই সিদ্ধান্তে আমরা অত্যন্ত বিপদগ্রস্থ হই এবং বিচলিত হয়ে পড়ি। কিন্তু আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন জন ষ্টোন হাউস (এম পি) এবং তিনি ন্যাশনাল ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ব্যাংকে এ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করে দেন। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, এই ব্যাংক পূর্বে আমাদের এ্যাকাউন্ট খুলতে রাজী হয়নি। অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে এমন ব্যবস্থা করা হয় যাতে করে সরাসরি ব্যাংকে টাকা জমা দেয়া যায়। ইংলণ্ডের যেকোন প্রান্ত থেকে যে কোন ব্যাক্তি সরাসরি ব্যাংকে টাকা জমা দিতে পারতেন। অর্থ সংগ্রহ এবং আন্দোলন পরিচালনার জন্য নানা প্রান্তে একশটি কমিটি গঠন করা হয়। প্রথম থেকেই আমি রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে থাকি এবং কনসারভেটিভ পার্টির প্রফেসার জিন-কিন'স এর সাথে যোগাযোগ করি। তিনি একজন প্রাক্তন আই. সি. এস অফিসার ছিলেন। কনসারভেটিভ পার্টির অফিসে একটি সভার আয়োজন করি এবং তাদের কাছে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের কারণ তুলে ধরি।

লেবার পার্টির সদস্যদের সাথেও আমার যোগাযোগ হয়। তাঁরা আমাদের এই আন্দোলনের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁরা একটি সভার ব্যবস্থা করেন। এ সভা পার্লামেন্ট ভবনেই অনুষ্ঠিত হয়। আমার কাছে মনে হয়েছে এটি ছিল আমাদের আন্দোলনের প্রতি এক ধরণের শ্রদ্ধা এবং স্বীকৃতির ইংগিত। মে মাসে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আমার আনুষ্ঠানিক কর্মের অংশ হিসেবে আমি সে মাসেই নিউইয়র্ক যাই। ওখানকার বাঙ্গালী কূটনীতিক জনাব মাহমুদ আলীর নেতৃত্বে প্রায় দু'শ বাঙ্গালী আমার সাথে বিমান বন্দরে মিলিত হয়। এই দৃশ্য অত্যন্ত আবেগ প্রবণ ছিল। কারণ এতে করে আমাদের আন্দোলনের প্রতি ব্যাপক সমর্থনের লক্ষণ দেখা যায়। যেদিন আমি নিউইয়র্কে পৌছি আরো কয়েকজন বাঙ্গালী উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী যথা জনাব এ. এম. এ মুহিত, জনাব খোরশেদ আলম, জনাব

হারুন রশীদ এবং আরো অনেকে আমার সাথে দেখা করেন। তাঁদের সাথে আন্দোলনের নানাদিক নিয়ে আলোচনা হয়। জনাব মাহমুদ আলী বিভিন্ন দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করেন এবং আমি তাদের সাথে মিলিত হই এবং প্রকৃত অবস্থা তাদের সামনে তুলে ধরি। একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারের কথা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত জনাব বারুদী যিনি খৃষ্টান ছিলেন, রোকেয়া হলের ঘটনা শুনে তিনি এতো বেশী আলোড়িত হয়েছিলেন যে, কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তিনি বলেন যে, তিনি সৌদী বাদশাহকে সমস্ত কথা জানাবেন এবং সবতোভাবে হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করার প্রচেষ্টা চালাবেন।

জাতিসংঘের বিভিন্ন কূটনৈতিক সদস্যের সঙ্গেও দেখা করি এবং বক্তব্য রাখি। জাতিসংঘের তৎকালীন অধিবেশনের সভাপতি নওরয়ের প্রতিনিধি ছিলেন তাঁর সাথেও আমার সাক্ষাৎ হয়। আমরা প্রচার পত্র বিলি করি এবং বিভিন্ন সাংবাদিকের সঙ্গে মিলিত হই।

জাতিসংঘের মহা সচিব উথাণ্টের সাথে দেখা করার চেষ্টা করি। তিনি আমাদের জানান যে তাঁর সাথে সরাসরি দেখা করা আমাদের বিপক্ষে যাবে। কেননা তিনি নীরবে আমাদের জন্য কাজ করে যেতে চান। দেখা করলে পাকিস্তানের চাপ প্রয়োগের সুযোগ অনেক বেশী থাকবে। তিনি আরো বলেন যে, এ সিদ্ধান্ত আমাদের কল্যাণের জন্য এবং আমাদের বক্তব্য শোনার জন্য তিনি জাতিসংঘের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাকে পাঠান।

আমি যখন ইংল্যাণ্ডের বাইরে যেতাম শেখ মান্নানকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতাম। কারণ তিনি ইংল্যাণ্ডে থেকেই অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। বৃটেনের বিভিন্ন জায়গায় আমরা সভা করি এবং আন্দোলন আরো তীব্র আকার ধারণ করে।

এরই মধ্যে ফ্রান্সের সাথে আমরা যোগাযোগ করি এপ্রিলের শেষের দিকে। আমি সেখানে গিয়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে বাংলাদেশের অবস্থা বর্ণনা করি। সেখানে থাকতে আমার একজনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ হয়, তিনি হচ্ছেন মরিসাসের প্রধান মন্ত্রী জনাব সিউ সাগর রামগোলাম। তাঁকে আমি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে অনুরোধ জানাই। বিভিন্ন অবস্থার কারণে তাঁর পক্ষে এটা সম্ভব হয়নি কিন্তু অন্য সব ধরণের সাহায্য তিনি আমাদের করেন। আমি প্যারিসে তাঁর সাথে একদিন আমাদের আন্দোলন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি। তিনি তাঁর দেশের লণ্ডনস্থ দূতাবাসকে আমাদের সব ধরণের সাহায্য করার জন্য নির্দেশ দেন এ ছাড়া আমরা কিছু বাঙ্গালী ছাত্রকে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে ফ্রান্সে পাঠাই। আন্তর্জাতিক পার্লামেন্টারী ইউনিয়নের সভায়ও আমরা প্রতিনিধি প্রেরণ করি।

বৃটেনে অবস্থিত 'সোস্যালিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের' সাধারণ সম্পাদক হ্যান্স ইয়ানিতশেখ আমাদেরকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা এবং সাহায্য করেন। তিনি বলেন, আমার অফিস তোমাদেরই অফিস, তোমরা এটা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পার। এখানে বলা উচিত যে, কিছুদিন আমরা এই প্রস্তাবের সদ্ব্যবহার করি।

লণ্ডনে জার্মানীর প্রাক্তন চ্যান্সেলার উইলি ব্রান্টের সাথে আমি সাক্ষাৎ করি এবং তাঁকে জানাই যে কেন স্বাধীনতা ছাড়া আমাদের পক্ষে অন্য কোন পথ সম্ভব নয়। তিনিও আমাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এখানে বলা যায় যে, যেখানেই গিয়েছি সেখানেই আমরা অত্যন্ত সহানুভূতিশীল অভ্যর্থনা এবং সাহায্যের আশ্বাস পেয়েছি। এর একটি কারণ হচ্ছে যে, বৃটেনের প্রেস আমাদের খবর এমনভাবে প্রকাশ করে যাচ্ছিল যে, জনমত আমাদেব পক্ষেই দাঁড়িয়েছিল। জুন-জুলাই এর দিকে একটি গুঞ্জন উঠে যে, আমাদের ইসরাইলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। আমি অনুসন্ধান করে দেখি যে এ সংবাদ একেবারে ভিত্তিহীন। সংবাদ-পত্রের মাধ্যমে আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই। জুলাই মাসে বৃটেনে অবস্থিত বাঙ্গালীদের আন্দোলন যথেষ্ট শক্তিশালী এবং জোরদার হয়ে ওঠে। আগষ্ট মাসের প্রথম তারিখে আমরা ট্রাফলগার্ড স্কোয়ারে একটি বিরাট জনসভা করি। এটি ছিল লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আমার জানামতে সাম্প্রতিক কালের সর্ব বৃহৎ জন সমাবেশ। প্রায় ৪০ হাজার লোক এই সমাবেশে উপস্থিত হন। এলাকার চারিদিকে সমস্ত বাড়ীঘরেব ছাদে লোকজন ভর্তি হয়ে যায়। এই সভাতে বাংলা-দেশ দূতাবাসের মহিউদ্দিন বাংলাদেশের প্রতি তাঁর আনুগত্যের কথা ঘোষণা করেন।

আগষ্ট মাসের শেষের দিকে মুজিব নগর সরকারের সম্মতি নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের মিশন চালু হয়। ২৪নং পেমব্রিজ গার্ডেনে মিশনের অফিস খোলা হয় এবং এই ভবনটির ব্যবস্থা করেন ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ। তিনি বিনা ভাড়ায় ভবনটির ব্যবস্থা করে দেন। আমরা শুধু পানি এবং গ্যাসের বিল দেবো এই ব্যবস্থা হয়। আগষ্টের শেষে পুরোদমে এই মিশন কাজ শুরু করে। এই সময় ডঃ মোশারফ হোসেন জোয়ারদার-এর মাধ্যমে প্রখ্যাত ব্যবসায়ী জহুরুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ হয়। তিনি অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসেন। তিনি সুবেদ আলী নাম নিয়ে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। এবং তিনি বৃটেনে এই ২৪নং প্রেমব্রিজ গার্ডেনে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের সমস্ত খরচ খরচ বহন করতেন। মিশন চালু হওয়ার পর আমি এর প্রধান হিসাবে যোগদান করি। বহির্বিশ্বে এটাই বাংলাদেশের প্রথম দূতাবাস।

আমরা বিদেশ ভ্রমণ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে। আমার দায়িত্ব ছিল আন্তর্জাতিক জনমত গঠন করা। ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে আন্দো-লন বেশ শক্তিশালী আকার ধারণ করে।

নেদারল্যাণ্ডেও একটি শক্তিশালী সংগঠন ছিল। এই সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন জনাব জহির উদ্দিন এবং আমীর আলী। জুন মাসের দিকে ঠিক হয় যে, আমি এ্যামস্টেডামে যাবো। একদিন পূর্বেই হঠাৎ করে আমার বাসায় এ্যামস্টেডামের টেলিভিশনের একটি দল উপস্থিত হয় এবং আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। এতে আমাদের আন্দোলন ব্যাপক প্রচার লাভ করে। বলা যেতে পারে অন্য দেশ থেকে এসে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা আমাদের আন্দোলনকে এক ধরনের স্বীকৃতি প্রদানের সামিল।

ডাচ্ পার্লামেন্ট ভবনে বৈদেশিক বিষয়ক উপ-পরিষদে তিন ঘন্টা আলোচনা করি। যাঁদের সঙ্গে আলোচনা হয় তাঁরা ছিলেন মিঃ টারবিক, জ্যাঁ প্রাংক, মোমেসত্যাগ, স্বীকার, ভ্যান উস্তেন। তাঁরা প্রায় সবাই বুঝতে পারেন কেন আমরা স্বাধীনতা দাবী করেছি। তাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং আমাদের বিজয় কামনা করেন। পার্লামেন্টে আমাদের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। আমাদের প্রেস কনফারেন্সটি অত্যন্ত সফল হয়েছিল। ডাচ সরকার আমাদের পক্ষে একটি বিবৃতি দান করেন এবং সরাসরিভাবে পাকিস্তান সরকারের কাছে প্রতিবাদ লিপি পাঠান। ডেনমার্কেও আমাদের সফর অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছিল। আগষ্ট মাসের দিকে আমরা সেখানে যাই ডেনিশ পার্লামেন্ট এর স্পীকারের সাথে সাক্ষাৎ করি এবং আমাদের বক্তব্য পেশ করি। তিনি আমাদের সব ধরণের সাহায্যের আশ্বাস প্রদান করেন। এখানে এক ভদ্র মহিলার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, তাঁর নাম কিনুটেন ওয়াট বার্গে। তাঁর গৃহ আমাদের আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। তিনি তাঁর বাসায় একটি সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। সেখানে অনেক বাঙ্গালীও উপস্থিত হন। ওই ভদ্র মহিলাকে কেন্দ্র করে কমিটি গঠন করা হয় আমরা সেখানেও ব্যাপক প্রচার কার্যে সফল হই। ডাচ পররাষ্ট্র মন্ত্রী এস, এ, ডাম-এর সঙ্গেও দেখা করি। আরেকজন যিনি আমাদের ব্যাপকভাবে সাহায্য করেন তিনি ছিলেন "পলিটিকেন" পত্রিকার সম্পাদক জন ডেনষ্টাম্প। তিনি শুধু আমাদের পক্ষে পত্রিকাতেই লিখেননি, বরং সাথে সাথে তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রচারের ব্যবস্থ ও করেন। ডেনিশ টি, ভি সাক্ষাৎকারের সময় আমাদের আন্দেলনের পক্ষে একটি হৃদয়স্পর্শী ঘটনা ঘটে। যিনি আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন, তিনি সাক্ষাৎকার শুরু হবার পূর্বেই আমাকে জানান যে, তিনি খবর পেয়েছেন একটি ডেনিশ কোম্পানী পাকিস্তান সরকারের কাছে অস্ত্র বিক্রয় করতে যাচ্ছে। তিনি বলেন যে, আমাকে এমনভাবে প্রশ্ন করা হবে যাতে আমি এই বিষয়টি উত্থাপন করতে পারি। সাক্ষাৎকার শুরু হবার সাথে সাথে আমি এই তথ্যটি জানাতে সক্ষম হই এবং সমস্ত বিষয়টির প্রতিবাদ ও ডেনমার্ক সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তারা আমাকে আশ্বাস দেন যে এই অস্ত্র কিছুতেই পাঠাতে দেয়া হবেনা। এই ঘটনাটি থেকে বোঝা যায় যে, আমাদের আন্দোলনের প্রতি

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাধারণ মানুষের কি ধরণের সমর্থন ছিল। এছাড়া আমি বিরোধী দলের নেতা পল হার্টলিংক-এর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করি।

নরওয়েতে দশ বার জনের বেশী বাঙালী ছিলনা কিন্তু আন্দোলন ছিল ব্যাপক। এর কারণ, নরওয়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী ছাত্র নেতা মিঃ বুর আমাদের আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন। তিনি আমাদের জন্য জনমতের জোয়ার সৃষ্টি করেন। তাদের প্রচেষ্টায় জাতীয় টেলিভিশনে আমার বক্তৃতা প্রচার করা হয়। এক সন্ধ্যায় আমি ছাত্র পরিষদের কার্যকরী কমিটির উদ্দেশে ভাষণ দিই। অসলো বিশ্ববিদ্যালয়েও আমি বহু ছাত্র সমাবেশে একটি ভাষণ দিই। আমি লক্ষ্য করি নরওয়ের ছাত্ররা আমাদের আন্দোলনকে তাদের নিজেদের আন্দোলন বলে মনে করছে। একজন ছাত্র (শিল্পী) ইয়াহিয়া খানের একটি ছবি এঁকেন তাকে একজন হত্যাকারী হিসেবে চিত্রিত করে। কয়েকজন পাকিস্তানী এই ছবিটি ছিঁড়ে ফেলে। এর ফলে পাকিস্তানের প্রতি তাদের মনোভাব আরো বিরূপ হয়ে ওঠে।

অসলোর মেয়র আমাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানান এবং একটি ভোজে আমাকে সরাসরিভাবে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে উল্লেখ করেন।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং আইন বিষয়ের প্রধানের সাথে একটি কমিটি গঠনের ব্যাপারে আলোচনা করি।

নরওয়ের প্রধান বিচারপতি পিয়ের ওল্ড আমাকে আমন্ত্রণ জানান। সেখানে অন্যান্য বিচারপতিরাও ছিলেন। তিনি আমার পুরানো বন্ধু। এছাড়া আমি রোটারি ক্লাবে বক্তব্য রাখি। সাধরণত এই ফোরামে কোন রাজনৈতিক বক্তব্য রাখতে দেয়া হয়না। কিন্তু আমার বেলায় ব্যতিক্রম হয়। আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আমাদের সমস্ত বক্তব্য পেশ করি এবং উপস্থিত সুধীমন্ডলীর কাছ থেকে প্রচুর সাড়া পাই। সম্ভবতঃ নরওয়ে রোটারী ক্লাবে এই ধরণের ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটেনি। সুইডেনে জনাব রাজ্জাক যিনি পূর্ব পাকিস্তান পররাষ্ট্র বিভাগে কর্মরত ছিলেন আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হন। তিনি আমার সাথে এয়ারপোর্টে দেখা করেন এবং বলেন যে, বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ গুনার মিরডালের সাথে সাক্ষাৎ এর ব্যবস্থা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমি খুবই আনন্দিত হই। তিনি আমাদের আন্দোলনের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থনের কথা জানান। শুধু তাই নয়, তিনি বাংলাদেশ এ্যাকশান কমিটির সুইডেন শাখারও প্রধান হিসেবে কাজ করতে রাজী হন এবং তাঁর অফিস সেই দিন থেকে এ্যাকশান কমিটি অফিসে পরিণত হয়। তাঁর বুকে স্বাধীন বাংলাদেশের ব্যাজ পড়িয়ে দিই। এ সময় তাঁর মাধ্যমেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকা সম্পাদকদের সাথে আমার যোগাযোগ হয় এবং তাঁরা আমাদের সব ধরণের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। তৎকালীন ক্ষমতাসীন পার্টির সাধারণ সম্পাদকের সাথেও আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে বলেন যে, মৌখিক

সমর্থন যথেষ্ঠ নয়, তাঁরা এর চেয়ে বেশী করতে প্রস্তুত। তিনি বলেন যে, সরাসরিভাবে তাঁরা মুক্তিবাহিনীকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবেন। যা হোক যদিও এর পরপরই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবার জন্য অস্ত্রের আর প্রয়োজন হয়নি তবও তাদের সদিচ্ছার তুলনা বিরল।

আমি যখন হেলসিংকি বিমান বন্দরে অবতরণ করি আমাকে প্রথমে অভ্যর্থনা করেন সেখানকার বৃটিশ কনসাল জেনারেল মিঃ রয় ফক্স। আমি খুবই আশ্চর্য হই এবং তাঁকে আমার সফরের উদ্দেশ্য জানাই। একজন বিদেশী কূটনীতিক হিসেবে আমার সংগে মেলামেশায় বিপদের সম্ভাবনার কথা তাঁকে জানাই। ফক্স আমাকে বলেন, আমি তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু এবং বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের কোন অধিকার নাই তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার। তিনি আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে যান এবং তাঁর অতিথি হবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। যাহোক, বহুকষ্টে তাঁকে বুঝিয়ে আমি সন্ধা বেলায় তাঁর বাসা থেকে হোটেলে উঠে আসি। টি, ভি, তে আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এছাড়া আমি পার্লামেন্ট ভবনে গিয়ে সংসদ সদস্যদের সাথে দেখা করি এবং আমাদের বক্তব্য প্রচার করি।

বিশ্ব শান্তি পরিষদের সদর দফতর এখানে অবস্থিত এবং এর সাধারণ সম্পাদক রমেশ চন্দ্রের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি জানান যে, তাঁর সংগঠন বাংলাদেশের পক্ষে সর্বাত্মকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরপর আমি লন্ডনে ফিরে আসি।

প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলনের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আমি একটি বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই। সেপ্টেম্বর মাসের কোন একদিন লন্ডনে এ্যনথনি মেসকারেনহাস রচিত "রেইপ অফ বাংলাদেশ" বইটির প্রকাশনা উৎসবে আমি উপস্থিত হই। তার পরদিন ভারতের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর লন্ডনে উপস্থিত হবার কথা। এই সভায় একজন ভারতীয় সাংবাদিক আমাকে জিজ্ঞেস করেন ভারতের প্রধান মন্ত্রীর সংগে আমি সাক্ষাৎ করবো কিনা। আমি তাঁকে জানাই যে, আমি প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য কোন সময় চাই নি।

* The Deputy High Commissioner of India in London rang up in the morning and told me that the Indian Prime Minister Mrs. India Gandhi would meet the British Prime Minister Mr. Edward Heath in the afternoon at his official residence at Chequers. She would therefore like to have a meeting with me before that She wanted to know the attitude of the countries I visited recently In response to the request, I arrived at Claridges Hotel at 11 A M It so happened that the Officer of the Scotland Yard who met me at Claridges saw me more than once

* বিচারপতি চৌধুরী তাঁর সাক্ষাৎকারের এই অংশটি নিজেই ইংরেজীতে যেভাবে লিখে দিয়েছেন ঠিক সেভাবেই মুদ্রিত হল।

about my security. I was at once taken by the Dy. High commissioner to the drawing room of Mrs. Gandhi's suite. Mrs. Gandhi came in a minute's time. This was my first meeting with her. * After she exchanged the greetings, she asked me about the reaction in the countries I visited recently about the demand for independence of Bangladesh. To that I told her that I received assurances of support from the peoples and the Govt. Of these countries for our independence movement but to my request for recognition by the governments of those countries the uniform answer was that even the neighbouring country of India did not recognize our govt. That would show that even India does not consider that our government was really an effective government. I told her that was a disappointing situation. Then I also said that althouh we felt very grateful to the people of India for giving shelter to those who had left Bangladesh, we really expected recognition of that governmet. I said "I really did not know if pundit Jawaharlal Nehru could have remained satisfied by giving shelter only to the people who went over to India" Mrs. Gandhi said that although she did not give formal recognition, she was giving all facilities to the provissional government to function. Formal announcement would create certain serious situation Pakistan would never take it quietly. She said they would attack India. It is true that Pakistan would ultimately be defeated but we have developed infrastructure of industries throughout the country. By initial air bombing they might be able to destroy all our years of struggle in this field. Therefore although we have decided to help Bangladesh on humanitariar ground, my primary responsibilities is to the people of India as their Prime Minister have also to be borne in mind. I have therefore tried to do both and give recognition to Bangladesh at an approprite time.

I told her of course that we have nothing to offer except friendship on the basis of sovereign equality.

Referring to friendship of Bangladesh with India she said that it should be left to the people of Bangladesh to decide after the independence. As far as she was concerned her only expectation was that a democracy would be functioning in a neighbouring country.

এর পর আমি অস্ত্র পাঠানোর জন্য আমাদের অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে কথা উঠাই। আমি বলি যে, আমরা টাকা সংগ্রহ করলেও অস্ত্র কিনতে পারছি না। ভারত যদি কিনে পাঠাবার ব্যবস্থা করে তবে আমরা টাকাটা তাদের হাতে দিতে পারি। মিসেস গান্ধী তখন আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমরা কত টাকা সংগ্রহ

* I met her second time at Dhaka after independence.

করেছি। আমি উত্তর দিই প্রায় চার লক্ষ পাউণ্ড। তিনি বলেন যে, একটি মুক্তিযুদ্ধে যে পরিমাণ অস্ত্রের দরকার সে পরিমাণ অস্ত্র এই টাকায় কেনা সম্ভব নয়। এছাড়া অনির্দ্ধারিতভাবে অস্ত্র পৌঁছালে তা বিরোধী শক্তির হাতেও পড়তে পারে। মুজিব নগর সরকারের সাথে তিনি যোগাযোগ করছেন এবং তাদের মাধ্যমে অস্ত্র বিতরণ করছেন। বিচ্ছিন্নভাবে অস্ত্র পৌঁছালে আইনগত সমস্যাও দেখা দিতে পারে। তিনি আমাকে বলেন যে, এই বৈদেশিক মুদ্রা পরবর্তীকালে একটি স্বাধীন দেশের জন্য খুবই প্রয়োজনে আসবে। আমি তাঁকে জানাই যে, বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর আমাকে বলেছে, একজন বিচারক হিসেবে নিশ্চয়ই অস্ত্র পাঠাবার সাথে জড়িত হবো না এই আশ্বাস তার পাকিস্তান সরকারকে দিয়েছেন। এটি এক ধরণের চাপ। অতএব কোন কিছু করতে হলে ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমেই করতে হবে। আমার এই কথা শুনে মিসেস গান্ধী উঠে পাশের কক্ষে যান এবং পাশের কক্ষ থেকে ভারতীয় হাই কমিশনারকে নিয়ে আসেন। তিনি হাইকমিশনারকে বলেন যে, বিচারপতি চৌধুরী যা পাঠাতে চান, অস্ত্রই হোক বা অন্য কিছু হোক, তিনি যেন তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা করেন। এর পর তিনি বাংলাদেশ আন্দোলনের শুভ কামনা করে আমাদের সাক্ষাৎকারের ইতি টানেন।

কয়েকদিন পরেই মুজিব নগর সরকারের তরফ থেকে টেলিগ্রাম আসে যে, আসন্ন জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে আমাকে নিউইয়র্ক যেতে হবে। ষোলজন সদস্যের একটি দল নির্বাচিত হয়। এঁরা হলেন (১) আব্দুস সামাদ আজাদ (২) ফণিভূষন মজুমদার (৩) এম, আর সিদ্দিকী (৪) সৈয়দ আব্দুস সুলতান (৫) ডঃ মফিজ চৌধুরী (৬) প্রফেসার মোজাফফর আহমেদ (ন্যাপ) (৭) ফকির শাহাবুদ্দীন (৮) এ্যাডভোকেট সিরাজুল হক (৯) ডঃ এ, আর, মল্লিক (১০) খুররম খান পন্নী (১১) এস, এ, করিম (১২) আব্দুল মুহিত (১৩) রেহমান সোবহান (১৪) মাহমুদ আলী (১৫) আবুল ফাতেহ। আমরা বেলমন প্লাজা নামে একটি সাধারণ হোটেলে আমাদের অফিস স্থাপন করি এবং বিভিন্ন দেশের সদস্যদের সাথে বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য প্রচার করতে থাকি। আমার বিশ্বাস আমরা প্রায় সবগুলো দেশের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হই। এছাড়া আমরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের প্রচার কাজ চালাতে থাকি। আমি হারভার্ড, এম, আই, টি, ইয়েল, কলাম্বিয়া, নিউইয়র্ক সিটি এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষকদের কাছে বক্তৃতা করি। শত শত শিক্ষক ও ছাত্রদের সমাবেশে বক্তৃতা করি। প্রতিটি শ্রোতা ছিলেন আমাদের পক্ষে। এ সময় আমাকে সাহায্য করতেন কাজী রেজাউল হাসান। তিনি ইঞ্জিনিয়ার। তিনি অনেকগুলি ওয়াকি টকি পাঠান মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার জন্য। আমরা হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি হিসেবে বোস্টনে ছিলাম। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রধান ইথিয়েল ডি সোলাপুল একটি ভোজসভার আয়োজন করেন যেখানে প্রায় ২৫ জন অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। এই অধ্যাপকগণ ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী যেহেতু

আমেরিকার স্টেইট ডিপার্টমেন্টের পরামর্শদাতা হিসেবে সকলেই কার্যরত ছিলেন। তাঁরা নিজেরাও আগ্রহী ছিলেন যেহেতু সরাসরিভাবে বাংলাদেশের অবস্থা জানার এটি একটি সুযোগ ছিল। হারভার্ড ল-স্কুলে আমি একটি বক্তৃতা দিই। আমি বলি যে, বাংলাদেশ স্বাধীন, কেবলমাত্র স্বীকৃতির অপেক্ষাই রয়েছে। এম, আই, টি অডিটোরিয়ামে আমি প্রায় দেড়ঘন্টা বক্তৃতা দিই এবং আমাদের পক্ষে তুমুল জনমতের লক্ষণ দেখতে পাই। আমি বারবার বলি যে, আমি ব্যক্তিগতভাবে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি নই। কিন্তু আমার জন্মভূমির উপর যা ঘটছে তারপর আমার পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব নয়। একটি আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন জাতি হিসেবে স্বাধীনতা ঘোষণা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় ছিল না। আমার পক্ষে একটি বড় সুবিধা ছিল যে, আমি যখন বাংলাদেশের পক্ষে আমার আনুগত্য প্রকাশ করি তখন আমি ছিলাম একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। অতএব তারা আমাকে সেইভাবে সম্মান দেখায়।

নিউইয়র্কে ফিরে এসে আবার লবিং-এ আমরা ব্যস্ত হই। এ সময় বাংলাদেশ সীমান্তে পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে মিত্র বাহিনীর যুদ্ধ শুরু হয়। পাকিস্তান যুদ্ধ বিরতির জন্য প্রচার চালায়। আমরা বাধা দেই। আমরা বলি একটি নির্যাতিত জাতি যখন জয় লাভ করতে যাচ্ছে তখন বিরতি অসম্ভব। কিন্তু আজ যখন দেশ শত্রুমুক্ত হতে যাচ্ছে তখন যুদ্ধবিরতির প্রশ্ন ওঠে কেন? আমি নিউইয়র্কের জাতিসংঘের দফতরে রয়টার অফিসে বেশীরভাগ সময় থাকতাম। যেহেতু অবস্থা সম্পর্কিত শেষ খবর ওখানেই পাওয়া যেতো। এমন সময় ১৬ই ডিসেম্বর টেলেক্স দেখলাম, খবর এল যে, নিয়াজী আত্মসমর্পণ করেছে। ঢাকা মুক্ত। বাংলাদেশ স্বাধীন। এই খবর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। আমি ধীর চিত্তে, শান্ত মনে এই সংবাদ গ্রহণ করলাম এবং পরম করুণাময় আল্লাহর হাজার শুকরিয়া আদায় করলাম।

—আবু সাঈদ চৌধুরী
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪।

ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম

১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বংগবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ উভয় পরিষদে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন একটি দলের পক্ষে এত বেশী আসন লাভ করার নজির ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। নির্বাচনে বাংলার মানুষ আওয়ামী লীগের ৬ দফার পক্ষে সম্পূর্ণভাবে তাদের রায় ঘোষণা করেন।

নির্বাচনের পর '৭১ সালের ৩রা জানুয়ারী ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জন সমুদ্রে বংগবন্ধু ঘোষণা করেন আওয়ামী লীগের কেউ বেঈমানী করলে জ্যান্ত কবর দেবেন। জনসভার প্রারম্ভে বংগবন্ধু নব-নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের শপথ গ্রহণ করান। এই ধরণের গণ শপথ পৃথিবীর ইতিহাসে ব্যতিক্রমী ঘটনা। এর কিছু দিন পর নির্বাচনপূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শাসনতন্ত্র রচনার জন্য আওয়ামী লীগ সংসদীয় দল একটি সাব কমিটি গঠন করে। দলের নির্দেশ অনুযায়ী সাব-কমিটি শাসনতন্ত্র রচনার কাজ শুরু করে। ২৭শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনার উদ্দেশ্যে এক বিরাট প্রতিনিধি দল নিয়ে ঢাকায় আসেন। নির্বাচনের পর পর ভুট্টো ৬ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার বিরোধিতা শুরু করেন। আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় আসার জন্য আলোচনার দরজা বংগবন্ধু খোলা রাখেন। ভুট্টো ও তার প্রতিনিধিদলের সাথে সর্বপ্রকার যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের হুইপ হিসেবে বংগবন্ধু আমার ওপর অর্পণ করেন। ভুট্টো ও তার প্রতিনিধিদলকে যথেষ্ঠ সম্মান ও সৌজন্য দেখানো হয়। ভুট্টো বংগবন্ধু এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে কয়েক দফা বৈঠকে মিলিত হন। আমাদের দলের কয়েক জন নেতা এবং ভুট্টোর প্রতিনিধি দলের সদস্যরা একদিন নৌপথে লঞ্চের মধ্যে এক বৈঠক মিলিত হন।

ভুট্টোর কয়েকজন বিশিষ্ট সহকারীর সাথে আমার আলোচনা হয়। এদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় সহকারী ব্যারিস্টার কামাল আছফার আমার সার্কিট হাউস রোডের বাসভবনে আমার সাথে দেখা করেন। ভুট্টোর দলের নেতাদের সাথে আলোচনার পর একটা জিনিস বুঝতে পারি। তারা ইতিমধ্যেই ধরে নিয়েছে যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাবে। ভুট্টো ও তার সহযোগীদের অনমনীয় মনোভাব থেকে এটা স্পষ্ট বুঝা গিয়েছিল। বংগবন্ধুর বাসভবনে আলোচনার পূর্বে ও পরে ভুট্টোকে ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেল থেকে আনা নেয়ার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। এক দিন আলোচনার পর ভুট্টোকে নিয়ে গাড়ীতে করে যখন হোটেলে যাচ্ছিলাম, তখন তাকে ভীষণ গম্ভীর দেখি। আমি গাড়ীতেই ভুট্টোকে বলি আমাদের এমন একটি শাসনতন্ত্র রচনা করা উচিত যাতে বাংলাদেশের এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী সাধারণ মানুষের আশা আকাংখার প্রতিফলন ঘটবে। আর তা যদি না করা হয় তাহলে সামরিক শাসনের বেড়াজাল থেকে পাকিস্তান কোন দিন মুক্তি পাবে না। আমার কথায় প্রচ্ছন্ন এই ইঙ্গিত ছিল যে, শাসনতন্ত্র রচনায় আমাদের সাথে সহযোগিতা না করলে ভুট্টোর কোন লাভ হবে না। বরং সামরিক জান্তারই বেশী সুবিধা হবে। আমার কথার জবাবে ভুট্টো একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করেন। তিনি বলেন, 'ডোন্ট ফরগেট আমিরুল ইসলাম, দ্যাট আই গট লারজেস্ট নাম্বার অব ভোটস ইনদি ক্যানটনমেন্ট'। এই একটি কথায় বুঝে নিতে আমার জন্য যথেষ্ঠ ছিল যে, পাকিস্তানের সামরিক জান্তার সাথে ভুট্টোর কি সম্পর্ক রয়েছে। অন্যান্য দিনের মত

ভুট্টো সেদিন হোটেলে না গিয়ে তখনকার গভর্ণর হাউসে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি তাকে সেখানে নামিয়ে দেয়ার সময় দেখলাম, সিড়ির নীচে গভর্ণরের এ ডি সি ভুট্টোর জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি ভুট্টোকে বলেন জেনারেল আকবর ফোনে তার জন্য অপেক্ষা করছেন।

আমার মনে হয় এ দুটো ঘটনা আলোচনার ভবিষ্যতকে সন্দিহান করে তোলে। ফিরে এসে আমি বংগবন্ধুকে এই ঘটনা জানাই। ৩১শে জানুয়ারী ভুট্টো সদলবলে ঢাকা ত্যাগ করেন। যাবার কালে ভুট্টো বলে যান আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শাসনতন্ত্র তৈরী করা হবে। কিন্তু করাচী ফিরে ভুট্টোর সুর বদলে যায়। তিনি বলতে থাকেন সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দেয়ার এখতিয়ার আওয়ামী লীগের নেই। আসন্ন গণ পরিষদের অধিবেশনে তিনি নিজেও যোগ দেবেন না এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অন্য কাউকে যোগ দিতে দেবেন না। পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে তিনি জেনারেলদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। বিভিন্ন ঘটনাবলী থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পাকিস্তান সামরিক জান্তার জেনারেলদের ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন সদিচ্ছা নেই। কেন না তারা বুঝতে পারে জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলে সামরিক জান্তার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। আর এই প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে জেনারেলদের সাথে গোপনে ভুট্টোও হাত মিলান।

ফেব্রুয়ারী মাসে আমাদের দ্বিতীয় দফা ও শেষ প্রচেস্টা ছিল পাকিস্তানের জন্য একটি শাসনতন্ত্র রচনা। পহেলা মার্চ সকালে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে শাসনতন্ত্র রচনাকারী কমিটির পক্ষ থেকে খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ করা হয় এই বৈঠকে পাঞ্জাবের মালিক সরফরাজ সহ পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েক জন নেতা উপস্থিত ছিলেন। আমাদের প্রণীত খসড়া শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন লাভ করে। এই ব্যাপারে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের দায়িত্ব বংগবন্ধু সংসদীয় দলের ওপর ন্যাস্ত করেন।

সকালের বৈঠকের পর হোটেল পূর্বাণীতে বিকেলের বৈঠকের স্থান ধার্য করা হয়। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সময় বেলা ১টা ৫মিনিটে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান বেতারে প্রচারিত এক বিবৃতিতে ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিস্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। বাংলার মানুষকে বিক্ষুব্ধ করার জন্য এই একটি ঘোষণাই যথেষ্ঠ ছিল। ঢাকা শহরের সকল শ্রেণীর মানুষ এই ঘোষণার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসে। জনতার জোয়ারে ভেসে যায় ঢাকার প্রতিটি অলিগলি রাজপথ। মিছিলকারী জনতার হাতে ছিল বিভিন্ন ধরণের লাঠি ও লোহার রড। জনতার মুখে একটি শ্লোগানই শোনা যায় 'বীর বাঙালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশকে স্বাধীন কর'। '৬ দফা', না এক দফা, এক দফা এক দফা'। সারা শহর থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল পল্টন ময়দানে এসে জমায়েত

হয়। পল্টনের সভায় বক্তৃতা করেন তোফায়েল আহমেদ, নূরে আলম সিদ্দিকী আ, স, ম, আবদুর রব, শাহজাহান সিরাজ, আবদুল কুদ্দুস মাখন, আবদুল মান্নান প্রমুখ। এই সভায় ডঃ কামাল হোসেন ও আমি উপস্থিত ছিলাম। জনতা সেই মুহূর্তে বংগবন্ধুর উপস্থিতি কামনা করছিল। আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের বৈঠক উপলক্ষ্যে বংগবন্ধু ও সংসদ সদস্যরা হোটেল পূর্বাণীতে উপস্থিত হয়েছেন।

বেলা সাড়ে চারটায় হোটেলে আয়োজিত এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে বংগবন্ধু অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, আমরা যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে প্রস্তুত। অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদে বংগবন্ধু ২রা মার্চ ঢাকায় এবং ৩রা মার্চ সারাদেশে পূর্ণ হরতাল পালনের আহবান জানান। তিনি বলেন আগামী ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় তিনি ভবিষ্যত কর্মসূচী ঘোষণা করবেন। শেখ সাহেব সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা কালে হোটেল প্রাঙ্গনে হাজার হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের পক্ষ থেকে ভবিষ্যত কর্মসূচী গ্রহণের জন্য বংগবন্ধুকে সর্বময় ক্ষমতা দেয়া হয়। তাঁর সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য হবে। ২রা মার্চ থেকে সারাদেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। নীতি নির্ধারণী বিষয়াদি ঠিক করার জন্য প্রতিদিন এই বৈঠক বসে। বংগবন্ধু, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম, মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমেদ, তাজউদ্দিন আহমদ এবং এ, এইচ কামরুজ্জামানকে নিয়ে দলীয় হাই কম্যাণ্ড গঠন করা হয়। তাজউদ্দিন আহমদকে কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়। তাঁকে সহায্য করার জন্য ডঃ কামাল হোসেন এবং আমাকে বলা হয়। কেন্দ্রীয় সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে সংগ্রাম কমিটি গঠনের জন্য সকল জেলা, মহকুমা ও থানাকে নির্দেশ দেয়া হয়। আমার দায়িত্ব ছিল প্রতিদিন সন্ধ্যায় সকল জেলার সংগ্রাম পরিষদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা। তাছাড়া ঢাকা শহরের বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার দায়িত্বও আমার ওপর ছিল। ব্যাংক কর্মচারী, ডাক, তার, টেলিফোন বিভাগের কর্মচারীদের সাথে আমরা যোগাযোগ করি। তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে ডঃ কামাল হোসেন ও আমি প্রতিদিন সন্ধ্যায় বৈঠকে বসে আন্দোলনের কর্মসূচী তৈরী করি। এসব বৈঠক কখনও বংগবন্ধুর বাসভবনে আবার কখনও ডঃ কামালের চেম্বারে অনুষ্ঠিত হত। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি ছিল তাজউদ্দিন আহমদের। মাঝে মধ্যে ব্যাংকের পদস্থ কর্মকর্তা বৈঠকে উপস্থিত থাকতেন। টেলিফোন বিভাগের একজন বড় অফিসার নুরুল হক সাহেব তখন খুবই সহযোগিতা করেন। তাঁকে পাক বাহিনী ২৫শে মার্চের রাতে হত্যা করে।

পশ্চিম পাকিস্তানে সকল প্রকার টেলেক্স, তার বন্ধ করে দেয়া হয়। শুধু মাত্র বিদেশী সাংবাদিকদের জন্য নির্দিস্ট কথায় টেলেক্স সুবিধা দেয়া হয়। প্রতিদিন সন্ধার পর আমরা তিনজন উদ্ভূত অবস্থার প্রেক্ষিতে একটা খসড়া তৈরী

করে রাত আটটার দিকে বংগবন্ধুর সাথে দেখা করতাম। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হলে বংগবন্ধু তার সমাধান করে দিতেন। এর পর সংবাদ পত্রে যা দেয়ার তা দিয়ে দেয়া হত। নতুন কোন সিদ্ধান্ত থাকলে জেলা সংগ্রাম কমিটিকে জানিয়ে দেয়া হত। সে সময় চট্টগ্রাম এবং খুলনা আন্দোলনের জন্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চট্টগ্রাম থেকে আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমেদ চৌধুরী, এম আর সিদ্দিকী, এম, এ, হান্নান, আবদুল হান্নান প্রমুখ এবং খুলনা থেকে শেখ আবদুল আজিজ আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। ঢাকা শহরের আওয়ামী স্বেচ্ছা সেবক বাহিনীকে সর্বদা সতর্ক রাখা হয়। তাছাড়া জনগণের সুবিধার্থে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়।

বংগবন্ধুর বাসভবনের লাইব্রেরী কক্ষটিকে অফিস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সকাল থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত বংগবন্ধু এখানে থাকতেন। তাজউদ্দিন আহমদ এবং ডঃ কামাল হোসেন নীতি নির্ধারণী হাই কম্যাণ্ডের বৈঠকে প্রায়ই ব্যস্ত থাকতেন বলে অফিসের দায়িত্ব বেশীর ভাগ সময় আমাকে পালন করতে হত। প্রতিদিন বিভিন্ন ধরণের লোক নানা সমস্যা নিয়ে এখানে ছুটে আসতেন। সারা দিন ধরে বাজত টেলিফোন। এগুলির সঠিক সমাধানের দায়িত্ব ছিল কন্ট্রোল রুমের। বাসভবনের নীচের কক্ষটিতে টেলিফোন ও কাগজ পত্র নিয়ে আমরা কাজ করতাম। হাই কম্যাণ্ডের অধিকাংশ বৈঠক হত বংগবন্ধুর কক্ষে। বাড়ীর প্রাঙ্গনে সর্বদাই থাকত অগণিত উৎফুল্ল জনতার এবং সাংবাদিকদের ভিড়।

বঙ্গবন্ধুর ১লা মার্চের আহবানে ২রা মার্চ থেকে সারা দেশে অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ৩রা মার্চ ছাত্র লীগ আয়োজিত পল্টনের বিরাট জনসভায় বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতায় দেশের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত খাজনা ট্যাক্স বন্ধ রাখার আহবান জানান। বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করা হয়। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই সঙ্গীতকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তাছাড়া সেদিনের সভা মঞ্চে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকাও দেখা যায়। ৬ই মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পুনরায় ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করেন। বাংলার মাঠে ঘাটে, হাটে বাজারে সর্বত্র আন্দোলন দানা বেধে উঠে। এদিকে বিভিন্ন স্থানে সামরিক জান্তার গুলীতে বেশ কিছু লোক হতাহত হয়।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলতে থাকে। বঙ্গবন্ধু ১লা মার্চ নিজেই বলেছেন ৭ই মার্চে রেসকোর্সের জনসভায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী ঘোষণা করবেন। বিভিন্ন দেশ থেকে বহু সাংবাদিক বাংলাদেশে আসেন। ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর ৬৭৭ নম্বর বাড়ী সংগ্রামের সূতিকাগারে পরিণত হয়। সকালে বিকালে দেশী বিদেশী সাংবাদিক এই বাড়ীতে এসে ভীড় জমান। তারা

সুযোগ পেলেই বঙ্গবন্ধুর নিকট থেকে বিভিন্নভাবে আন্দোলন ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্পর্কে জানতে চান।

আর পাক বাহিনীও সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে। শোনা যায়, রেসকোর্সের জনসভাকে লক্ষ্য করে ঢাকা সেনানিবাসে কামান বসানো হয়। শেখ মুজিব যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তাহলে জনসভায় গোলা বর্ষণ করা হবে।

ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করলাম বঙ্গবন্ধু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছেন। সারা দেশের মানুষের প্রাণঢালা ভালবাসা ও সমর্থন তাঁকে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলেছে। তখন তাঁর প্রতিটি কথাই ছিল বাঙ্গালীর মনের কথা।

বঙ্গবন্ধুর মনের কথা তাজউদ্দিন আহমদের জানা ছিল। বঙ্গবন্ধুর ইঙ্গিতই তাঁর জন্য যথেষ্ট ছিল। বিভিন্ন সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যের খসড়া আমরা রচনা করে দিতাম। নেতার নির্দেশ অনুযায়ী তা করা হত। তাজউদ্দিন আহমদ মুষ্ঠিবদ্ধ হাত মুখে রেখে কান পেতে কথা শুনতেন। একজন নিখুঁত শিল্পীর মত আমাদের রচিত খসড়াগুলো তিনি শুনতেন। এরপর তিনি বক্তব্যের খসড়া বঙ্গবন্ধুর কাছে নিয়ে যেতেন। আমাদের রচিত খসড়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বঙ্গবন্ধুর পছন্দ হতো। কোন কোন সময় তিনি কিছু পরিবর্তন করতেন। ৭ই মার্চের বক্তৃতা সম্পর্কে আওয়ামী লীগের বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনা হয়। আলোচনার পর বক্তব্যের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুকে সর্বময় ক্ষমতা দেয় হয়। বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে খসড়া বক্তব্য লেখার জন্য নির্দেশ দেন। ৭ই মার্চ অপরাহ্নে বঙ্গবন্ধুর পায়ের কাছে বসে রেসকোর্স ময়দানে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর বক্তব্য শুনছিলাম। তিনি সেদিন তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতির পথ নির্দেশ করেন। বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ, ভাষা ও ভঙ্গির মধ্যে তিনি একটি ইতিহাস আবৃত্তি করেন। তিনি বাঙ্গালী জাতির দীর্ঘ দিনের ক্ষোভ নির্যাতন ও নিষ্পেষণের কথা উল্লেখ করেন, বাঙ্গালী জাতিকে মরণপণ যুদ্ধের প্রস্তুতির আহ্বান জানান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাতিকে স্বাধীনতা ও মুক্তির বাণী শোনান। বক্তৃতা এক দিকে ছিল যেমন আবেগময়ী অপরদিকে ছিল নির্ভুল যুক্তি ও গভীর আত্মপ্রত্যয়ী।

প্রকৃতপক্ষে পহেলা মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাংলাদেশ পরিচালিত হয়। বক্তৃতার পর বঙ্গবন্ধু বলেন আমি স্বাধীনতা ঘোষণা করে আমার দায়িত্ব পালন করেছি। এখন দেশবাসীর দায়িত্ব হল হানাদার বাহিনীকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা। বাংলার মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তি পাগল মানুষ সে দায়িত্ব পালন করেছে একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর।

কেউ কেউ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের বক্তৃতাকে আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গ বক্তৃতার সাথে তুলনা করেন। বঙ্গবন্ধু জীবনে ৭ই মার্চের আগে ও পরে অসংখ্য বক্তৃতা করে গেছেন। ৭ই মার্চের বক্তৃতার সাথে তাঁর অন্য কোন বক্তৃতার তুলনা হয় কি? মুক্তিযুদ্ধকালে ৭ই মার্চের বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযোদ্ধারা

মরণ পণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাই আমি মনে করি, ৭ই মার্চের বক্তৃতা এক অনন্য বক্তৃতা, যার সাথে পৃথিবীর অন্য কোন বক্তৃতারই তুলনা চলেনা। তাই বাঙ্গালী জাতি যতদিন বিশ্বের বুকে বেঁচে থাকবে ততদিনই এই বক্তৃতার দ্বারা আলোড়িত হবে। বাঙ্গালী জাতির জীবনে এই বক্তৃতা অক্ষয় ও অম্লান হয়ে থাকবে।

৭ই মার্চের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু আন্দোলনের নয়া কর্মসূচী ঘোষণা করেন। দেশের সর্বত্র শহরে বন্দরে নগরে গ্রামে গঞ্জে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে জনসভা, বিক্ষোভ মিছিল ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ১৫ই মার্চ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দলের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ ৩৫টি নির্দেশ জারী করেন। এই নির্দেশের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সর্বময় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৭ই মার্চ ছিল বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। এদিন সকালে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের এক বৈঠক ডাকেন। বৈঠকে বঙ্গবন্ধু উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মতামত ব্যক্ত করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। বৈঠকে উপস্থিত দুই-একজন ছাড়া সকলেই এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে পাক সশস্ত্র বাহিনীর মোকাবেলা সশস্ত্রভাবেই করতে হবে। এই বৈঠকে অন্য একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সেটা হল এই পরিস্থিতিতে আমরা বিদেশের কাছ থেকে কিরকম সাড়া বা সাহায্য পেতে পারি।

আমি এ বৈঠকে আমার বক্তব্য তুলে ধরি। চার্চিলের 'উই আর এলোন অন দি ব্রিজ' এই উদ্ধৃতি দিয়েই বক্তৃতা শুরু করি। বাংলাদেশের আন্দোলন সম্পর্কে বিদেশের সাথে আমাদের যোগাযোগ ছিল না। সত্তরের ১২ই নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ের পর বাংলাদেশের মানুষের প্রতি বিশ্ববাসীর সমর্থন বাড়তে থাকে। এরপর জাতীয় সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নিরংকুশ বিজয় সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরপর ঐতিহাসিক আন্দোলনের খবর বহির্বিশ্বের পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু বিদেশের কোন সরকার বা উচ্চ পর্যায়ের লবির সাথে আমাদের কোন যোগাযোগ ছিল না। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে তুলনায় আমাদের বলতে গেলে কোন যোগাযোগই ছিল না।

আমার বক্তৃতার পর তাজউদ্দিন আহমদ বক্তৃতা করেন। তিনি আমার বক্তব্য সমর্থন করে কর্তব্য সম্পর্কে ইঙ্গিত দেন। তিনি বংগবন্ধুর নেতৃত্ব ও জনগণের ঐক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাজউদ্দিন আহমদ বলেন সম্মুখ যুদ্ধে পাকিস্তানের সাথে মোকাবেলা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সংগ্রামকে গণভিত্তিক সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত করতে হবে। সভাপতির ভাষণে বংগবন্ধু সশস্ত্র যুদ্ধের মোকাবেলায় সকলকে প্রস্তুত থাকার ইঙ্গিত দেন।

এদিকে ঢাকায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও তার সহকর্মীদের সাথে বংগবন্ধু ও তাঁর সহকর্মীদের আলোচনা অব্যাহত থাকে। ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে স্বাধীন

বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে প্রতিরোধ দিবস পালন করা হয়। ঐদিন বংগবন্ধুর বাস ভবনসহ বাংলাদেশের সর্বত্র স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

ঐ দিন সন্ধ্যায় বংগবন্ধুর পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্টের কাছে শাসনতন্ত্রের একটি খসড়া পেশ করা হয়। এই খসড়াটির মূল অংশগুলো মেনে নেয়া হবে প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে এ ধরণের একটা ধারণা দেয়া হয়। চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবার কথা পরবর্তী বৈঠকে। ২৪শে মার্চ প্রেসিডেন্টের পক্ষ নীরব থাকে এবং সামরিক বাহিনী দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্যাতন শুরু করে। ইতিমধ্যে আমরা খবর পেয়ে গেছি যে প্রত্যহ বিমানে করে পাকিস্তান থেকে সৈন্য আনা হচ্ছে।

চট্টগ্রাম থেকে আমরা খবর পেলাম পশ্চিম পাকিস্তান থেকে 'সোয়াত' জাহাজে করে অস্ত্র এসেছে। বংগবন্ধু হাজী গোলাম মোর্শেদের মাধ্যমে চট্টগ্রামে মেজর জিয়ার কাছে একটি নির্দেশ প্রেরণ করেন। খবরটি ছিল সোয়াত জাহাজ থেকে যেন অস্ত্র নামাতে না দেয়া হয়। এ ব্যাপারে মেজর জিয়া কোন সক্রিয় ভূমিকা পালন না করায় পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ করা হয়নি।

২৩শে মার্চ সকালে ঢাকা থেকে সকল জেলা সদরে আওয়ামী লীগ সংগ্রাম কমিটির কাছে একটি নির্দেশ প্রেরণ করা হয়। নির্দেশে বলা হয়, যে কোন সময় পাক বাহিনী আমাদের ওপর হামলা চালাতে পারে। পাল্টা আঘাত হানার জন্য সকলকে প্রস্তুত থাকতে হবে। বাংলাদেশের পতাকা ইতিমধ্যেই দেশের সর্বত্র তৈরী হয়ে গেছে।

২৪শে মার্চ বিকেল থেকেই বংগবন্ধু সকলকে ঢাকা ছেড়ে যাবার নির্দেশ দেন। বংগবন্ধু তাঁর পেছনের ঘরে প্রায় প্রত্যেকের সাথে এক মিনিট করে কথা বলেন। অনেক সময় ভিড়ের মধ্যে বাথরুমেও কারো কারো সাথে তিনি কথা বলেন।

২৫শে মার্চ তারিখেও এ ধরণের শলাপরামর্শ চলে। বংগবন্ধু একে একে সকলকে বিদায় দিচ্ছেন। বিকেল থেকেই যেন ৩২ নম্বরের বাড়ীতে থমথমে ভাব বিরাজ করতে থাকে। বিকেল প্রায় ৪টা আমার বন্ধু তৎকালীন ইউনাইটেড ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব রিজভী বংগবন্ধুর বাসায় এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন কথা বলার সময় আছে কিনা। সময় থাকলে তার সাথে চা খেতে যাওয়ার আমন্ত্রন জানান। রিজভীর বাসা বংগবন্ধুর বাড়ী থেকে ২০০ গজ দূরে। আমি রিজভীর সাথে তার বাসায় গেলাম। রিজভী আমাকে বলেন, অস্বাভাবিক একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। এদেশ বসবাসের কোন যোগ্য থাকবে না। তিনি এখনই স্ত্রী পুত্র নিয়ে সেনানিবাসে তার ভগ্নিপতির বাসায় চলে যাচ্ছেন। রিজভী তার পাঠান দারোয়ানের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, আমি কোন সময় গেলে যেন আমাকে থাকার আশ্রয় দেয়া হয়। তিনি বলেন, ইচ্ছা

করলে আমি তার বাড়ী ব্যবহার করতে পারি। পেছনের একটি দরজা দেখিয়ে বলেন, বিপদের সময় পলায়নের রাস্তা রয়েছে। পরে জেনেছিলাম শহিদুল্লাহ্ কায়সার কিছুদিন এই বাড়ীতে ছিলেন।

বংগবন্ধুর বাসায় ফিরে এসে তাড়াতাড়ি হাতের কাজ গুলো শেষ করি। রিজভীর কাছে শোনা বক্তব্য এক ফাঁকে বংগবন্ধুকে জানাই। বংগবন্ধু শুনে গম্ভীর হয়ে যান। এর ক'দিন পূর্বে এরকম একটি আত্মগোপনের কথা নিয়ে আমরা বংগবন্ধুর সাথে আলোচনা করি। আমরা বংগবন্ধুকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আত্মগোপনের জন্য চাপ দেই। তিনি আত্মগোপন করতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন। তাজউদ্দিন আহমদ বলেন, আত্মগোপনের জন্য তিনি পূর্ব থেকেই বংগবন্ধুকে বলে আসছেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না।

বংগবন্ধু একদিন তাঁর বেড রুমে হাইকম্যাণ্ডের বৈঠকের সময় তাজউদ্দিন আহমদ ও আমাকে ডাকেন। আমি আমার সহ হুইপ আবদুল মান্নানকে নিয়ে সেখানে যাই। বৈঠকে আত্মগোপনের জন্য আমরা সকলে মিলে বংগবন্ধুকে চাপ দেই। তিনি প্রশ্ন করেন, আমাকে নিয়ে তোরা কোথায় রাখবি? বাংলাদেশে আত্মগোপন সম্ভব নয়। আমার হয়তো মৃত্যু হবে, কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই।

২৫শে মার্চ বিকেলে আমার আবার ইচ্ছা হলো আত্মগোপন করার জন্য বংগবন্ধুকে অনুরোধ জানাই। মনে মনে ঠিক করলাম, তাজউদ্দিন আহমদ ও ডঃ কামাল হোসেন আসলে সকলে মিলে বংগবন্ধুকে পুনরায় শেষ অনুরোধ জানাবো। তাঁরা দু'জন অন্য কাজে বাইরে ছিলেন। আমি জাতির উদ্দেশে বংগবন্ধুর শেষ বক্তব্যের খসড়া তৈরী করতে ব্যস্ত। আমার খসড়াপ্রস্তুত হলো। বংগবন্ধু একটু দেখে ঠিক করে দেন। রাত সাড়ে আটটার দিকে বংগবন্ধু সাংবাদিকদের সামনে পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

আমি বঙ্গবন্ধুর বাসা থেকে বেরিয়ে পাশে বদরুন্নেছা আহমদের বাসায় খোঁজ নিতে যাই। নুরুদ্দিন ভাই বলেন, সেনানিবাস থেকে শীগগীরই ট্যাংক বেরিয়ে আসবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো জনতার ওপর আক্রমণ শুরু হবে। আমি বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে ফিরে এসে দেখি তিনি ওপরে চলে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর বাসা থেকে আবার বেরিয়ে আসি। আমি এখনো আশা করছি তাজউদ্দিন আহমদ ও কামাল হোসেনকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে শেষ আলোচনা করবো। তাজউদ্দিন ভাই এর বাড়ীতে গিয়ে দেখি নুরজাহান মোর্শেদ এম, পি বসে আছেন। বাড়ীর ভেতরে তাজউদ্দিন ভাই জোরে জোরে ভাবীর সাথে কথা বলছেন। কথা শুনে বুঝলাম তাজউদ্দিন ভাইয়ের মন খারাপ। কি করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কিছু না বলেই এই বাড়ী ত্যাগ করি। উদ্দেশ্য কামাল হোসেনের সাথে দেখা করা। গাড়ীতে নুরজাহান মোর্শেদকে নিয়ে নিলাম। বিশ্ব বিদ্যালয় চত্বরে তার বাসায় নামিয়ে দিতে যেয়ে তাকে বল্লাম, আজ রাতটা বড় খারাপ। তাকে

নামিয়ে আমার বাসায় আসার পথে দেখি পাক সৈন্যরা বেতার ভবন দখল করে নিয়েছে।

সার্কিট হাউজ রোডের ৪ নম্বর বাড়ীতে আমি থাকি। কামাল হোসেন থাকেন ৩ নম্বর বাড়ীতে। আমার বাড়ীতে যাওয়ার পূর্বে কামাল হোসেনের বাড়ীতে যাই। তিনি বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে আহমেদুল কবীর ও তাঁর স্ত্রীকে বিদায় দিচ্ছেন। বিদায়ের সময় লম্বা না করার জন্য আমি তাঁদের তাড়া দিলাম। তাঁদের বিদায় দিয়ে ডঃ কামাল কি করা যায় বলে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। বললাম, পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আপনি প্রস্তুত হোন। আমি বাসায় লীলাকে বলে আসি।

১লা মার্চ থেকে বাড়ীতে দুপুরে খাওয়ার সময় আসি। স্ত্রী ও পুত্র কন্যার সাথে এক প্রকার কথা বার্তা হয়না বল্লেই চলে। আমার শ্বশুর আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা খান সাহেব এম, ওসমান আলী ১৯শে মার্চ ইন্তেকাল করেন। স্ত্রী তখনো শোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি। পিতৃহারা স্ত্রীকে শান্তনা দেয়ার সময়ও আমার হয়ে ওঠেনি।

ঘরে প্রবেশ করে লীলাকে বললাম, আমাকে এখন চলে যেতে হবে। সে শুধু জানতে চাইলো আমার কাছে টাকা আছে কিনা। পকেটে ২/১০ টাকা থাকতে পারে। আমার পরনে পাজামা, গায়ে পাঞ্জাবী, আর পায়ে সেণ্ডেল। 'ভাল থাক', এ কথা বলেই স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। পূর্বের মত দেয়াল টপকিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে কামাল হোসেনের বাসায় আসি। তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

পথে দেখি শাহবাগের মোড়ে জনতা গাছ কেটে ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছে। এই পথে বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ। বহু কষ্টে কর্মীদের সহযোগিতায় রাস্তার ব্যারিকেড সরিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাসায় আমরা পৌঁছি। বঙ্গবন্ধু যে আত্মগোপন করতে নারাজ গাড়ীতে ডঃ কামালকে সে কথা জানাই। ৩২ নম্বরের বাড়ীতে প্রবেশ করে দেখি বঙ্গবন্ধু নীচের তলায় খাবার শেষ করেছেন। দৃশ্যটি দেখে আমার 'লাষ্ট সাপারের' কথা মনে পড়লো। বঙ্গবন্ধুর পরনে লুঙ্গি ও গায়ে গেঞ্জী ছিল। আমাদের দু'জনকে দেখে তিনি দরজার আসেন। আমরা সংক্ষেপে শহরের অবস্থা জানিয়ে বঙ্গবন্ধুকে আমাদের সাথে চলে যাবার জন্য পুনরায় অনুরোধ জানাই। বঙ্গবন্ধু তার পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল। তিনি বললেন, তোমরা প্রতীজ্ঞা পাঠ করেছ, আমি যা নির্দেশ করবো তাই শুনবে। তারপর তিনি আমাদের দু'জনের পিঠে দু'হাত রেখে বলেন, 'কামাল, আমিরুল আমি কোন দিন তোমাদেরকে কোন আদেশ করিনি। আমি তোমাদের আজ আদেশ করছি, এই মুহূর্তে তোমরা আমার বাড়ী ছেড়ে চলে যাও। আর তোমাদের দায়িত্ব তোমরা পালন করবে'।

আর শহরের অবস্থার কথা শুনে তিনি বলেন, আমার কাছে সব খবর আছে। ইয়াহিয়া খান ঢাকা ছাড়ার পরই আক্রমণ শুরু হবে। তিনি বলেন, আমি বাড়ী ছেড়ে চলে গেলে হানাদাররা আমার জন্য ঢাকা শহরের সকল লোককে হত্যা করবে। আমার জন্য আমার জনগণের জীবন যাক এটা আমি চাইনা।

বঙ্গবন্ধুর বাড়ী থেকে মোহাম্মদ মুসার বাড়ীতে যাই। আমার গাড়ী সেই বাড়ীতে রেখে মুসার গাড়ীতে উঠি। মুসার ড্রাইভার গাড়ী চালায়। আমরা তাজউদ্দিন আহমদের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হই। তাজউদ্দিন ভাইকে সর্বশেষ পরিস্থিতি অবহিত করি। তাঁকে জানাই, বঙ্গবন্ধু সকলকে আত্মগোপনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ইতস্তত করেন।

এ সময় বি ডি আর এর একজন হাবিলদার এসে আমাদের বলে গেলেন, বি ডি আর এর সকল বাঙ্গালী সদস্যরা বেরিয়ে পড়েছে। আজ রাতে তারা পাক বাহিনীর হামলার আশংকা করছে। তাজউদ্দিন ভাইকে তাড়াতাড়ি তৈরী হতে বল্লাম। তিনি ভেতরে গেলেন। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। ডঃ কামালকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছিল। ডঃ কামাল গাড়ী যোগে অন্যত্র যেতে চাইলেন। আমি বল্লাম, এটা ঠিক হবে না। তাজউদ্দিন আহমদের কিছুটা দেরী হলো। তিনি বেরিয়ে আসলেন। তার পরনে লুঙ্গি ও গায়ে পাঞ্জাবী। কাঁধে একটি ব্যাগ ঝোলানো রয়েছে। আর তার ঘাড়ে একটি রাইফেল। তার এই বেশ দেখে আমি বল্লাম, শিকারে যাচ্ছেন নাকি?

তাজউদ্দিন ভাই গত কিছুদিন যাবৎ আমাদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণের কথা বলছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে রাইফেল ট্রেনিং নিয়ে নিয়েছেন। আরহাম সিদ্দিকী তাকে এই রাইফেল যোগাড় করে দেন। কিন্তু এই রাইফেল পরবর্তীকালে আমাদের জন্য সমস্যা হয়ে দাড়ায়। রাইফেল বেশী দুর নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

সময় দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো এই এলাকায় পাক সৈন্য এসে যাবে। পুরাতন ঢাকার একটা বাড়ীতে সকলের একত্রিত হবার কথা ছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁর বাসভবন থেকে বাইরে আসতে রাজী না হওয়ায় সেই সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর বাড়ী ছেড়ে না যাবার সিদ্ধান্তে নেতাদের মন ভেঙ্গে যায়। তাজউদ্দিন আহমদ ভগ্ন মনোরথ অবস্থায় বাড়ীতে বসে ছিলেন। তিনি নিজেকে এক রকম ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। আঘাত হানার পূর্বেই আমাদের নেতা বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করার চেষ্টা করি। এরপর ভাবলাম, ১লা মার্চ থেকে তাজউদ্দিন আহমদ, ডঃ কামাল হোসেন ও আমি একত্রে কাজ করেছি। এই ৩ জনকে যে কোন মুল্যে একত্রে থাকতে হবে। ১৫ নম্বর সড়কের কাছাকাছি এলে ডঃ কামাল গাড়ী থামাতে বলেন। তিনি বলেন, সকলে এক বাড়ীতে না থেকে আমি এখানে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থেকে যাই।

আমার চরম অনিচ্ছা থাকা সত্বেও বাধা দিতে পারলাম না। তবে মনে মনে খুবই বিরক্ত হলাম। কামাল হোসেন আমার ঘনিষ্ট বন্ধু। কিন্তু তার একক

সিদ্ধান্ত নেয়ার ধরণটা মেনে নিতে পারলাম না। তবুও কামাল হোসেন গাড়ী থেকে নেমে গেলেন। কথা রইলো পরদিন সুযোগ পেলেই তিনি মুসা সাহেবের বাড়ীতে যাবেন। আমরাও সেখানে যাব, না হয় যোগাযোগ করে সিদ্ধান্ত নেব। কিন্তু এটা আর হয়ে ওঠেনি। ডঃ কামাল মুসা সাহেবের বাড়ী যেতে পারেননি, আর আমরাও পারিনি ডঃ কামালের সাথে যোগাযোগ করতে। পরবর্তীকালে তিনি পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। নির্যাতিত হন পাকিস্তানী কারাগারে। আর আমরা বঞ্চিত হই তার সুযোগ্য নেতৃত্ব থেকে। ডঃ কামালের সেদিনের একক সিদ্ধান্ত আজও আমাকে পীড়া দেয়। যদ্দিন তিনি পাকিস্তানী কারাগার থেকে ফিরে না এসেছেন, তদ্দিন নিজেকে খুবই অপরাধী মনে হয়েছে। কেন সেদিন জোরে বাধা দিতে পারিনি।

ইতিমধ্যে ধানমণ্ডির বিদ্যুৎ চলে গেলো। রাস্তা জনমানব শূন্য। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের দুই একটা গাড়ী মাঝে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকানোর মত দেখা যায়। কাল বিলম্ব না করে লালমাটিয়ায় রেলওয়ের এক কালের চীফ ইঞ্জিনিয়ার গফুর সাহেবের বাড়ীর কাছে গিয়ে দু'জন নেমে গেলাম। ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে মুসা সাহেবের বাড়ী চলে গেলো।

গফুর সাহেব আমাদের জন্য প্রস্তুত ছিলেননা। আমরা তাকে পূর্বে কোন খবর দেইনি। তবুও তিনি আমাদের স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করলেন। আমরা বাড়ীতে ঢুকার ৫/৭ মিনিটের মধ্যেই এক প্রচণ্ড শব্দে সমস্ত ঢাকা শহর কেঁপে উঠলো। পরে জেনেছি এটা ছিল আঘাত শুরু করার সংকেত।

শুরু হলো চারদিক থেকে ব্রাশ ফায়ার। অবস্থা জানতে আমি ও তাজউদ্দিন ভাই বাড়ীর ছাদে যাই। পাক বাহিনীর ব্যাপক হামলার মাঝে আমাদের ছেলেদের ৩০৩ রাইফেলের বিচ্ছিন্ন শব্দ। 'জয় বাংলা' ধ্বনি শুনতে পাই। পাশাপাশি মোহাম্মদপুরের কয়েকটি বাড়ী থেকে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি শোনা গেল। আমরা মোহাম্মদপুর এলাকার কাছাকাছি ছিলাম। তবে একদিক থেকে আমাদের বাড়ী নিরাপদ মনে হলো। কেননা অবাঙ্গালী অধ্যুষিত মোহাম্মদপুর এলাকায় পাক বাহিনী কোন হামলা করবে না। আক্রমণের ব্যাপকতা ও আকস্মিকতায় একেবারে 'থ' হয়ে গেছি।

আমাদের ওপর হামলা হবে একথা জানতাম। সেটা হবে রাজনীতিবিদ, ছাত্র ও কর্মীদের ওপর। কিন্তু আধুনিক সমর সজ্জায় সজ্জিত পাক বাহিনী নিরস্ত্র বাঙ্গালীর ওপর বর্বরভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তা ভাবতে পারিনি। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ধরণের নজির আর কোথাও দেখিনি। গফুর সাহেবের বাড়ীর অসম্পূর্ণ ছাদের ইট-শুরকীর ওপর বসে আমরা দু'জন পাকসেনাদের হামলার মুখে ভয়ার্ত মানুষের আর্ত চিৎকার শুনছি। এক সময় তীব্র নীলাভ এক উজ্জ্বল আলোতে ঢাকা শহর আলোকিত হয়ে উঠল। বিভিন্ন স্থানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। আগুনের কালো ধোয়ায় ঢাকার আকাশ ক্রমশঃই কালো হয়ে উঠছে।

মধ্যরাতের দিকে ব্রাশ ফায়ার ও বিকট শব্দ শুনে তাজউদ্দিন আহমদ বলে ওঠেন, এবার দস্যুরা ৩২ নাম্বার বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে হামলা করছে। এ সময় তিনি কেঁদে উঠলেন। বঙ্গবন্ধু কি তাঁর বাসা থেকে বেরিয়েছেন? বঙ্গবন্ধু যখন কোন অবস্থাতেই বাসা থেকে বেরিয়ে যেতে অসম্মত হন, তখন আমাদের সর্বশেষ অনুরোধ ছিল, তাঁর বাড়ীর পেছনে জাপানীদের অফিসে যেন তিনি চলে যান। এ সময় বঙ্গবন্ধুর কথা, তার পরিবার পরিজনের কথা, দলের বিভিন্ন নেতার কথা বার বার মনে হতে লাগলো।

এক সময় আমরা দুই জন ছাদ থেকে নেমে এলাম। নীচে এসে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। শুধু ভাবছি আর ভাবছি। এমনিভাবে রাত ভোর হতে চলল। চারদিক থেকে গুলীর শব্দ আসছে। শরীর ও মন অবসন্ন হয়ে উঠছে।

সকালে আমি বাথরুমে গেলাম। আয়নায় নিজের চেহারা দেখলাম। মনে হলো এক রাতে একটা শতাব্দী পার হয়ে গেছে।

পাশে পড়ে ছিল গফুর সাহেবের ব্লেড। ১৯৬১ সালে লণ্ডনে ব্যারিষ্টারী পড়ার সময় সযত্নে রক্ষিত ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি কেটে নিলাম। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার পর তাজউদ্দিন ভাই অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকালেন। বুঝলাম, দাড়ি কাটা কাজ দেবে। ২৬শে মার্চ সকালে দু'জনে বসে গতরাত থেকে ঘটনাগুলো বুঝবার চেষ্টা করলাম। নিজেদের কর্তব্য স্থির করতে দেরী করিনি। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রথম কাজ হলো এই বাড়ী ত্যাগ করা। বাড়ীর সামনে দিয়ে পাক বাহিনীর টহলদার জীপ আসা যাওয়া করছে। আমাদের বাড়ীর সামনে ওয়াসার একজন কর্মচারীকে মিলিটারীরা বেদম প্রহার করল। অবাঙ্গালীরা মাথায় রুমাল বেঁধে জীপে করে পাক সেনাদের সাথে ঘুরছে। তারা বঙ্গালী নেতা-কর্মীদের বাড়ী ঘর, অবস্থান পাক বাহিনীকে দেখিয়ে দেয়ার কাজে সহযোগিতা করছে আন্দাজ করলাম।

স্থানীয় সংগ্রাম কমিটির একটি চালাঘরে কয়েকজন কর্মী আত্মগোপন করে রয়েছে। তাদের কাছে একটা রেডিও ছিল। ওরা রেডিওর খবরাখবর শুনছে।

২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বক্তৃতা দেন। আমরা দেয়ালে কান পেতে বেতারে ইয়াহিয়ার বক্তৃতা শুনি। পাক প্রেসিডেন্ট বক্তৃতায় আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বিষোদগার করেন। জনগণের শতকরা ৯৭ ভাগ ভোট লাভকারী আওয়ামী লীগকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেআইনী ঘোষণা করেন। ইয়াহিয়ার গলা থেকে সুতীব্র ক্রোধ বেরিয়ে আসে। ইয়াহিয়ার বক্তৃতা ও গত কয়েক ঘন্টার নৃশংস হত্যাকাণ্ড আমরা মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করি।

দু'জনে ঠিক করলাম, পাক বাহিনীর এই বর্বরোচিত হামলার খবর যে কোনভাবে বিশ্ববাসীকে জানাতে হবে। ২৫শে মার্চে ঢাকায় গণহত্যার খবর ভারত বা বিশ্বের কোন বেতারে প্রচারিত হয়নি। তবে ২৬শে মার্চ রাতে অস্ট্রেলিয়া বেতার ঢাকার গণহত্যার খবর প্রচার করে।

পাক বাহিনী আমাদের বাড়ী সার্চ করতে পারে এই আশংকায় আমরা কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়ি। প্রথম সমস্যা তাজউদ্দিন আহমদের রাইফেল। যদ্দিন আমরা এই বাড়ীতে ছিলাম, এর সমাধান করতে পারিনি। দ্বিতীয় সমস্যা, আমাদের তিন জন পুরুষ মানুষ ছাড়া এ বাড়ীতে কোন মেয়ে মানুষ নেই। মেয়ে লোক না থাকাতে আমাদের অবস্থান নিয়ে প্রশ্নের সৃষ্টি হতে পারে।

এই অবস্থায় তাজউদ্দিন ভাই এর নাম মহম্মদ আলী আর আমার নাম রহমত আলী ঠিক করে নেই। সার্চ হলে বলা হবে মহম্মদ আলী চাঁদপুরে গফুর সাহেবের ঠিকাদারীর কাজ তদারকি করেন। আর আমার বাড়ী পাবনা, আমি গৃহস্বামীর ভাই এর ছেলে। ঢাকায় বেড়াতে এসেছি।

২৬শে মার্চ সারা দিন গফুর সাহেবের বাড়ীতে আটক থাকি। বাইরে কার্ফু। চারদিকে মিলিটারী জীপ টহল দিচ্ছে। ফিজিক্যাল এডুকেশন কলেজের উপর সেনাবাহিনী ক্যাম্প করেছে। উপরে সার্চ লাইটের মত কি যেন একটা বসানো হয়েছে। এটা দেখে মনে হয় যেন একটা যুদ্ধের ছাউনী। কলেজের ছাদের ওপরে মেশিনগান তাক করে ওরা কন্ট্রোল রুম থেকে সকল এলাকা পাহারা দিচ্ছে। আমরা যে বাড়ীতে আছি সে বাড়ী থেকে সব দেখা যাচ্ছে। আমরা আশংকা করছি যে কোন মুহূর্তে বাড়ী বাড়ী তল্লাসী শুরু হতে পারে।

পরদিন ঘুম থেকে ওঠে লক্ষ্য করলাম, কার্ফু ও গোলাগুলীর মধ্যেও সাধারণ মানুষের গতি অব্যাহত রয়েছে। সামনে রাজপথ দিয়ে লোকজনের চলাচল নেই। কিন্তু ভেতরের রাস্তা দিয়ে সাধারণ মানুষ চলাচল করছে। ছোট ছোট ছাপড়া দোকানগুলোর ঝাপ উঠিয়ে সওদা বিক্রয় করছে। কাজের মেয়েরা কলসী দিয়ে পানি নিচ্ছে। মনে মনে ঠিক করলাম, সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে গেলে আমার চলাচলেও কোন অসুবিধা হবে না।

আমি একাই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ি। যে কোন ভাবে সাত মসজিদ রোড পার হতে হবে। আমার অবস্থান থেকে সাত মসজিদ রোড বেশ দূরে। আমার খুবই পরিচিত কুষ্টিয়ার আতাউল হক সপরিবারে সাত মসজিদ রোডের কাছাকাছি থাকেন। গলি দিয়ে পার হচ্ছি। পথে একজন মৌলানাকে পেলাম। এমনিতেই তার সাথে কথা বলি। তিনি লালমাটিয়ার পুরাতন অধিবাসী। মৌলানা সাহেব আতাউল হককে চিনেন। তার সাহায্যে আতাউল হকের বাড়ীতে পৌঁছি। মৌলানাকে বললাম, আমি হক সাহেবের আত্মীয়, পাবনা থেকে এসেছি। ওরা আমাকে দেখে প্রথমে চিনতে পারেনি। পরে জড়িয়ে ধরে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেল।

মৌলানাকে ঐ বাড়ীতে আমার আত্মীয় মহম্মদ আলী আছেন, তাকে নিয়ে আসার জন্য বললাম। কিছুক্ষণ পর মহম্মদ আলী এসে হাজির হলেন।

হক সাহেবের বাড়ীতে আমাদের নাশতা তৈরী করতে ওরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে আমি আবার বেরিয়ে পড়েছি। বিভিন্ন বাড়ীর পেছনের অলিগলি দিয়ে

পথ চলছি। আমার আশংকা হচ্ছিল এই বাড়ী থেকে বেরোতে না পারলে, আটকে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোন কোন স্থানে হামাগুড়ি দিয়ে সাত মসজিদ রোডে পৌছার চেষ্টা করছি। হঠাৎ করে একটি মিলিটারী জীপ এই রাস্তায় ঢুকে পড়ে। রাস্তায় ঢুকেই ওরা এলোপাথারি গুলি ছুড়ে। আমি একটি বাড়ির পাশে নিজেকে লুকিয়ে রাখি। জীপটি ফিরে যেতেই আমি আতাউল হকের বাড়ীতে ফিরে আসি। কিছুক্ষণ পর এ ধরণের গোলাগুলি চরম আকার ধারণ করে। কোথাও কোথাও আগুন জ্বলছে। ভয়ার্ত মানুষের আর্ত চীৎকারে পরিবেশ ভয়াবহ হয়ে ওঠে।

আতাউল হকের ঘরের বেড়া ও চাল টিন দিয়ে তৈরী। টিনের বেড়া ফুটো করে গুলী যে কোন একজনের গায়ে লাগতে পারে। গৃহকর্তা বলেন, পাশের পাকা বাড়ীতে চাকর ছাড়া অন্য কোন লোকজন নেই। আমরা ইচ্ছা করলে দেয়াল টপকে সেখানে যেতে পারি। তার কথায় আমি পাশের পাকা বাড়ীতে যাই। তাজউদ্দিন ভাই ঐ বাড়ীতে গেলেন না।

এলোপাথারি গুলি প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চলে। পরে শুনেছি, এটা ছিল প্রথম পর্যায়ের অপারেশন। পাক বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল পরিবেশকে আতংকিত করে ঢাকা-বাসীকে গ্রামের দিকে ঠেলে দেয়া। বস্তী এলাকা পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। নীড় হারা বস্তির হাজার হাজার মানুষ বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েছে। আতাউল হকের নির্মাণাধীন বাড়ীর ভেতরে খোলা আকাশের নীচে বস্তির বহু লোক আশ্রয় নিয়েছে। ছিন্নমূল মানুষ গুলো সামান্য আসবাবপত্র ও ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কোলে নিয়ে এসেছে এখানে। কার্ফু জারী থাকা অবস্থায়ও এলোপাথরি গুলী চলে। এমন সময় একটি মাইকে কেউ বলে গেল, কিছুক্ষণের জন্যে কার্ফু তুলে নেয়া হয়েছে।

সে সময় একজন ছাত্র এ বাড়ীতে আসে। সে আমাদেরকে চিনতে পারে। তার মুখে শহরের টুকরো টুকরো খবর পেলাম। আমাদের প্রধান জিজ্ঞাস্য ছিল ৩২ নাম্বারে কি হয়েছে? ছাত্রটি সঠিক কিছু বলতে পারলোনা। তবে বংগবন্ধুর ব্যাপারে দু'ধরণের খবর শুনেছে। কেউ বলেছে বংগবন্ধু সরে গেছেন। আবার কেউ বলেছে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বাইরে কার্ফু না থাকায় আমরা বাড়ী ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেই। আমাদের দুজনের হাতে ১টি করে বাজারের থলি। যেন আমরা বাজার করতে যাচ্ছি। তাজউদ্দিন ভাই এর পরনে লুঙ্গি ও পাঞ্জাবী, মাথায় সাদা টুপি। বাজারের থলির নীচে তার নিজের ব্যাগ রাখা হয়েছে।

আমরা সাত মসজিদ রোডে পৌছি। আর একটু এগিয়ে ডান দিকে মোড় নিলে ১১ নাম্বার রাস্তা। সেটা পার হলেই রায়ের বাজার। এমন সময় আমাদের পেছনে একটি মিলিটারী জীপ এলো। জীপটি চলে যেতেই আমরা আবার রাস্তায় চলে আসি। ডানে মোড় নিলে লালমাটিয়ার সীমানা পেরিয়ে ১৯ নাম্বার সড়ক। ডানে মোড় নেব এ সময় তাজউদ্দিন ভাই থমকে দাঁড়ান। আর একটু এগুলেই

ডান পাশে তার বাড়ী। তিনি তার বাড়ী যেতে চাইলেন। আমি জোর আপত্তি জানাই। যুক্তি দিলাম, আপনার বাড়ী নিশ্চয়ই আক্রান্ত হয়েছিল। হায়েনার দল এখনো বাড়ীর আশে পাশে আড়ি পেতে বসে থাকতে পারে। তাজউদ্দিন ভাই-এর মনে পড়লো তার ঔষধগুলোর কথা। সে গুলো বাড়ীতে রয়ে গেছে। বাড়ীতে আর যাওয়া হলো না।

ডান দিকে মোড় নিয়ে আমরা রায়ের বাজার পৌঁছি। এখানে আওয়ামী লীগ কর্মীদের একটি শক্ত ঘাটি তখনো রয়েছে। নির্ভীক কর্মীরা সংগ্রাম কমিটির অফিস পাহারা দিচ্ছে। এদের সাহস দেখে একদিকে যেমন বিস্মিত হলাম, অপর দিকে আমার হাসিও পেল। কেননা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে এ ধরণের মোকাবেলা সাহসের দিক দিয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হলেও কৌশলের দিক দিয়ে একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়।

পাক বাহিনীর হামলা এখানে তখনো আসেনি। এলাকাবাসীর মনে ভয়ের লেশ মাত্র নেই। সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক ও অন্যান্য নেতা কর্মীদের সাথে আমাদের কথা হলো। তারা আমাদের কাছে এই মুহূর্তের করণীয় জানতে চাইল। আমরা সংক্ষেপে তাদের কয়েকটি নির্দেশ দেই।

রায়ের বাজার থেকে দুজন লোককে দুদিকে পাঠালাম। একজন গেল ৩২ নাম্বারে বংগবন্ধুর খোঁজ খবর জানতে, আর অপরজনকে পাঠালাম মুসা সাহেবের বাসায় ডঃ কামাল এসেছেন কিনা তা জানার জন্য। ৩২নাম্বারের খোজ নিয়ে আমাদের প্রেরিত লোক ফিরে এসে জানায় বংগবন্ধুর বাড়ীর সামনে পুলিশ নিহত হয়ে পড়ে রয়েছে। বাড়ীতে কোন লোকজন নেই। পরস্পর জানতে পেরেছে বংগবন্ধুকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। আর মুসা সাহেবের বাড়ীতে খোঁজ করে জানা গেল, ডঃ কামাল হোসেন সেখানে পৌছুতে সমর্থ হননি।

সংগ্রাম কমিটির এই অফিসে চারদিক থেকে বিচ্ছিন্নভাবে খবর আসছে মানুষের মুখে মুখে খবর প্রচার হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেল শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুল রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ, প্রমুখ নদী পার হয়ে জিনজিরার দিকে চলে গেছেন। শেখ কামাল ও শেখ জামাল বাসা থেকে পালিয়ে গেছে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী কামরুজ্জামান, প্রমুখ নেতৃবৃন্দের কোন খোঁজ খবর জানতে পারলাম না।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা এ স্থান ত্যাগ করব। সেখানে জমায়েত নেতা-কর্মীদের বললাম, সংগ্রামকে বংগবন্ধুর নির্দেশ মোতাবেক গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দিতে হবে। আমরা বংগবন্ধুর নির্দেশ মোতাবেক বেরিয়েছি। তারা সময়ে সময়ে নির্দেশ পাবে।

ইতিমধ্যে আমরা অনেক ভেবেছি। পাক বাহিনীর নগ্ন হামলার জবাব দিতে হবে। বাংলার দামাল যুবকদের পুনর্গঠিত করতে হবে। ২৭শে মার্চ রায়ের

বাজারের কর্মীদের কাছ থেকে আমরা বিদায় নিলাম। এই বিদায় ছিল মর্মস্পর্শী। তাজউদ্দিন ভাইকে আমি বলি, এখন পথই আমাদের ঠিকানা, পথই আমাদের সঠিক পথে পৌছে দেবে। বিদায়ের সময় রায়ের বাজারের একজন কর্মী জিজ্ঞাসা করেন আমাদের পরিবারের জন্য কিছু বলার আছে কিনা। আমরা দু'জনে দুটুকরো কাগজ নিয়ে কিছু লিখে তাদের হাতে দিলাম। কর্মীরা পৌছে দেয়ার দায়িত্ব নিলেন। তাজউদ্দিন ভাইয়েরটা পৌছুল, আমারটা কর্মীরা পৌছাতে পারেনি। শুনেছি আমার বড়ীওয়ালী কাউকে বাড়ীতে ঢুকতে দেননি। আমার খোঁজে কেউ আসলে তাকে ভয় দেখাতেন।

পরবর্তীকালে দু'জনে আলাপ করে দেখেছি স্ত্রীর কাছে আমাদের দুজনার লেখার মধ্যে আশ্চর্য রকমের মিল ছিল। আমাদের বক্তব্যের সারমর্ম ছিল আমরা এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়িয়েছি। কবে এর শেষ হবে জানি না। আট কোটি মানুষের সাথে মিশে যাও। যদি বেঁচে থাকি, তাহলে দেখা হবে।

আমরা আবার যাত্রা করি। তাজউদ্দিন আহমদের পায়ে কাপড়ের জুতা। হাঁটতে তার কষ্ট হচ্ছে। হাটতে হাটতে তার পায়ে ফোস্কা পড়ে যায়। জুতা খুলে তিনি হাটতে থাকেন।

আমরা রায়ের বাজার থেকে নদী পার হয়ে নবাবগঞ্জ থানায় যাব। অগণিত লোক পার হয়ে যাচ্ছে। পার হয়ে হেটে চলেছি। ঢাকা থেকে ভাগ্যাহত মানুষ যাচ্ছে। চারিদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ। পাক বাহিনীর বর্বর অত্যাচারে লোকজন ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মানুষের মিছিলে সর্বশ্রেণীর মানুষ রয়েছে। এই মিছিলে আমরা মিশে গেছি। কেউ জানেনা আমরা কারা। শুধু জানি আমিও ওদের একজন। চলতে চলতে এক সময় হয়তো এক বৃদ্ধার মাথার পুটলিও নিজের হাতে নিয়েছি। কখনো বা কোন ছোট শিশুকে কোলে করে পার করে দিয়েছি।

আমাদের গতি দ্রুত। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হাজার হাজার মানুষ উত্তপ্ত বালির ওপর দিয়ে চলছে। রাস্তার দুপাশের গ্রামের মানুষ মিছিলের মানুষকে উদার হস্তে খাওয়াচ্ছে, আশ্রয় দিচ্ছে। ডেকে ডেকে মানুষকে খাওয়াচ্ছে। আতিথেয়তার প্রতিযোগিতা ছিল প্রতিটি গৃহে। সেদিন বাংগালীর জন্য বাংগালীদের দরদ দেখেছিলাম, এতে আমি নিশ্চিত হই যে বাংলার স্বাধীনতাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।

চলার পথে একজন সিপাই যুবকের সাথে কথা হলো। তার পরনে লুঙ্গি। ২৫শে মার্চ রাতে সে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ছিল। সে রাতে কিভাবে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচলো, কিভাবে তার সঙ্গী সাথীরা পাক বাহিনীর বর্বরতার শিকার হলো, এই ভয়াবহ কাহিনী তার মুখ থেকে শুনলাম। অন্য একজন সিপাই। সে মিটফোর্ড হাসপাতালে একজন রাজবন্দীর পাহারায় ছিল। অতি কষ্টে সে জীবন নিয়ে চলে এসেছে।

কাফেলাতে শুধু জীবন্ত মানুষ নয়, এখানে রয়েছে লাশ। কয়েক দিনের পুরনো লাশও রয়েছে। প্রিয়জনের মৃতদেহ ওরা ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছে। পথে পথে অনেক জনাজা হতে দেখলাম। ঢাকাতে যারা শহীদ হয়েছে তাদের লাশ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

পথিমধ্যে তাজউদ্দিন ভাইকে অনেকে চিনে ফেলে। একজন আওয়ামী লীগ কর্মী আমাদের আপত্তি সত্ত্বেও এক প্রকার জোর করে তার বাড়ী নিয়ে গেলেন। তার জোর দাবী কিছু মুখে দিয়ে যেতে হবে।

আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণা এক প্রকার ভুলে গেছি। চা ও বিস্কুট খেলাম। কিছু বিস্কুট পকেটে নিয়ে আবার পথ চলা শুরু করি।

যাবার আগে কর্মীদের উদ্দেশে বলে গেলাম, সংগ্রাম কমিটির আওতায় সব কিছু পরিচালনা করতে হবে। শত্রুদের ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। শত্রুদের খবর পেলে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

পথ চলতে চলতে এক সময় বেলা পড়ে গেল। সামনে একটি নদী। এই নদী পার হলে নবাবগঞ্জ থানা পার হয়ে আমারা দোহার থানায় যাব। খেয়া নৌকায় লোকজনকে পার করে দেয়া হচ্ছে। তবুও নদীর দু'ধারেই মানুষের ভিড়। তবে মানুষকে পার করে কেউ কোন পয়সা নিচ্ছেনা। আশেপাশের মানুষ নিজেদের নৌকা দিয়ে উদ্যোগী জনতাকে পার করে দিচ্ছে। আমরাও অন্যান্য যাত্রীর সাথে একটি নৌকায় পার হই। নৌকাওয়ালা পয়সা নিতে রাজী হলোনা।

ওপারে নেমেই দেখি একজন যুবক দাঁড়িয়ে। আমাদেরকে জড়িয়ে ধরল। সে যেন আনন্দে আত্মহারা। যুবক মোটর সাইকেল নিয়ে এসেছে। সে বলল, আপনাদের নেয়ার জন্যই আমি এখানে অপেক্ষা করছি।

মোটর সাইকেলে দুইজনের বেশী ওঠা যায়না। প্রথমে তাজউদ্দিন ভাইকে নিয়ে গেল তার গ্রামে। আমি হাঁটতে থাকি। পরে আমাকেও নিয়ে গেল। সে গাঁয়ে আওয়ামী লীগের এক বিশিষ্ট নেতার বাড়ীতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো। স্বাভাবিক ভাবেই আমরা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর। বাড়ীর সামনে পানি ভরা পুকুর। সন্ধ্যা হওয়া সত্ত্বেও দু'জনে গোসল করি। এরপর বৈঠকে বসি। ইতিমধ্যে এই বাড়ীতে অনেক লোক জমা হয়ে গেছে। স্থানীয় নেতা-কর্মীদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা শেষে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হলো।

আহার শেষে দু'জন এক চৌকিতেই ঘুমাতে যাই। পরদিন ভোরে আমাদের যাওয়ার জন্য ২টি মোটর সাইকেলের ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের অবস্থান থেকে পদ্মার দূরত্ব ৫০ মাইল। মোটর সাইকেলে যেগে রওয়ানা হয়ে রোদ উঠতে না উঠতে আমরা সুবেদ আলী এম পি এ'র বাড়ীতে পৌঁছি। সুবেদ আলী টিপু ব্যারিস্টারী পড়তে বিলেতে গিয়েছিলেন। বিলেতে থাকাকালে তার সাথে আমার পরিচয়। তিনি একজন উৎসাহী দলীয় সদস্য।

এই বাড়ীতে আমরা আবার বৈঠকে বসি। সেখানে কৃষক নেতা জিতেন বাবুর সাথে দেখা হলো। তিনি ন্যাপ এর সদস্য। ঘন্টা খানেক পরে আমরা আবার যাত্রা করি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা অপর একজন এম, পি এ আশরাফ চৌধুরীর বাড়ীতে পৌঁছে যাই। গৃহস্বামী মাত্র ২ঘন্টা আগে বাড়ী পৌছেছেন। তিনি ২৫শে মার্চের কালো রাতে ঢাকায় ছিলেন। বিরাট দ্বিতল বাড়ী। পানি এনে স্নানের ব্যবস্থা করা হয়। এখানে কিছু খেয়ে আবার পথ চলা শুরু করি। পথ দেখাবার জন্যে স্কুলের একজন দফতরী আমাদের সাথে রয়েছেন। পদ্মার তীরে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। প্রমত্ত পদ্মার বুকে তখন প্রচণ্ড ঢেউ। কয়েকটি নৌকা তীরে বাধা রয়েছে। বহু অনুরোধ সত্বেও কোন নৌকা আমাদের ওপারে নিয়ে যেতে সাহস পেলোনা। অগত্যা তীর থেকে আমরা আগারগাও নামক একটি গ্রামে ফিরে এলাম। আমাদের দলীয় একজন কর্মী-বন্ধুর বাড়ীতে রাত্রি যাপন করি।

বাড়ীর লোকেরা তাঁতের কাজ করে খায়। স্নান করে খেতে যাব, হঠাৎ স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান কানে ভেসে আসলো। ঘোষক বেতারে বলছেন, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চট্টগ্রামের লালদিঘী ময়দানে হাজির হতে বেতারে নির্দেশ দেয়া হলো। প্রথমে এদের নাম ধাম কিছুই বুঝা গেলনা। ঠাওর করে উঠতে পারলামনা, কারা কোথেকে এই বেতার চালাচ্ছে। পরে বেতারে মেজর জিয়ার কণ্ঠ শোনা গেল। তিনি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান।

মেজর জিয়ার আহবান বেসামরিক, সামরিক তথা বাংলার সর্বশ্রেণীর মানুষকে সংগ্রামে উজ্জীবিত করে। পরদিন এই বেতার থেকে টিক্কা খানের আহত হবার খবর শুনি। তা ছাড়া মুক্তি যোদ্ধাদের বিজয়ের অনেক খবর প্রচার করা হয়।

আমরা দু'জন গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম যে অবিলম্বে একটি সরকার গঠন করা প্রয়োজন। পরদিন ভোরবেলা আবার রওয়ানা হই। পদ্মা তখন শান্ত। মাঝ নদীতে চর পড়েছে। আমাদের তাই দুই অংশে পার হতে হবে। আমাদের সাথে আশরাফ আলী চৌধুরীর স্কুলের পিওন রয়েছে।

পদ্মার ঘাটে ছোট বড় অনেক নৌকা। অনেক নৌকা খুলনা বরিশালে ধান কাটতে যাচ্ছে। আমরা ভাবছি এবারে ফসল কেটে সব নৌকা কি ঘরে ফিরতে সমর্থ হবে? এমনিভাবে ভাবতে ভাবতেই নদী পার হওয়ার জন্য নৌকায় উঠছি। সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলছি। সকলের মনেই ভীতির ভাব। এমন সময় আই ডব্লিউ টি এর একটি মোটর যান দেখা গেল শব্দ করে আমাদের দিকে আসছে। কেউ কেউ এটাকে পাক সামরিক বাহিনীর মোটর যান ভেবে আশংকা প্রকাশ করে। আমি বললাম, এত তাড়াতাড়ি ওরা ঢাকা ছেড়ে আসতে পারে না। মোটর যানটি কাছে আসার পর দেখা গেল এতে কিছু সাধারণ যাত্রী রয়েছে। পরে

শুনেছি, পাক বাহিনী যাতে ব্যবহার করতে না পারে এ জন্য শ্রমিকরা এই বোট গুলোকে নিয়ে এসেছিল।

আমরা নদীর ওপারের খবর জানি না। সেখানে একটি বাজার দেখা যাচ্ছে। একটি নৌকা করে আমরা নদীর ওপারে যাই। আর নদীর এপার থেকেই আমাদের পথ দেখাতে আসা স্কুলের পিওনকে বিদায় করে দেই।

বাজারের পাশেই একটি মাঠ। মাঠে কেউ লাঙ্গল চালাচ্ছে কেউ বা অন্যান্য কাজ করছে। চারদিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক মনে হলো। এই অবস্থায় আমরা বাজারে গিয়ে পৌছি। বাজারে গিয়েই সেখানকার সংগ্রাম পরিসদের কর্মীদের সাথে দেখা হলো।

আমরা এখান থেকে ফরিদপুর যাব। সেখান থেকে পায়ে হেটে ছাড়া অন্য কোন পথে যাওয়ার সুযোগ নেই। এমনকি পায়ে হাটা পথও ভাল নয়। খাল, বিল, নালা পেরিয়ে যেতে হবে। তবে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া যায়। অগত্যা আমরা দুটি ঘোড়াই ভাড়া নেই। এই বাজার থেকে ৭মাইল দূরে ফরিদপুর শহর। ঘোড়ায় চড়ে শহরের এক প্রান্তে নামি। সেখান থেকে রিক্সা যোগে আওয়ামী লীগ নেতা ও এম, পি ইমামউদ্দিনের বাড়ীতে উপস্থিত হই। বাড়ীতে পা দিয়েই বুঝলাম লোকজন বেশ শংকিত। গত রাতে শহর থেকে অনেকজন গ্রামে চলে গেছে। ঢাকা থেকে লোকজন এসে সেখানকার ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা বর্ণনা দিয়েছে। ঢাকার মর্মান্তিক হত্যাযজ্ঞের কথা শুনেই অনেকজন রাতের বেলা শহর থেকে চলে যায়।

ইমামউদ্দিনের স্ত্রী খুবই সাহসী মহিলা। বাড়ীতে তিনি একা। ইমামউদ্দিন বাড়ীতে নেই, তিনি সংগ্রাম পরিষদের নেতা-কর্মীদের নিয়ে আশে পাশের পুলিশ ও বি ডি আর এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছেন। স্ত্রীর কাছ থেকে খবর পেয়ে ইমাম সাহেব বাড়ী আসেন। তাড়াতাড়ি ডাল ভাত রান্না হলো। শহরের লোক আশংকা করছে এখানে যশোর থেকে পাক সৈন্যরা যে কোন সময় হামলা করতে পারে।

আমরা সবে মাত্র খেতে বসেছি। এমন সময় খবর এলো পাক সৈন্য এদিকে আসছে। কোন্ দিক দিয়ে আসছে সে সময় তা বুঝা গেলনা। চারদিক লোকজন ছুটোছুটি করছে প্রাণ ভয়ে। মনে মনে ঠিক করলাম এখান থেকে মাগুরার পথে রওয়ানা হবো। সেখান থেকে যশোর সেনানিবাস ও আশে পাশের খবর পাওয়া যাবে।

স্থানীয় নেতা কর্মীদের সাথে আলোচনা শেষে আমরা ফরিদপুর ত্যাগ করি। রাস্তার বিভিন্ন অংশ কেটে দেয়া হয়েছে পাক সৈন্যের গতি রোধ করার জন্য। একটা রিক্সা যোগে আমরা কামারখালীর পথে চলেছি। কোথাও কোথাও নিজেরা রিক্সা পার করেছি। এমন সময় ফরিদপুরের দিকে একটি জীপ আসতে দেখি। জীপটি কার তা দেখার জন্য আমরা রাস্তার আড়ালে চলে যাই। কিছুক্ষণ পর বুঝলাম জীপটিতে অসামরিক লোক রয়েছেন। জীপে চালকের পক্ষে সাদা পোশাক

পরিহিত একজন ভদ্রলোক বসা। রাস্তায় এসে জীপটি নামাবার ইঙ্গিত দেই। পরিচয় নিয়ে জানলাম তিনি রাজবাড়ীর মহকুমা প্রশাসক। নাম শাহ ফরিদ। তাঁর কাছে টুকরো টুকরো খবর পেলাম।

শাহ ফরিদ মেহেরপুর গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি চুয়াডাঙ্গার সাথে যোগাযোগ করেছেন। তিনি জানান, মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক তওফিক ইলাহী চুয়াডাঙ্গার পুলিশ ও বি ডি আর এর সাথে যোগাযোগ করে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। ঝিনাইদহ, যশোর, রাজবাড়ী ও কুষ্টিয়ার জনগণ পাক সৈন্যের বিরুদ্ধে অবরোধ সৃষ্টি করছে। সেখানে চলছে যুদ্ধের প্রস্তুতি। এসব খবর শুনে আমরা দু'জন আশান্বিত হই।

শাহ ফরিদ আমাকে চিনত কি না বুঝলামনা। ঢাকার পরিস্থিতি তাকে জানাই। আমি বললাম, আমরা আওয়ামী লীগ হাই কম্যাণ্ডের পক্ষ থেকে এই এলাকার পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে এসেছি। পরে শাহ ফরিদ পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন।

রাজবাড়ী ও ফরিদপুরের পুলিশ ও বি ডি আরদের কুষ্টিয়ার মুক্তিসংগ্রামীদের সাথে মিলিত হবার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠেনি। আরো কিছুক্ষণ এগিয়ে রিক্সা ছেড়ে দেই। স্থানীয় একটি বাসে অন্যান্য কয়েকজন যাত্রীর সাথে আমরাও উঠি। কিছুদূর যেয়ে বাসটি আর যেতে পারলোনা। এখন আমাদের সাথে অনেক যাত্রী। কামারখালি পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো।

সামনে নদী পার হতে হবে। একটি মাত্র খেয়া নৌকা। যাত্রী বেশী। নদীর স্রোত অত্যন্ত প্রবল। নৌকা প্রায় ডুবে যাওয়ার অবস্থা। অনেক কষ্টে নদী পার হ'লাম। আকাশে চাঁদ ঝলমল করছে। চাঁদটিতে আমাদের বেশ সুবিধা হলো। এখান থেকে মাগুরা ৮ মাইল। আমাদের সাথে আরো অনেকে রয়েছে। তারা ঢাকা থেকে এসেছে। এদের মধ্যে কিছু ছাত্র-যুবকও রয়েছে। আমরা এদের মধ্যে অচেনা রয়ে গেছি, যেমনি ছিলাম সারা পথে। ঘনিষ্ঠ কর্মী ছাড়া কারো কাছে নিজেদের পরিচয় দেইনি।

সন্ধ্যাবেলা কামারখালি ঘাটে রেডিও শুনি। রেডিওর কাছে বহু লোক ভিড় করে। বেতারে টুকরো টুকরো খবর প্রচার করা হয়। "মুক্তিবাহিনীর গুলীতে টিক্কা খান আহত," পাক বাহিনী পালিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি। বেতারে সকলকে সতর্ক থাকার আহবান জানানো হয়।

মাগুরা খালের ওপর কাঠের পুলটি পুড়তে দেখলাম। শত্রুদের গতিরোধ করার জন্যে নিজেরাই পুল পুড়ছে। টর্চের আলোতে ওপারে সঙ্গীন দেখা গেল। বললাম, আমরা বন্ধু। পার হওয়ার জন্যে একটি মাত্র ছোট নৌকা ছিল। দুই জনের বেশী নৌকায় ওঠা যায় না। আমরা দুই জন সকলের শেষে পার হই।

ওপারে গেলে সকলের দেহই তল্লাশী করা হলো। আমার পর তাজউদ্দিন ভাইএর পালা। মুখের দিকে তাকিয়েই তাকে জড়িয়ে ধরলো। নেতাকে চিনতে পেরেছে। তাজউদ্দিন ভাইও তাকে জড়িয়ে ধরেন।

রাত তখন অনেক। একটি রিক্সাওয়ালাকে বাড়ী থেকে ডেকে আনা হলো। আমরা দু'জনে রিক্সায় আর সে হেটে চলে। অনেক রাতে আমরা আওয়ামী লীগ নেতা সোহরাব হোসেনের বাড়ী পৌঁছি। সোহরাব ভাইএর স্ত্রী রাতের বেলা আমাদের জন্য রান্না করেন। খেতে খেতে ভোর হয়ে গেল।

সোহরাব হোসেন এখন থেকে সংগ্রাম পরিচালনা করছেন। মাগুরার মহকুমা প্রশাসক কামাল সিদ্দিকী মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সক্রিয় ভাবে কাজ করছেন। স্থানীয় কর্মীরা তার ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

সিদ্দিকী আমার পূর্ব পরিচিত। বিশ্ব বিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অন্যান্য কয়েকজনের সাথে সিদ্দিকীকেও বহিষ্কার করা হয়েছিল। আমি তার পক্ষে মামলার কৌশলী ছিলাম। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলা কালেও সিদ্দিকী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

আমরা দুজন ও সোহরাব ভাই জীপ যোগে জেলা বোর্ডের রাস্তা দিয়ে ঝিনাইদহ পৌঁছি। সেখানে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল আজিজের বাসায় উঠি। আমরা সেখানে পৌছে এস ডি পিও মাহবুবউদ্দিনকে খবর পাঠাই। মুক্তিযুদ্ধকালে মাহবুবের ভূমিকা ছিল স্বর্ণোজ্জ্বল। পরে তিনি ঢাকার পুলিশ সুপার হন।

মাহবুব ঝিনাইদহে কন্ট্রোল রুম স্থাপন করেছে। আমাদের দেখে খুবই উৎফুল্ল হলো। এই কন্ট্রোল রুম থেকে কুষ্টিয়া, মেহেরপুর চুয়াডাংগা ও মাগুরার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। যশোর সেনানিবাসের চারদিকে জনগণ ও মুক্তি যোদ্ধারা অবরোধ করে রেখেছে। হাজার হাজার লোক বজ্র কণ্ঠে শ্লোগান দিচ্ছে সেনানিবাস পুড়ে দেয়ার জন্যে। জনতার হাতে বন্দুক, রাইফেল, বল্লম, বর্শা, দা, কুড়াল সহ স্থানীয় অস্ত্রশস্ত্র। কুষ্টিয়াতে তিনশতাধিক পাক সেনা মুক্তিবাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ।

কুষ্টিয়া ঝিনাইদহ থেকে ২৮ মাইল দূরে। চুয়াডাংগায় মেজর ওসমান মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে রয়েছেন। মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগ দিয়েছেন। চুয়াডাংগার অবাংগালী মহকুমা প্রশাসককে হত্যা করা হয়েছে। কুষ্টিয়ার অবাংগালী জেলা প্রশাসক মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বন্দী। আমরা চুয়াডাংগায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। কুষ্টিয়ার অবরোধ জোরদার করার পরিকল্পনা নেয়া হয়। বিভিন্ন জরুরী নির্দেশ দিয়ে আমরা দুইজন ও মাহবুব চুয়াডাংগা চলে যাই। সেখানে পৌছে তওফিক এলাহী ও মেজর ওসমানের সাথে ব্যাপক আলোচনা হয়। চুয়াডাংগার সকল আওয়ামী লীগ কর্মীকে সর্বশেষ পরিস্থিতি অবহিত করি।

ইতিমধ্যে আমরা চুয়াডাংগা থেকে একটি বি ডি আর বাহিনী কুষ্টিয়ায় প্রেরণ করি।

কুষ্টিয়াতে পাক সেনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। গ্রাম থেকে অগণিত লোক শহরে আসে। হাজার হাজার মানুষের শ্লোগানে শহর কেঁপে ওঠে। মানুষের হাতে বিভিন্ন শ্রেণীর সাধারণ অস্ত্র। পুলিশের সকল রাইফেল মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে। অবাংগালী এডিসি সার্কিট হাউজে পাক সেনাদের সাথে অবরুদ্ধ। এডিসি নিহত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে। তিনি একজন পাক জেনারেলের আত্মীয়।

কুষ্টিয়ার সর্ব শ্রেণীর লোক যুদ্ধে অংশ নেয়। এমনকি মেয়েরা পর্যন্ত। সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে ভাত, ডাব, ডিম, রুটি, পিঠা, মিষ্টি ইত্যাদি পাঠায়। আমাদের অগণিত সৈনিকের রসদের কোন অভাব হয়নি। ঝিনাইদহ থেকে খবর পাই, কিছু সংখ্যক পাক সৈন্য ভয়ে পালিয়ে গেছে।

সারাগঞ্জ ব্রিজ আমার বাড়ীর পাশে। যশোর-কুষ্টিয়ার মধ্যে সংযোগকারী রাস্তার ওপর এই ব্রীজ দিয়েই যশোর থেকে পাক বাহিনী কুষ্টিয়া আসতে পারে। স্থানী. মুক্তিযোদ্ধারা ব্রিজের পাশে মাটি কেটে এর উপর চট বিছিয়ে দেয়। চটের মধ্যে আলকাতরা দিয়ে রাস্তার পিচের মত কালো করা হয়। কুষ্টিয়া থেকে পাক সেনাদের একটি পলাতক জীপ সেই খাদে পড়ে যায়। গ্রামের লোক ওদের পিটিয়ে মারে। এমনিভাবে কুষ্টিয়ার গ্রামের মানুষ পালিয়ে যাওয়া পাক সেনাদের পিটিয়ে মারে।

চুয়াডাঙ্গা থেকে খবর পাই, কুষ্টিয়াতে আমরা জয়ী হয়েছি। ওরা অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পলায়নোন্মুখ। এদের একজনও যশোর সেন নিবাসে ফিরে যেতে পারেনি। দুপুরে চুয়াডাঙ্গা থেকে কুষ্টিয়ার বীর জনতার প্রতি একটি অভিনন্দন বাণী পাঠাই। আমার এই বিবৃতি ভারতের কয়েকটি কাগজে প্রকাশিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা গিয়ে তিন ভাগে বৈঠক করি। একটি রাজনৈতিক, একটি সামরিক ও অপর বৈঠকটি করি তওফিক ও মাহবুবকে নিয়ে। তওফিক একাধারে চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক। সেখানে বসে পাবনার খবর পাই। সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে জেলা প্রশাসক নুরুল কাদের যোগ দিয়েছেন। মাগুরা, ঝিনাইদহ, ফরিদপুরে আমাদের অবস্থা ভাল। যশোর সেনানিবাস বীর জনতার দ্বারা তখনো অবরুদ্ধ।

ঢাকার অবস্থা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। চট্টগ্রামের খবর বিপ্লবী বেতার যোগে পেয়েছি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হলো, সারা বাংলায় গণযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এই যুদ্ধ চলছে। বাংলার সেনাবাহিনী, বি ডি আর, পুলিশ সহ সর্ব শ্রেণীর লোক সংগ্রামে অংশ নিয়েছে। বীর জনতার মনোবল থেকে আমরা বিশেষভাবে আশান্বিত। বিভিন্ন স্থানে খণ্ড যুদ্ধে আমরা জয়ী হলেও বিশাল পাক বাহিনীর সাথে লড়াই করার মত অস্ত্রসম্ভার এই মুহূর্তে

আমাদের নেই। তবে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে জনতার যে শক্তি দানা বেধেঁ ওঠেছে, একে সুসংহত করতে হবে। জনযুদ্ধের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে যোদ্ধাদের হাতে প্রয়োজনীয় অস্ত্র তুলে দিতে হবে। শত্রুর কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়ার কৌশল আমাদের যোদ্ধাদের শিখাতে হবে।

চুয়াডাংগায় তৌফিক, মাহবুব ও মেজর ওসমানের সাথে আবার বৈঠক করি। ডাঃ আসহাবুল হক আমাদের সাথে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করছেন। অস্ত্রের জন্য ভারতে যে আমাদের নেতা-কর্মী ও মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের ওপর চাপ দিয়ে যাচ্ছেন।

বেলা ৩ টার দিকে আমি ও তাজউদ্দিন ভাই সীমান্তের পথে রওয়ানা হই। তওফিক ও মাহবুব আমাদের সাথে ছিল। পলায়নী মনোবৃত্তি নিয়ে সীমান্ত পার হবোনা বলে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ্য মর্যাদা নিয়েই আমরা ভারতে যাব। স্বাধীন দেশের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের গ্রহণ করলেই প্রতিবেশী রাস্ট্রের সাথে আমাদের আলোচনা সম্ভব।

সীমান্ত থেকে কিছু দূরে একটি জঙ্গলের মাঝে ছোট্ট খালের ওপর একটি বৃটিশ যুগের তৈরী কালভার্ট। কালভার্টের ওপর তাজউদ্দিন ভাই ও আমি বসে আছি। আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে তওফিক ও মাহবুবকে ওপারে পাঠাই।

তাজউদ্দিন ভাইকে বিষন্ন মনে হলো। তার বিষন্নতার কারণ জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, ছোট বেলার একটা কথা তার মনে পড়ছে। তিনি বলতে থাকেন ছোট বেলা হিন্দু সহপাঠীরা বলতেন, তোদের পাকিস্তান টিকবেনা। আমি পাল্টা জোর দিয়ে বলতাম অবশ্যই টিকবে। ছোট বেলার সহপাঠীদের কথা তার মনে পড়ছে। সূর্য ডুবু ডুবু করছে বাংলাদেশের আকাশে আবার কখন নতুন সূর্যের উদয় হবে, তা ভাবতে ভাবতে আমরা দু'জনেই কালভার্টের ওপর শরীর এলিয়ে দেই।

তওফিক এলাহী ও মাহবুব চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ কেটে গেল। ওরা ভারতীয় সীমান্ত ফাঁড়িতে গেছে। জঙ্গলের ভেতর বেশ অন্ধকার নেমে এসেছে। জনবসতি নেই বললেই চলে।

চারদিকে আগাছায় ভরে গেছে। আরো কিছুক্ষণ পর অন্ধকারে মানুষের পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। তাজউদ্দিন ভাইকে ডেকে নিয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াই। শব্দ ক্রমশঃ আমাদের দিকেই আসছে। আগন্তুকরা কাছে এসেই হাতের অস্ত্র উঁচু করে সামরিক কায়দায় আমাদের অভিবাদন জানান। অফিসারটি জানান, আমাদেরকে তিনি যথোপযুক্ত সম্মান দিয়ে ছাউনিতে নিয়ে যেতে এসেছেন।

আগন্তুক অফিসারের সাথে আমরা ছাউনীতে চলে যাই। ছাউনীতে গিয়ে জানতে পারি যে, আমাদের আগমনের খবর ইতিমধ্যে কোলকাতায় পৌঁছে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বি এস এফ এর আঞ্চলিক প্রধান গোলক মজুমদার ছাউনীতে এসে পৌঁছলেন। রাত আনুমানিক আটটার কাছাকাছি। মিঃ মজুমদার জানান;

তাদের হাই কমাণ্ডের নির্দেশেই তিনি এখানে এসেছেন। আমরা আমাদের সংগ্রামে ভারতের সর্বাত্মক সাহায্যের আবেদন জানাই।

মজুমদার বলেন, আপনাদের আবেদনের জবাব শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীই বলতে পারেন। তিনি জানান, আমাদেরকে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করার ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন। তার সাথে কোলকাতা যাওয়ার জন্য আমাদের অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, তার পক্ষে ছোট ছোট অস্ত্রশস্ত্র দেয়া সম্ভব। তবে দিল্লীর সাথে আলোচনা ছাড়া কিছু করা সম্ভব নয়। তওফিক এলাহী ও মাহবুবকে বিদায় দিয়ে মজুমদারের জীপে করে আমি ও তাজউদ্দিন ভাই কোলকাতা যাত্রা করি।

মজুমদার নিজে গাড়ী চালিয়ে আমাদের দমদম বিমান বন্দরে নিয়ে আসেন। তিনি জানান, আমাদের সাথে আলোচনার উদ্দেশ্য এই ফ্লাইটে দিল্লী থেকে এক জন কর্মকর্তা আসবেন। তার এ কথা শুনে আমরা কিছুটা আশ্চর্য হই। রাতেই তার সাথে আমাদের দেখা হবে। আমাদের আগমনের কথা শুনেই মজুমদার দিল্লীর সাথে যোগাযোগ করেন। জীপ থেকে নামিয়ে আমাদের অপেক্ষাকৃত বড় কালো রং এর একটি গাড়ীতে তোলা হলো। বিমান থেকে ছ'ফুটেরও বেশী লম্বা একজন লোক নেমে সোজা আমাদের গাড়ীতে উঠলেন। মজুমদার তার সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি হলেন বি এস এফ এর প্রধান রুস্তমজী। রুস্তমজী এক সময় ভারতের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী নেহেরুর নিরাপত্তা প্রধান ছিলেন। নেহেরু পরিবারের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। তিনি প্রধানমন্ত্রীর খুবই আস্থাভাজন।

এদিকে আমাদের কাপড় চোপড়ের অবস্থা একেবারেই শোচনীয়। গাড়ীতেই শুরু হয় আলোচনা। রুস্তমজীর প্রথম প্রশ্ন ছিল বংগবন্ধু কোথায়? মজুমদারের প্রথম প্রশ্নও ছিল এটাই। এর পরেও আমরা অনেকের সাথে দেখা হয়েছে সকলেরই প্রথম প্রশ্ন ছিল বংগবন্ধু কেমন আছেন? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমরা তৈরী ছিলাম। দলীয় নেতৃবৃন্দ, মুক্তিযোদ্ধা সহ সকলের সাথে বংগবন্ধুর অবস্থানের ব্যাপারে আমরা একই উত্তর দিয়েছি। আমরা যা বলতে চেয়েছি তা হলো বংগবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমরা তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাচ্ছি। তিনি জানেন, আমরা কোথায় আছি। তিনি আমাদের দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছেন। সময় হলে বা প্রয়োজন দেখা দিলে,তিনি উপযুক্ত স্থানে আমাদের সাথে দেখা করবেন।

একটি সুন্দর বাড়ীতে (আসাম হাউজ) আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হলো। একটি ঘরে আমি আর তাজউদ্দিন ভাই, অন্য ঘরে রুস্তমজী। আমরা খুবই ক্লান্ত। স্নান করা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের সাথে অতিরিক্ত কোন কাপড় নেই। রুস্তমজী আমার পরিধেয় বস্ত্রের অভাবের কথা জেনে তার ইস্ত্রি করা পায়জামা ও কোর্তা দিলেন। ছ'ফুট লম্বা মানুষের কোর্তা সামাল দেয়া আমার পক্ষে কণ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

তখন প্রায় মধ্যরাত। স্নানের কাজ সেরে নিলাম। এত রাতে খাবার পাওয়া কষ্টকর, তবুও গোলক মজুমদার আমাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা

করেন। খাওয়ার পর টেবিলের ওপর রাখা একটি মানচিত্রের দিকে আমরা চোখ রাখি। কোনদিন যুদ্ধ করিনি বা এর কথা ভাবিনি। অথচ আজ যুদ্ধের পরিকল্পনায় অংশ নিতে হচ্ছে। রুস্তমজী রণকৌশলী। আমাদের মূল উদ্দেশ্য তাকে জানালাম। আজ রাতেই আমাদের অনেকগুলো সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আমাদের প্রথম কাজ হলো দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা রাজনৈতিক নেতাদের একত্রিত করে তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসা। আর দ্বিতীয় কাজ হলো। মুক্তিযুদ্ধকে সংঘবদ্ধ ও সুসংহত করা। বি এস এফ এর বিভিন্ন প্রধানদের এই গভীর রাতে ডাকা হয়। তার যোগাযোগ প্রধানের সাথে এই রাতেই যোগাযোগ করা হলো। আওয়ামী লীগের এম এল এ এম পি এ সহ নেতাদের একটি তালিকা তৈরী করে এতে তাদের সম্ভাব্য অবস্থানের কথা উল্লেখ করা হয়। এ সব নেতার সাথে যোগাযোগের জন্যে এই তালিকা বিভিন্ন সীমান্ত ফাঁড়িতে প্রেরণ করা হয়। আমরা বিশেষ ক'জন দলীয় নেতার কথা জানালাম যাদের সাথে আমাদের সহসাই যোগাযোগ প্রয়োজন। যশোর সেনানিবাস অবরুদ্ধ, কুষ্টিয়াতে আমরা জয়লাভ করেছি এবং চুয়াডাঙ্গাতেও আমাদের শক্ত ঘাটি হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে অতি দ্রুত আমাদের সুসংবদ্ধ হয়ে উঠতে হবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের এই খবর পৌছে দেয়া প্রয়োজন। বি এস এফ এর মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা সহ নেতৃবৃন্দের কাছে নির্দেশ পৌছে দেয়া শুরু করি।

যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের যথাসম্ভব সাহায্য দিতে বি এস এফ রাজী হলো। পরার্মশ করতে রাত প্রায় শেষ হয়ে গেল। ভোরের দিকে কিছুক্ষণের জন্য আমার বিছানায় যাই। ঘুম থেকে উঠে বাথ রুমে গিয়ে রেডিওর শব্দ শুনি। বি এস এফ এর চট্টপাধ্যায় এই রেডিও দিয়েছিলেন। রেডিওতে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পাক হানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের কাহিনী শুনি। আমাদের মা-বোনদের ওপর বর্বর অত্যাচারের কথা শুনে মনের অজান্তেই বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মত দু-চোখ বেয়ে অশ্রু নেমে এলো।

বি, এস, এফ আমাদের আতিথেয়তার ভার নেয়। চট্টপাধ্যায়ের সাথে পরিচয় হয়ে গেছে। ৯ মাস আমাদের সাথে তিনি বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে কাজ করেছেন। আমাদের সিদ্ধান্তগুলো কার্যকরী করার দায়িত্ব ছিল তার ওপর। একজন বিদেশী রাষ্ট্রের কর্মচারী হয়ে এমন নিষ্ঠার সাথে কাজ করেও তিনি কোনদিন কোন কৃতিত্বের দাবী করেন নি। মিঃ চট্টপাধ্যায় আমার জন্য একটি প্যান্ট ও একটি শার্ট যোগাড় করলেন।

আমাদের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হলো। যে সব স্থানে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান কেন্দ্র গড়ে ওঠেছে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয়। কিছুক্ষণ পর চুয়াডাঙ্গার সাথে যোগাযোগ হলো। চুয়াডাঙ্গাকে আমরা বিপ্লবী সরকারের

রাজধানী করার পরিকল্পনা মনে মনে ঠিক করেছি। পরদিন দেখি, সংবাদ পত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়ে গেছে। এই খবর ফাঁস না করার জন্যে ডাঃ আসহাবুল হককে আমি আগেই অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু পরে বুঝলাম, আনন্দের আতিশয্যে বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে তিনি তা বলে দিয়েছেন। ডাঃ আসহাবুল হক, মেজর ওসমান ও তওফিক ইলাহীর সাথে আমাদের ফোনে যোগাযোগ হলো। মেজর ওসমানকে বল্লাম তার সাথে খুব সহসাই আমাদের দেখা হবে। তিনি বেশ প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও গোলা বারুদের একটি তালিকা তৈরী করে রাখেন।

সেদিন ছিল কোলকাতায় 'বন্দ'। বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থনে এই বন্দ ডাকা হয়। কোলকাতার জনজীবন একেবারে স্তব্ধ। গাড়ী ঘোড়া সব কিছু বন্ধ। কোলকাতার ভাইরা সেদিন আমাদের আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। কোলকাতাস্থ পাক সরকারের কার্যালয়ের চার দিকে হাজার হাজার জনতা বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

আমাদের জন্য একটা বাড়ী দরকার। রুস্তমজী বাড়ীর সন্ধানে আমাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। পাকিস্তান কনস্যুলেট এর কাছে আমাদের জন্য একটি বাড়ী নির্বাচিত করা হলো।

ঘরে ফিরেই তাজউদ্দিন ভাই ও আমি তিনটি খসড়া পরিকল্পনায় হাত দেই। এ গুলো হলো দলের সাংগঠনিক, সরকার গঠন ও সামরিক পরিকল্পনার কাজ। যা মাথায় এসেছে, তাই লিখেছি। সাথে সাথে ছক কেটে তীর চিহ্ন দিয়ে সাংগঠনিক কাঠামো তৈরী করেছি। এরপর মুক্তিযুদ্ধের জন্য সারাদেশকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়।

পরদিন আমাদের দিল্লী যাওয়ার কথা। বি এস এফ ও অন্যেরা খুবই সাবধানতা অবলম্বন করছে আমাদের অবস্থান গোপন রাখার জন্য। পরদিন সকালে সীমান্তের দিকে যাই। খবর অনুযায়ী মেজর ওসমান অস্ত্রশস্ত্রের একটা তালিকা তৈরী করে নিয়ে আসেন। মেজর ওসমানকে কিছু অস্ত্র দেয়া হলো। এর মধ্যে এল এম জিও ছিল। ইতিমধ্যে খবর এলো পাক সৈন্যরা যশোর সেনানিবাস থেকে বের হবার চেষ্টা করছে। তাকে এক্ষুনিই যেতে হবে। মেজর ওসমান সদ্য পাওয়া এল এম জি কাঁধে নিয়ে দ্রুত রওয়ানা হলেন।

চুয়াডাংগা, কুষ্টিয়া, যশোর অঞ্চলে স্বাধীনতা যুদ্ধে মেজর ওসমানের সাথে তার স্ত্রীও সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। এই তেজস্বী মহিলা অশেষ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সাহসী এই বীরের স্ত্রী বেগম ওসমান মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণার উৎস হয়ে ওঠেন। একদিকে তিনি স্বামীকে যুদ্ধের মুখে ঠেলে দিতেন, অপরদিকে বি ডি আর, জোয়ান ও মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি অনুপ্রাণিত করতেন। নিজের হাতে রান্না করে তিনি যুদ্ধ শিবিরে পাঠিয়ে দিতেন।

১৯৭১ সালের ৬ই নভেম্বর রাতে সেনা বাহিনীর সদস্যদের গুলিতে বেগম ওসমান নিহত হন।

১৯৭১ সালের ১লা এপ্রিল। আজ আমরা দিল্লী যাচ্ছি। গোলক মজুমদার আমাদের সাথে আছেন। সরজিৎ চট্টপাধ্যায়ের বিমান বন্দরে আমাদের সাথে দেখা করার কথা রয়েছে। একটি নির্দিষ্ট কক্ষে আমাদের বসার ব্যবস্থা করা হয়। সাংবাদিক ও অন্যান্য যাত্রীর দৃষ্টি এড়িয়ে আমাদের যেতে হবে। ইতিমধ্যেই চট্টপাধ্যায় আমাদের দুজনের জন্য একটি স্যুটকেস ও একটি ব্যাগ নিয়ে এসেছেন। হাত ব্যাগে কাগজ পত্র, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি রয়েছে। সুটকেসে আমাদের পরিধেয় কাপড়, তোয়ালে ও সাবান। রাত ১০ টার দিকে জীপে করে একটি মিলিটারী মালবাহী বিমানের কাছে আমাদের নিয়ে আসা হল। মই দিয়ে আমরা বিমানের কক পিটে উঠি। পাইলট ও তার সহকারীদের ছাড়া বিমানে বসার অন্য কোন আসন নেই। শুধুমাত্র কেনভাসের বেল্ট দিয়ে আমাদের চারজনের বসার একটি ব্যবস্থা করা হল। বিমানের পিছন দিক উন্মুক্ত। এ দিয়ে অনায়াসে মাল উঠা নামা করা যায়। তখনও এতে মাল ভর্তি ছিল। এই মালবাহী সামরিক বিমানে নেয়ার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সকল এজেন্সী থেকে আমাদের যাত্রা গোপন রাখা।

এটা ছিল একটা পুরনো রাশিয়ান বিমান। এর শব্দ ছিল বিকট। বিমানের যাত্রা শুরু হল। সমস্ত ককপিট কাঁপছে। তাজউদ্দিন ভাই বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করেও ওভাবে বসে থাকতে পারলেন না। দিল্লী পৌঁছতে রাত শেষ হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পর একটা কেনভাস বিছিয়ে আমি ও তাজউদ্দিন ভাই মেঝেতে শুয়ে পড়ি। গরমে আমরা ঘামছিলাম। বিমানের কাঁপনের সাথে আমাদের শরীরও কাঁপছিল। এমনি করে আধা ঘুমে আধা জেগে ভোরের দিকে আমরা দিল্লী পৌঁছি। সেখানে মিলিটারী বিমান বন্দরে আমাদের জন্য একটি গাড়ী প্রস্তুত ছিল। একজন কর্মকর্তা আমাদের নিয়ে গেলেন। চট্টপাধ্যায় আমাদের সাথে ছিলেন। মজুমদার গেলেন তাঁর মেয়ের বাসায়। প্রতিরক্ষা কলোনীর একটি বাড়ীতে আমাদের রাখা হলো। পরে জেনেছি বাড়ীটি ছিল বি এস এফ এর একটি অতিথিশালা। এ বাড়ীতে অন্য আর কেউ নেই। আমি ও তাজউদ্দিন ভাই এক ঘরে, চট্টপাধ্যায় অন্য ঘরে। আমাদের ঘরে দুটি বিছানা রয়েছে। ঢাকা থেকে বেরোবার পর থেকে দুজন একত্রেই থাকছি। এতে সুবিধা অনেক। রাতে ঘুম না আসা পর্যন্ত সব কিছু পর্যালোচনা করার সুযোগ পাই। গোলক মজুমদার ও রুস্তমজী ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আমাদের একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করার কাজে লিপ্ত রয়েছেন। আমাদের কিন্তু বিলম্ব সইছে না। ইতি-

মধ্যেই দিল্লীর বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা প্রশ্ন তুলেছে যে মাহমুদ আলী প্রকৃতই তাজউদ্দিন আহমেদ এবং রহমত আলী ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম কিনা।

ভারতের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার আচরণে কখনো অবাক হয়েছি আবার কখনো ভীত হয়েছি। তবে 'র' RAW নামক একটি গোয়েন্দা সংস্থা মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজেদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় খুবই ব্যস্ত ছিল। এই সংস্থাটির কার্য কলাপে কখনই আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন আমাদের সাথে আলাপ করে। তারা নিশ্চিত হতে চায় আসলেই আমরা আওয়ামী লীগের লোক কিনা। তাদের আলোচনার পর সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার মিঃ কাউলের কিছুটা বিশ্বাস জন্মে যে সত্যিই আমরা আওয়ামী লীগের লোক।

মেজর ওসমানের অস্ত্রের তালিকাটা তখনো আমার পকেটে। কথায় কথায় মিঃ মীরন আমাদের জানান যে, আলোচনার মাধ্যমে অস্ত্র পেতে আমাদের বিলম্ব হবে। মিঃ মীরনের কাছে আরো জানতে পারি, লণ্ডনে মিনহাজ উদ্দিনের সাথে তাদের কথা হয়েছে। আমাদের কোন খবর থাকলে তিনি তা পৌঁছে দিতে পারেন।

মিনহাজ আমার পূর্ব পরিচিত। আমি তাকে চিঠি লিখি। আমি চিঠিতে অস্ত্রের একটা তালিকা পাঠাই। তাকে জানাই, লণ্ডনস্থ বাংগালীরা ইচ্ছা করলে আমাদের জন্য অস্ত্রের ব্যবস্থা করতে পারে। তখনো বুঝে উঠতে পারিনি অস্ত্র কেনা ও তা সরবরাহ করা তত সহজ নয়।

ইতিমধ্যে আমরা খবর পেলাম, রেহমান সোবহান ও ডঃ আনিসুর রহমান দিল্লীতে পৌঁছেছেন। তাছাড়া এম আর সিদ্দিকী, সিরাজুল হক বাচ্চু মিয়া ও যুবনেতা আবদুর রউফ তখন দিল্লীতে ছিলেন। তাদের সকলের সাথে আলাদা আলাদাভাবে আমাদের বৈঠক হয়। এম আর সিদ্দিকীর কাছে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলের মোটামুটি কিছু খবর পাই। তার কাছে চট্টগ্রামের কালুর ঘাট বেতার থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠের কাহিনীও শুনি। তিনি জানান, মেজর জিয়া একটা জীপে করে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতারা এক প্রকার জোর করে জিয়াকে দিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করান। তিনি আরো জানান, চট্টগ্রাম থেকে তারা একটি ট্রান্স-মিটার আগরতলাতে নিয়ে এসেছেন এবং তা দিয়ে প্রচার কাজ চালানো হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্য সরকার ও জনগণ তাদেরকে সর্ব প্রকার সাহায্য করেছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। একটি সরকার গঠন করার জন্য তিনি আমাদের অনুরোধ জানান। কর্মীদের প্রতি শুভেচ্ছা নিয়ে তিনি আগরতলা চলে যান। তবে তাকে সরকার গঠন করার ইঙ্গিত দিয়ে দিলাম। আবদুর রউফকে কিছু নির্দেশ সহ রংপুর পাঠিয়ে দেই।

এ সময় ময়মনসিংহ থেকে রফিকউদ্দিন ভুঁইয়া ও সৈয়দ আবদুস সুলতানের চিঠি পেলাম। সৈয়দ সুলতান বাংলাদেশের পক্ষে জাতিসংঘে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

এমনিভাবে দিল্লী আসার পর ২দিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে রুস্তমজী ও গোলক মজুমদার প্রধানমন্ত্রী ইন্দীরা গান্ধীর সাথে দেখা করেছেন। আমরা তাদের দু'জনকে এ কথা বুঝাতে সক্ষম হই যে, বাংগালী হলেও আমাদের জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় সত্বা বাংলাদেশের ভু-খণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমরা আমাদের ৫৪ হাজার বর্গমাইল ভু-খণ্ডের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করি।

৪ঠা এপ্রিল তাজউদ্দিন ভাই ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎ-কালে তাদের কোন সহযোগী ছিল না। বৈঠকে উপস্থিত না থাকলেও পূর্বাপর আলোচনার বিষয় আমার জানা ছিল। সাক্ষাতে যাওয়ার পূর্বে তাজউদ্দিন ভাই আমার সাথে কয়েক ঘন্টা ধরে সম্ভাব্য আলোচ্য সূচী নিয়ে আলোচনা করে যান।

মিসেস গান্ধীর সাথে সাক্ষাতের পর তাজউদ্দিন ভাই আমাকে সব কিছু জানান। মিসেস গান্ধী বারান্দায় পায়চারী করছিলেন। তাজউদ্দিন ভাই এর গাড়ী পৌছে যাওয়ার পর তাঁকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী স্টাডী রুমে নিয়ে যান। স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী প্রথম প্রশ্ন করেন "হাউ ইজ শেখ মুজিব, ইজ হি অল রাইট?" এই প্রশ্ন সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত ছিলাম। কেননা এই প্রশ্নের সম্মুখীন আমাদেরকে আরো অনেক বার হতে হয়েছে। মিসেস গান্ধীর প্রশ্নের জবাবে তাজউদ্দিন ভাই বলেন, "বংগবন্ধু আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি তাঁর স্থান থেকে আমাদের নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের বিশ্বাস, তিনি আমাদের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। ২৫শে মার্চের পর তাঁর সাথে আমাদের আর যোগাযোগ হয়নি।" সাক্ষাতে তাজউদ্দিন ভাই আরো বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে। যে কোন মূল্যে এই স্বাধীনতা আমাদের অর্জন করতে হবে। তিনি বলেন, পাকিস্তান আমাদের আন্তর্জাতিকীকরণের চেষ্টা চালাতে পারে। যে কোন মূল্যে পাকিস্তানের এই প্রচেষ্টা বন্ধ করতে হবে। তাজউদ্দিন ভাই বলেন, আমাদের অস্ত্র ও মুক্তি যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হবে। প্রয়োজন হবে বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থী-দের জন্য আশ্রয় ও খাদ্য। মাতৃভূমির স্বাধীনতা যুদ্ধে তাজউদ্দিন ভাই ভারত সরকারের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। বাংলাদেশের নেতা জানান, আমাদের পররাষ্ট্রনীতি হবে জোট নিরপেক্ষ, সকলের প্রতি বন্ধুত্ব কারো প্রতি শত্রুতা নয়। বাংলার মানুষের সংগ্রাম মানবতার পক্ষে ও হিংস্র ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। সকল গণতন্ত্রকামী মানুষ ও সরকারের সহায়তা আমরা চাই।

আমরা একটি সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করি। কেননা ভারত সরকারের সাথে একটি সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের কথা বলা উচিত। এদিকে সরকার গঠনের জন্যে বিভিন্ন ফ্রণ্ট থেকে চাপ আসা অব্যাহত

রয়েছে। সরকার গঠন করার ব্যাপারে তাজউদ্দিন ভাইকে খুবই চিন্তিত মনে হয়। অস্ফুটস্বরে তিনি বলে ফেলেন বংগবন্ধু আমাকে কি বিপদে ফেলে গেলেন। আমি বিরক্তির সাথে জানতে চাইলাম সরকার গঠনের ব্যাপারে তাজউদ্দিন ভাই দ্বিধাগ্রস্থ কেন? জবাবে তাজউদ্দিন ভাই বলেন আপনি আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি জানেন না। সরকার গঠন করার প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝি। জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই তা প্রয়োজন। কিন্তু বংগবন্ধু ও অন্যান্য নেতাদের অনুপস্থিতিতে সরকার গঠন করে নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে।

আমার সরল মনের কাছে দেশের এমন একটি ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা রাজনৈতিক চেতনার দিক দিয়ে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য বলে মনে হয়।

তাজউদ্দিন ভাই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, কাকে নিয়ে সরকার গঠন করা হবে? আমি স্বাভাবিক উত্তর দিলাম। বংগবন্ধু সরকার গঠন করে রেখে গেছেন। আমি বললাম, যে ৫জন নিয়ে বংগবন্ধু হাই কম্যাণ্ড গঠন করেছিলেন, এই ৫জনকে নিয়েই সরকার গঠন করা হবে। দলীয় প্রধান বংগবন্ধু, সাধারণ সম্পাদক ও তিন জন সহ সভাপতি নিয়ে এই হাই কম্যাণ্ড পূর্বেই গঠিত হয়েছিল। তাজউদ্দিন ভাই পুনরায় প্রশ্ন করেন, প্রধানমন্ত্রী কে হবেন? দ্বিধা না করে এবারও জবাব দিলাম, ২৫শে মার্চের পর থেকে আজ পর্যন্ত যিনি প্রধান দায়িত্ব পালন করে আসছেন তিনিই স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ের দায়িত্ব পালন করবেন।

তাজউদ্দিন ভাই অনেকক্ষণ ভাবলেন। আমার প্রস্তাবের যৌক্তিকতা কোনভাবেই তিনি নাকচ করতে পারলেন না। তিনি এত বেশী কেন ভাবছিলেন তার উত্তর জানতে আমার অনেক সময় লেগেছিল।

তাজউদ্দিন ভাই নিষ্ঠাবান ও সংগ্রামী পুরুষ। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দল ও দেশের স্বার্থে কাজ করতেন। নিজে বেশীর ভাগ কাজ করেও তিনি কৃতিত্বের দাবী করতেন-না। সকল কৃতিত্ব বংগবন্ধুকে দিয়ে তিনি নিজেকে সর্বদাই দূরে রাখার চেষ্টা করেছেন। তাই আমি যখন বিপ্লবী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার নেয়ার জন্যে তার নাম প্রস্তাব করি তখন এই প্রস্তাব মেনে নিতে তাঁর খুবই কষ্ট হচ্ছিল। এই দায়িত্বের গুরুভার সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি আবার আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের কথা স্মরণ করেন। তাঁরা কে কোথায় কি অবস্থায় আছেন, এ নিয়ে তিনি বিশেষভাবে চিন্তা করছেন। পত্রিকাতে ইতিমধ্যে অনেকের মৃত্যুসংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। অবশ্য পত্রিকাতে প্রকাশিত নিহতের তালিকায় তাজউদ্দিন ভাই এবং আমার নামও রয়েছে।

নিহতের তালিকায় আমাদের দুজনের নাম দেখে ভেবেছিলাম, আমাদের নেতারাও হয়তো জীবিত রয়েছেন। আমাদের আর একটি চিন্তা হলো বংগবন্ধুকে সরকারের প্রধান করা হলে আমাদের আন্দোলনের ব্যাপারে কি প্রতিক্রিয়া হবে। অথবা

তার জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কারণ দেখা দিবে কিনা। এ নিয়ে দুজনে অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা করি। পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি দেই আবার খণ্ডন করি। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলাম, ফলাফল যাই হোক, বংগবন্ধুকে সরকারের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করতে হবে।

তাজউদ্দিন ভাই বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে বংগবন্ধুর সহকর্মী হিসেবে তাঁর সাথে কাজ করেছি। তবে এই ব্যাপারে আমি স্থির নিশ্চিত যে কোন প্রকার ভয় ভীতি বা চাপের মাধ্যমে পাক সরকার বংগবন্ধুকে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে কোন বিবৃতি দিতে সমর্থ হবে না।

আমরা যেহেতু একটি যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম এবং বংগবন্ধু তখন শত্রুর কারাগারে বন্দী কাজেই সে সময় আমাদের সব কিছুই ভাবতে হয়েছিল। তা ছাড়া ভাবাভাবির বেশী সময়ও ছিলনা। কেননা আমাদের ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। একটা সরকার গঠন করা ছাড়া কাজে এগুনো যাচ্ছে না। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সিপাহসালার শত্রুর হাতে বন্দী। আবার তাকে বাদ দিয়ে যে মুক্তিযুদ্ধের কথা কল্পনাও করা যায় না।

তারপর কথা উঠলো দেশের নাম কি হবে। আমি বল্লাম, 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'। তাজউদ্দিন ভাই এর পছন্দ হলো। নামটি ঠিক করার সময় আমাদের মাথায় গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের কথা মনে হচ্ছিল। এসময় সরকারী কাগজপত্রে ব্যবহারের জন্য একটি মনোগ্রাম ঠিক করা দরকার। মনোগ্রাম আমাদেরই ঠিক করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের যে মনোগ্রাম সরকারী কাগজপত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা আমার হাতে আঁকা। চারপাশে গোলাকৃতি লাল এর মাঝখানে সোনালী রংএর মানচিত্র। মনোগ্রাম দেখে তাজউদ্দিন ভাই পছন্দ করলেন। শুধু তাই নয়, সাথে সাথে তিনি তা অনুমোদনও করেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এটি তাঁর প্রথম সরকারী অনুমোদন।

এই দিন সন্ধ্যার পর রেহমান সোবহান ও ডঃ আনিসুর রহমান আমাদের সাথে দেখা করতে এলেন। রেহমান সোবহান এর আগে একবার দেখা করে গেছেন। এ সময় আনিসুর রহমান স্বচক্ষে দেখা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাক বাহিনীর নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দেন। তিনি নিজের বাসার গেটে তালা ঝুলিয়ে অন্যদিক দিয়ে বাসায় ঢুকে স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে বাসার মেঝেতে শুয়ে রাত কাটান এবং জানালা দিয়ে সেই নারকীয় হত্যাকাণ্ড দেখেন। পাক দস্যুরা তার বাসার গেটে দরজা দেখে চলে যায়। সারাদিন আমি তাজউদ্দিন ভাইএর বক্তৃতা তৈরী করছি। রেহমান সোবহান বক্তৃতার খসড়া রচনায় আমাকে সহায়তা করেন। সেদিনই তার কাছে জানতে পারি যে, ডঃ কামাল হোসেন গ্রেফতার হয়েছেন। রেহমান সোবহান জানান, তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করবেন। তাঁর ইংরেজী খসড়ার একটা অংশ আমার খুব ভাল লেগেছিল। সেটা ছিল "Pakistan is dead and burried under mountain

of Corpses" বাংলায় এর অনুবাদ করি পর্বত প্রমাণ লাশের নীচে পাকিস্তানের কবর রচিত হয়েছে। শেষ অনুচ্ছেদে আমি লিখি। 'আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা, ছেলেদের রক্ত ও ঘামে মিশে জন্ম নিচ্ছে নতুন বাংলাদেশের।' এক সময় চোখের জলে বক্তৃতার খসড়ার এক অংশ ভিজে গেল। চোখ মুছে আবার লিখতে শুরু করি। লেখা শেষ হলে সমস্ত বক্তৃতাটা তাজউদ্দিন ভাইকে শোনাই।

রাজনৈতিক খসড়া প্রণয়নে তাজউদ্দিন ভাই খুবই দক্ষ। কোন একটি খসড়া করার পর তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, মাথা নড়তেন, কোন স্থানে থেমে নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করে বলতেন। প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতেন। এমনিভাবে চূড়ান্ত বক্তব্য তৈরী হতো। আমাদের দু'জনের মন ও চিন্তা যেন একইভাবে কাজ করছিল।

আমার হাতের লেখা খুব ভাল নয়। তাজউদ্দিন ভাইএর বক্তৃতা টেপ করতে হবে। আমি একটি টেপ রেকর্ডারের ব্যবস্থা করি। তিনি সমস্ত বক্তৃতা নিজের হাতে লিখে নিলেন। চট্টপাধ্যায় তার নিজের হাতে আরো একটা কপি করে নেন। তখন তিন জনের হাতে বক্তৃতার তিনটি কপি হয়ে গেল। পরদিন তাজউদ্দিন ভাই দ্বিতীয়বারের মত ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করেন। ইন্দিরা গান্ধী জানান, বঙ্গবন্ধুকে বন্দী করে পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অবশ্য এই খবর পাকিস্তান সরকার তখনো সরকারীভাবে প্রকাশ করেনি।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে তাজউদ্দিন ভাই বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করেন। সিদ্ধান্ত হয় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার ভারতের মাটিতে অবস্থান করতে পারবে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, তাদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ, এবং শরণার্থীদের আশ্রয় ও খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের খবরাখবর প্রচারের জন্য একটি বেতার স্টেশন স্থাপনের বিষয়ও আলোচনা হয়।

এদিকে আমাদের নেতারা কে কোথায় আছেন সে খবর আমরা এখনো জানি না। তাঁদের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য একটি ছোট বিমানের ব্যবস্থা করা হলো। স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তা করার জন্য ভারত সরকার একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলকে আমাদের সাথে দেন। ঐ জেনারেলের নাম নগেন্দ্র সিং। তাঁর বয়স ৬০ এর উর্দ্ধে। তিনি সামরিক ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ দেবেন। জেনারেল সিং মনে-প্রাণে একজন খাঁটি সৈনিক। ব্যক্তিগত জীবনে খুবই ধর্মপ্রাণ। তাছাড়া মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন মানুষ। আমাদের সংগ্রামের প্রতি তিনি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধাশীল। দিল্লীতে বসেই তাজউদ্দিন ভাইয়ের বক্তৃতা টেপ করা হয়। বক্তৃতার পূর্বে আমার কণ্ঠ থেকে ঘোষণা প্রচারিত হয় এখন তাজউদ্দিন আহমদ জাতির উদ্দেশে বক্তৃতা দেবেন। এরপর তাজউদ্দিন ভাই বক্তৃতা শুরু করেন।

আমরা বিমানে করে আবার কলকাতা ফিরে এলাম। এখানে এসে জানলাম মনসুর ভাই ও কামরুজ্জামান (হেনা ভাই) এসেছেন। তাঁদের কথা শুনে কিছুটা স্বস্তি পেলাম। খবর নিয়ে জানলাম কলকাতায় গাজা পার্কের কাছে একটা বাড়ীতে কামরুজ্জামান ভাই থাকেন। শেখ ফজলুল হক মনি ঐ বাড়ীতে আছেন। পরে আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ ও সিরাজুল ইসলাম খান এই বাড়ীতে ঘাঁটি করেন।

আমি ও তাজউদ্দিন ভাই কামরুজ্জামান ভাইয়ের কাছে দেখা করতে গেলাম। আমরা তার কাছে এ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাবলী ব্যক্ত করি। কামরুজ্জামান ভাইয়ের মনে একটা জিনিস ঢুকানো হয়েছে যে আমরা তাড়াহুড়া করে দিল্লী গিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করেছি। নেতাদের জন্য অপেক্ষা করা আমাদের উচিত ছিল।

শেখ মনি আমাকে অন্য একটি ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে এটা বুঝালেন যে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আমাদের বিলম্বে সাক্ষাৎ হওয়ার কারণ হলো তাঁরা এখান থেকে ক্লিয়ারেন্স দেননি। তিনি বুঝাতে চাইলেন তাঁরা একটি শক্তিশালী গ্রুপ এবং তাঁদের সাথে ইন্দিরা গান্ধীর পূর্ব থেকেই যোগাযোগ রয়েছে।

আমাদের সরকার গঠনের ব্যাপারে সন্তুষ্ট নন এমন অনেক এম পি এ, এম এন এ ও আওয়ামী লীগ নেতা কলকাতায় এসেছেন। প্রিন্সেপ স্ট্রীটের এম এল এ হস্টেলে ওঁরা উঠেছেন।

একটা জিনিস বুঝতে পারলাম আমাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে। শহরের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে আলাপ-আলোচনা চলছে। ইতিমধ্যে কামরুজ্জামান ভাইকে নিয়ে কতিপয় এম পি ও নেতা প্রিন্সেপ স্ট্রীটে একটি বৈঠক করেছেন। আর এতে ভালভাবে সুর মিলিয়েছেন মিজানুর রহমান চৌধুরী। তাজউদ্দিন ভাই আমাকে ডেকে বললেন, আপনাকে আগেই বলেছিলাম এই দল দিয়ে কি স্বাধীনতা যুদ্ধ হবে ?

আমরা বি এস এফ-এর লর্ড সিনহা রোডের একটি অফিসে অবস্থান করছি। ভারত সরকার আমাদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। আমরা ভারতের মাটিতে, ইন্দিরা গান্ধীর সরকার এই কথা প্রকাশ করতে রাজী নয়।

আমাদের নেতাদের বিভিন্নমুখী বৈঠকে তাজউদ্দিন ভাই ও আমি বিশেষভাবে বিব্রতবোধ করছি। কামরুজ্জামান ভাই খুবই সুবিবেচক মানুষ। তিনি ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা বললেন। রাতের বেলা লর্ড সিনহা রোডে আমাদের বৈঠক বসল। উপস্থিত বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন কামরুজ্জামান, মিজান চৌধুরী, শেখ মনি, তোফায়েল আহমেদ ও আরও অনেকে। শেখ মনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে, বঙ্গবন্ধু শত্রু শিবিরে বন্দী, বাংলার যুবকরা বুকের তাজা রক্ত দিচ্ছে, এখন কোন মন্ত্রীসভা গঠন করা চলবে না।

মন্ত্রী-মন্ত্রী খেলা এখন সাজে না। এখন যুদ্ধের সময়। সকলকে রণক্ষেত্রে যেতে হবে। রণক্ষেত্রে গড়ে উঠবে আসল নেতৃত্ব। এই যুদ্ধ পরিচালনার জন্য একটি বিপ্লবী কাউন্সিল গঠন করতে হবে।

তাজউদ্দিন ভাই ও আমি ছাড়া বৈঠকে উপস্থিত প্রায় সকলে শেখ মনির বক্তব্য সমর্থন করেন। তাজউদ্দিন ভাই যেহেতু নিজে প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন তাঁর পক্ষে পাল্টা জবাব দেয়া সম্ভব নয়। তাই শেষ পর্যন্ত আমাকেই উঠে দাঁড়াতে হলো। উপস্থিত প্রায় সকলেরই ধারণা ছিল আমি ও তাজউদ্দিন ভাই আগে ভাগে দিল্লী গিয়েছি ক্ষমতা কুক্ষীগত করার জন্য।

আমি আমাদের দিল্লী যাওয়ার সমর্থনে ও শেখ মনির বক্তব্যের আমি কয়েকটি যুক্তি পেশ করি। আমার প্রথম যুক্তি ছিল, দিল্লী যাত্রার পূর্বে আমাদের জানা ছিল না কারা বেঁচে আছেন এবং কাকে কোথায় পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় যুক্তি হলো, ইন্দিরা গান্ধীর সাথে তাজউদ্দিন ভাই দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কথা বলেছেন। দলের সভাপতি বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কথা বলার এখতিয়ার তাজউদ্দিন ভাইয়ের রয়েছে। তাছাড়া ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে মাত্র। ভবিষ্যতে আরও আলোচনা হবে। তখন দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ করতে সমর্থ হবেন। তৃতীয়ত আমরা বঙ্গবন্ধু নিয়োজিত হাই কম্যাণ্ড নিয়ে অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রীসভা গঠনের পরিকল্পনা করেছি মাত্র।

আমি আরও বললাম, বাংলাদেশ বার ভুঁইয়ার দেশ। বারটি বিপ্লবী কাউন্সিল গড়ে ওঠা বিচিত্র কিছু নয়। আমাদের অবশ্যই আইনগত সরকার দরকার। কেননা, আইনগত সরকার ছাড়া কোন বিদেশী রাষ্ট্র আমাদের সাহায্য করবে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি নির্বাচিত সরকারের নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ খুব কমই হয়েছে। স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার অধিকার একটি আন্তর্জাতিক নীতি। যে কোন জনগোষ্ঠীর তাদের নির্বাচিত সরকার দ্বারা শাসিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বাংলার মানুষের সে গণতান্ত্রিক অধিকারের অবমাননা করেছে। তাই আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠার অধিকার হরণই হচ্ছে জনগণের অধিকার হরণ।

শেখ মনির বক্তব্য খণ্ডন করার জন্য দুটি যুক্তি দিলাম। শেখ মনির প্রস্তাবিত বিপ্লবী কাউন্সিল যদি বিভিন্ন মতাবলম্বীরা দুইটি, পাঁচটি বা সাতটি গঠন করে তাহলে জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধারা কোনটির আদেশ মেনে চলবে না। কোন্ কাউন্সিলের সাথে বিদেশের সরকার সহযোগিতা করবে। এই ক্ষেত্রে একাধিক কাউন্সিল গঠনের সম্ভাবনাই নয় কি?

সরকার প্রতিষ্ঠার অধিকারই হচ্ছে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। আজকে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা না করে অন্য কোন বিপ্লবী কাউন্সিল গঠন করা হলে জনগণের মৌলিক অধিকারকে অবমাননা করা হবে। সেটা নিশ্চয়ই আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

আমার বক্তব্যের পর মিজান চৌধুরী ও শেখ মনি ছাড়া উপস্থিত প্রায় সকলে তাদের পূর্বের মনোভাব পরিবর্তন করেন।

কামরুজ্জামান ভাই আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, শেখ মনির কথানুযায়ী বিপ্লবী পরিষদ গঠন করা যায় কিনা। আমি তাকে বল্লাম, তা করা হলে যুদ্ধ বিপন্ন হবে। তিনি আমার কথার আর কোন প্রতিবাদ করলেন না। আমি তাকে বলি তার সাথে দেখা করে আমি বিস্তারিত সব কিছু বলবো।

সভার শেষ পর্যায়ে তাজউদ্দিন ভাই বক্তৃতা দেন। উপস্থিত সকলে সরকার গঠন করার ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য মেনে নিলেন।

১০ই এপ্রিল বিভিন্ন অঞ্চল সফরের জন্য আমাদের বের হবার কথা রয়েছে। একটি ছোট্ট বিমানের ব্যবস্থা করা হলো। বিমানটি খুব নিচু দিয়ে উঠতে পারে। বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আমাদের লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করাই এই সফরের উদ্দেশ্য। মনসুর ভাই ও কামরুজ্জামান ভাই ও তোফায়েল আহমেদ একই বিমানে আমাদের সাথে যাবেন।

পরদিন খুব ভোরে গাজা পার্কের বাড়ীতে কামরুজ্জামান ভাই এর সাথে দেখা করে তাকে বিস্তারিত সব কিছু অবহিত করি।

তাঁর সাথে বলতে গেলে আমার আত্মিক যোগাযোগ ছিল। তিনি প্রাণখোলা সহজ সরল মানুষ। দু'জনে একান্তে প্রায় আধ ঘন্টা আলোচনা করি। আলোচনার মাধ্যমে তার মনের জমাট মান অভিমান দূরীভূত হয়ে গেল। বিপ্লবী পরিষদ গঠনের জন্য যুবকদের প্রস্তাব যে অযৌক্তিক ও অবাস্তব এবং এটা যে যুদ্ধের সহায়ক হবে না তাও তিনি মেনে নিলেন।

তাজউদ্দিন ভাই এর অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ব্যাপারে তার আর কোন আপত্তি রইলোনা। আমাদের সাথে বিমানে আগরতলা যাওয়ার জন্য কামরুজ্জামান ভাইকে বল্লাম। তিনি বলেন, যাওয়ার ব্যাপারে তার কোন আপত্তি ছিল না। তিনি খবর পেয়েছেন, তার পরিবার পরিজন কোলকাতার পথে দেশ ত্যাগ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে তার এখানে থাকা প্রয়োজন। আমি খুশী মনে বিদায় নেই।

১০ই এপ্রিল। বিমানে আমাদের আগরতলা রওয়ানা হওয়ার কথা। তাজউদ্দিন ভাই, মনসুর ভাই, শেখ মনি, তোফায়েল আহমেদ ও আমি লর্ড সিনহা রোড থেকে সোজা বিমান বন্দরে যাই। অন্যান্যের মধ্যে মিঃ নগেন্দ্র সিং আমাদের সঙ্গী হলেন। বিমানটি খুবই ছোট। এতে বসার মত ৫/৬টি আসন ছিল।

খুব নীচু দিয়ে বিমান উড়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তৈরী অব্যবহৃত বিমান বন্দর বমলার কয়েকটিতে আমরা নামি। এ গুলো বাংলাদেশ সীমান্তের খুব কাছাকাছি।

ছোট ছোট বিমান বন্দর গুলো বাংলাদেশ সীমান্তের খুব কাছাকাছি। একটি বিমান বন্দরে আমরা দুপুরের খাবার খাই। বি এস এফ এর মাধ্যমে খবর দেয়া হলো কোন আওয়ামী লীগ নেতার খোঁজ পেলে পরবর্তী কোন বিমান বন্দরে তৈরী রাখতে।

উত্তর বঙ্গ তথা রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা অঞ্চলের কোন নেতা খুঁজে পাওয়া গেল না। এদের বেশীর ভাগ কোলকাতা এসে গেছেন। কিছুক্ষণ পর আমরা বাগডোগরা বিমান বন্দরে নামি। সেখান থেকে জীপে করে শিলিগুড়ি যাই। শহর থেকে অনেক ভেতরে সীমান্তের খুব কাছাকাছি একটি বাংলোতে উঠলাম। গোলক মজুমদার এখানে আমাদের অভ্যর্থনা জানান। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী এখানের কোন একটি জঙ্গল থেকে গোপন বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে তাজউদ্দিন ভাই এর বক্তৃতা প্রচারিত হবে।

এসময় তোফায়েল আহমদ কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েন। শেখ মনি বলেন, তোফায়েল আহমদের কলকাতা যাওয়া দরকার। শেখ মনি কিছু নির্দেশ সহ তোফায়েল আহমদকে কলকাতা পাঠিয়ে দিলেন।

মনসুর ভাই এর জ্বর এসে গেছে। তিনি শুয়ে আছেন। আমি তার পাশে বসে আছি। তার সাথে আমার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। প্রবাসী সরকারের প্রধান মন্ত্রীর পদ নিয়ে তার সাথে আলাপ করলাম। তিনি মত দিলেন তাজউদ্দিন ভাই প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি কোন আপত্তি করবেন না। এর পর মনসুর ভাই বা কামরুজ্জামান ভাই প্রধানমন্ত্রীর পদের ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন তোলেন নি।

পাঁচ জন নেতার মধ্যে তিন জনের সাথে আলাপের পর আমার খুব বিশ্বাস হয়েছিল যে, সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দিন ভাই এর প্রধানমন্ত্রীত্বে কোন আপত্তি করবেননা। তাছাড়া তাকে উপরাষ্ট্রপতি করা হয়েছে। বংগবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। এখন বাকী রইলো খন্দকার মোশতাক আহমদ। শুধু তিনি আপত্তি করতে পারেন।

তবুও চারজন এক থাকলে মোশতাক ভাইকেও রাজী করানো যাবে। এখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দিন ভাই এর প্রথম বক্তৃতা প্রচার করার পালা। তাজউদ্দিন ভাই প্রচারের জন্য চোখে অনুমতি দিলেন। প্রধানমন্ত্রীর রেকর্ড করা বক্তৃতার ক্যাসেট গোলক মজুমদারের কাছে দেয়া হলো।

শেখ মনি তাজউদ্দিন ভাই এর সাথে একান্তে আলাপ করতে চাইলেন। আমি বাইরের ঘরে বি এস এফ এর আঞ্চলিক কর্মকর্তার সাথে দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের অবস্থা ও শত্রুদের তৎপরতা নিয়ে আলোচনা করলাম।

শেখ মনির সাথে কথাবার্তা শেষে তাজউদ্দিন ভাই আমাকে ডাকেন। তিনি জানান, শেখ মনি এখন সরকার গঠনের ব্যাপারে রাজী নন। আগরতলা গিয়ে দলীয় এম পি, এম এন এ ও নেতা-কর্মীদের সাথে বৈঠক শেষে শেখ মনি সরকার

গঠনের প্রস্তাব করেছেন। আর এটা করা না হলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

আমি সরকার গঠনের পক্ষে পুনরায় যুক্তি দিলাম। আমি বল্লাম, সরকার গঠন করতে বিলম্ব হলে সংকট আরো বৃদ্ধি পাবে এবং এতে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। তাছাড়া সরকার গঠনের পরিকল্পনা তো নতুন কিছু নয়। মনসুর ভাই ও কামরুজ্জামান ভাই তাজউদ্দিন ভাইকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেনে নিয়েছেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও খন্দকার মোশতাক আহমদের তখনো দেখা নেই। তাঁরা কোথায়, কি অবস্থায় আছেন, সে খবর এখনো আসেনি। ইতিমধ্যে বন্ধুরাষ্ট্রের সাথে আমাদের কিছুটা রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সরকার গঠনে বিলম্ব হলে তাও নস্যাৎ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার গঠন করার ব্যাপারে ভারত সরকারকে আমরা আশ্বাস দিয়েছি। তাতে বিলম্ব হলে আমাদের নেতৃত্ব সম্পর্কেও তারা সন্দেহ পোষণ করবেন। আমাদের মধ্যে যে কোন্দল রয়েছে কোন অবস্থাতেই তা বাইরে প্রকাশ হতে দেয়া উচিত নয়। ভারত সরকারও জানেন, আমাদের বক্তৃতা শিলিগুড়ির এই জঙ্গল থেকে আজ প্রচারিত হবে। আমার এ সব কথা শেখ মনি মানতে রাজী নন। বেশী করে বুঝাতে চাইলে শেখ মনি জানান, তারা বংগবন্ধু থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। অতএব তাঁদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কারো প্রশ্ন তোলা উচিত নয়। এ সময় তাজউদ্দিন ভাই আমাকে বলেন, আমি যেন গোলক মজুমদারকে জানিয়ে দেই যে প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা আজ প্রচার করা হবে না। এ ব্যাপারে পরবর্তী সিদ্ধান্ত তাকে যথা সময়ে জানানো হবে।

গোলক মজুমদারকে ফোন করে জানাই যে আজ বক্তৃতা প্রচার করা হবে না। একথা শুনে তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, বিলম্ব করা কি ঠিক হবে? তিনি বলেন, যে মুহূর্তে সব কিছু ঠিক ঠাক সে মুহূর্তে তা স্থগিত রাখলে সব মহলে যে প্রশ্ন দেখা দেবে, তা আমরা ভেবে দেখছি কিনা। ইতিমধ্যে রেকর্ড করা ক্যাসেট নির্ধারিত স্থানে (জঙ্গলে) পৌঁছে গেছে।

আমি গোলক মজুমদারকে বল্লাম ক্যাসেট যদি পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে প্রচার করে দিন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এই একটি মাত্র সিদ্ধান্ত এককভাবে নিয়েছিলাম। এই দিন ছিল দশই এপ্রিল। রেডিও অন করে রেখে খেতে বসেছি। খাওয়ার টেবিলে তাজউদ্দিন ভাই ও শেখ মনি আছেন। রাত তখন সাড়ে নটা। সেই আকাংখিত মুহূর্ত আসলো। প্রথমে আমার কণ্ঠ ভেসে আসল। ঘোষণায় আমি বলেছিলাম, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ এখন বক্তৃতা দেবেন। প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা প্রচারিত হল। সারা বিশ্ববাসী শুনলো স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রধান মন্ত্রীর বেতার বক্তৃতা। আমাদের সংগ্রামের কথা দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো।

বক্তৃতা প্রচারিত হলো। আমাদের তিনজনের কারো মুখে কোন কথা নেই। আমি শুধু বল্লাম, গোলক মজুমদার শেষ পর্যন্ত বক্তৃতা প্রচার বন্ধ করতে পারেননি।

মনসুর ভাই ক্লান্তি খেয়ে আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তিনি বক্তৃতা শুনতে পাননি।

পরে একক সিদ্ধান্তে বক্তৃতা প্রচারের জন্য তাজউদ্দিন ভাই এর কাছে ক্ষমা ও শাস্তি প্রার্থনা করি। তিনি বলেছিলেন যে, সে সময় আমার সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। সেদিন বক্তৃতা প্রচার না করলে গোলমাল আরো বৃদ্ধি পেত বৈকি।

শেখ মনি তাজউদ্দিন ভাইকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁকে প্রধান মন্ত্রী করার ব্যাপারে তিনি আগরতলা গিয়ে সকল প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। কিন্তু আগরতলা গিয়ে শেখ মনি ভারত সীমান্তের কাছাকাছি কসবাতে সংসদ সদস্যা মমতাজ বেগমের বাড়ীতে চলে যান।

তাজউদ্দিন ভাই এর বক্তৃতা প্রচারের পর অনেক রাতে কর্ণেল (অবঃ) নুরুজ্জামান (সেকটর কমাণ্ডার) ও আবদুর রউফ (রংপুর) আসেন। গভীর রাত পর্যন্ত তাদের সাথে আলোচনা করি। উত্তর বঙ্গে কয়েকটা সেকটর রয়েছে। একটা সেকটরের দায়িত্বে রয়েছেন কর্ণেল জামান। তারা জানান, গেরিলা কায়দায় আকস্মিক হামলায় শত্রুদের পর্যুদস্ত করা হচ্ছে।

আমি অবাংগালীদের ওপর হামলা না করার পরামর্শ দিলাম। অবাংগালী বিহারীদের ওপর জনগণ ক্ষুব্ধ। রংপুর ও সৈয়দপুরে বেশ কিছু বিহারী রয়েছে। অবশ্য ইতিমধ্যে কোন কোন স্থানে এদের ওপর বিচ্ছিন্ন হামলা হয়ে গেছে। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব হামলা বন্ধ করার চেষ্টা করছে। অবশ্য অবস্থা অনেকটা শান্ত হয়ে গেছে।

আলোচনা করতে করতে রাত প্রায় ভোর হয়ে গেল। ভোরের দিকে তাঁরা দু'জন চলে গেলেন। তাঁদের অনেক কাজ। এক মুহূর্ত সময় নেই। যোদ্ধারা তাদের নির্দেশের অপেক্ষা করছেন। সরকার গঠনে তারা আনন্দ প্রকাশ করলেন।

পরদিন ১১ই এপ্রিল সকালে নাশতা করে আমরা বিমানে উঠি। আগের রাতে প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতার পর থেকেই শেখ মনি চুপচাপ রয়েছেন। বক্তৃতার কথা শুনে মনসুর ভাই উৎফুল্ল। রাতের বিশ্রামের পর মনসুর ভাই কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত মনসুর ভাই অবিশ্রান্তভাবে কাজ করেছেন। প্রধান মন্ত্রীর বিতর্কের অবসান হওয়ায় মনসুর ভাই যেন বেশী খুশী।

খুব নীচু দিয়ে আমাদের ছোট বিমান উড়ছে। দু'দেশের সীমান্ত সংলগ্ন ছোট ছোট বিমান বন্দরে নেমে আমরা স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের খোঁজ খবর নিচ্ছি। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে বিশেষভাবে খোঁজ করার জন্য ময়মনসিংহ সীমান্তে আমরা খবর দিয়ে রেখেছিলাম। সৈয়দ নজরুলকে পাওয়া যেতে পারে এমন একটি স্থানে গিয়ে প্রথমে শুনলাম, নেতৃস্থানীয় কাউকে পাওয়া যায়নি। পরে বি এস এফ এর স্থানীয় অফিসার জানান, ঢালু পাহাড়ের নীচে সৈয়দ নজরুল

ইসলাম ও আবদুল মান্নান রয়েছেন। একথা শুনে আমরা 'ইউরেকা' বলে আনন্দে লাফিয়ে উঠি।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে তাঁরা দু'জন আসলেন। নজরুল ভাই জীপ থেকে প্রথমে নামেন। আমার সহকর্মী হুইপ আবদুল মান্নানকে দেখে প্রথমে চিনতে পারিনি। পরে জানলাম ২৫শে মার্চের পর থেকে মান্নান সাহেব খুব কষ্টে দিনকাল কাটিয়েছেন। পাক বাহিনীর ভয়ে তিনি দু'দিন পায়খানায় পালিয়েছিলেন। টাঙ্গাইল থেকে সড়ক পথে হেঁটে ময়মনসিংহ এসেছেন। তিনি একেবারে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে গেছেন।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম তার গ্রামের বাড়ীতে ছিলেন। আমাদের খবর পেয়ে নজরুল ভাই ও তার ভাই যথেষ্ঠ উৎসাহিত হন। নজরুল ভাইকে তাজউদ্দিন ভাই ডেকে নিয়ে একান্তে কথা বলেন। গত কয়েক দিনের ঘটনাবলী তাকে অবহিত করা হয়। আমরা বাইরে বসে আছি। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন ভাইকে প্রধান মন্ত্রী হিসেবে মোবারকবাদ জানান। এই দৃশ্য দেখে আমরা সকলেই উৎফুল্ল হই। আমরা আবার বিমানে উঠি। আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল আগরতলা। আমরা বিমানে আসন গ্রহণ করি। সামনের আসনে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও মনসুর ভাই। নজরুল ভাই বিমানে বসে ঢাকা থেকে পলায়নের কাহিনী বর্ণনা করেন। তিনি ডাঃ আলীম চৌধুরীর ছোট ভাইএর বাসায় থাকতেন। তিনি ছিলেন নজরুল ভাইএর আত্মীয়। সেই বাসা থেকে পরচুলা ও মেয়েদের কাপড় পরিধান করে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। মনসুর ভাই একথা নিয়ে এমনভাবে ঠাট্টা করলেন যে বিমানে কেউ না হেসে থাকতে পারলেন না। আমাদের আগরতলা পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে আগরতলায় অনেক নেতা এসে পৌঁছেছেন। কর্ণেল ওসমানীর সাথে দেখা হলো। তার চেহারায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত গোঁফ তিনি কেটে ফেলেছেন। প্রথমে তাকে চিনতেই পারছিলাম না। আমার নিজেরও দাড়ি কেটে ফেলেছি। দু'জনেই দুজনকে ডেকে হাসি ঠাট্টা করলাম।

আগের রাতে খন্দকার মোশতাক এসেছেন। ডঃ টি, হোসেন ঢাকা থেকে তাকে নিয়ে এসেছেন। এম আর সিদ্দিকী কয়েক দিন পূর্বে আগরতলা এসেছেন। চট্টগ্রাম থেকে জহুর আহমদ চৌধুরী এবং সিলেট থেকে আব্দুস সামাদও এসে গেছেন। তাছাড়া সেখানে তা.হেরউদ্দিন ঠাকুর ও মাহবুব আলী চাষী ছিলেন।

আগরতলা সার্কিট হাউজের পুরোটা আমাদের দখলে। ওসমানী ও নগেন্দ্র সিং ভিন্ন একটি ঘরে অবস্থান করছেন।

ওসমানী যুদ্ধের পরিকল্পনা এবং অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা তৈরী করে ফেলেন। আধুনিক সমর সজ্জায় সজ্জিত পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে সম্মুখ যুদ্ধে আমাদের পক্ষে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। ওসমানীকে সশস্ত্র বাহিনী প্রধানের দায়িত্ব-

ভার গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হলো। তিনি এর পূর্বশর্ত হিসেবে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জামের কথা উল্লেখ করেন।

রাতে খাবারের পর নেতৃবৃন্দ বৈঠকে বসেন। খন্দকার খুবই মনক্ষুণ্ণ। নাটকীয়ভাবে তিনি বল্লেন, আমরা যেন তাকে মক্কায় পাঠিয়ে দেই। আর মৃত্যুকালে তার লাশ যেন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আমি ডঃ টি হোসেনের মাধ্যমে মোশতাক সাহেবের মনোভাব জানতে চাইলাম। মোশতাক ও টি হোসেন এর মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে। দু'জনেই এক জেলার লোক। পারিবারিক পর্যায়েও তাদের সম্পর্ক খুবই মধুর। তিনিই তাকে নিয়ে এসেছেন আগরতলায়।

টি হোসেনের সাথে আলাপ করে জানলাম, মোশতাক সাহেব প্রধানমন্ত্রী পদের প্রত্যাশী। সিনিয়র হিসেবে এই পদ তারই প্রাপ্য বলে তিনি জানিয়েছেন। সারা রাত শলাপরামর্শ হলো।

অনিদ্রা ও দীর্ঘ আলোচনায় আমি খুবই ক্লান্তি অনুভব করি। এক পর্যায়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

শেষ পর্যন্ত খন্দকার মোশতাক মন্ত্রী সভায় থাকতে রাজী হলেন। তবে একটা শর্ত হলো, তাঁকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দিতে হবে। তাজউদ্দিন ভাই আমাকে একথা জানান। সবাই এতে রাজী হলেন। কেননা, একটা সমঝোতার জন্যে এই ব্যবস্থাটা একেবারে খারাপ নয়। অবশেষে খন্দকার মোশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগদানের বিষয়টির সুরাহা হলো। একজন হেসে খবর দিলেন, তিনি যোগদানে রাজী হয়েছেন। উপস্থিত সকলে এক বাক্যে আলহামদু লিল্লাহ পড়লেন। সকলে জহুর ভাইকে মোনাজাত করতে অনুরোধ করলেন। তিনি কয়েকদিন পূর্বে পবিত্র হজ্জ ব্রত পালন করে এসেছেন। তার মাথায় তখনো মক্কা শরীফের টুপি। তিনি আধ ঘন্টা ধরে আবেগ প্রবণভাবে মোনাজাত পরিচালনা করেন। তার মোনাজাতে বঙ্গবন্ধুর কথা, পাক দস্যুদের অত্যাচার, স্বজন হারানো, দেশবাসীসহ শরণার্থীদের কথা এলো। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। অনেকের চোখে পানি এসে গেল। এই মোনাজাতের মাধ্যমে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিলাম।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আগরতলায় অনুষ্ঠিত বৈঠককে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের প্রথম বৈঠক বলা যেতে পারে। তাজউদ্দিন ভাই ও আমার প্রচেষ্টায় যে সব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল বৈঠকে সবগুলোর অনুমোদন দেয়া হয়।

এদিকে ওসমানী ও নগেন্দ্র সিংএর বৈঠকে যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রস্তুতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়। বৈঠকের এক পর্যায়ে আমি অংশ নেই। এর পূর্বে যুদ্ধ পরিকল্পনা নিয়ে দিল্লী কলকাতা সহ দেশের বাইরে ভেতরে সীমাবদ্ধ আলোচনা হয়েছে। সব ক'টিতে আমি গভীরভাবে জড়িত ছিলাম। যুদ্ধের ব্যাপ্তি, প্রকৃতি, সামরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝাবার চেষ্টা করি।

১৩ই এপ্রিল ছোট বিমানে কলকাতা ফিরে গেলাম। মন্ত্রীসভার সদস্য ছাড়াও আব্দুস সামাদ আজাদ ও কর্ণেল ওসমানী কলকাতা আসেন। অন্যান্যরা কলকাতায় রয়ে গেলেন। বাংলাদেশ থেকে ভারতে পৌঁছার ব্যাপারে আমরা ২টি প্রবেশ পথ ঠিক করি। এর একটি হচ্ছে আগরতলা। এই পথে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও সিলেটের লোকজন প্রবেশ করবে। আন্যান্য জেলার লোকজনের জন্য প্রবেশ পথ করা হয় কলকাতা। পরে অবশ্য সিলেটের জন্য ডউকি, ময়মনসিংহের জন্য তোরা পাহাড়, রংপুরের জন্য ভুরুঙ্গামারী, দিনাজপুরের জন্য শিলিগুড়ি, বরিশালের জন্য টাকি—এরকম বেশ কয়টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবেশ পথ ঠিক করা হয়।

মন্ত্রিসভার আনুষ্ঠানিক শপথের জন্যে ১৪ই এপ্রিল দিনটি নির্ধারণ করা হয়েছিল। শপথের স্থানের জন্যে আমরা চুয়াডাঙ্গার কথা প্রথমে চিন্তা করি। কিন্তু ১৩ই এপ্রিল পাক হানাদার বাহিনী চুয়াডাঙ্গা দখল করে নেয়। পাক দস্যুরা সেখানে বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করে। আমরা চুয়াডাঙ্গা রাজধানী করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম শেষ পর্যন্ত তা আর গোপন থাকেনি। চুয়াডাঙ্গার কথা বাদ দিয়ে আমাদের নতুন স্থানের কথা চিন্তা করতে হলো।

এই নিয়ে গোলক মজুমদারের সাথে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ ব্যাপারে সবাই একমত হন যে যেখানেই আমরা অনুষ্ঠান করিনা কেন, পাক বাহিনীর বিমান হামলার বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

শেষ পর্যন্ত মানচিত্র দেখে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথ তলাকে মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের উপযুক্ত স্থান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। মন্ত্রিসভার শপথের জন্য নির্বাচিত স্থানের নাম আমি, তাজউদ্দিন ভাই, গোলক মজুমদার এবং বি এস এফ এর চট্টোপাধ্যায় জানতাম। ইতিমধ্যে দ্রুত কতগুলো কাজ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

অনুষ্ঠানের কর্মসূচী নির্ধারণ ছাড়াও প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতার খসড়া রচনা করতে হবে। প্রধান মন্ত্রীর ভাষণে বিশ্বের কাছে নবজাত বাংলাদেশকে স্বীকৃতির আবেদন জানাতে হবে। ১০ই এপ্রিল প্রধান মন্ত্রী প্রথম যে ভাষণ দেন, তার কপি ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় করা হয়েছিল। ইংরেজী কপি বিদেশী সাংবাদিকদের দেয়া হয়। সবচেয়ে বড় কাজ হলো স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র রচনা করা।

আমি আর তাজউদ্দিন ভাই যে ঘরে থাকতাম, সে ঘরের একটি ছোট্ট স্থানে টেবিল ল্যাম্পের আলোতে লেখার কাজ করি। আমার কাছে কোন বই নেই, নেই অন্য দেশের স্বাধীনতা ঘোষণার কোন কপি।

আমেরিকার ইণ্ডিপেনডেন্স বিল অনেকদিন আগে পড়েছিলাম। সেই অরিজিনাল দলিল চোখের সামনে ভাসছে। আর সেই বড় বড় হাতের স্বাক্ষর গুলো। কিন্তু ভাষা বা কর্ম কিছুই মনে নেই। তবে বেশী কিছু মনে করার চেষ্টা

করলামনা। শুধু মনে করলাম, কি কি প্রেক্ষিতে আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণার অধিকার রয়েছে। এমনি চিন্তা করে ঘোষণা পত্রের একটা খসড়া তৈরী করলাম। স্বাধীনতার ঘোষণায় অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা নির্ধারণ করে দেয়া হলো।

স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রের খসড়া রচনার পর তাজউদ্দিন ভাইকে দেখালাম। তিনি পছন্দ করলেন। আমি বললাম, আমরা সকলে এখন যুদ্ধে অবতীর্ণ। এই দলিলের খসড়াটি কোন একজন বিজ্ঞ আইনজীবীকে দেখাতে পারলে ভাল হতো। তিনি বললেন এই মুহূর্তে কাকে আর পাবেন, যদি সম্ভব হয় কাউকে দেখিয়ে নিন।

ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবীরা আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের স্বপক্ষে সমর্থন দিয়েছেন। এদের মধ্যে সুব্রত রায় চৌধুরীর নাম আমি শুনেছি। রায় চৌধুরীর আন্তর্জাতিক খ্যাতি রয়েছে। আমি তার লেখা কিছু নিবন্ধ পড়েছি বলে মনে হলো। বি এস এফ এর মাধ্যমে রায় চৌধুরীর ঠিকানা জেনে নিলাম। টেলিফোনে তাকে যোগাযোগ করি। বললাম তাঁর সাথে দেখা করতে চাই। তিনি রাজী হলেন। বালিগঞ্জে তার বাসা। আমার পরিচয়, 'রহমত আলী' নামে। সুব্রত রায় চৌধুরীর বাসায় পৌছে তাকে আমার প্রণীত ঘোষণাপত্রের খসড়াটি দেখালাম। খসড়াটি দেখে তিনি আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন। এই খসড়া আমি করেছি কি-না জিজ্ঞাসা করলেন। আমি হাঁ সূচক জবাব দেই। তিনি বলেন, একটা কমা বা সেমিকোলন বদলাবার কোন প্রয়োজন নেই।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার যে আইনানুগ অধিকার, তা মানবাধিকারের একটা অংশ। এই কথা স্বাধীনতার সনদে ফুটে উঠেছে। তিনি জানান, তিনি এর ওপর একটা বই লিখবেন। এই ঘোষণা পত্রের একটা কপি তাকে দেয়ার জন্যে তিনি অনুরোধ করলেন। এরপর আইন ব্যবসা প্রায় বন্ধ করে দিয়ে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর বই লেখা শুরু করেন। তার রচিত বইটির নাম হচ্ছে 'জেনেসিস অব বাংলাদেশ' আন্তর্জাতিকভাবে অধ্যয়নের জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার বহু বিশ্ব বিদ্যালয়ে এখন তা পড়ানো হচ্ছে।

এটা ছিল সুব্রত চৌধুরীর সাথে আমার প্রথম পরিচয়। এরপর থেকে যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত তিনি আমাকে বড় ভাই এর মত সময়ে অসময়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। আমার জন্য তাঁর দুয়ার সর্বদাই ছিল খোলা।

এদিকে শপথ অনুষ্ঠানের খুটিনাটি তৈরী করা হচ্ছে। জানা গেল প্রধান সেনাপতি ওসমানীর সামরিক পোষাক নেই। কিন্তু শপথ অনুষ্ঠানের জন্য তার সামরিক পোষাক প্রয়োজন। বি এস এফকে ওসমানীর জন্য এক সেট সামরিক পোষাক দিতে বললাম। তাদের স্টকে ওসমানীর গায়ের কোন পোষাক পাওয়া

পেল না। সেই রাতে কাপড় কিনে, দর্জি ডেকে তাঁর জন্য পোষাক তৈরী করা হলো।

শপথ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের হাজির করার ভার ছিল আমার ও আবদুল মান্নানের ওপর। ১৬ই এপ্রিল আমরা দু'জনে কলকাতা প্রেস ক্লাবে যাই। এই প্রথম বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে দু'জন প্রতিনিধি বিদেশী সাংবাদিকদের সাথে মিলিত হই। সমস্ত প্রেস ক্লাব লোকে লোকারণ্য। তিল ধারণের ঠাঁই নেই। সার্চ লাইটের মত অসংখ্য চোখ আমাদের দিকে নিবদ্ধ। ক্লাবের সেক্রেটারী উপস্থিত সাংবাদিকদের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাদেরকে প্রথম অনুরোধ জানাই আমাদের উপস্থিতির কথা গোপন রাখতে হবে। এরপর বললাম, আমরা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে একটি বার্তা নিয়ে এসেছি।

সমবেত সাংবাদিকদের পরদিন ১৭ই এপ্রিল কাক ডাকা ভোরে এই প্রেস ক্লাবে হাজির হতে অনুরোধ জানাই। বললাম, তখন তাদেরকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের একটি বিশেষ বার্তা দেয়া হবে। তাদের কেউ কেউ আরো কিছু প্রশ্ন করতে চাইলেন। আমরা কোন উত্তর দিতে অপারগতা প্রকাশ করি। এতে তারা কেউ কেউ হতাশও হন। সাংবাদিকদের নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের গাড়ী তৈরী থাকবে বলেও জানালাম।

আওয়ামী লীগের এম পি এ, এম এন এ এবং নেতাদের খবর পাঠিয়ে দেই রাত বারোটার মধ্যে লর্ড সিনহা রোডে সমবেত হওয়ার জন্যে।

বি এস এফ এর চট্টোপাধ্যায়কে বলি আমাদের জন্যে ১০০টি গাড়ীর ব্যবস্থা করতে। এর ৫০টা থাকবে প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের বহন করার জন্যে। অবশিষ্ট ৫০টার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নেতাদের বাংলাদেশ সীমান্তে পৌঁছানো হবে।

রাত বারোটা থেকে নেতাদের আমি গাড়ীতে তুলে দেই। বলে দেয়া হলো, কোথায় যাচ্ছেন জিজ্ঞাসা করতে পারবেন না। সকাল বেলা আমরা একত্রিত হবো। গাড়ীর চালক নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেবেন। সাইক্লোস্টাইল করা স্বাধীনতা সনদের কপি গুলো গুছিয়ে নিলাম। হাতে লেখা কিছু সংশোধনী রয়েছে। কয়েক জনকে এগুলো সংশোধন করার জন্যে দেই।

১৭ই এপ্রিল জাতীয় ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব-দানকারী মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণের দিন। সারা রাত ঘুম হয়নি। ভোরের দিকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমদ, এম মনসুর আলী, এ এইচ এম কামরুজ্জামান এবং ওসমানী একটি গাড়ীতে রওয়ানা হয়ে যান।

আমি ও আব্দুল মান্নান ভোরের দিকে পূর্ব কর্মসূচী অনুযায়ী কলকাতা প্রেসক্লাবে যাই। সেই ভোরেও ক্লাবে লোক ধরেনি। ক্লাবের বাইরেও অনেক লোক দাঁড়িয়ে ছিল।

আমি সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে বিনীতভাবে বললাম, আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রধান মন্ত্রীর কাছ থেকে আপনাদের জন্য একটা বার্তা নিয়ে এসেছি। তাদের জানালাম স্বাধীন বাংলার মাটিতে বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করবেন। আপনারা সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত। কেউ জানতে চাইলেন কিভাবে যাবেন, কোথায় যাবেন। আমি পুনরায় বলি, আমি আপনাদের সাথে রয়েছি, পথ দেখিয়ে দেব। আমাদের গাড়ীগুলো তখন প্রেস ক্লাবের সামনে। উৎসাহিত সাংবাদিকরা গাড়ীতে ওঠেন। তাদের অনেকের কাঁধে ক্যামেরা। ৫০/৬০টা গাড়ী যোগে রওয়ানা হলাম গন্তব্যস্থানের দিকে। আমি ও আবদুল মান্নান দু'জন দুই গাড়ীতে। আমার গাড়ীতে কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিক ছিলেন। পথে তাদের সাথে অনেক কথা হলো।

শপথ অনুষ্ঠানের নির্ধারিত স্থান আম্রকাননে পেঁছিতে ১১টা বেজে গেল। অনুষ্ঠানের আয়োজন প্রায় শেষ। মাহবুব ও তওফিক এলাহী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। আগেই ঠিক করা হয়ে ছিল, যে চীফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার সনদ পাঠ করবেন।

এদিকে পাক হানাদার বাহিনীর চাপের মুখে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের পিছু হঠতে হয়েছে। সম্মুখ সমরে হানাদার বাহিনীর মোকাবেলা করা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে সম্ভব নয়। নির্দেশ সত্ত্বেও দেশ মাতৃকার মুক্তি পাগল যোদ্ধারা বাংকার ছেড়ে আসতে রাজি হচ্ছিল না। মাহবুব ও তওফিক তাদের সৈন্য সহ পাক হানাদার বাহিনীর দ্বারা ঘেরাও হয়ে পড়েছিলেন। তারা সুকৌশলে পিছু হটে আসেন। মনোবল ঠিক রেখে পশ্চাদপসরণ করা একটা কঠিন কাজ।

ক্লান্ত শ্রান্ত মুক্তিযোদ্ধারা বাংকার থেকে উঠে আসে। ওদের চোখে মুখে বিশ্বাসের দীপ্তি বিদ্যমান ছিল।

কোরান তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হলো। একটি ছোট্ট মঞ্চে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্যবর্গ, ওসমানী, আবদুল মান্নান ও আমি। আবদুল মান্নান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ইউসুফ আলী স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রী ভাষণ দেন। একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এই স্থানের নাম 'মুজিব নগর' নামকরণ করেন। ১৬ই ডিসেম্বর পাক হানা. র বাহিনীর আত্মসমর্পণ পর্যন্ত মুজিব নগর ছিল অস্থায়ী সরকারের রাজধানী।

সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রধান প্রশ্ন ছিল সরকারের প্রধান বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোথায়? জবাবে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, আমরা বংগবন্ধুর নির্দেশেই মন্ত্রিসভা গঠন করেছি। ত:র সাথে আমাদের চিন্তার (বিস্তর)

যোগাযোগ রয়েছে। আমরা জানতাম বংগবন্ধু শত্রু শিবিরে বন্দী। কিন্তু আমরা তা বলতে চাইনি। পাক বাহিনী বলুক এটাই আমরা চাচ্ছিলাম। কারণ আমরা যদি বলি বংগবন্ধু পাক শিবিরে, আর তারা যদি তা অস্বীকার করে তাহলে সমূহ বিপদের আশংকা রয়েছে। আর আমরা যদি বলি তিনি দেশের ভেতর থেকে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তখন হানাদাররা বলে বসবে তিনি বন্দী আছেন।

আম বাগানের অনুষ্ঠানে ভর দুপুরে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ছাড়াও পার্শ্ববর্তী এলাকার হাজার হাজার লোক জমায়েত হয়। হাজারো কণ্ঠে তখন উচ্চারিত হচ্ছিল জয় বাংলা, জয় বংগবন্ধু, বীর বাংগালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর, ইত্যাদি শ্লোগান।

আমার কাজ ছিল দ্রুত অনুষ্ঠান শেষ করে সাংবাদিকদের ফেরত পাঠানো। দুপুরের মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলো। সাংবাদিকদের গাড়ীযোগে ফেরত পাঠানো হল। মন্ত্রিসভার সদস্যরা ফিরেন সন্ধ্যায়। অনুষ্ঠানের পর কলকাতা গিয়ে সাংবাদিকরা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এই সংবাদ পরিবেশন করেন।

কলকাতার বাসায় ফিরে তাজউদ্দিন ভাইকে জিজ্ঞাসা করি কলকাতায় পাকিস্তান মিশনের হোসেন আলীকে আমাদের পক্ষে আনা যায় কি না। ফরিদপুরের আত্মীয় শহিদুল ইসলামের মাধ্যমে হোসেন আলীর সাথে যোগাযোগ করা হল। হোসেন আলী প্রধান মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করতে রাজী হলেন;

গংগার ধারে একটি হোটেলে দু'জনের সাক্ষাত হল। হোসেন আলী আমাদের পক্ষে আসতে রাজী হলেন।

ইতিমধ্যে বিশ্বে যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্যে লণ্ডনে ফোন করি। লণ্ডনের গেনজেজ হোটেলের মালিক তসদ্দুক আহমদ আমার পুরাতন বন্ধু। এক কালে তিনি প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তার সাথে যোগাযোগ করে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ফোন নাম্বার পেলাম। বিচারপতি চৌধুরী যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব থেকেই লণ্ডনে ছিলেন। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

বিচারপতি চৌধুরীর মাধ্যমে লণ্ডনের তৎকালীন কাউন্টি কাউন্সিলের সদস্য এলভারস্যান, শ্রমিক দলের নেতা ডোনাল্ড চেসয়ার্থ এর সাথে যোগাযোগ করি। ডোনাল্ড আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। লণ্ডনে ব্যারিস্টারী পড়ার সময় তার সাথে আমার পরিচয়। পরিচয় সূত্রেই বন্ধুত্ব। ডোনাল্ড ও অন্যান্যদের আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য সহযোগিতা করার আবেদন জানাই।

লণ্ডনে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে ডোনাল্ডের যথেষ্ঠ সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছিলাম। তার সাথে টেলিফোনে কথা হল। তিনি মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে সার্বিক সাহায্যের আশ্বাস দিলেন। সে সময় রকিব সাহেব সিলেট থেকে কল-

কাতা আসেন। তিনি লণ্ডন যাবেন। তার কাছে আবু সাঈদ চৌধুরীকে একটা চিঠি দিলাম।

চিঠিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে মত গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তাকে আহ্বান জানাই। চৌধুরীর সাথে আমার ফোনেও যোগাযোগ হল।

১৮/১৯ তারিখের দিকে ওয়াশিংটন থেকে হারুনুর রশীদ এলেন। তিনি বিশ্ব ব্যাংকে চাকুরী করেন। তার কাছে বিদেশে অবস্থানরত বাংগালীদের মনোভাব জানতে পারলাম। ওয়াশিংটনে এ এম এ মুহিত ও অন্যান্যদের সহযোগিতায় তারা একটা গ্রুপ গঠন করেছেন। তিনি তাদের পক্ষে সাহায্যের আশ্বাস দিলেন। দিল্লী থেকে কলকাতা ফিরে আমরা খবর পেয়েছিলাম প্রফেসর নুরুল ইসলাম কলকাতায় আছেন।

মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণের পরদিন (১৮ই এপ্রিল) স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আরো একটি স্মরণীয় দিন। এই দিন সকালবেলা কলকাতা পাক মিশনের হোসেন আলী সহ মিশনের প্রায় সকল কর্মকর্তা বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করেন। সার্কাস এভিনিউতে অবস্থিত পাক দূতাবাসে এত দিন ধরে যেখানে পাকিস্তানের পতাকা উড়তো, সেখানে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ানো হল। এই ঘটনায় দেশে বিদেশে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। দূতাবাসে সে দিন জনতার ঢল নামে। বিভিন্ন সংগঠন মিছিল করে সার্কাস এভিনিউতে এসে হোসেন আলীকে স্বাগত সম্ভাষণ জানায়। ফুলের মালায় মিশনের প্রাঙ্গণ ভরে যায়।

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী সর্ব প্রথম আমাকে প্রেরণ করেন হোসেন আলীকে অভিনন্দন জানাতে। হোসেন আলীর স্ত্রী, দুই কন্যা এবং এক ছেলের সাথে পরিচয় হল। তারা সকলেই স্বাধীনতা যুদ্ধে শরীক হলেন। হোসেন আলীর স্ত্রী খুবই সাহসী মহিলা। এ ব্যাপারে স্বামীকে তিনি প্রচণ্ড সাহস যুগিয়েছেন।

বিদেশী বেতারের সাথে বাংলাদেশের পাক দস্যুদের অত্যাচারের করুণ কাহিনী তিনি বর্ণনা করেন। কান্নাজড়িত তার এই বক্তব্য কলকাতা বেতারে প্রচারিত হয়। এই মহিলার হৃদয়স্পর্শী বক্তব্য যারা শুনেছেন তারাই মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।

১৮ই এপ্রিলের পূর্বরাতে বেগম হোসেন আলী ও তার এক মেয়ে মিলে স্বাধীন বাংলার পতাকা তৈরী করেন। আমি থাকতে থাকতে সেখানে বহুলোক এলো হোসেন আলীকে অভিনন্দন জানাতে। বেশীক্ষণ সেখানে আমি অবস্থান করিনি। বহু গণ্য মান্য লোককেও আসতে দেখলাম।

বাংলাদেশের বহু লোক পাক বাহিনীর অত্যাচারে কলকাতায় শরণার্থী হয়েছে। তাদের জন্যে সাহায্য প্রয়োজন। ১৯ শে এপ্রিল থেকে বাংলাদেশ মিশনে কাপড়, অর্থ ইত্যাদি সাহায্য আসতে থাকে। হোসেন আলী আগেই পাক মিশনের অর্থ ব্যাংক থেকে তুলে রেখেছিলেন। এই অর্থ দিয়ে মিশন পরিচালনা করা হবে।

পাক মিশনের একজন মাত্র কর্মচারী বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য পোষণ করেননি। তিনি তার বাসায় রয়ে গেলেন। মিশনে আসেন না। এই ভদ্রলোকের সাথে কথা বলতে তার বাসায় গেলাম। তিনি আমার পূর্ব পরিচিত। ১৯৬৪ সাল, তখন মোনায়েম খানের রাজত্ব। এই ভদ্রলোক সে সময় পাবনার পুলিশ সুপার ছিলেন। তার নাম আর আই চৌধুরী। সরকার বিরোধী এক মিছিল করায় পাবনায় সে সময় বহু লোককে গ্রেফতার করা হয়। আমাদের দলের নেতা মনসুর আলী তখন জেলে। আমি ও নাইমুদ্দিন পাবনা গিয়ে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের সাথে দেখা করি এবং পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে পত্রিকায় একটি রিপোর্ট প্রকাশ করি। জেলে আমাদের নেতাদের সাথে দেখা করার পর আদালতে তাদের জামিনের আবেদন করি।

পুলিশ সুপার আর আই চৌধুরীর প্রচণ্ড দাপটের কথা তখন আমার মনে পড়ছিল। তবে '৬৪ সালের চেহারার সাথে আজকের চেহারার কোন মিল নেই। তাঁর স্ত্রী তখনো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। কিছুদিন পর তাঁর স্ত্রী কলকাতা আসার পর আর আই চৌধুরী বাংলাদেশের পক্ষে তার আনুগত্য প্রকাশ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় মেজর ডালিম তার মেয়ের সাথে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। মেয়ের পিতা রাজী হননি। পরে ছেলে মেয়ে নিজেদের উদ্যোগে বিয়ে করে। তাজউদ্দিন ভাই তাদের মিলিয়ে দেন।

ক্রমশঃ আমাদের লোকজন বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থান সংকুলান হচ্ছেনা। বি এস এফ বালিগঞ্জে একটি বাড়ী ভাড়া করে। আমরা সেই বাড়ীতে উঠি। তাজউদ্দিন ভাই ও আমি একটি ঘরে। অন্য একটি ঘরে সৈয়দ নজরুল ও মনসুর ভাই এবং পৃথক একটি ঘরে খন্দকার মোশতাক। কামরুজ্জামান ভাই থাকতেন তার এক বন্ধুর বাড়ীতে।

১৯ শে এপ্রিল থেকেই বাংলাদেশ মিশনের একটি ভবনে তিন তলায় আমি অফিস করছি। আমার প্রথম কাজ হচ্ছে বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে আবেদন তৈরী করা। কয়েকজন টাইপিস্ট আমার সাথে রাত দিন কাজ করছে। প্রধান মন্ত্রীর ১০ই এপ্রিল ও ১৭ই এপ্রিলের বক্তৃতা বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করতে হবে। স্বীকৃতির আবেদন পত্র সহ বক্তৃতার বহু কপি তৈরী করা হলো।

স্বীকৃতির আবেদনে দস্তখত নিয়ে একটু ঘাপলার সৃষ্টি হল। পররাষ্ট্র মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক এগুলোতে নানা অজুহাতে সই দিতে দেরী করলেন। এদিকে আমি অস্থির হয়ে গেছি। কয়েকদিন গড়িমসি করে পরে তিনি সই করেন।

স্বীকৃতির এই আবেদনপত্রগুলো কিছু ডাক যোগে আবার কিছু লোক মারফত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয়। আবদুস সামাদ আজাদ কিছু চিঠি সহ বিদেশের পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আমাদের এই স্বীকৃতির আবেদনের খবর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

মোশতাক সাহেবের পরিবার আনার জন্যে ডঃ টি হোসেন আগরতলা থেকে আবার ঢাকা ফিরে গেছেন। আমার পরিবারের খবর সম্ভব হলে নেয়ার জন্যে ডঃ হোসেনকে অনুরোধ করেছি। কিন্তু তিনি ঢাকায় সন্ধান করেও আমার পরিবারের কোন খোঁজ পাননি। তার আগেই আমার পরিবারকে ঢাকা ছাড়তে হয়েছে। ডঃ হোসেন আমার প্রতিবেশী ডাঃ নাইমুর রহমানের বাসায় আমার পরিবারের খোঁজ করেছিলেন। তারা ভাল আছেন বলে তিনি শুনেছেন। কিন্তু কোথায় তারা ছিলেন এই খবর পাই আরো পরে। কিছুদিন পর ডঃ টি হোসেন কলকাতা ফিরে আসেন।

ইতিমধ্যে মন্ত্রিসভা কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আমি সন্ধ্যায় মিশন থেকে বাসায় ফিরে জানলাম, আমাকে প্রধান মন্ত্রীর 'প্রিন্সিপাল এইড' করা হয়েছে। আমার সহকারী হুইপ আবদুল মান্নানকে প্রচারের দায়িত্ব দেয়া হয়।

আমি প্রধান মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইলাম, আমাকে কেন এই পদে নিয়োগ করা হল। তিনি বলেন, এটা মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত এবং আমারও ইচ্ছা। পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, আমার কি করণীয় হবে? তাজউদ্দিন ভাই জানান, 'প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি যা কিছু করবো তার সবকিছুই আপনার কাজের অংশ হবে।'

এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে থেকে কিছু বেসামরিক অফিসার এসে গেছেন। পাবনার জেলা প্রশাসক নুরুল কাদের, রাজশাহীর জেলা প্রশাসক হান্নান সহ আরো অনেকে। এঁদের কাজ দেয়া হলো। রাজশাহীর জেলা প্রশাসক কয়েকদিন কাজ করে ফিরে চলে যান।

সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে শত শত লোক প্রতিদিন আসছে। এদের মধ্যে সরকারী কর্মচারী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী, উকিল, ছাত্র-যুবক, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী বিভিন্ন স্তরের লোক রয়েছে। সকলেই চলে আসে বাংলাদেশ মিশনে। এদের পেশা উল্লেখ করে নাম ঠিকানা রেকর্ড হতে লাগলো। পেশা জানার উদ্দেশ্য হল প্রয়োজনে কাজে লাগানো। মিলিটারী, পুলিশ, বিডি-আর, মুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী হলে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়ার কথা ছিল। এখান থেকে আমি তাদের প্রয়োজনীয় কাজে লাগাবার চেষ্টা করতাম।

এ সময়টা আমাদের জন্য চরম সংকটের সময় ছিল। পাক হানাদার বাহিনী প্রচণ্ড হামলা করে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সীমান্তের দিকে ঠেলে দিয়েছে। প্রায় সকল ফ্রন্ট থেকে মুক্তিযোদ্ধারা পশ্চাদপসরণ করছে। এ সময়ে তাদের মনোবল ঠিক রেখে যুদ্ধ পরিচালনা ছিল খুব কঠিন কাজ।

বনগাঁ সীমান্তে একটা তাঁবুতে মেজর ওসমান, তওফিক এলাহী ও মাহবুব তাদের দল বল নিয়ে অবস্থান করছেন। তখনো তারা ভারতের ভেতরে প্রবেশ করেন নি। কাস্টম চেক পোস্টের ওপারে তাদের ছাউনী।

সারাদিন অফিসে খুবই ব্যস্ত থাকতাম। কিন্তু শত ব্যস্ততার মধ্যেও সীমান্তে যোদ্ধাদের খোঁজ খবর প্রতি সন্ধ্যায় নিতে চেষ্টা করতাম। এ সময় আমার জুনিয়র পার্টনার ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ কলকাতা পৌছেন। সহযোগিতা করার জন্যে তাঁকে আমার সাথেই রাখলাম। আমার অফিসের পাশে একটা ঘরে তার বসার ব্যবস্থা হলো। প্রথম দিকে তিনি বিদেশী প্রেসের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এ কাজ তিনি খুবই দক্ষতার সাথে করেন। পরে তাকে বহিঃ প্রচারের দায়িত্ব দেয়া হয়।

এর পর বাংলাদেশ সরকার ডাকঘর স্থাপন করেন। মওদুদ আহমদ পোস্ট মাস্টার জেনারেল হন। বিমান মল্লিকের নক্সা করা স্ট্যাম্প বাজারে ছাড়া হলো। স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মারক হিসেবে এই স্ট্যাম্প ছাড়া হয়।

দৈনিক প্রচুর লোক আসতো। এসেই জিজ্ঞাসা করতো থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা কোথায়? সোজা জবাব দিতাম, 'এই প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারবে না। আপনাকে ম্যানেজ করে নিতে হবে। অর্থাৎ আপনি আমাদের ম্যানেজ কমিটির সদস্য হলেন। যেখানে রাত হবে, সেখানেই ঘুমাবার চেষ্টা করবেন। কেউ খেতে বললে কোন আপত্তি করবেন না।'

কলকাতায় অনেকের বন্ধু বান্ধব রয়েছে। অনেকে আবার বাংলাদেশ থেকে গেছেন। কিছু কিছু বাংলাদেশী সেই সূত্রে আশ্রয় লাভ করেছেন। মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়ীতে থাকতেন কেউ কেউ। পরে মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়ীর পাশে একটি স্কুলে ক্যাম্প তৈরী করা হয়। এমনিভাবে কলকাতা শহরে বিভিন্ন ভাবে থাকার ব্যবস্থা হয়ে যায়। আগরতলাতেও এমনি ধরণের ব্যবস্থা হয়ে যায়। আসাম ও মেঘালয়ের জীবন ছিল আরো শক্ত। শেষোক্ত দুটি রাজ্যের মানুষ তত প্রাণখোলা ছিল না।

এ সময় বৃটেনের শ্রমিক দলীয় সংসদ সদস্য ডগলাস ম্যান কলকাতা আসেন। আমার বন্ধু ডোনাল্ডের চেষ্টায় তিনি আমাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্যে আসেন। ডোনাল্ড আমাকে ফোন করে বলেন, ডগলাস ম্যান এর সাথে যেন বাংলাদেশ সরকারের কারো সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেই।

ডগলাস ম্যান বৃটিশ হাই কমিশনারের বাড়ীতে উঠেছেন। সেখানে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করি। মিঃ ম্যান ও আমি বাংলাদেশের ভেতরে যাব। সেখানে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের সাথে তার দেখা হবে।

তাজউদ্দিন ভাই ভোরে চলে গেছেন। বাংলাদেশের মাটিতে প্রথম সাক্ষাতের প্রয়োজন। তাই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাস্টম চেক পোস্টের কাছে প্রধান মন্ত্রীর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। আমি ডগলাস ম্যানকে নিয়ে গিয়ে প্রধান মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করি। সেখানে মেজর ওসমানকে পাওয়া গেল। বৃটিশ এম পি:কে নিয়ে আমরা মুক্তিযোদ্ধা-দের ক্যাম্পে গেলাম। এই বিদেশীকে দেখে মুক্তিযোদ্ধারা খুবই খুশী হলো। তারা ডগলাস ম্যান এর কাছে মুক্তিযুদ্ধ, পাক হানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচার, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ ইত্যাদি বর্ণনা করেন। আমরা তাকে অনুরোধ করি তিনি যেন আমাদের দূত হয়ে সারা বিশ্বে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কথা জানিয়ে দেন। বৃটিশ এম পি প্রথমে অভিভূত হয়ে পড়েন। প্রথমে তিনি আবেগে কথা বলতে পারেন নি। কিছুক্ষণ পর মিঃ ম্যান আমার হাত ধরে বলেন, আমাকে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গ্রহণ করো। তিনি আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। মানবিক গুণে গুণান্বিত খাঁটি পুরুষ ডগলাস তাঁর কথা রেখেছিলেন।

ডগলাস ম্যান এর এই সফর এবং প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এর সাথে সাক্ষাত এর খবর ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। এতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সাড়া জাগে। ডগলাস ম্যান ফিরে গিয়ে খবরের কাগজ, বৃটিশ পার্লামেণ্ট, শ্রমিক দলের বৈঠক সহ বিভিন্ন কমিটিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে রিপোর্ট দেন।

ডগলাস ম্যানকে বিদায় করে দিয়ে কলকাতা ফেরার পথে তাজউদ্দিন ভাই ও আমি যশোর অঞ্চল থেকে আগত আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের সাথে বৈঠক করি। তারা খুব কষ্টে দিনাতিপাত করছে। সেখানেও শরণার্থী সংখ্যা বেড়েই চলেছে। পথে আসতে আসতে প্রধান মন্ত্রীর সাথে শরণার্থী সহ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি।

বাংলাদেশ থেকে খবর আসছে যে সেখানে সর্বত্র হানাদার বাহিনীর আক্রমণের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে। হানাদার বাহিনীর অত্যাচার যত বৃদ্ধি পাচ্ছে শরণার্থীদের সংখ্যাও সেই হারে বেড়ে চলেছে। ২৫শে মার্চের পর ঢাকা থেকে যে হারে মানুষ গ্রামে চলে গিয়েছিল আজো সেই হারে বাংলাদেশ থেকে মানুষ সীমান্ত পার হয়ে আসছে।

কলকাতা ফিরে আইনজীবী সুব্রত রায় চৌধুরীর সাথে শরণার্থী সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতির কর্ম-কর্তাদের সাথে আমার যোগাযোগ করে দেন। সমিতির সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তীর সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি বলেন, পরদিন তিনি সীমান্তের

দিকে যাবেন। কৃষ্ণনগর ও নদীয়া জেলা সীমান্তে। আমি গেলে তিনি নিয়ে যেতে পারেন। আমি রাজী হলাম। কথা হলো, তিনি আমাকে বাংলাদেশ মিশন থেকে তুলে নেবেন।

সীমান্তে যাওয়ার জন্য আমি হাতের কাজ গুছিয়ে নেই। আমার সেখানে যাওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন। কারণ, সীমান্তের এই অঞ্চলে নিজের জেলা কুষ্টিয়ার অনেকের সাথে সাক্ষাত হবে। কৃষ্ণনগরে গিয়ে দেখি, স্থানীয় সমাজকর্মীরা এক বাড়ীতে অফিস করেছে। সে দিন সেখানে শরণার্থী সমস্যার সমাধান ও মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সর্বদলীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বৈঠক আহবান করা হয়েছে। প্রফেসর দিলীপ চক্রবর্তী বৈঠকে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। আমাকে পেয়ে তারা খুশী হন।

আমি সমাবেশে আমাদের সংগ্রাম, যুদ্ধপরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করি। বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিম বংগের সচেতন অধিবাসীদের কাছ থেকে কি আশা করি তাও জানালাম। ছোটবেলায় দাদুর মুখে শোনা কৃষ্ণনগর, 'পুতুল খেলার কৃষ্ণনগর' আজ স্বচক্ষে দেখলাম। বাংলাদেশের ভিটে মাটি হারা মানুষ আসছে। কিন্তু এপারের জনগণ আঁৎকে উঠেনি। ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় বলেই এপারের মানুষ ওপারের ভাগ্যাহত মানুষদের আশ্রয় দিচ্ছে। বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসলে চুয়াডাংগার সকল কর্মী ভাইয়েরা আমার সাথে কোলাকুলি করেন। এদের মধ্যে মিছকিন মিয়া, ফকীর মোহাম্মদ, ডাঃ নজির আহমদ সহ আরো অনেকে ছিলেন। তাদের মুখে অনেক কথা শুনলাম। আমি তাদেরকে বললাম, এদেশে আমরা যেন বাস্তুহারা হয়ে না যাই। এই যুদ্ধে সকলকে অংশ নিতে হবে। যিনি অস্ত্র হতে নিতে পারবেন, তিনি প্রশিক্ষণ নেবেন। আর যিনি তা পারবেন না, তাকে সহকারী হিসেবে যুদ্ধের সামগ্রী বহন করতে হবে। সকলকে একত্র থাকতে হবে। যা পাই তা ভাগ করে খেতে হবে। আমি তখন কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় দায়িত্ব ছাড়াও জেলার প্রতি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।

এরপর আমি কয়েকদিন ধরে কুষ্টিয়া জেলার দলীয় কর্মীদের খুঁজে বের করি। চুয়াডাংগা আওয়ামী লীগের তৎকালীন প্রচার সম্পাদক (বর্তমানে জাসদ-নেতা) মীর্জা সুলতান রাজা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কুষ্টিয়া আওয়ামী লীগ সংগঠনের সাংগঠনিক ব্যাপারে তিনি আমাকে সক্রিয় সহায়তা করেছেন। সমাজতান্ত্রিক ও বিপ্লবী কর্মী গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসনীয়। তাঁকে খুঁজে বের করি। মীর্জা সুলতান, আবুল হাশেম, ডাঃ নাজির সহ আরো অনেকে মিলে একটি বাড়ীতে একটি ক্যাম্প গড়ে তুলেছে। বিভিন্নভাবে তাঁবু, খাবার ও রান্নার জিনিসপত্র যোগাড় করা হল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতি বিশেষ করে দিলীপ চক্রবর্তী এ ব্যাপারে বিশেষ সহযোগিতা করেন।

এমনিভাবে বয়রা, মামাভাগ্নে, কৃষ্ণনগর, শিকারপুর সহ বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের দলীয় কর্মীদের উদ্যোগে ছোট ছোট ক্যাম্প গড়ে ওঠে। এগুলোর মধ্যে শিকারপুরের অবস্থা অতি করুণ। কুষ্টিয়া সদর, কুমারখালি, রাজবাড়ী, ইত্যাদি অঞ্চলের লোকজন এখানে জমা হয়েছে। একটি ছোট গুদাম ঘর স্থানীয় লোকেরা ছেড়ে দিয়েছে। সেখানে সকল রাজনৈতিক কর্মী স্থান নিয়েছেন। কুষ্টিয়ার আব্দুল হামিদ, আজিজ মিয়া, আবুল কালাম, জলিল সবাই এখানে স্থান নিয়েছেন। এক হাটু পানি দিয়ে এই গুদাম ঘরে যেতে হয়। কোন রকমে ছাউনি দিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাটিতে বিছানা পেতে থাকতে হচ্ছে। এত কষ্টের মধ্যে থেকেও এদের মনোবল ও উদ্দীপনা কমেনি। কিভাবে দেশ স্বাধীন হবে, এই যেন তাদের সবসময়ের চিন্তা। মেহেরপুরের এম পি এ মহিউদ্দিন, এম পি এ নুরুল হক, জলিল এঁদেরকেও খুঁজে পেলাম। তারা একটি পাটের গুদামে আশ্রয় নিয়েছে। আমাদের সকলের চিন্তায় এক অদ্ভুত মিল রয়েছে। আওয়ামী লীগ কর্মীরা যে এক পরিবারভুক্ত তা দুর্দিনের দিনে বুঝা যায়। কেউ কাকে ছেড়ে যাবে না। যা পাবে, তা সকলে মিলে ভাগ করে খাবে এমনি মনোভাব গড়ে ওঠেছে। সীমান্তের বিভিন্ন এলাকা ঘুরতে ঘুরতে অনেক রাত হয়ে যেতো। কোন কোন দিন রাত ১২টার দিকে কলকাতা ফিরতাম। দিনের বেলা অফিসে আর রাতের বেলা সীমান্তে এই ছিল নিত্যদিনের কাজ। প্রধান মন্ত্রীকে প্রায়ই মনঃক্ষুণ্ণ মনে হতো। নকশালীদের তখন চরম দাপট। কৃষ্ণনগর, রানাঘাট অঞ্চলে তাদের তৎপরতা চলছে। তেমনি কলকাতায়ও। ২/১ ঘণ্টা ঘুমিয়ে, উঠে পড়তাম। সকালে নাশতার টেবিলেও তাজউদ্দিন ভাইএর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতো। ১২/১ টার মধ্যে মিশনে গিয়ে কাজ শেষ করতাম। এরপর হোসেন আলীর সাথে দুপুরের খাওয়া সেরে নিতাম। হোসেন আলীর স্ত্রী ডাল ভাত পাক করতেন। বিদেশ থেকে পাওয়া চিঠিপত্রের সংক্ষিপ্ত সার ও প্রেস ক্লিপস প্রধানমন্ত্রীকে দিতাম। দুপুরের খাওয়া শেষ করে সীমান্তের দিকে রওয়ানা হতাম।

ইতিমধ্যে শরণার্থী সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করলো। সীমান্তের কাছাকাছি ভারতের কয়েকটি রাজ্যের স্কুল কলেজ গুলোকে বন্ধ করে দিতে হলো। বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীরা এগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে। স্থানীয় উদ্যোগে শরণার্থীদের সাহায্য করা হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা এত ব্যাপক যে কেন্দ্রীয় উদ্যোগ ছাড়া এর সমাধান সম্ভব ছিলনা। ভারত সরকার চাল, ডাল, ইত্যাদির ব্যবস্থা করলেন কিন্তু রান্নার হাড়ি, পাতিল, বাসন কোসনের অভাব রয়েছে। পায়খানা প্রস্রাব করার স্থানেরও অভাব। পানির ব্যবস্থা নিতান্তই অপ্রতুল। এই অবস্থার জন্য আশ্রয়দাতা ও আশ্রিত কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় বিভিন্ন শিবিরে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা এসব সমস্যার আশু সমাধানের চেষ্টা করছে। কোন কোন শিবিরে কলেরা, রক্ত আমাশয় ইত্যাদি

রোগ দেখা দিয়েছে। শিশু মৃত্যুর হার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। দীর্ঘ সীমান্ত পথ পাড়ি দিয়ে শিবিরে এসে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অনাহার ও রোগের বেশী শিকার হচ্ছে শিশু ও বৃদ্ধরা। এমনও ঘটনা ঘটেছে মা মৃত শিশুকে সৎকার না করে পথিমধ্যে ফেলে এসেছে। অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের আহার, বিশ্রাম প্রয়োজন। শরণার্থী শিবিরের করুণ অবস্থা দেখে চোখের জল বাধ মানে না। কিন্তু দুরবস্থার মধ্যে থেকেও মানুষের মনোবল কমেনি। কলকাতার বন্ধুদের আমাদের এই দুরবস্থার কথা জানাই। বিভিন্ন ত্রাণ সমিতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করে এগিয়ে আসে।

মৈত্রেয়ী দেবী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা কমিটির আহবায়িকা। তিনি ছোট একটি ত্রাণ তহবিল গঠন করেছেন। রবি ঠাকুরের স্নেহ ধন্যা মৈত্রেয়ী দেবী বাংলার মানুষের দুঃখের দিনে এগিয়ে এলেন। তাঁকে নিয়ে আমি বিভিন্ন শিবিরে গিয়েছি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা, বিশেষ করে শরণার্থী ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে সু সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

একটি লিফলেট ছাপা হলো। লিফলেটে শরণার্থী শিবিরে থাকার নিয়ম কানুন, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি লিখা ছিল। এটা শরণার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। প্রথম দিকে বিভিন্ন ত্রাণ সংস্থার সাহায্যে শিবিরগুলো পরিচালিত হয়। পরে অবশ্য এগুলোর ভরণ পোষণের দায়িত্বভার কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করে। চব্বিশ পরগনা অঞ্চলে বরিশাল ও খুলনার শরণার্থীদের শিবির তৈরী করা হয়। এমনিভাবে মুর্শিদাবাদেও ক্যাম্প হয়েছে। রাজনৈতিক নেতা ও স্থানীয় সমাজ কল্যাণ সংস্থাগুলোর সহায়তায় শরণার্থী শিবিরগুলো পরিচালিত হতে থাকে।

বিভিন্ন সেক্টরে সামরিক বাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের কাজ চলছে। আগরতলাতে খালেদ মোশাররফ ও শফিউল্লাহ নিজ নিজ ছাউনীতে নিয়মিত বাহিনীর সাথে অনিয়মিত মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলছেন। নতুন নতুন যোদ্ধা তৈরী হচ্ছে। পাক বাহিনীর সাথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লড়াইয়ে নবাগতরা অংশ গ্রহণ করে।

আমাদের সাথে ভারত সরকারের কথা হয়েছিল তারা ১ লাখ গেরিলাকে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দেবে। এ ছাড়া একটি বেতার স্টেশন চালুর ব্যাপারেও ভারত সরকার প্রতিশ্রুতি দেন। এদিকে ভারত সরকারের বিভিন্ন এজেন্সীর লোক আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে। কখনো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, কখনো সামরিক লিয়াজোঁ আমাদের কাছে আসছে। এ সব বিষয়ে সমন্বয় সাধনের জন্য বাংলাদেশ মন্ত্রিসভা মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত নেয়।

মিসেস গান্ধীর সাথে দেখা করার জন্যে সকল মন্ত্রী দিল্লী যান। দেখা করে তারা কলকাতা ফিরে আসেন। এ সময় ওসমানী রাজনৈতিক সচেতন

ছেলেদের প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রস্তাব করেন। রাজ্জাক, তোফায়েল প্রস্তাব নিয়ে আসেন তাদের দায়িত্ব দিলে তারা ভাল ছেলে রিক্রুট করে দিতে পারে। ওসমানী তাদের প্রস্তাবে উৎসাহ প্রকাশ করেন। তিনি আমার পাশের ঘরে থাকতেন। বালিগঞ্জে তার অফিস ছিল। তার অফিস তখনো ভালো ভাবে গড়ে ওঠেনি। তিনি আমাকে একটা অথোরাইজেশন লেটার লিখে দেয়ার অনুরোধ করেন। আমি তা' লিখে টাইপ করে দিয়ে দিলাম। ওসমানী তাঁর পক্ষে রাজ্জাক, তোফায়েলকে রিক্রুট করার অধিকার দিয়ে দিলেন। এই চিঠির সযোগ গ্রহণ করেই শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ, আ,স,ম, আবদুর রব 'মুজিব বাহিনী' নামে আলাদা বাহিনী গড়ে তোলেন।

ভারতের ২টি স্থানে মুজিব বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। জেনারেল ওভান এই প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন। আজ পর্যন্ত আমি বুঝে উঠতে পারছিনা মুজিব বাহিনী নামে এই আলাদা বাহিনীর কোন প্রয়োজন ছিল কি না। তবে যদ্দুর জেনেছি ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এর সাথে শেখ মনির লবি ছিল। তাকে বুঝানো হয় যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব সে সময় নেতৃত্ব দিতে অসমর্থ হবে। অথবা এই নেতৃত্ব কোন প্রকার আপোষ করতে পারে। তাকে আরো বুঝানো হয়, যে যুব শক্তি স্বাধীনতার উন্মেষ ঘটিয়েছে, তারাই কেবলমাত্র সঠিক নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে। প্রয়োজনে এই নেতৃত্ব আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বিকল্প হিসেবে কাজ করতে পারবে। তাছাড়া বাংলাদেশ স্বাধীন হলে এই নব শক্তি চীন বা নকশাল পন্থীদের বিরুদ্ধে স্বাধীন ও সার্বভৌম সরকার প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করবে। পরে আরো জেনেছি, ভারত সরকার এই সিদ্ধান্ত নেয় যার অর্থ হলো: 'এক বাক্সে সকল ডিম না রাখা'।

বি এস এফ এর রুস্তমজী মুজিব বাহিনী গঠনের তীব্র প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তার প্রতিবাদ শেষ পর্যন্ত গ্রাহ্য হয়নি। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হলো, ভারত সরকার মুজিব বাহিনী গঠন সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্ত মুজিব নগর সরকারের কাছে গোপন রাখে। তবে মুজিব বাহিনী গঠনের বিষয়টি আমাদের কাছে আর গোপন থাকেনি। তাজউদ্দিন ভাই সহ আমাদের অনেককে এই সিদ্ধান্ত পীড়া দেয়। জাতি যখন সম্পূর্ণভাবে একটি নেতৃত্বের পেছনে ঐক্যবদ্ধ ও আস্থাবান তখন যুব শক্তিকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করা বা বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা মুক্তিযুদ্ধের যেমন সহায়ক হয়নি, তেমনি পরে দেশ পুনর্গঠনের কাজেও অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে।

আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে এর চেয়ে বড় বিপর্যয় (সেট ব্যাক) আর কিছু হতে পারেনা। আমাদের এম পি, এম এন এ ও নেতাদের মনোনীত ছেলেদের মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ওসমানীর প্রত্যাশিত 'সোনার ছেলে' পাওয়া গেল না। মুজিব বাহিনীর নেতৃবৃন্দ তাকে এই সুযোগ দেয় নি।

ওসমানীর প্রাথমিক ধারণা ছিল তারা হয়তো তাদের দায়িত্ব পালন করেন নি। কিন্তু পরে তিনি জানেন, এই দায়িত্বের ভার নিয়ে তাঁরা অন্য দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত ছিলেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার প্রতিষ্ঠার জন্যে সবাই তাগিদ দিচ্ছে। এটা আমাদের পরিকল্পনার শুরুতেই প্রধান কর্মসূচী ছিল। আমার জানা মতে আমাদের নিজস্ব বেতার স্টেশন স্থাপনের ব্যাপারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। এ ব্যাপারে একটা নির্দেশ আসার কথা ছিল। কিন্তু কোন কারণে এতে জটিলতা দেখা দেয়। ভারতীয় আমলাতন্ত্রের জট খুলতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হয়।

ইতিমধ্যে ভারতীয় বৈদেশিক অফিসের মিঃ রয়, মিঃ নাথ, কংগ্রেসের বহু নেতা উপনেতা আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন। ত্রিগুণা সেনের সাথে বাংলাদেশ মিশনে পরিচয় হয়। তিনিও সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণও আমাদের সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি দেখান।

কিছুদিনের মধ্যে ব্যবস্থা হলো যে আমাদের কর্মসূচী রেকর্ড করে তা স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচার করতে পারবো। আমরা বালিগঞ্জের যে বাড়ীতে থাকতাম সেখানে একটা ঘরে রেকর্ড করা শুরু হয়। একটি টেপ রেকর্ডার এর ব্যবস্থা করে তা করা হয়। কিছুদিন পর থিয়েটার রোডের একটি বাড়ীতে রেকর্ডের কাজ করা হয়। বেতারকেন্দ্রও ঐ বাড়ীতে চলে যায়। আব-দুল মান্নান বেতার পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ সময় বৃটেন থেকে ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ আসেন। তার সাথে আসেন 'ওয়ার অন ওয়ান্ট' এর পক্ষ থেকে একটি ছোট্ট প্রতিনিধিদল। সাথে ছিলেন ফাদার হার্ডেলসন ও মাইকেল বার্নস এম পি। তিনি আসার আগেই আমাকে খবর দেয়া হয়। প্রতিনিধিদল সরে জমিনে শরণার্থীদের ক্যাম্প ঘুরে ঘুরে দেখেন।

আমি তাদের থাকার জন্য সুব্রত রায় চৌধুরীর বাড়ীর তিন তলায় ব্যবস্থা করি। কিন্তু তারা সেখানে উঠেন নি; তাঁরা উঠেন গ্র্যাণ্ড হোটেলে। সেখানে উঠেই টেলিফোনে যোগাযোগ করেন। ফাদার হার্ডেলসন ছিলেন কলকাতায় নিযুক্ত বৃটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার। এই প্রতিনিধিদলের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তারা জানতে চান কি ভাবে আমাদের সাহায্য করবেন। আমি প্রস্তাব করি, 'ওয়ার অন ওয়ান্ট' নিজেরা প্রত্যেক ক্যাম্পে সাহায্য করতে পারবেনা। কারণ, সমস্যা অতি ব্যাপক। তাই তাঁরা যদি বাংলাদেশী কোন সাহায্য প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ সরকারকে সাহায্য করেন, তাহলে আমরা তা ক্যাম্পে পৌঁছাতে পারবো।

ডোনাল্ড পূর্ব থেকেই আমাদের সাহায্যের ব্যাপারে উৎসাহী। তিনি অন্যান্য ট্রাস্টিদের সাথে আলোচনা করে যথাসাধ্য সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি আমার কাছে পরিকল্পনা ও বাজেট চান। আমি তা দিই। আমাদের প্রধান মন্ত্রীর সাথেও এ নিয়ে আলোচনা হয়। শরণার্থী শিবিরের সাধারণ মানুষকে সাহায্য

করা ছাড়াও রাজনৈতিক ও সমাজকর্মী যারা কোন কাজ করতে পারছেন না, তাদের কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

আমি বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার সার্ভিস নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও এর একটা বাজেট পেশ করি। প্রধানমন্ত্রী এই সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন। তিনি এই সংগঠন করার অনুমতি দেন।

বরিশাল থেকে নূরুল ইসলাম মনজুর ও মহিউদ্দিন এম পি অস্ত্রের জন্য আসেন। সে জেলায় তখন প্রচণ্ড প্রতিরোধ যুদ্ধ চলছে। বরিশাল শহর ও তার আশে পাশে মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে। তারা জানান, অস্ত্র পেলে সেখানে তারা পাক হানাদার বাহিনীর মোকাবেলা করতে সক্ষম হবেন। আমি বুঝালাম, বরিশালে যে শক্তি আছে, তাদের এদিকে নিয়ে এসে নতুন সাংগঠনিক রূপরেখায় গড়ে তোলা প্রয়োজন। কিন্তু তারা তাদের সংকল্পে অটল। তাদের দু'জনেরই বিশ্বাস অস্ত্র পেলে তারা বরিশাল মুক্ত করতে পারবেন। মেজর জলিল এই সেকটরের কমাণ্ডার। বরিশালে তিনি বীরের মত যুদ্ধ করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাদের অনুরোধ রক্ষার্থে দু'নৌকা অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়।

দুর্ভাগ্যবশতঃ পাক চরেরা আগে ভাগে এই খবর পেয়ে যায়। পশ্চিম বাংলার মুসলমানরা সাধারণতঃ আমাদের আন্দোলন সহানুভূতির চোখে দেখতোনা। এদের কেউ কেউ হানাদারদের মদত দিতো। নৌকা ভর্তি অস্ত্র নিয়ে যাওয়ার সময় চব্বিশ পরগণার কোন এক স্থানে পাক বাহিনী এই ছোট্ট নৌকাকে এমবুশ করে। পাক বাহিনীর হামলার হাত থেকে মনজুর রক্ষা পেলেও মহিউদ্দিন ও অপর একজন শত্রুর হাতে বন্দী হন। তাদের অকথ্য নির্যাতন করা হয়। কিছুদিন পর মেজর জলিল ও নূরুল ইসলাম মনজুর দলবল নিয়ে টাকিতে এসে ক্যাম্প স্থাপন করেন।

টাকি থেকে নৌপথে খুলনা সাতক্ষীরা ইত্যাদি প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমরা যেতাম। মুক্তিযুদ্ধের খবরাখবর ও সংগঠনের অবস্থা এমনিভাবে জানা সম্ভব হতো। হাজার হাজার শরণার্থী এই অঞ্চলে বসবাস করছে। এরা খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালীর শরনার্থী। এরা নৌকায় সংসার সাজিয়ে নিয়েছে। দেশ থেকে চাল, ডাল, হাড়ি পাতিল সব সাথে এনেছে। হাজার হাজার নৌকায় এভাবে লোকজন বসবাস করেছে। ছিন্নমূল মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে কিভাবে ঢেউ এর সাথে লড়াই করছে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। দুঃখী মানুষের এই দুঃসাহসী মনোবল দেখে আমার মন গর্বে ভরে ওঠেছে। চব্বিশ পরগণার এমনি কয়েকটি অঞ্চলে প্রধানমন্ত্রী সহ আমি বহুবার গিয়েছি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বেশ কিছু বিদেশী সাংবাদিক অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। এঁরা বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব গাথা বিশ্বের জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন। এ সব বরেণ্য সাংবাদিকদের মধ্যে পিটার

হেজেল হার্ন্ট, নিউইয়র্ক টাইমস-এর সিডনী সেন বার্গ, লা মঁদের একজন সাংবাদিক ও লণ্ডনের গ্রেনাডা টেলিভিশনের প্রতিনিধি শিলার নাম উল্লেখযোগ্য।

শিলা খুব সাহসী মহিলা। তিনি বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধের চিত্র সারা পৃথিবীতে প্রচার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন বাংলার মুক্তিযুদ্ধ কাল্পনিক কিছু নয়। এক সময় শীলাকে আমি খালেদ মোশাররফের যুদ্ধ ক্যাম্পে পাঠাই। খালেদ পূর্বাঞ্চলে এক দুঃসাহসী প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলেছে। খালেদ আমার পুরাতন বন্ধু। আমরা দু'জনেই ঢাকা কলেজের ছাত্র। আমি তখন ছাত্র রাজনীতি করি। সামরিক বাহিনীতে যাওয়ার পরেও তার সাথে আমার দুই-একবার দেখা হয়েছে। খালেদের দুঃসাহসিক বীরত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছে। খালেদ ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে শফিউল্লাহ, এম, এ, জলিল, রফিকুল ইসলাম, ওসমান চৌধুরী, নূরুজ্জামান, নজমুল হুদা, তওফিক, মাহবুব সহ আরো অনেকের ভূমিকা ছিল অনন্য।

শিলা খালেদের সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রায় এক সপ্তাহ বাংকারে বসে ছবি তুলেছেন। তিনি ফিরে এসে আমাকে বলেন, আমি যা দেখেছি, এতে জোর দিয়ে বলতে পারি, বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। পৃথিবীর কোন শক্তি এই অদম্য স্পৃহা দমাতে পারবেনা। শিলা খালেদের বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এমনি ভাবে টেলিভিশন ক্রু সহ বিদেশী প্রতিনিধি নিয়ে বহুবার রণাঙ্গনে গেছি। একদিন বয়রার কাছে একটি ক্যাম্পে যাই। ক্যাপ্টেন নজমুল হুদা ঐ ক্যাম্পের ইনচার্জ ছিলেন।

একটু পানি ভেঙ্গে শিবিরে যেতে হয়। কয়েকদিন পূর্ব থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল। ক্যাম্পে পৌছে দেখি কোথাও কোন শুকনো জায়গা অবশিষ্ট নেই। ছেলেদের গায়ের কাপড় ভিজে গেছে। আমরা সবাই শীতে থর থর করে কাঁপছি। বিকেল ৩/৪ টা বেজে গেল, তবুও তাদের খাওয়া হয়নি। ভেজা কাঠে রান্না করতে হলো। তবুও হুদা কোন অভিযোগ করলেন না। ফেরার সময় হুদা শুধু বললেন, কিছু মশারী দিতে পারলে ভাল হয়। মশার খুবই উৎপাত। পরদিন দিলিপ চক্রবর্তীর কাছে মশারী চাইলাম। তিনি কয়েকশ' মশারীর ব্যবস্থা করে দিলেন। দুইদিন পর এই মশারী সহ ক্যাম্পে যাই। সেদিন পরনে লুঙ্গি ছিল। তাই ক্যাম্পে পৌছাতে কোন অসুবিধা হলো না। হুদার সাথে অনেক আলোচনা হলো। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণের পর দেশে পাঠানো, এবং দেশে এদের পরিচালনার ব্যাপারে নেতৃত্বের অভাব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম। আমি এসব বিষয় নিয়ে পরে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করি। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার আবেদন জানাই।

বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় বহু অধ্যাপক, শিক্ষক এঁসেছেন। এঁদের মধ্যে ডঃ সারওয়ার মোর্শেদ, বেগম নুরজাহান মোর্শেদ, ডঃ এ আর মল্লিক, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ মোশাররফ হোসেন, ডঃ স্বদেশ বোস এর সাথে কথা হলো। আমার কিছু কাজ তাদের কারো কারো মধ্যে ভাগ করে দিলাম। এখন থেকে

প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা বিবৃতি তৈরী করার দায়িত্ব ডঃ সারওয়ার মোর্শেদ ও ডঃ আনিসুজ্জামানকে দিলাম। তারা খসড়া তৈরী করতেন। আমি প্রধান মন্ত্রীর সাথে এগুলোর চূড়ান্ত রূপ দিতাম। ডঃ মল্লিককে বাংলাদেশ থেকে আগত শিক্ষকদের সংগঠিত করার দায়িত্ব দেয়া হলো। তাঁর প্রচেষ্টায় সেখানে শিক্ষক সমিতি গড়ে ওঠে।

(স্কুল) শিক্ষক সমিতির সভাপতি কামরুজ্জামান এই শিক্ষক সহায়ক সমিতির ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেন। বন্ধু মঈদুল হাসানও কলকাতা আসলেন। তাকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে কয়েক দফা বৈঠক হলো। তিনি দিল্লী চলে গেলেন। সেখানে নেপথ্য থেকে তিনি আমাদের লবি সৃষ্টি করেন।

এদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ কোন কাজেই হাত দিচ্ছেন না। মাহবুবুল আলম চাষী ও তাহের উদ্দিন ঠাকুরকে আগরতলা থেকে কলকাতা আসার জন্য মোশতাক চাপ দিচ্ছেন। মোশতাক এর দাবী অনুযায়ী তাদের দু'জনকে কলকাতা আনা হলো। চাষীকে মোশতাক আহমদ পররাষ্ট্র সচিব-এর পদে নিয়োগ করেন। আমি বুঝলাম, আমার মাধ্যমে বিদেশের সাথে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যে যোগাযোগ হচ্ছিল, তাতে মোশতাক খুশী হতে পারেন নি। চাষী কাজ শুরু করেছেন। মোশতাক এরপর দাবী করলেন, বাংলাদেশ মিশনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছাড়া অন্য কোন বিভাগ থাকতে পারবেনা। এতদিন আমি বাংলাদেশ মিশনে কাজ করেছি। মোশতাকের এই নুতন দাবীর অর্থ বুঝতেও আমার অসুবিধা হলোনা। অর্থাৎ আমাকে সার্কাস এভিনিউস্থ পররাষ্ট্র মিশন থেকে তাড়াতে হবে।

থিয়েটার রোডে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে আমার বসার ব্যবস্থা করা হলো। আমার পরিবার না আসা পর্যন্ত প্রধান মন্ত্রী ও আমি একটি ঘরের দুইটি চৌকিতে থাকতাম। থিয়েটার রোডের বাড়ীটি বেশ বড়। সৈয়দ নজরুল ইসলামের পরিবার না আসা পর্যন্ত তিনিও এখানে থাকতেন। এরপর সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক ও কামরুজ্জামান পৃথক পৃথক ফ্ল্যাটে ওঠেন। কিন্তু পরিবার আসার পরেও প্রধানমন্ত্রী থিয়েটার রোড ত্যাগ করেন নি। তাজউদ্দিন ভাই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যতদিন দেশ স্বাধীন না হবে, ততদিন তিনি পারিবারিক জীবন যাপন করবেন না। তিনি বলতেন, যুদ্ধরত অবস্থায় যোদ্ধারা যদি পরিবার বিহীন অবস্থায় থাকতে পারে, আমি সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তা' করতে পারবোনা কেন? তিনি তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন।

আমার পরিবার আসতে অনেক দেরী হয়ে যায়। ঢাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আমার ছোট্ট পরিবার ৩ ভাগে বিভক্ত ছিল। আমি প্রধান মন্ত্রীর সাথে, ছেলে প্যাবলু স্ত্রীর সাথে, আর মেয়ে শম্পা তার নানীর সাথে গিয়েছিল নারায়ণগঞ্জে। ২৫শে মার্চের পর পাক বাহিনী নারায়ণগঞ্জ আমার শ্বশুরের বাড়ী এবং স্ত্রীর ভাই মুস্তাফা সারোয়ারের বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয়। মেয়েটি

তার নানীর সথে মানুষের মিছিলে শামিল হয়। এরপর বহু কষ্টে শ্বশুরের পৌত্রিক বাড়ী দাউদকান্দির জামালকান্দিতে উপস্থিত হয়।

আমার স্ত্রী লীলা আমার কোন খোঁজ খবর পাননি। বাড়ীওয়ালী বেগম হাবিবুদ্দিন ওপর তলায় থাকতেন। আমাদের সাথে তাঁর খুবই সদ্ভাব ছিল। আমি তাকে খালাম্মা ডাকতাম। তিনিও পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। কিন্তু ২৫শে মার্চের পর আমার স্ত্রীকে ৪ বছরের ছেলে সহ বাড়ী ছাড়তে বাধ্য করেন। স্ত্রী পাশের বাড়ীর নাইমুর রহমানের সাথে আমার খোঁজে মুসা সাহেবের বাড়ীতে যান। আমি মুসা সাহেবের বাড়ীর ছাদের যে ঘরে থাকতাম, সেখানের একটি চৌকিতে একটি রক্তাক্ত চাদর ছিল। আমার স্ত্রী এই চাদর দেখে ফেলেন। ২৫শে মার্চ রাতে সেই চৌকিতে একজন গাড়ী চালক ঘুমিয়েছিল। হানাদারদের গুলিতে সে নিহত হয়। এরপর লীলা আমার খোঁজে শ্বশুরবাড়ী নারায়ণগঞ্জে রওয়ানা হন। কিন্তু তিনি সেখানে যেতে পারেননি। ফতুল্লায় পাক বাহিনী ব্যারিকেড সৃষ্টি করে রাখে। ফিরে এসে তিনি দু'এক জন আত্মীয় স্বজনের বাসায়ও যান। কিন্তু অনেকেই সেদিন তাকে ভাল চোখে দেখেন নি। তবে কোন এক সাহসী সহৃদয় আত্মীয়ের বাড়ীতে আমার স্ত্রী প্রায় দু'সপ্তাহ অবস্থান করেন। সেখান থেকে ডাঃ নাইমুর রহমানের স্ত্রীর সহযোগিতায় গাড়ীযোগে তিনি নারায়ণগঞ্জে যান। কিন্তু সেখানে গিয়ে শ্বশুর বাড়ীর কাউকে না পেয়ে নৌকা যোগে জামালকান্দি চলে যান। তখনো আমার মেয়ে সেখানে পৌঁছেনি। নদীর প্রায় কাছাকাছি আমার শ্বশুরের গ্রামের বাড়ী। মিলিটারীর হামলার আশংকায় আমার পরিবারের লোকজন ভয় ভীতির মধ্যে সেখানে অবস্থান করেছে। হানাদারদের গান বোটের হামলার আশংকায় আমার অন্তঃসত্বা স্ত্রীকে গ্রামান্তরে দৌড়াতে হয়েছে। তা'ছাড়া তিনি তখনো জানতে পারেননি আমি কোথায়, কি অবস্থায় রয়েছি। আওয়ামী লীগের একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী রহমত আলীর কাছে খবর পেলাম আমার স্ত্রী জামালকান্দিতে রয়েছেন। রহমত আলীর কাছে তাজউদ্দিন ভাই এর পরিবারের খবর পাওয়া গেল। রহমত আলী জানান, তিনি প্রধান মন্ত্রীর পরিবারকে নিয়ে আসবেন। আমি রহমত আলীর কাছে চিঠি দিলাম। রহমত আলী প্রথমে বেগম তাজউদ্দিন ও জুন মাসের শেষ দিকে আমার পরিবারের লোকজনকে কলকাতায় নিয়ে আসেন।

মে-জুন মাসের দিকে আগরতলা গিয়েছিলাম। সেখানে আমার স্ত্রীর বড় ভাই আওয়ামী লীগ নেতা এ কে এম শামছুজ্জোহা তার পরিবার পরিজন নিয়ে আসেন। তাঁদের কাছে আমার পরিবারের খোঁজ খবর পাই। আমার পরিবার যখন কলকাতায় পৌঁছেন, আমি তখন উপস্থিত থাকতে পারিনি। বি এস এফ এর মিঃ চট্টপাধ্যায় একটি কারগো বিমানে করে তাদেরকে আগরতলা থেকে কলকাতা নিয়ে যান। বি এস এফ এর ভাড়া করা বাড়ী কোহিনুর ম্যানসনে

তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। এসময় আমি খুবই ব্যস্ত। আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির একটি প্রচণ্ড সংকট মোকাবেলা করতে হচ্ছিল।

প্রথম থেকেই মন্ত্রিসভার প্রতি আমাদের যুব সমাজের একটা অংশের বিরূপ মনোভাব ছিল। তারা মুজিব নগর সরকারের নেতৃত্ব মেনে নিতে অনীহা প্রকাশ করছিলেন। যুবকদের এই অংশের কাজ ছিল বিভিন্নভাবে সরকারকে অপদস্ত ও হয়রানী করা। তারা ভারতের প্রধান মন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পর্যন্ত মুজিব নগর সরকারের নেতৃত্ব সম্পর্কে কুৎসা ও ভুল তথ্য পরিবেশন করে। অপপ্রচারের অংশ হিসেবে তারা প্রচার করে যে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের প্রতি অধিকাংশের সমর্থন নেই।

এই অবস্থায় আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্য ও নেতাদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। কারণ এমন একটি বৈঠকই প্রমাণ করতে পারে যে তাজউদ্দিন সরকারের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের শুধু সমর্থনই নেই, এ পর্যন্ত তাঁর সকল কার্যক্রমের প্রতিও তাদের অনুমোদন রয়েছে।

এই উদ্দেশ্যে শিলিগুড়ির জঙ্গলে বৈঠকের আয়োজন করা হয়। নদীর পাশে পাহাড়িয়া এলাকার এই জঙ্গলে বৈঠকের জন্য অনেকগুলো তাঁবু টানা হয়। নির্বাচিত সদস্য ও দলীয় নেতাদেরকে বৈঠকে একত্রিত করার ব্যাপারে বি এস এফ এর চট্টপাধ্যায়ের বিরাট অবদান রয়েছে।

বৈঠকে খোলাখুলিভাবে সরকারের কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে মুজিবনগর সরকারের প্রতি আস্থা ও সমর্থন প্রকাশ করা হয়। এতদিন যারা তাজউদ্দিন সরকারের অপপ্রচার করেছিল, বৈঠকের ফলে তাদের মুখে ছাই কালি পড়ে। শিলিগুড়ির বৈঠকের পর কলকাতা বিমান বন্দরে এসে জানলাম, আমার পরিবারবর্গ এসেছে।

কোহিনুর ম্যানসনের ফ্ল্যাটে স্ত্রী, মেয়ে ও পুত্রের সাথে মিলিত হ'লাম দীর্ঘ দিন পর। ফ্ল্যাটে কোন আসবাবপত্র নেই। মেঝেতে বিছানা পাতা হয়েছে। একই ফ্ল্যাটে আমরা ছাড়াও শামসুজ্জোহা ও মুস্তাফা সারওয়ারের পরিবারবর্গ রয়েছে। জায়গার তুলনায় আমরা লোক ছিলাম বেশী।

এ সময় হানাদার বাহিনীর সমর্থকরা আমার গ্রামের বাড়ী জ্বালিয়ে দিলে তারা গৃহহারা হন। অসুবিধা হলে দেশ ছাড়ার জন্যে আমি আব্বাকে ইতিপূর্বে খবর দিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, দেশের মাটিতে থেকেই আমাদের জন্যে তিনি দোয়া করছেন। জীবনের অধিকাংশ সময় চাকরি সূত্রে তিনি কলকাতায় কাটিয়েছেন। তার কলকাতা আসার কোন ইচ্ছা ছিল না। বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়ার পরে আত্মীয় স্বজনরা এক প্রকার জোর করে আব্বাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন।

হানাদাররা আমার বাড়ীর সকল সম্পত্তি লুঠ করে নিয়ে যায়। তাদের গুলিতে আমার চাচী আহত হন। বাড়ীর মেয়েরা অন্যত্র আত্মীয়দের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। আব্বাসহ যুবক ও অন্যান্য পুরুষ মানুষ কলকাতা চলে আসেন। ২৫শে মার্চের রাত থেকেই এ পর্যন্ত তাজউদ্দিন ভাই ও আমি একত্রে থেকেছি। পরিবার আসার পর তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম। তাকে ছেড়ে আসতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। তাছাড়া রাতের বেলায় এই বিচ্ছিন্নতায় কাজেরও বিরাট ক্ষতি হলো। কেননা, এতদিন দিনের কাজ শেষে রাতের বেলা বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করতাম। আমার স্ত্রী অন্তঃসত্বা। তাছাড়া সকল প্রতিকূলতার ভেতর সংগ্রাম করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে জীবন যাপন করে খুবই দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। স্ত্রীর এই শারীরিক অসুস্থতার সময় আমার কাছে থাকা খুবই প্রয়োজন। অসুস্থ স্ত্রীকে ডাঃ অমীয় ঘোষের কাছে নিয়ে গেলাম। ইতিমধ্যে তার সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়ে গেছে। প্রথম থেকেই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে কাজ করে আসছেন। আমার স্ত্রীর অবস্থা দেখে ডাক্তার চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ অপুষ্টি ও অনিয়মের কারণে গর্ভজাত সন্তান বিপদমুক্তভাবে প্রসব নাও হতে পারে। অন্যান্য সংসদ সদস্যদের হারে মাসিক যে টাকা পেতাম, তা দিয়ে কোন রকমে বাজার খরচ চলতো।

আমার জন্য একটি সরকারী জীপ বরাদ্দ ছিল। এর জন্য প্রয়োজনীয় পেট্রোল দিতেন বলাইদা। বলাইদা ছিলেন একজন নাম করা সলিসিটর। তার এক মক্কেলের এক্সপেন্স এ্যাকাউন্টে একটি নির্দিষ্ট পেট্রল পাম্প থেকে স্লীপ দিয়ে গাড়ীর জন্যে পেট্রোল নিতাম। ৯মাস যুদ্ধের সময় এই দানের পেট্রোল ছিল চলাফেরার একমাত্র সহায়।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার সার্ভিস (বি ভি এস) গঠন করা হয়েছে। এই সংস্থা গঠনের উদ্দেশ্য, কার্যকরী কমিটি, উপদেষ্টা ঠিক করা হয়েছে। আমি নিজে বি ভি এস এর চেয়ারম্যান। আমার স্কুলের প্রধান শিক্ষক করিমুদ্দিন আহমদ উপদেষ্টা এবং শাহীন স্কুলের অধ্যক্ষ মামুনুর রশীদ নির্বাহী পরিচালক।

'ওয়ার অন ওয়ান্ট' আমাদের প্রাথমিক কাজের জন্য টাকা দেয়। প্রত্যেক শরণার্থী শিবিরে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়। 'ওয়ার অন ওয়ান্ট' বিভিএস কে একটি জীপও দেয়। সদর স্ট্রীটে গীর্জা সংলগ্ন বাড়ীতে মিশনের বদান্যতায় বিভিএস এর অফিসের জন্য দুইটা ঘর পাওয়া গেল।

কৃষ্ণনগরে স্বেচ্ছাসেবকদের একটি সম্মেলন হয় জুলাই এর কোন এক সময়ে। শরণার্থী শিবিরে করণীয় কার্যক্রমের বিশদ বিবরণ সহ পুস্তিকা ছাপানো হয়। সকাল বেলা সম্মেলনে যাবার পূর্বে দেখলাম, আমার স্ত্রী প্রসব বেদনায় কাতর। বেগম শামসুন্নাহার সাহায্যে পাশের ক্লিনিকে তাকে নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই অবস্থায়ও আমার স্ত্রী অত্যন্ত সাহসের সাথে আমাকে সম্মেলনে যেতে বলেন।

এমনি এক অবস্থায় আমাকে সাহস দিয়ে সম্মেলনে প্রেরণের কথা কোনদিন ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। সম্মেলনে ডঃ মোশাররফ হোসেন, শিল্পী কামরুল হাসান, মামুনুর রশীদ প্রমুখ আমার সাথী হলেন। আমার বন্ধু ও রাজনৈতিক সাথী কুষ্টিয়ার কুমারখালি কলেজের অধ্যক্ষ দেওয়ান আহমদকে কৃষ্ণনগরে এই সম্মেলনের প্রস্তুতির ভার দিয়েছিলাম।

বিভিন্ন শরণার্থী শিবির থেকে স্বেচ্ছাসেবক আসেন। এদের সকলেই রাজনৈতিক ও সমাজকর্মী। তবে তাদের যুদ্ধে যাওয়ার বয়স নেই। আর্ত মানবতার সেবা করাই সম্মেলনে আগত সকলের উদ্দেশ্য। ডঃ মোশাররফ হোসেন সম্মেলনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। সম্মেলনে বক্তৃতা ছাড়াও কিছু ছাপানো পুস্তিকা বিতরণ করা হয়। এসব পুস্তিকায় বিভিএস এর কর্মসূচী, শরণার্থী শিবিরে করণীয় কর্তব্য, স্বাধীনতা সংগ্রামে এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় এবং স্বাধীনতার পর দেশ গঠনে এদের ভূমিকা লিপিবদ্ধ ছিল। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে ডঃ স্বদেশ বোস এবং শিল্পী কামরুল হাসানও বক্তব্য রাখেন।

কৃষ্ণনগর থেকে ফেরার পথে জানলাম, কুষ্টিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মীরা এখানে আশে পাশে রয়েছে। খবর পেলাম, কুষ্টিয়ার খোকসা থানার ৭টি গ্রাম পাক বাহিনী জ্বালিয়ে ছারখার করে দিয়েছে। একতারপুর গ্রামের কাপালিকরাও গ্রাম ছেড়ে এখানে এসেছেন। এসব গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা আমাকে তাদের অত্যন্ত আপন জন জানতেন। কলকাতায় ফিরে প্রথমেই ক্লিনিকে যাই। বুকের ভেতর ছিল চাপা উত্তেজনা। ক্লিনিকে গিয়ে জানলাম, আমার পুত্র সন্তান হয়েছে। মা ও সন্তান সুস্থ আছে বলেও জানলাম। আমরা সখ করে সন্তানের নাম রাখি জয়; কিন্তু আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না। জন্মের পর জয় আমশায় রোগে আক্রান্ত হয় এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই জয় আমাদের ছেড়ে চলে যায়। অর্থাভাবে জয় এর চিকিৎসা করাও সম্ভব হয়নি। ক্লিনিকে মৃত্যুপথযাত্রী জয়কে নেয়া হয়। সেলাইন দেয়ার কথা ডাক্তার বলেন। সেলাইন-এর বিল আমরা পরিশোধ করতে পারবো কি না, এই নিয়ে ক্লিনিকের কর্তৃপক্ষ চিন্তিত ছিল। কিন্তু সেলাইন দেয়ার আর প্রয়োজন হয়নি। তার আগেই জয় চলে যায়।

পুত্রশোকের অভিজ্ঞতা যেন কোন পিতা মাতার না হয়। আমি জয়কে নিজ হাতে মাটিতে নামিয়ে দেয়ার সময় আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করি, আল্লাহ আমার জয় এর পরিবর্তে আমদের স্বাধীনতা দিও। এই শোক সামলে নিতে আমার প্রায় সপ্তাহ খানেক সময় লাগে। কিন্তু আমার স্ত্রীর সেই স্মৃতি আজো মুছে যায়নি। তাছাড়া কোন মায়ের পক্ষে তা সম্ভবও নয়। ডঃ স্বদেশ বোস পরে বলেছিলেন, সন্তান পেটে থাকা অবস্থায় পথে পথে ঘুরে এবং খাদ্য ও বিশ্রামের অভাবে মা ও সন্তানের অপুষ্টি হয়। এই সন্তান বেঁচে থাকলেও সংশয় মুক্ত ছিলনা। স্ত্রীকে সান্তনা দিয়ে বলেছি প্রতিদিন শরণার্থী শিবিরে বহু শিশু চিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্ছে। এরপর থেকে স্ত্রীও আমার সাথে সীমান্তে শিবির দেখতে

যেতেন। এমনিভাবে স্ত্রী আমার কাজের সহযোগী হয়ে ওঠেন। আমরা এ সময় বিভিন্ন শিবিরে অর্থকরী কাজে মেয়েদের প্রশিক্ষণ দেয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করি। তাছাড়া প্রতি ক্যাম্পে শিশু কিশোরদের জন্যে কয়েকটি নির্ধারিত কর্মসূচী ছিল। প্রতি ক্যাম্পে ভোর বেলা পতাকা উত্তোলন, মুক্তিযুদ্ধের গান, পিটি, শরীর-চর্চা ও খেলাধুলা এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এগুলো ক্যাম্পে ক্যাম্পে প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি করে। ক্যাম্পগুলোতে ময়লা নিস্কাশন ও স্বাস্থের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ড্রেন কাটা, নালা সাফ, আবর্জনা পরিস্কার ও ব্লিচিং পাউডার ছিটানোর ব্যবস্থা করা হয়। আমাশয় রোগে বিভিন্ন শিবিরে বহুলোক মারা যায়। তম্মধ্যে শিশু মৃত্যুর হারই বেশী। ডাক্তার ও ওষুধের প্রচণ্ড অভাব। প্রত্যেক ক্যাম্পে মেডিক্যাল সেন্টার খোলার সঙ্গতি আমাদের নেই।

এ সময় আমি হোমিও প্যাথিক ডাক্তারদের খুঁজে বের করে প্রত্যেক ক্যাম্পে নিয়োগ করি। তাদের ওষুধের বাক্স দেয়া হল। এতে বেশ কাজ হলো। সীমান্তের নিকটে আমরা হাসপাতাল গড়ে তুলি। একজন কর্মঠ ডাক্তার এবং তাকে সাহায্যকারী কয়েকজন নার্স পেলেই হাসপাতাল শুরু করা হয়। কোন ছোট গুদাম জাতীয় স্থান নামমাত্র অর্থে ভাড়া নিয়ে সেখানে ছোট ছোট চৌকি ফেলে ১০/১২ বেডের হাসপাতাল তৈরী করা হতো। বিভিন্ন সংস্থার সাহায্য সহযোগিতায় হাসপাতাল পরিচালনা করা হয়।

এসব হাসপাতাল আমাদের খুবই উপকারে আসে। এতদিন পাক বাহিনীর সাথে যুদ্ধে আহত যে সব মুক্তিযোদ্ধা সামান্য চিকিৎসার অভাবে মারা যেত, হাসপাতালগুলো চালু হওয়ার পর তারা চিকিৎসা পেতে থাকে। ডাক্তারী পড়া ছাত্ররা এসব হাসপাতালে চমৎকার সাফল্য দেখিয়েছেন। বাংলাদেশ সরকার এম পি দের প্রতি মাসে ২০০টাকা মাসহারা দিত। কিন্তু রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী-দের এ ধরণের কোন আর্থিক সুবিধা ছিলনা। বিভিএস (বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার সার্ভিস)এর পক্ষ থেকে এসব রাজনৈতিক ও সমাজকর্মীদের মাসিক ৫০টাকা মাস-হারা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। দুঃসময়ে এটাকা তাদের খুবই কাজে আসে।

প্রধান মন্ত্রী আমাকে দু'বার দিল্লী পাঠান। প্রথমবার দিল্লী যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার বিভিন্ন এজেন্সীর লোকদের সাথে সাক্ষাত করা। সেখানে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সাথে আমার দেখা হয়। এদের কাছে বিভিন্ন ধরণের খবর পাওয়া গেল। বিশিষ্ট সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার এর সাথেও আলো-চনা করি। তাছাড়া দিল্লীতে অবস্থিত বিদেশী মিশনের কর্মকর্তাদের সাথেও পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হই।

এদের সাথে সাক্ষাতের সময় আমি শুনতাম বেশী, বলতাম কম। দেশ বিদেশে আমাদের সংগ্রামের প্রতিক্রিয়া সহ পরাশক্তি সমূহের মনোভাবও জানার সুযোগ হয়। ভারত সরকার সম্পর্কেও অনেক খবর জানা সম্ভব হলো। হিন্দুস্তান টাইমস এর সম্পাদক উইলিয়াম ভারগিস ও তার মত আরো অনেকে বুঝাতে চান,

ভারতের সকলে যে বাংলাদেশের পক্ষে আছে বা থাকবে এ ধারণা করার কোন কারণ নেই। তারা বলেন, আজো অনেকে ভাবেন যে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানই ভারতের জন্য মঙ্গল হবে। কারণ পাকিস্তানকে এতদিনে চেনা-জানা হয়ে গেছে। কিন্তু বাংলাদেশ একটা অনিশ্চিত ব্যাপার। কারো কারো ধারণা, বাংলাদেশকে নিয়ে ভারত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে ভারতের অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হতে পারে।

এ সময় দিল্লীতে শেখ আবদুল্লার সাথেও আমার দেখা হয়। একটি বাড়ীতে আধা নজরবন্দী অবস্থায় তিনি থাকতেন। তাঁর চলাফেরার ওপর বিভিন্ন সংস্থার কড়া নজর ছিল। তাঁর মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে তখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন। তবুও পুরো ১টা দিন তিনি আমার জন্য ব্যয় করেন।

বহু দিন পূর্ব থেকেই তাঁর নাম শুনেছি। কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। আমার চোখে তিনি বীর। ভারতের উত্থান পতনের ইতিহাসে তিনি ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি স্পষ্টবাদী। তিনি তার মনোভাব গোপন করলেন না। তিনি বললেন, তিনি পাকিস্তান চাননি। কিন্তু বাঙ্গালীরা তা চেয়েছিল। তারা আবার আজকে বাংলাদেশ চায়। আগামীতে তারা আবার কি চাইবে, তার কোন নিশ্চয়তা আছে কি? শেখ আবদুল্লাহর কথাগুলো তখন আমার খুব ভাল লাগেনি। কিন্তু তার কথার ভেতরে যে ইঙ্গিত ছিল, পরে তার মর্ম বেশী করে উপলব্ধি করেছি।

আমি শেখকে বুঝাবার চেষ্টা করি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাঙ্গালী আজ সম্পূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ। আমাদের সংগ্রাম ৮ কোটি বাঙ্গালীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের কথা বলতেই তিনি আবার ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, তোমরা জিন্নাহর পেছনেও ছিলে। নাচাটাই তোমাদের স্বভাব। আজ তোমরা বঙ্গবন্ধুর পেছনে আছ। আবার কালকে তাঁর বিরোধিতা করতেও তোমাদের সময় লাগবেনা। কাজেই তোমাদের প্রতি অন্ততঃ আমার কোন সমর্থন নেই।

সে সময় পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে এমন কিছু ব্যক্তির সাথেও আমি সাক্ষাত করি। তখন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ভারতীয় সংসদে একটি প্রতিনিধিদলও প্রেরণ করা হয়। মিঃ ফনীভূষণ মজুমদারের নেতৃত্বাধীন এই প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্য ছিলেন মিসেস নুরজাহান মোর্শেদ এবং শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন।

আমি দিল্লী আসার আগেই বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ভারতীয় সংসদে বক্তৃতা করেন। আমি দিল্লী এসেছি জেনে তারা আমার সাথেও যোগাযোগ করেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল আহুত সাংবাদিক সম্মেলনে থাকার জন্যে আমাকে অনুরোধ করা হলো। সম্মেলনে পেশ করার জন্যে বক্তব্য তৈরী করে নিয়ে গেলাম। ফনীদা জানতেন বিদেশী প্রেসের সাথে আমি যোগাযোগ রক্ষা করছি। দিল্লী প্রেস ক্লাবে তিনি আমাকে সামনে ঠেলে দিলেন। সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলাম।

সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন আহবান করি। শাহ মোয়াজ্জেম আমার নাম বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কিন্তু তখনো আমি ছদ্মনাম 'রহমত আলী' হিসেবে পরিচিত। ভারতীয় পত্র পত্রিকায় আমার বক্তব্য প্রচারিত হলো। পরিবার পরিজনের সাথে তখনো আমার দেখা হয়নি।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের মূল বক্তব্য ছিল পাক হানাদার বাহিনীর মোকাবেলায় অনভিজ্ঞ গেরিলা মুক্তিযোদ্ধারা কিভাবে সফল হবেন এবং যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থাই বা কি? উত্তরে বললাম, দেশ মাতৃকার জন্য রক্তদানে প্রস্তুত বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা তাড়াটে পাক হানাদার বাহিনীকে পরাভূত করবেই। আমাদের ধারণা ছিল বর্ষাকালে পাক বাহিনীর অগ্রযাত্রা ব্যাহত হবে। প্লাবন ও বন্যায় অনভ্যস্ত পশ্চিমা বাহিনী এ সময় মূলতঃ শহরে আটক থাকবে। আমাদের যুদ্ধ পরিকল্পনাও তেমনি ছিল। সাংবাদিক সম্মেলনে এরূপ ইঙ্গিত দেই। কিন্তু বাস্তবে ঘটনা ছিল অন্যরূপ। পাক হানাদার বাহিনী গান বোটের সাহায্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রবেশ করে মুক্তিবাহিনীর ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে।

দিল্লী থাকাকালে অন্য একটি কাজ করি। সি পি আই এর একজন এম পি'র মাধ্যমে দিল্লীস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ হয়। সংসদীয় দলের ৬জন প্রতিনিধি সহ আমরা ৪জন সোভিয়েত দূতাবাসে যাই। এটি পাক দূতাবাসের সামনে অবস্থিত ছিল। রাষ্ট্রদূতের পরবর্তী কর্মকর্তা আমাদের সাথে দেখা করেন। অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তিনি আমাদের বক্তব্য শোনেন। তিনি বলেন, দূতাবাসের পক্ষ থেকে আমাদের বক্তব্য তিনি মস্কোতে পাঠাবেন। এর বেশী কিছু তিনি করতে পারবেন না বলে জানান। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ আমাদের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগে আগ্রহী ছিলেন না। আবদুস সামাদ আজাদ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শান্তি সম্মেলনে মস্কো যান। তখনো তিনি সোভিয়েতের কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাক্ষাত লাভে সমর্থ হন নি।

শান্তি সম্মেলনের সময় খাবার টেবিলে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের পতাকা থাকতো। আবদুস সামাদ আজাদ সেখানে বাংলাদেশের পতাকা রাখার দাবী জানালে স্বাগতিক দেশ অসম্মতি প্রকাশ করে। এমনকি বাংলাদেশ প্রতিনিধি ব্যক্তিগতভাবে একটি পতাকা রাখতে চাইলে মস্কোর তা পছন্দ হয়নি। এরপর আব্দস সামাদ আজাদ নিজের ঘরে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

তাজউদ্দিন ভাই সাংবাদিক মঈদুল হাসানের মাধ্যমে মস্কোর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। আমাদের সংগ্রামের প্রতি সরাসরি সমর্থন করতে মস্কোর যে অসুবিধা ছিল, সেটা আমরা বুঝতাম। তবে আমাদের সংগ্রামের প্রতি যে মস্কোর সমর্থন রয়েছে বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতারের পর পাক সরকারের কাছে প্রেরিত প্রেসিডেন্ট পদগোর্ণির চিঠিতে তার আভাস পাওয়া গেছে। ২৫শে মার্চ

পাক হানাদার বাহিনীর হামলার প্রতিবাদ করে প্রেসিডেন্ট পদগোর্ণি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে চিঠি দিয়েছিলেন। বিশ্ব রাজনীতিতে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যেই সে সময়ে মস্কোর পক্ষে আমাদের সংগ্রামের প্রতি সরাসরি সমর্থন দেয়া সম্ভব হয়নি।

তবে একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন দেয়ার জন্যে ভারতের সাথে খোলাখুলি আলোচনা শুরু করে। আমাদের সংগ্রাম চলার সময় মিঃ হেনরি কিসিঞ্জার গোপনে চীন সফর করেন। আর চীন মার্কিন সম্পর্কের উন্নতির ব্যাপারে পাকিস্তান দূতিয়ালী করে। এই ঘটনা ভারত সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরের প্রেক্ষিত রচনা করে। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থা ও বৃহৎ শক্তির ভারসাম্যের আলোকে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবস্থান সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর ভবিষ্যৎবাণী কার্যে পরিণত হয়েছিল।

এসব আলোচনাকালে আমরা দু'জনেই মোটামুটি একই রকম মতামত পেশ করতাম। কিসিঞ্জারের চীন সফরের খবরের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সফর আমাদের সংগ্রামে প্রভাব বিস্তার করবে। পরে এটা সত্যে প্রমাণিত হয়। মস্কো উপলব্ধি করে যে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও পাকিস্তান এই অঞ্চলে রাশিয়াবিরোধী জোট গঠনে ব্যস্ত রয়েছে। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করতে চীন-মার্কিন তখন বিশেষভাবে ব্যস্ত।

চীন-মার্কিন সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর রুশ-ভারত সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই ঘনিষ্ঠতর হয়। এখন রাশিয়ার পক্ষ থেকে ভারতের একটি আশ্বাস প্রয়োজন। সেই আশ্বাসটি হলো, কোন কারণে চীন ভারতে হামলা করলে রাশিয়া যেন পাল্টা চাপ সৃষ্টির ব্যবস্থা করে, যাতে চীন নির্বিঘ্নে ভারতে ঢুকে পড়তে না পারে।

হিমালয়ের তুষার ও সোভিয়েতের বন্ধুত্ব এই দু'টি ছিল চীনের বিরুদ্ধে ভারতের রক্ষা কবচ। তাই সময় ও সুযোগে আন্তর্জাতিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে ভারত যখন অপেক্ষা করছিল, সে সময় বাংলাদেশের বীর সন্তানেরা গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে পাক বাহিনীর মোকাবেলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

দিল্লীতে আমি ভারতের বৈদেশিক দফতরে টি এন কাউলের সাথে যোগাযোগ করি। তিনি আমাদেরকে বিদেশে প্রচার কাজের ওপর জোর দেয়ার কথা বলেন। তিনি বিদেশের বিভিন্ন রাজধানী, সেখানকার সরকার, সংবাদপত্র ও জনমত সম্পর্কে আমাদের একটি ধারণা দেন। আমি এসব দিল্লী সফরের রিপোর্ট হিসেবে একটা নক্সার মত প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করি।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিশ্বের সরকারগুলো কে কি ভাবছে, তা বুঝতে আমাদের কোন অসুবিধা হয়নি। এ ব্যাপারে তাজউদ্দিন ভাই এর একটি মোটা-

মুক্তি হিসেব ছিল। তিনি জোর দিয়েই বলতেন যে আগামী শীতেই একটা ফয়সালা হয়ে যাবে। কেননা এছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না।

মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্যে প্রতিদিন সীমান্ত পার হয়ে শত শত তরুণ যুবক আসছে। তাদের মুখে এক কথা--ট্রেনিং চাই, অস্ত্র চাই। মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণে ইচ্ছুক যুবক ছাড়াও প্রতিদিন বহু লোক আমার অফিসে সাক্ষাত করতে আসতেন তাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও সংসদ সদস্যরা প্রধান মন্ত্রীর অফিসে ভিড় করা শুরু করলেন। তাদের সবার বক্তব্য, স্ব স্ব স্থানের ছেলেদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা বুঝতে পারলাম, যে সংখ্যায় মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা আমরা করেছি, এর চেয়ে বহু বেশী সংখ্যায় যুবকরা আসছে প্রশিক্ষণের জন্যে। এ সময় আমরা 'ইয়ুথ ক্যাম্প' খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এই ক্যাম্পগুলো এম পি ও আওয়ামী লীগ নেতারা পরিচালনা করেন।

এর পরের ধাপ ছিল অভ্যর্থনা শিবির। অভ্যর্থনা শিবিরের কাজ ভারতীয়রা ও আমরা যৌথভাবে পরিচালনা করতাম। মুক্তিযোদ্ধাদের অভ্যর্থনা ক্যাম্প থেকে ছয় সপ্তাহের ট্রেনিংএ পাঠানো হতো।

প্রথমে আমাদের ২৫ হাজার গেরিলাকে প্রশিক্ষণ দেয়ার সিদ্ধান্ত ছিল। পরে এই সংখ্যাকে এক লক্ষে উন্নীত করা হয়। এর মধ্যে ট্রেনিং শেষ করে ৯০ হাজার স্বদেশে আসতে সক্ষম হয়। তাছাড়াও ছিল নিয়মিত বাহিনী। সেনাবাহিনী নৌ বাহিনী, বিমান বাহিনী ও বি ডি আর এর সৈনিকদের দ্বারা এই বাহিনী গঠন করা হয়। পুলিশের সংখ্যাও ছিল পর্যাপ্ত।

সীমান্তে ছাউনী তৈরী করে নিয়মিত বাহিনী অবস্থান করতো। সেখান থেকেই তারা পাক বাহিনীর ওপর হামলা করেছে! তা ছাড়া ছিল সহায়তাকারী একটা গোষ্ঠী। একটু বয়স্ক, যাদের পক্ষে মুক্তিযোদ্ধা হওয়া সম্ভব ছিলনা, তারা 'ইয়ুথ ক্যাম্প' ও 'অভ্যর্থনা ক্যাম্পে' নিয়মিত বাহিনীর সাথে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতো।

ইয়ুথ ক্যাম্প করতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা পাওয়া গেল। বাংলার হাজার হাজার দামাল ছেলের দ্বারা ক্যাম্প গুলো ছিল পরিপূর্ণ। তাদের শুধু একটাই কথা ট্রেনিং চাই, অস্ত্র চাই। খান সেনাদের যে কোন মূল্যে খতম করতে হবে।

এসময় আমি নিয়মিত ইয়ুথ ক্যাম্পে যেতাম। প্রিনসেপ স্ট্রীটে ত্রান মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি অফিস খোলা হল। এই মন্ত্রণালয় ইয়ুথ ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কাজের মাধ্যমে ত্রান মন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামানের সাথে আমার সম্পর্ক আরো গভীর হয়ে ওঠে। সপ্তাহে কয়েকবার আমাদের বৈঠক হতো। এতে কাজের সমন্বয় বৃদ্ধি পায়। কামরুজ্জামান (হেনা ভাই) ও আমি সড়ক পথে বাংলাদেশের পরো

সীমান্ত দেখার জন্য ২৫ দিনের এক কর্মসূচী গ্রহণ করি। স্বরাষ্ট্র সচিব আবদুল খালেক আমাদের সাথে ছিলেন। ২৫শে মার্চ রাতে খালেক রাজশাহীতে ছিলেন, পরে সীমান্ত পার হয়ে আসেন। আবদুল খালেক পুলিশ বাহিনীর লোকদের সংঘবদ্ধ করেছেন। তিনি অত্যন্ত অমায়িক লোক। তাঁর উদ্যম ও কর্মোৎসাহ আমাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি ছিলেন একটি ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্রের অধিকারী। আমরা রওয়ানা হই কলকাতা থেকে। মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুরের শিলিগুড়ি পার হয়ে মেঘালয়ের তোরা পাহাড় অঞ্চলের পাদদেশে আমরা ক্যাম্প স্থাপন করি। ফিরে আসার সময় পথে পথে সকল ক্যাম্প পরিদর্শন করি।

আমাদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা হতো ইয়ুথ ক্যাম্পে। ইয়ুথ ক্যাম্প ছাড়াও পথিমধ্যে নিয়মিত যোদ্ধাদের ক্যাম্পগুলোতে গেছি। আমাদের এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল সৈনিক ও মুক্তিযোদ্ধাদের সবে জমিনে দেখা এবং স্থানীয় ও ভারতীয় প্রশাসন যন্ত্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। তোরাতে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা হলো। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানান হয়। মেঘালয়ের জনগণের অধিকাংশ খৃস্টান। তারা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত। মিশনারীদের পুরাতন প্রভাব বিদ্যমান। এখানে পশ্চিম বঙ্গ ও ত্রিপুরার মত সহায়তা এত ব্যাপক নয়। আমাদের লোকদের অবস্থা খুবই শোচনীয়।

মেঘালয় সরকারের সাথে সরাসরি আলোচনা হলো। হেনা ভাই এর সাথে মুখ্যমন্ত্রীর ছাত্র জীবনের সম্পর্ক ছিল। আলোচনায় এই সম্পর্ক আরো গভীর হলো।

এখানেই মেজর জিয়াউর রহমানের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়। খবর পেয়ে তিনি ডাক বাংলোতে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের ভেতর থেকে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ অফিসারের একটা গ্রুপ তৈরীর ভার ছিল জিয়ার ওপরে। কয়েকদিন পূর্বে জিয়া সৃষ্ট আমাদের শিক্ষানবিশ গ্রুপটিকে পাক বাহিনী ধ্বংস করে দিয়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান করাও আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমরা ঘটনাস্থলে গেলাম। সেই পরিত্যক্ত ক্যাম্প সার্ভে করি। সব কিছু শুনে মনে হলো শত্রুর মুখে শিক্ষানবিশ অফিসাররা নিতান্তই নিরাপত্তাহীন ছিল। এত বড় আঘাতের রেশ তখনো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। মেঘালয়ের কাজ শেষে আমরা শিলং এর পথে রওয়ানা হই। পাহাড়ী পথ বেয়ে আমাদের গাড়ী চলতে থাকে। পাহাড়ী অঞ্চলে রাতের বেলা শীত বাড়ে।

জঙ্গলে ক্যাম্প স্থাপন করে মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন ক্যাম্পে শত্রুহানার পরিকল্পনায় ব্যস্ত। রাতের বেলা এমন একটি ক্যাম্পে গিয়ে আমরা উপস্থিত হই। পরিত্যক্ত বাড়ীতে ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। চালা দেয়া ঘর এবং কয়েকটি

তাঁবু রয়েছে ছেলেরা তখন আগুন পোহাচ্ছিল। শীতের মধ্যে তাদের প্রয়োজনীয় কাপড় নেই। পাহাড়ী জঙ্গল খাওয়া দাওয়ার এমনি হাই অসুবিধা। যোগাযোগের অবস্থাও ভাল নয়। এই অবস্থায়ও মুক্তিযোদ্ধাদের মুখে অম্লান হাসি। তাদের সাথে অনেকক্ষণ খোলাখুলি কথা হয়। কারো কারো প্রশ্ন, স্বাধীনতার পর দেশকে কিভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে। অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কি ব্যবস্থা নেয়া হবে ইত্যাদি। তাদের প্রয়োজনীয়তার কথা জিজ্ঞাসা করি। তারা জানান, তাদের প্রয়োজন শুধু অস্ত্রের। তাদের অভাবের তালিকায় শীতবস্ত্র জুতা, কম্বল ও খাওয়াসহ অনেক কিছু ছিল। কিন্তু তারা এ সবের কিছুই উল্লেখ করেনি। তাদের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ দাবী হলো অস্ত্র চাই। শত্রুকে হত্যা করে দেশকে মুক্ত করতে হবে।

সারারাত গাড়ী চালিয়ে আমরা পথ অতিক্রম করে পরদিন সিলেট সীমান্তে আসি। পথে পথে বহু শিবির আমরা পরিদর্শন করেছি। সিলেটের কিছু অঞ্চল মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে রয়েছে। হেনা ভাই এর খুব ইচ্ছা বাংলার মাটিতে রাত কাটাবেন। বর্ষার পানিতে সিলেটের হাওড় তখনো পরিপূর্ণ। আমাদের আসার খবর চারদিকের গ্রামে ছড়িয়ে গেছে। ছোট ছোট নৌকায় আমাদের দলীয় কর্মীরা দেখা করতে এলেন। নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় বি এস এফ কর্মকর্তার এই সং আলোচনা শেষে শিলং এর পথে যাত্রা করি।

স্বদেশে যেখানে মুক্তাঞ্চলে বহু শরণার্থী শিবির রয়েছে। রয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের নৌ বাহিনী এখান থেকে গিয়ে তারা হানাদারদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। স্বাধীনবাংলার করা হচ্ছে উড়ছে। একটি গ্রামে পৌঁছলাম। সেখানে বিরাট জনতার সমাগম হয়। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও আমরা বক্তৃতা করি। স্বাধীন বাংলার মাটিতে প্রকাশ্যে জনসভা করতে পেরে অফুরন্ত আনন্দ পেলাম। জনসভা শেষে রাতেই আমাদের শিলং পৌঁছার কথা রয়েছে। এই অঞ্চলে সিলেটের একজন এম, পি আবদুল হক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি এক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন।

সেখান থেকে আমরা শিলং ডাক বাংলোতে যাই। সিলেটের একজন এম, পি এই অঞ্চলে প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন। এই এম, পির নাম ব্যারিষ্টার মোনতাকিম চৌধুরী পরে তাকে জাপানে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হয়। এখানে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে কয়েকটি বৈঠক করি। পরদিন আমরা সিলেট ও আসামের সীমান্তে অবস্থিত 'বালাট' এর পথে রওয়ানা হই। কিছুদিন পূর্বে বালাটের কাছে পাক বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে আমাদের কয়েকজন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছে। সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের মাটিতে এই বীরদের কবর দেয়া হয়েছে। বালাটেও স্থানীয় নেতাদের সাথে আমাদের কয়েকদফা বৈঠক হয়।

আমাদের ফেরত যাত্রা শুরু হল। শিলং এ পৌছে দিনের কর্ম ব্যস্ততা শেষ করে

পশ্চিম বাংলার একজন প্রখ্যাত সাংবাদিকের বাসায় যাই। তার কাছ থেকে স্থানীয় রাজনীতি, আসাম ও মেঘালয় সরকারের মনোভাব সম্পর্কে অবহিত হই। এর পূর্বে আমি কয়েকবার গৌহাটি, আগরতলা ঘুরে গেছি। আসাম সরকার মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে খুব বেশী উৎসাহী ছিলেন না। শরণার্থী শিবিরগুলোতে খুবই কড়াকড়ি। তাই তাদের জীবন এখানে খুব সুখকর ছিল না।

এর আগে ডোনাল্ড চেসওয়ার্থকে নিয়ে আমি আগরতলা গেছি। তাকে নিয়ে আমি সাবরুমে গেছি, এখানে ওপারে বাংলাদেশ সীমান্তে একটি রেস্ট হাউজ রয়েছে। সেখানে হানাদার বাহিনী ক্যাম্প তৈরী করেছে। পাক হানাদার বাহিনী এখানে নারী নির্যাতন করেছে। দস্যুরা নারীদের উলঙ্গ করে পর্যন্ত রাখে। ওপারের লোকের মুখে এসব নির্যাতনের কথা আমরা শুনি। সাবরুমের ডাক বাংলোতে বিশ্রামের সময় ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী মাহফুজুল বারীর সাথে আমাদের দেখা হয়। বারী একজন সাধারণ শরণার্থীর মত ডোনাল্ড-এর কাছে বাংলাদেশে পাক বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করেন। ডোনাল্ড এ সব কথা বৃটিশ সংসদে বলবেন বলে আমাদের জানান। এবং তিনি পরে তা করেছিলন।

হ্যানসার্ড এর রিপোর্টে বাংলাদেশের এই করুণ আলেখ্য প্রকাশিত হয়। আমি জন স্টোন হাউজ, ডগলাস ম্যান, পিটার বার্নস এম, পি সহ অনেক সাংবাদিককে নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে পৌছি। এমন একটি দল নিয়ে পাটগ্রামের মুক্তাঞ্চলে যাই। যুদ্ধ চলার সময়েও আমি বহুবার পাটগ্রাম গেছি। পাটগ্রামে একবার আমরা একটি ডাকঘর উদ্বোধন করি। এ সময় প্রখ্যাত ডিজাইনার বিমান বোস অংকিত স্বাধীনতা যুদ্ধের কোমেমোরেটিভ স্ট্যাম্প লণ্ডন ও কলকাতায় বিক্রি করা হয়।

পাটগ্রামে ডাকঘর উদ্বোধন করার সময় টেলিভিশন সহ বিদেশী সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এবং মুস্তফা সারওয়ার অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। পাটগ্রাম থেকে আমরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যাই। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আমরা ১ রাত ১ দিন কাটাই। সামরিক ছাউনীতে আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়।

আমরা দিনাজপুরের পচাগড় পর্যন্ত মুক্তাঞ্চলে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজ খবর নিই। আমাদের উপস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধাদের কামান বিপুল উৎসাহে গর্জে ওঠে। আমাদের মুক্তি বাহিনীর হাতে তখন কামান এসে গেছে। এই কামানের গোলায় দূরের পাকিস্তানী বাংকারগুলো ভেঙে পড়ছে। দূরবীণ দিয়ে পলায়নপর পাক বাহিনী দেখে উল্লসিত হই।

দিনাজপুর জেলার এই অঞ্চলের একটি গ্রামের সমস্ত অধিবাসী মুক্তি বাহিনীর জন্যে গ্রামটি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে গেছে। গ্রামটির নাম মনে নেই গ্রামের বেশীরভাগ বাড়ী-ঘরে টিনের বা খড়ের চালা। ঘরের ভিটিগুলো বেশ উঁচু। ঘরের ভিতরে বাংকার তৈরী করা হয়েছে। মেঝেতে গর্ত করে মাটির ভেতরে

কামান বসানো হয়েছে। এ সময়ে বঙ্গবন্ধুর সেই উদাত্ত আহবান 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল' এ কথা মনে হতো। গোরস্থানে কবরের ভেতরেও অনেক স্থানে বাংকার হয়েছে। গ্রামবাসীরা মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য সরবরাহ করছে। ছোট ছোট রাখাল ছেলেরা দূরে গরু চরাতে গিয়ে পত্র বাহকের কাজ করছে ও দূরে শত্রুদের অবস্থান জানাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে ভিয়তনাম যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ভিয়েতনামের জনগণ পরম পরাক্রমশালী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বীরের মত লড়াই করেছে। প্রতিদিন বাংলাদেশের মাটিতে একাধিক বীরত্ব গাঁথা জন্ম নিচ্ছে। এই বীরত্ব গাঁথার সবগুলো হয়তো কোন দিনই লেখকের কলমে, কবির কবিতায় বা শিল্পীর কন্ঠে শোনা যাবে না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসে হয়তো কোন দিনই লেখা হবে না। তবে ৯ মাস ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তি যোদ্ধাদের বীরত্ব ও সাহস দেখে মন ভরে উঠতো। প্রথম প্রথম বেশ ভয় করতাম। পরে আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে যাই। একদিন ভারতীয় একজন জেনারেলের কথা শুনে আমার ভয় অনেকটা কমে গেল। তিনি বলেন, 'যে গুলিতে তুমি মারা যাবে, সে গুলির আওয়াজ তোমার কানে আসবেনা। আর যে গুলির শব্দ তুমি শুনছ, তা তোমার গায়ে লাগবেনা।' এরপর বলতে গেলে গুলির শব্দে আর ভয় পাইনি। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী ও আমি যুদ্ধের নিয়ম কানুন কিছুটা রপ্ত করে ফেলেছি। তাছাড়া কোন ক্যাম্পে গেলে আমাদের জন্য যথেষ্ট নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হতো। আর বিশেষ কথা হলো আমাদের তখন মরবার ভয় ছিল না, ভয় ছিল শত্রুর হাতে যেন না পড়ি। শত্রুর হাতে না পড়ার জন্যে সতর্কতা অবলম্বন করতে হতো। কারণ, যুদ্ধাবস্থায় বন্দীত্ব মৃত্যুর চেয়ে খারাপ হতে পারে। সে সময় পঁচাগড়ের একটা সেতু মুক্তিযোদ্ধারা উড়িয়ে দেয়। সেতুর স্থান থেকে ঢাকার মাইল ষ্টোন দেখা যায়। ভাবতাম, এই পথে কখন ঢাকা যাব। বাংলাদেশের এই অঞ্চলের মুক্তাঞ্চলগুলো ছিল আমাদের আগামী দিনের মাইল পোষ্ট।

প্রধান মন্ত্রী ও আমি পাটগ্রাম সফর করে শিলিগুড়িতে ফিরে আসি। শিলিগুড়ির মিলিটারী হাসপাতালে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের দেখতে গেলাম। আহতদের মুখে মুক্তিযুদ্ধে তাদের বীরত্বের কাহিনী শুনলাম। তাদের চোখে মুখে দেশে ফেরার স্বপ্ন। শিলিগুড়ির একটি কাকর বিছানো পথ দিয়ে আমরা পাটগ্রাম যেতাম। পাটগ্রামের পরিত্যক্ত রেল ষ্টেশনে বসে বাংলাদেশ যুদ্ধে সহায়তাকারী বন্ধু ডোনাল্ড ও ষ্টোনহাউসকে বাংলাদেশে প্রবেশের ভিসা প্রদান করি। শিলিগুড়িতে বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক কর্মচারীদের একটি প্রশাসন কাঠামো ছিল। গণ সংযোগের জন্য আমি একবার শিলিগুড়ি বারে যাই।

প্রধান মন্ত্রীর সাথেও একবার শিলিগুড়ি যাই। সারাদিনের কর্মসূচী ছিল। এবার চিত্তদের বাসায় যেতে পারিনি। সন্ধ্যাবেলায় শিলিগুড়িতে ভারতীয় সামরিক

বাহিনীর মিলিটারী ক্লাবে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। এই অঞ্চলে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর প্রধান, তার সঙ্গী সাথী কর্মকর্তারা সকলে উপস্থিত। তাদের ব্যবহার খুবই ভাল। তাদের আলোচনায় একটি বিষয় বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তা হল ভারতের গণতন্ত্রের প্রতি তাদের অগাধ শ্রদ্ধা। গণপ্রতিনিধিদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাভাব দেখে আমার খুব ভাল লাগলো। বুঝলাম, সে দেশে কেন গণতন্ত্র টিকে আছে।

পরদিন সকালে আমরা আমাদের মুক্তি বাহিনীর প্রশিক্ষণ ক্যাম্প পরিদর্শনে গেলাম। এগুলো ভারতীয় বাহিনীর সরাসরি তত্বাবধানে। আমরা ক্যাম্পে পৌছে দেখি শিক্ষানবিশ মুক্তিযোদ্ধারা টার্গেট শুটিং এ ব্যস্ত। মুক্তিযোদ্ধারা প্রশিক্ষণ শেষে লাইন করে দাঁড়িয়ে প্রধান মন্ত্রীকে অভিনন্দন জানায়। জয় বাংলা শ্লোগানে পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত ক্যাম্প কেঁপে ওঠে। আমাদের সব৷ র কণ্ঠে ভেসে আসলো 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'।

তারপর সীমার শেষ প্রান্তে এসে ছেলেরা আমাদের বিদায় দিয়ে গেল। এখান থেকে আমরা রংপুরের ভুরুঙ্গামারীর দিকে রওয়ানা হই। আমাদের সাথে ভারতের একজন বিখ্যাত আলোকোচিত্র শিল্পী রয়েছেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি তুলছেন। পেছনে একটি জীপে সেই ক্যামেরা ম্যান। আমাদের সাথে অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন সংস্থাপন সচিব নূরুল কাদের খান, আলোকচিত্র শিল্পী আলম সহ আরো কয়েকজন সাংবাদিক। ভুরুঙ্গামারী পৌছে জানলাম, এই অঞ্চলে একজন জজ (নাম সম্ভবতঃ আনোয়ার) যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন।

পরদিন আমরা আবার মুক্তাঞ্চলে যাই। এ সময় আমাদের মাঝে মধ্যে খাল, বিল, খরস্রোতা নদী ও মুক্তিযোদ্ধাদের উড়িয়ে দেয়া সেতু পার হতে হতো। একদিন প্রধান মন্ত্রী ও আমি কলা গাছের ভেলায় করে একটি খাল পার হই। এই ভেলা সহ আমাদের ছবি আন্তর্জাতিকভাবে প্রচারিত হয়। পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য বই এ এই ছবি প্রকাশিত হয়।

এই সফর সূচীতে আমরা বিভিন্ন মুক্তাঞ্চল হয়ে বাংলাদেশের সীমান্ত ছুঁইয়ে আগরতলা পৌছি। কঠিন দুর্গম ও পাহাড়ী পথ। আগরতলা, সাবরুম, হরিনা, বালাট, তোরা, ভুরুঙ্গামারী, পাটগ্রাম, পঞ্চগড়, রাজশাহী, বেতায়, শিকারপুর, মুজিবনগর, বেনাপোল, মামা ভাগ্নে, টাকি, দেবহাটা, এগুলো ছিল আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের মাইল পোষ্ট। মুক্তিযো 'রা বাংলাদেশের মানচিত্রকে মালা দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে।

সীমান্তের ওপারে এক কোটি মানুষের ভিড়। এরা গৃহে ফিরতে আগ্রহী। শৃংখল মুক্তির উদ্দাম আবেগ তাদের মনে। মুক্তিযোদ্ধারা প্লাবনের মত সারা দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। এরা বাংলার নিভৃত গ্রামে, অরণ্যে মাঠে, নদী খাল বিল, হাটে ঘাঠে, বাজার ও শহরের পাড়াতে ছড়িয়ে রয়েছে।

দেশের জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর ভরসা করে রয়েছে। এরা ঢাকার ইন্টারকন থেকে মতিঝিল আবাসিক এলাকা, ফার্মগেট, মফস্বল শহরের রাজপথ, গঞ্জে বাজারে, ধানক্ষেতে রাজাকারের ক্যাম্পে, দালালের গৃহে, হানাদার বাহিনীর ছাউনিতে ত্রাস সৃষ্টি করেছে। আগরতলায় এসে আমরা মেজর শফিউল্লার সাথে মিলিত হলাম। শফিউল্লাহ হরিনাতে ক্যাম্প স্থাপন করে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করে আসছেন।

আমরা মেজর খালেদ মোশাররফের ক্যাম্পেও গেলাম। ক্যাপ্টেন রফিক খুব শীর্ণ হয়ে পড়েছেন। তার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। অনেক দিন পর তার সাথে দেখা। ইয়াহিয়ার শাসনামলে তিনি কুষ্টিয়ায় ছিলেন। দু'সপ্তাহ পূর্বে তিনি ফ্রন্ট থেকে ফিরেছেন। কয়েকদিন পূর্বে তার জ্বর হয়েছিল। জ্বর থেকে সেরে উঠেছেন। যুদ্ধে ফিরে যাওয়ার জন্যে তিনি উদগ্রীব। এই ক্যাম্পে সবার সাথে মাটিতে বসে আমরা দুপুরের খাবার খেলাম।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন আহমদের উপস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধারা আনন্দিত। পাক সেনাবাহিনী তখন আগরতলা সীমান্তে দারুণ চাপ সৃষ্টি করেছে। তাদের গোলা সীমান্ত পার হয়ে শরণার্থী শিবির পর্যন্ত আসছে। হানাদারদের হটাবার জন্যে আমাদের মুক্তিবাহিনী ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এ সময় চট্টগ্রামের জহুর আহমদ চৌধুরী ও এম, এ হান্নানের সাথে দেখা হলো। আমরা বিভিন্ন ক্যাম্প পরিদর্শন করি। আগরতলাতে জনসংখ্যার চেয়ে শরণার্থীর সংখ্যা অনেক বেশী। ফেরার পথে মালেক উকিলের সাথে দেখা হলো। এখানে ছোট্ট পরিবার নিয়ে তিনি থাকেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রী যেখানে যান সেখানেই বিপুল লোকের সমাগম হয়। তাদের দু'জনের আগমনে এখানে প্রাণচাঞ্চল্য বয়ে গেল।

পরদিন সকালে আমরা খালেদ মোশাররফের ক্যাম্পে গেলাম। খালেদ আমাদের জানান, এই মুহূর্তে তিনি আমাদের কুমিল্লা অঞ্চলে নিয়ে যেতে পারছেন না। কুমিল্লা-চট্টগ্রাম সড়ক তিনি অবরোধ করে রেখেছেন বলে আমাদের জানান। তার লোকজন অনেক গভীরে যোগাযোগ স্থাপন করে রেখেছে। আমাদের নিয়ে তিনি জঙ্গলের পথে বের হলেন। পাহাড়ের গা ঘেঁষে কয়েকটি পরিচ্ছন্ন গ্রাম। ভারতীয় সীমান্তের সাথে লাগানো। এই গ্রামের মানুষের সাথে আমাদের মুক্তি বাহিনীর একটা সখ্যতা স্থাপিত হয়ে গেছে। পুকুর থেকে গ্রামের মেয়েরা পানি নিচ্ছে, তারই পাশ দিয়ে চলাচল করছে মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা। গ্রাম থেকে একটু দূরে আম বাগানের ভেতরে বৃহৎ কামান বসিয়ে গোলা ছুঁড়ছে আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী। এই কামানগুলো খুব পুরানো আমলের বলে মনে হলো। এগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী। খালেদ আমাকে কামানের সামনে নিয়ে গেল। আমার মাথার ওপর দিয়ে কামানের গোলা উড়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত এক

উত্তেজনার শিহরণ। এরপর খালেদ পাহাড়ে ওঠার জন্যে আমাদের আমন্ত্রণ জানান। তিনি আমাদেরকে শত্রুর শিবির দেখানোর কথা বল্লেন। ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে না নিয়ে যেতে পারলেও সড়কটি আমাদের দেখাতে চাইলেন। কণ্টকাকীর্ণ পথ। খালেদের চাল চলন দেখে মনে হলো, তিনি যেন এখানে মানুষ হয়েছেন। তার কাঁধে একটি দূরবীণ, পায়ে বুট এবং হাতে একটা ছোট্ট ছড়ি। আমাদের হাতেও এমনি করে লাঠি দিয়েছেন পথ চলার সুবিধার জন্যে। আমার উঠতে কোন অসুবিধা হচ্ছিলনা। নজরুল ভাইকে নিয়ে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। পাহাড়ে উঠে দূরবীণ দিয়ে খালেদ কি যেন দেখলেন। এক সময় খালেদ পাক-ছাউনি দেখালেন। আমি দেখলাম। ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কও দেখলাম। রাস্তাটি একেবারে জনমানবহীন।

আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী তখনো গোলাবর্ষণ করছে। শত্রু বাহিনীর ছাউনীর কাছে সেই গোলা গিয়ে পড়ছে। শত্রু ছাউনীর পাশে একটি রেস্ট হাউজ দেখা যাচ্ছে। খালেদ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন। কতক্ষণ পরে ক্যাম্পে ফিরে গেলাম। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রী জোয়ানদের সাথে খেলেন। ইতিমধ্যে গাফফার (অবসর প্রাপ্ত লেঃ কর্নেল) একটি ছোট্ট বাহিনী নিয়ে আসেন। গাফফার অত্যন্ত সাহসী যোদ্ধা। বাড়ী খুলনা। অসম সাহসী, ধীর, স্থির। একটা ভাল লাগার মত ব্যক্তিত্ব। তার কাছে যুদ্ধের বহু কাহিনী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কথা শুনলাম। সন্ধ্যা হতেই আমরা আগরতলা ফিরে আসি। পরদিন আমাদের কলকাতা যাবার কথা। বি এস এফ এর মালবাহী বিমানে আমাদের যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। খালেদ সকাল বেলা আমাদের বিদায় জানাতে এলেন। তিনি তার সুবিধা-অসুবিধা এবং আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতৃস্থানীয় লোকের সাথে যোগাযোগের অভাবের কথা জানান। কিছুদিন পূর্বে মুজিব বাহিনীর কার্যক্রমের সাথে যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, আমরা তা' দূর করতে সক্ষম হই। দুইদিন পর কলকাতায় এসে আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির বৈঠকে আমরা সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করি। এই সময় খবর আসে যে খালেদ মোশাররফ আহত হয়েছেন। তাকে লক্ষ্ণৌ হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করি।

আওয়ামী লীগের এই বৈঠক ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা তখন বুঝতে পারি যে উপ মহাদেশের পরিস্থিতি ও যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতি সব কিছু মিলে আমাদের সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে গেছে। এ সময় ভারত সরকারের পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব আসে। বাংলাদেশের শরণার্থীদের নিয়ে আমরা দেশের ভেতরে যেতে পারি কি-না। ভূ-খণ্ড দখলের ব্যাপারে ভারত সরকার সাহায্যের আশ্বাস দেয়। আমরা এই প্রস্তাব সরাসরি নাচক করি। আমরা জানি, বাংলাদেশের প্রায় সকল মানুষই আমাদের সংগ্রামের পক্ষে। হানাদার বাহিনীর বন্দুক কামানের বাইরে সারা দেশই বলতে গেলে স্বাধীন। আমাদের তাই নতুন করে ভূ-খণ্ড দখলের প্রয়োজন নেই।

ইতিমধ্যে আমরা আমাদের কথার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে সক্ষম হই। জুলাই মাসের পর মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। শত্রুদের মধ্যে সৃষ্টি হয় ভয়ভীতি। বিশ্বব্যাংকের একটি দল আগষ্ট মাসে ঢাকা আসে। তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে পাক সরকার সাহায্য পাবে। বীর মুক্তিযোদ্ধারা তখন ইন্টারকন্টিনেন্টালে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে ১২ই আগষ্ট তারিখে। বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে বলে পাক সরকার যে প্রচার চালাচ্ছিল এই গ্রেনেড নিক্ষেপের ফলে তা' অনেকটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

মুক্তিযোদ্ধারা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে। গেরিলা যোদ্ধারা অতি অল্প সময়ে শত্রু হননের কলা কৌশল রপ্ত করে। প্রথমদিকে পাক বাহিনীর সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। পরে মুক্তিযোদ্ধারা কৌশল পরিবর্তন করে গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

জুন মাসের এক ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। কুষ্টিয়া কলেজের ছাত্র বীর যোদ্ধা তারেক। এক সম্মুখ সমরে তারেক শহীদ হয়। কৃষ্ণনগর ক্যাম্প পরিদর্শনে গেছি। শুনলাম, তারেক দলবল নিয়ে যুদ্ধে গেছে। সন্ধ্যা হয়ে আসলো, কিন্তু তারেক ফিরে আসলোনা। জরুরী কাজে আমার কলকাতা ফিরে আসা দরকার। ক্যাম্পের বাইরে ৪টি ছেলেকে দেখতে পাই। তাদের মুখে শুনলাম কিভাবে তারেক বীরের মত শহীদ হয়েছে। আমি তাদের বল্লাম, "যুদ্ধে বিজয় বড় কথা নয়, সবচেয়ে বড় কথা হলো বীরত্বের কথা। আমরা তারেকের গর্বে বেঁচে থাকবো। তারেক শহীদ হলেও তার একটা জিনিস পাওনা আছে। তা' হলো, তার বন্ধুদের কাছ থেকে সম্মান। তাঁকে সেই সম্মান দেখাতে হবে। তোমরা তার লাশ আনতে পারোনি। তার আত্মাকে তোমরা নিয়ে এসেছো। এসো, আমরা তাকে সম্মান করি।"

সকলকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হলো। পতাকা অর্ধনমিত রাখা হলো। আমরা শ্রদ্ধার সাথে তারেককে স্মরণ করলাম। সবার চোখে নেমে এলো অশ্রুধারা। ধরা গলায় আবার গাইলাম 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।'

অন্য একদিনের ঘটনা। শিকারপুর ক্যাম্প। তওফিক এলাহী এই ক্যাম্পের অধিনায়ক। যুদ্ধে একজন আনসার মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়েছে। সহযোদ্ধারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লাশ নিয়ে আসে। বুট পায়ে সামরিক পোষাক পরে ছাউনীর সবুজ ঘাসে শুয়ে আছে শহীদ ভাই। বাংলাদেশের পতাকা দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো শহীদের শরীর। তাকে সামরিক কায়দায় দাফন করে ক্যাম্পে ফিরে আসি। এসে দেখি, শহীদের স্ত্রী। কোলে অবুঝ পুত্র। সাথে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। জানিনা, আজ তারা কে কোথায় কেমন আছে। যুদ্ধকালে এই পরিবারের ভরণ পোষণের ভার নিয়েছিল বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার সার্ভিস। এমনি শত শত মুক্তিযোদ্ধা শুয়ে আছে

সিলেটের বালাট সীমান্তে। তাদের শেষ ইচ্ছানুযায়ী বাংলার মাটিতে তাদের কবর দেয়া হয়। শুধু বালাট নয়, ২৪ পরগণার টাকি পর্যন্ত পুরো সীমান্তে শহীদের অসংখ্য কবর রয়েছে।

পররাষ্ট্র দপ্তরে কাজ করার সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি হলেও আমি সেখানে একটা সংযোগ রাখার চেষ্টা করতাম। সেখানে আমার তদারকি মোশতাক আহমদ কিছুতেই পছন্দ করতেন না। খন্দকার মোশতাক মাহবুব আলম চাষীকে পররাষ্ট্র সচিব করেছেন। হোসেন আলী কলকাতা মিশনের প্রধান হিসেবে কাজ চালাচ্ছেন। হোসেন আলী থেকে শুরু করে কলকাতা মিশন ও পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তারা যেভাবে আমাকে সহযোগিতা দিয়েছেন, তা ভুলবার নয়।

পররাষ্ট্র দপ্তরে একটি প্রচার সেল খোলা হয়। আমার বন্ধু ও সহকারী মওদুদ আহমদ এ সেলে কাজ করতেন। এ সময়ে তার একটি পুস্তক বিদেশ অফিসের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। মান্নান সাহেব জয় বাংলা পত্রিকা ও বেতার পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। ডঃ টি হোসেন থাকেন স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগের দায়িত্বে। তিনি যুদ্ধ চলাকালে বিভিন্ন শিবিরে আহতদের শুশ্রূষা চালু করেন।

পররাষ্ট্র দপ্তরের 'প্রকাশনা সেল' কে একটি নতুন দায়িত্ব দেয়া হয়। বিদেশী প্রতিনিধিদল আসলে তাদের সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব এরা পালন করতে থাকে। মিঃ বটমলির নেতৃত্বে একটি বৃটিশ সংসদীয় প্রতিনিধিদল ঢাকা সফর করে। এদের কলকাতা আসার কথা ছিল। তাদের সাথে কথাবার্তা বলার জন্যে আমরা একটি ছোট্ট দল গঠন করি। এই দলে সৈয়দ আবদুস সুলতান, ডাঃ টি হোসেন, ডঃ স্বদেশ বোস সহ আরো অনেকে ছিলেন।

বেনাপোলের ডাক বাংলোতে বৃটিশ প্রতিনিধিদলের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের লোকদের বিভিন্ন শিবিরে পোস্টার ও ফেস্টুন সহ পাঠাই। প্রতিনিধিদল আসেন বেশ বিলম্বে। বটমলি বলেন, তারা সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলবেন। আমাদের ন্যায় বুদ্ধিমান মানুষের সাথে কথা বলার প্রয়োজন নেই। আমি বলেছিলাম যে আমরা বুদ্ধি বিবেকহীন মানুষের অত্যাচারে আজ দেশ ছাড়া, গৃহহারা। বুদ্ধি বিবেক সম্পন্ন মানুষের সাথে কথা বলার জন্য অপেক্ষায় আছি। তাই তাঁর এই পার্লামেন্টারী ডেলিগেশনের সাথে আমাদের আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের সমস্যা নিয়ে তাদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা হয়। তারা আমাদের পক্ষে সম্ভাব্য সব কিছু করার আশ্বাস দেন।

টেড কেনেডী আসেন একবার। তাঁর সাথে আমাদের প্রতিনিধিদলের দেখা হয়। আমি ছাড়াও প্রতিনিধি দলে ছিলেন ডঃ এ আর মল্লিক, ডঃ স্বদেশ বোস ও মুস্তফা সারওয়ার। কেনেডী প্রথমেই জানতে চান, আমাদের জন্যে তারা কি করতে পারেন। আমি বললাম, মার্কিন জনগণ, সে দেশের পত্র-পত্রিকা ও

কেনেডী আমাদের জন্যে যা করেছেন, এ জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমি আগে বলি, যুক্তরাষ্ট্র সরকার যদি কিছুই না করেন, তা হলেই আমরা খুশী। সফরের পর কেনেডীর রিপোর্ট আমাদের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ চরম ভাবে দেখা দেয়। এই উচ্চাভিলাষ যুবক, ছাত্রনেতা থেকে শুরু করে বন্দুকধারী মুক্তিযোদ্ধা, সিপাই, চাকরিজীবী সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। রাজনীতিকদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছিল তবে উচ্চাভিলাষীর সংখ্যা তত বেশী ছিল না।

মিলিটারীদের প্রতি যুবকদের একটা চরম অবিশ্বাস ছিল। তাদের অভিযোগ, এককালে এরা পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সঙ্গে থাকায় তাদের ভাবধারা প্রভাবান্বিত। তাই তাদেরকে ক্ষমতায় আসতে দিলে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আত্মবিকাশে চরম বিপর্যয় ঘটবে।

অপরদিকে সামরিক বাহিনীর মধ্যে আওয়ামী লীগের যুবকদের প্রতি তেমনি অবিশ্বাস। এর মধ্যে মুজিব বাহিনী সৃষ্টির ফলে এই অবিশ্বাস আরো বৃদ্ধি পায়। একজন সংসদ সদস্য থাকা সত্ত্বেও ওসমানী মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বহু সামরিক অফিসারের মধ্যে তাকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। তাদের বক্তব্য ছিল সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির অধিনায়ক হওয়া উচিত নয়।

জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ প্রমুখ ওসমানী সম্পর্কে এ ধরণের উদাসীন উক্তি করেছেন। সামরিক বাহিনীর মধ্যে ক্ষমতার প্রতিযোগিতা তখন থেকেই শুরু হয়। শফিউল্লাহ, জিয়া ও খালেদ এই তিন জনের মধ্যে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল বলে আমার ধারণা। শফিউল্লাহ ও খালেদ দু'জনেই যুদ্ধে বীরত্বের পরিচয় দেন। এরা চিরকাল বীর হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। জিয়ার তেমন কোন বীরত্বের নজীর নেই। তবে তাঁর মধ্যে ক্ষমতার অস্পষ্ট প্রস্তুতি তখন থেকেই লক্ষ্য করা গেছে। নূরুল ইসলাম শিশু প্রধানমন্ত্রীর মিলিটারী সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেন। প্রধান মন্ত্রী বলতেন, "সামরিক বাহিনীর সকল অফিসারের সহযোগিতা ও সম্মান আমাদের অর্জন করতে হবে। তবে আমাদের প্রতি এদের আস্থার অভাব স্পষ্টতঃই দেখা যায়। শিশু তাদের পক্ষ হয়ে আমাদের কাছে আছেন ও থাকবেন। আমাদের কতটুকু কাজে লাগবে জানিনা। তবে তার মাধ্যমে সামরিক অফিসারদের আস্থা ও সম্মান অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত। ওদের এটাও বুঝানো দরকার যে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধ অচল এবং নতুন দেশ গড়াও অসম্ভব। তাই দেশ প্রেমের তাগিদে যারা অস্ত্র ধরেছেন, একই কারণে রাজনৈতিক নেতৃত্বের পেছনে ওদের কাতারবন্দী হওয়াও উচিত।"

সামরিক বাহিনীর সাথে মুজিব বাহিনীর, মুজিব বাহিনীর সথে অনিয়মিত মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের খুটিনাটি বিরোধ দেখা দেয়। এ সব বিষয় আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির বৈঠকেও আলোচিত হয়। তাজউদ্দিন ভাই এ বিষয়ে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে সঠিক মূল্যায়নের নির্দেশ দেন। তাঁর বক্তব্য ছিল কে বা কারা পাকিস্তানী ভাবধারায় অগণতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাচারী গণবিরোধী মনোভাবে প্রভাবান্বিত বা কে তা নন, এর বিচার শুধু ভবিষ্যতেই সম্ভব।

নয় মাসের সংক্ষিপ্ত সময়ে তাজউদ্দিন ভাই এর সেই আবেদন কতটুকু সফল হয়েছিল তা' ভবিষ্যৎ ইতিহাসই বলবে। প্রত্যেক সেক্টর কমাণ্ডারের সাথে যোগাযোগ করার জন্য একজন করে লিয়াজো অফিসার নিয়োগ করা হয়। বেশীর ভাগ লিয়াজো অফিসার ছিলেন সংসদ সদস্য। সামরিক বাহিনীর সাথে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল।

পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস থেকে যে সব অফিসার যোগ দেন, এদের মধ্যে উচ্চাভিলাষী লোকের অভাব ছিল না। আবার এদের মধ্যে বেশীর ভাগ অফিসারই অসীম সাহসিকতা, ত্যাগ ও কর্মস্পৃহার পরিচয় দেন।

মাগুরা ও মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক কামালউদ্দিন ও তওফিক এলাহীর অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। একজন ছেলেদের সাথে বন্দুক কাঁধে নিয়ে যুদ্ধে যেতেন, যিনি পরে ঢাকার জেলা জজ হয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ এমন একটি ব্যাপক ও সম্মিলিত আন্দোলন ছিল। এখানে অনেক লোকই তাদের পোষাকী, পদবী ও মনোভাব বর্জন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু পাক সিভিল সার্ভিসের অনেকের মধ্যে পদবী মেজাজের রেশ ছিল। ফলে রাজনৈতিক মহলে এই নিয়ে কিছুটা ক্ষোভ দেখা দেয়। এই পদবীজনিত মনোভাবের কারণে পরবর্তীকালে বাংলাদেশে ভুল বুঝাবঝির সৃষ্টি হয়েছিল। তবে এদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না।

এসব পদবী মনোভাবাপন্ন অফিসারদের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব, ফাইলের খেলা, কলম পিষে নোট লিখা, লাল ফিতাতে বাধা এমন এক পর্যায়ে এলো যে পুরো ৪/৫ তলা বাড়ী প্রবাসী সরকারের অফিসে পরিণত হলো। স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপকতায় এদের মিশিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। ফলে এরা একটি ভিন্ন মনোভাব ও ভিন্ন স্রোত হয়ে দেশে ফিরে আসে।

কেবিনেটে তাজউদ্দিন ভাই এর বিরুদ্ধে প্রথম থেকে চরম অসন্তোষের বারুদ নিয়ে বসেছিলেন খন্দকার মোশতাক। ব্যক্তিগত আক্রোশ বা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বা স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি ভিন্ন মনোভাব, যে কোন কারণেই হোক না কেন, মোশতাক অনেক কাজেই বাধা সৃষ্টি করেছেন।

মোশতাক কখনো শেখ মনি সহ যুব নেতাদের উস্কিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। মোশতাকের ভাবশিষ্য তাহের ঠাকুর এক বার স্বাধীন বাংলা বেতারের শিল্পীদের দিয়ে ধর্মঘট করার ব্যবস্থাও পাকা পোক্ত করেন। অবশ্য এসব সফল হয়নি। সাধারণ কর্মীদের সংগ্রামের প্রতি ছিল সমর্থন আর প্রধানমন্ত্রীর প্রতি ছিল তাদের গভীর আস্থা।

অপরদিকে আওয়ামী লীগের দলগত দিক থেকে তাজউদ্দিন ভাই এর প্রতি মিজান চৌধুরীর একটি ক্ষোভ ছিল। প্রধানমন্ত্রী থাকা সত্বেও তাজউদ্দিন ভাই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ ছাড়েন নি।

আর অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভাসানী ন্যাপ, মোজাফফর ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, ইত্যাদি দলগুলোর দাবী ছিল একটি সর্বদলীয় সরকার গঠন করার। আওয়ামী লীগের বক্তব্য ছিল নির্বাচিত প্রতিনিদিনের বাদ দিয়ে সরকার গঠন যুক্তিযুক্ত হবে না। সর্বদলীয় সরকার গঠনের দাবীদারদের কেউ কেউ ভারতবর্ষের বন্ধু বান্ধবদের মাঝে দাবি সৃষ্টি করতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

ভারতে সি পি আই ও সি পি আই (এম) এর কংগ্রেসের ওপর প্রভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাদের কাছ থেকেও সর্বদলীয় সরকার গঠনের ব্যাপারে আনাগোনা শোনা যেতে লাগলো।

এ সবের অবসান ঘটাবার জন্যে প্রধানমন্ত্রী কেবিনেটের সাথে পরামর্শ করে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। এতে ভাসানী, মনি সিং ও মোজাফফর আহমদ সদস্য হলেন। উপদেষ্টা পরিষদের কয়েকটি বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়।

উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের ইস্যুকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে প্রধান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। সেরনিয়াবত এই প্রস্তাবের নেতৃত্ব দেন। শেখ আজিজ, শাহ মোয়াজ্জেম সহ আরো কেউ কেউ নেপথ্য থেকে এই প্রস্তাব চাঙ্গা করেন। অবশ্য আলোচনার পর এই প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়।

যুদ্ধকালে তাজউদ্দিন ভাইকে ঘায়েল করার জন্যে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন মহল কম চেষ্টা করেনি। এই সব প্রচেষ্টা অনেক সময় সামগ্রিক সংগ্রামকে ব্যাহত করেছে। প্রধান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে যখন কিছুই বলা সম্ভব হতো না, তখন তাকে উচ্চাভিলাষী রাজনীতিবিদ হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলেছে। সে সময় কেউ কেউ এমন কথাও বলেন যে তাজউদ্দিন আহমদ বঙ্গবন্ধুকে ধরিয়ে দিয়ে ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামকে নিয়ে ভারতে এসে নিজেকে প্রধান মন্ত্রী বলে ঘোষণা করেছেন।

তাজউদ্দিন ভাই বহুদিনের অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। তিনি বঙ্গবন্ধুকেই তার জীবনের একমাত্র নেতা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে এসব ভাবতে হচ্ছে বলে তিনি অস্বস্তি বোধ করতেন। সহকর্মীদের মাঝে কাউকে খুঁজতেন তার এই ভার বইতে। মন ও মানসিকতার দিক দিয়ে প্রধান মন্ত্রী রাজনীতির এই সংকীর্ণ

মনোবৃত্তিতে কখনোই অভ্যস্ত ছিলেন না। তাই তাকে অনেক কষ্ট ও বেগ পেতে হয়েছে। কর্তব্যে অটল, নীতিতে দৃঢ়, কঠিন প্রত্যয় নিয়ে তিনি জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীতে তার সংস্পর্শের লোকেরা মুগ্ধ হয়েছেন। ভারতের কংগ্রেস নেতৃত্ব, মিসেস গান্ধী, সরকারী কর্মচারী, সামরিক কর্মচারী বি এস এফ থেকে বিভিন্ন এজেন্সী সবাই মুগ্ধ ছিলেন। এদের সকলের সম্মান অর্জন করতে তিনি সক্ষম হন। গান্ধী ভাবধারায় প্রভাবিত ভারতীয় নেতৃত্ব তাজউদ্দিন ভাই এর মত চরিত্রের লোকের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপন করেন। দলের অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র সত্বেও আমাদের সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের বিপুল অংশ তার নেতৃত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করেন। তিনি একজন বড় নেতা ছিলেন। তার চিন্তাকর্ম ও ভাব ধারার সাথে দলের এবং কেবিনেটের খুব কম লোকে-রই মিল ছিল। কেবিনেটের মধ্যে মনসুর ভাই ও হেনা ভাই একাগ্রমন নিয়ে পরিশ্রম করেছেন। তবে তাজউদ্দিন ভাই এর সাথে প্রধান মন্ত্রীত্বের দাবী কমবেশী যাই থাকনা কেন, সমান থাকার কারণেই হোক, এরা খুব একাত্ম হতে পারেননি।

ইয়াহিয়ার কারাগারে বন্দী বংগবন্ধুর বিচার প্রহসন চলছে। এই বিচারের বিরুদ্ধে আমরা বিদেশে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপারে আমা-দের বন্ধু ও হিতাকাঙ্খীদের কাছে আমরা চিঠি পাঠিয়েছি। লণ্ডনে ডোনাল্ড চেসওয়ার্থকে চিঠি লিখে তাকে জানাই সেখানে বাংলাদেশ কমিটির সাথে যোগাযোগ করে জেনেভা কনভেনশনের চার নং ধারা মতে একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কি-না। কোন যুদ্ধকালীন অবস্থায় সম্মুখ সমরে যারা লিপ্ত, তাদের গ্রেফতার ও বিচারের ব্যাপারে জেনেভা কনভেনশনে বিধি নিষেধ রয়েছে। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুর বিচার আইনসিদ্ধ ছিল না। পাকি-স্তান জেনেভা কনভেনশন মানতে বাধ্য থাকায় এই মর্মে কোন বৃটিশ নামী কৌশলীর একটি মতামত গ্রহণ করা আবশ্যক।

তা ছাড়া নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শন ম্যাকব্রাইডের যুক্তিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ লিখিত মতানুযায়ী জেনেভাতে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের মাধ্যমে এ ব্যাপারে আমরা আবেদন করতে পারি। ডোনাল্ড ও আবু সাঈদ চৌধুরী পৃথক পৃথকভাবে লিখে জানান, এ ব্যাপারে আমাদের পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। তাজউদ্দিন ভাইকে এগুলো অবহিত করার পর তিনি আনন্দিত হন। পররাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রী হিসেবে এ ব্যাপারে খন্দকার মোশতাকের মত নেয়া প্রয়োজন। তাজউদ্দিন ভাই আমাকে খন্দকার মোশতাকের সাথে দেখা করতে পাঠান। মোশ-তাক সাহেব তার পরিবার নিয়ে একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন। দেখা করার জন্যে সেখানে গিয়ে আমাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। সেখানে আরো কিছু লোক তার সাথে গল্প গুজবে ব্যস্ত ছিলেন। সবাই চলে যাবার পর আমার ডাক পড়লো। মোশতাক ম্যাকব্রাইডের লেখা মতামত না পড়েই একটা মন্তব্য

করেন। তার এই বক্তব্য আমি কোনদিন ভুলতে পারবে না। তিনি বলেন, "You must decide, whether you want Sheikh Mujib or Independence. You can't have both." আমি এ কথা শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়ি। সাথে সাথে উত্তর দিলাম, "We want both, Sheikh without Independence or Independence without Sheikh, both are incomplete" আমি বুঝলাম, তার মন্তব্য আকস্মিক নয়। এর পেছনে একটা যোগসূত্র কাজ করছে। শেখ মুজিবকে আনতে হলে স্বাধীনতার প্রশ্নে আমাদের আপোষ প্রয়োজন। এটাও এক ধরণের ব্ল্যাক মেইল বলে আমার কাছে মনে হলো। আমি যে উদ্দেশ্যে গেছি মোশতাক সুকৌশলে যে তা এড়িয়ে গেলেন, তা বুঝতে আর বাকী রইলোনা। খুব বিরক্ত হয়ে ভগ্ন হৃদয়ে সেখান থেকে ফিরে এসে তাজউদ্দিন ভাইকে সব জানালাম।

প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশে এ ব্যাপারে অগ্রসর হবার জন্যে আমি ডোনাল্ড ও আবু সাঈদ চৌধুরীকে চিঠি লিখি। ম্যাকব্রাইড ও মিঃ চৌধুরী আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের মাধ্যমে পাক সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। জেনেভা কনভেনশনের Article—4 এ কার্যকরী কোন ব্যবস্থার উল্লেখ না থাকায় আমাদের কোন পদক্ষেপ সম্পূর্ণভাবে সফল না হলেও আন্তর্জাতিক বিশ্বে এর একটা বিশেষ গুরুত্ব ছিল। ইয়াহিয়া সরকার এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। ম্যাকব্রাইড পরে ইসলামাবাদে গিয়ে আমাদের পক্ষে বলেন যে, শেখ মুজিবের বিচার আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী।...

পররাষ্ট্র মন্ত্রী মোশতাক প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্যদের অগোচরে যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে পাকিস্তানের সাথে একটি রাজনৈতিক সমঝোতায় আসার চেষ্টা করেন। একই সাথে তিনি দলীয় নেতা, কর্মী ও সংসদ সদস্যদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করেন।

বিভিন্ন সময় বিদেশ থেকে নানা ধরণের লোক প্রধান মন্ত্রীর সাথে দেখা করতে আসতেন। অনেকের সাথেই তিনি দেখা করতেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নিজে সাক্ষাতের পূর্বে তিনি আমাকে পাঠাতেন। এক সময় যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গুস্তাভ পাপানেক কলকাতায় এসে প্রধান মন্ত্রীর সাথে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তার সাথে প্রাথমিক আলোচনার জন্যে তাজউদ্দিন ভাই আমাকে প্রেরণ করেন। একটি হোটেলে তার সাথে আমি দেখা করতে যাই। তার সাথে আমার কোন পূর্ব পরিচয় নেই। পাপানেক বলেন, সি আই এ বাংলাদেশ আন্দোলনের পক্ষে নয়। হোয়াইট হাউজের মত পাল্টাতে হলে আগে সি আই এ'র মত পাল্টাতে হবে। তিনি বলেন, প্রধান মন্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্র সফর প্রয়োজন। মাকিন প্রশাসন, বিশেষ করে সি আই এ'র মত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উত্তরে আমি জানাই, একজন রাজনৈতিক নেতার পক্ষে গোয়েন্দা সংস্থার সাথে কোন আলোচনা হতে পারে না, তেমনি এর প্রয়োজনীয়তাও আমি বুঝতে পারি না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন,

খোলা মেলা ব্যাপার। এর মধ্যে কোন আঁতাত বা ষড়যন্ত্রের চিহ্ন নেই। তাছাড়া সি আই এ'র মত একটি শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা এই আন্দোলনের সকল বিষয় সম্পর্কে অবহিত। যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের বন্ধুরা আমাদের পক্ষে কাজ করছেন। তাদের কোন বক্তব্য থাকলে বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে খোলাখুলি উত্তর পেতে পারেন।

পাপানেকের প্রস্তাব নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। তবু প্রধান মন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে তাকে চূড়ান্ত কথা জানাবার প্রতিশ্রুতি দেই। তাঁর প্রস্তাব শুনে প্রধান মন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সফর বা সি আই এ'র সাথে সাক্ষাৎ কোনটাতেই তিনি রাজী নন। আমি প্রধান মন্ত্রীর জবাব পাপানেককে জানাই। আমার জানা মতে বিদেশী ব্যক্তিদের মধ্যে এক মাত্র পাপানেকের সাথেই প্রধান মন্ত্রী সাক্ষাৎ করেন নি। প্রফেসর রেহমান সোবহান যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের পক্ষে কাজ করেন।

বৃটেনের লেবার পার্টি নেতা প্রাক্তন মন্ত্রী পিটার শোর কলকাতায় এসে প্রধান মন্ত্রীর সাথে দেখা করেন। বৃটিশ জনমত গড়তে তার ভুমিকা ছিল অনন্য। শোর এর সাথে প্রধান মন্ত্রীর বৈঠককালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত, মানবিক দিক, বাস্তুহারা সমস্যা ইত্যাদি আলোচনা করা হয়। এই সাক্ষাৎকালে ডোনাল্ড ও আমি উপস্থিত ছিলাম। শোর ও ডোনাল্ড উভয়েই প্রধান মন্ত্রীকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। পরে শোর সাংবাদিক সম্মেলনে তার মতামত ব্যক্ত করেন। তার বক্তব্য বৃটেন ও ভারতে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়।

বৃটিশ এম পি মাইকেল বার্নস এর সাথে দেখা হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। স্থানটা ছিল, ২৪ পরগণা পার হয়ে বাংলার মাটিতে। তিনটা টুল ছিল। এগুলো অনায়াসে হাতে করে বহন করা যায়। পাশে যুদ্ধ ক্ষেত্রের জন্যে সামরিক টেলিফোন সেট। কিছু দূরে নদীর ওপার থেকে গোলাগুলির আওয়াজ আসছে। এমনি করে টাইমস পত্রিকার নামী সাংবাদিক হেজেল হার্টস এর সাথেও সাক্ষাত হয়।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি আমাদের সুখবর আসতে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যের খবর আসতে থাকে। আন্তর্জাতিকভাবেও আমাদের সমর্থন বৃদ্ধি পায়। আঁদ্রে মালরো থেকে শুরু করে তরুণ বিটল এবং ইহুদি মেনহুইন থেকে রবিশংকর, কৃশকায় পপসিঙ্গার মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাদের সমর্থন প্রকাশ করেন।

এছাড়া বাংলাদেশের ওপর গান রচনা ও রেকর্ড হয়ে আসছে। বিদেশী বন্ধুরা টাই পরে এসেছেন, তাতে বাংলাদেশের ছবি। বাংলাদেশ সারা পৃথিবীর মানুষের অন্তরে।

ইতিমধ্যে নানা রকমের পরিকল্পনা এসেছে। ভারত বিরাট ও ব্যাপক দেশ। নানা ধর্ম ও বর্ণের লোক এখানে বাস করে। ভারতের সরকারও একটি বৈচিত্র্যময় সরকার। মিসেস গান্ধী তার নিজস্ব পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করে যাচ্ছেন। অটল বিশ্বাস নিয়ে তিনি কাজ করছেন। বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মিসেস

গান্ধীর কাছে বহু প্রস্তাব এসেছে। সেগুলো তিনি কিভাবে দেখেছেন, তা তিনিই জানেন। কিন্তু আমরা দূর থেকে যা বুঝেছি, দিল্লী থেকে বিভিন্ন এজেন্সী কাজ করতো। ভারতীয় বিশেষ মন্ত্রণালয় কলকাতায় অফিস খোলে। মিঃ রায় ও মিস অরুন্ধতী এ অফিসের কর্মকর্তা ছিলেন। অপর একটি এজেন্সী ছিল 'র'। এর পক্ষ থেকে লিয়াজো করতেন মিঃ নাথ। পরবর্তীকালে ১৯৭৪ সালে হৃদরোগে তিনি মারা যান। মিঃ নাথ ছিলেন বাংগালী সুপুরুষ ধীর স্থির ব্যক্তিত্ব। সচরাচর গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীদের থেকে তিনি পৃথক ছিলেন। এ ছাড়া ছিলেন বি এস এফ এর কর্মকর্তা। ইস্টার্ণ সেকটরের কমাণ্ডার গোলক মজুমদার প্রথম থেকেই সর্ব পর্যায়ে আমাদের দেখাশুনা করতেন। ভারতের সামরিক প্রতিনিধি জেনারেল সরকার আমাদের সামরিক কম্যান্ডের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এ ছাড়াও ছিলেন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। দিল্লী থেমে লিয়াজো রক্ষা করার জন্যে কেউ কেউ কলকাতায় থাকতেন।

পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেসের নেতা সাত্তার সাহেব আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। দিল্লী থেকেও অনেকে আসতেন। প্রধান মন্ত্রী যোগাযোগ রক্ষা করার জন্যে আমাকে ন্যস্ত করেন। কিন্তু রাজনৈতিক যোগাযোগ কখনই সফল রূপ নিতে পারেনি। তবে স্থানীয় সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে এটা খুবই কার্যকরী হয়। কিন্তু নীতিগতভাবে এই লিয়াজোর খুব একটা প্রয়োজন ছিল না। এমনি বিভিন্ন মহল ও এজেন্সীর সাথে সমন্বয় করতে একটি মূল সূত্রের অভাব সর্বদা লক্ষ্য করেছি। ফলে অনেক সময় যোগাযোগের অভাব বিশৃংখলা ও বিভ্রান্তিতে পরিণত হয়। মিঃ ডি পি ধরের দিল্লীতে আসার সময় পর্যন্ত এই বিভ্রান্তি বিরাজ করছিল। ডি পি ধর ছিলেন একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব। এই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যাপক প্রেক্ষিত সম্পর্কে একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করেন। মিঃ ধর যদি মিসেস গান্ধীর পক্ষ থেকে কাজ করতেন, তা হলে হয়তো বহু ভুল বুঝাবুঝি ও বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যেতো। দিল্লী সরকারের বিভিন্ন এজেন্সী, তাদের মন্ত্রণালয় ও বিভাগ নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। তাদের মধ্যে ছিল প্রতিযোগিতার মনোভাব। ফলে সামগ্রিক উদ্দেশ্য অনেক সার বাধাগ্রস্থ হয়েছে। ডি পি ধরের সাথে আমাদের প্রধান মন্ত্রী এ সব বিষয় আলোচনা করেন। মুজিব বাহিনী গঠনের ব্যাপারেও ডি পি ধরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

শামসুল হককে দিল্লীতে আমাদের পক্ষে কাজ করতে বলা হয়। শাহাবুদ্দিন প্রথম থেকেই পাক দূতাবাসের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে আমাদের সাথে চলে আসেন। একই সাথে দূতাবাসের প্রেস এটাচীও আসেন। এদের সাথে প্রথম থেকেই আমাদের যোগাযোগ হয়। প্রথম বার দিল্লী গিয়েই আদের সাক্ষাত পাই। সেখানে অফিস করার ব্যাপারে তদের সাথে আলোচনা করি। পরবর্তীকালে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বাংলাদেশের পক্ষে আসার পর দিল্লীতে

অফিস স্থাপনে সক্ষম হই। অক্টোবরের শেষ দিকে মিসেস গান্ধীর সাথে বাংলাদেশ মন্ত্রীসভার একটা বৈঠক হয়। এই বৈঠকের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আগামী শীতেই বাংলাদেশ প্রশ্নে একটা অবশ্যম্ভাবী ফয়সালা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বলতে গেলে অক্টোবর থেকেই আমরা ভারতের স্বীকৃতির জন্যে চাপ সৃষ্টি করতে থাকি।

১৫ই অক্টোবর আমাদের প্রধান মন্ত্রী ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে লেখা এক চিঠিতে স্বীকৃতির জন্যে পুনরায় অনুরোধ করেন। সেই চিঠিতে এটাও দাবী করা হয় যে বাংলাদেশের অর্ধেক ভূখণ্ড মুক্তিবাহিনীর দখলে ও বাংলাদেশ সরকারের শাসন ব্যবস্থা সেখানে চালু আছে। এই চিঠির সূত্র ধরে ১৫ই নভেম্বর অন্য একটি চিঠি লেখা হয়। সেই চিঠিতে বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, স্বীকৃতির অনুরোধ, তৎকালীন অবস্থা ইত্যাদি ছিল। এই চিঠি লেখা হয় ইন্দিরার ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের প্রাক্কালে। ২৩শে নভেম্বর অপর একটি চিঠি লেখা হয় তাঁর সফর শেষে।

এই চিঠিতে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান ও বিশ্ব জনমতের প্রতি ইয়াহিয়ার চরম উপেক্ষার কথা বলা হয়। এই চিঠিতে আরো ছিল শরণার্থীদের স্বদেশে ফেরার ব্যবস্থা করার কথা। বিশেষ করে বৃদ্ধ ও শিশুরা শীতের আগে দেশে ফিরে যেতে না পারলে বিপদজনক অবস্থায় সম্মুখীন হবে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রাধান মন্ত্রী এক চিঠিতে জানান, বাংলাদেশের দু'তৃতীয়াংশ মুক্তিবাহিনীর দখলে থাকলেও পাক হানাদাররা ক্যান্টনমেন্ট থেকে হামলা করে সম্পদ ধ্বংস করছে। জবাবে ভারত সরকার মুক্তি বাহিনীর সশস্ত্র সহযোগিতার প্রস্তাব করে। বাংলাদেশ সরকার ভারতের বন্ধুসুলভ সশস্ত্র বাহিনীকে সর্ব প্রকার সাহায্য ও বেসামরিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়।

পাক ভারত যুদ্ধের ডামাডোল বেজে উঠলো। স্বভাবতই বোঝা গেল পাকিস্তান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে পৃথিবীর দৃষ্টি অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যস্ত। অর্থাৎ পাকিস্তান আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধকে আন্তর্জাতিকীকরণ করতে চাচ্ছে।

এ সময় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভারতীয় সমর শক্তির সরাসরি যুদ্ধে অবতরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আমাদের প্রধান মন্ত্রী ভারত সরকারের কাছে এক জরুরী আবেদনে বলেন, বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়ার আগে ভারতীয় সেনাবাহিনী যেন বাংলাদেশে প্রবেশ না করে। আবেদনে আরো বলা হয় একটি যৌথ বাহিনী গঠন করতে হবে এবং এই বাহিনী দু'দেশের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবে। তাছাড়া বাংলাদেশ মুক্ত হবার পর বাংলাদেশ যখন ইচ্ছা প্রকাশ করবে তখনই ভারতীয় বাহিনীকে দেশ ত্যাগ করতে হবে। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে দিল্লী থেকে ডি পি ধর কলকাতা আসেন। থিয়েটার রোড থেকে অন্য একটি বাড়িতে গিয়ে আমাদের প্রধান মন্ত্রী ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সাথে ডি পি ধরের দু'দিন

ব্যাপী আলোচনা হয়। রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনায় পারস্পরিক সমঝোত ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে ভারত সরকার স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

৬ই ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। স্বীকৃতি দেয়ার এটা ছিল যথোপযুক্ত সময়। হানাদার বাহিনী তখন সেনানিবাসের ভেতরে আবদ্ধ। দেশের বিভিন্ন স্থানে আমাদের শাসন ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। হানাদার বাহিনীকে তাড়াতে পারলেই দেশে যাওয়া সম্ভব।

সীমান্তের ভেতরে-বাইরে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে তখন উল্লাস দেখা দিয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাজধানীতে এই বিষয়টি নিয়ে আলেচনা চলছে। বিদেশী সাংবাদিকরা এসেছেন আমাদের প্রধান মন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া জানতে। প্রধান মন্ত্রী কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, তোমরা জানতে চাচ্ছ আমি কেমন আছি? সন্তানের জন্মের কথা জনক না জানলে তার মর্মব্যথা তোমরা বুঝ? আমি একটি ধাত্রীর কাজ করেছি মাত্র। বাংলাদেশ ভূমিষ্ঠ হয়েছে। আর তার জনক রয়েছেন হানাদারদের কারাগারে। জাতির জনক হয়তো কিছুই জানেন না। দুঃখে, ক্ষোভে, বেদনায় তাজউদ্দিন ভাই কেঁদে ফেলেন। তিনি অবিলম্বে জাতির জনককে মুক্তি দেয়ার দাবী করেন।

৭ই ডিসেম্বর যশোর সেনানিবাসের পতন হয়। এরপর আমি বেশীর ভাগ দিন কাটিয়েছি অগ্রগামী দলের সাথে।

আমি যশোরে প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করার জন্যে রওয়ানা হই। পরদিন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রী যাবেন। অগ্রগামী দলে আমি ও মুস্তফা সারওয়ার ছিলাম পথে পথে মানুষের বিপুল উল্লাস। মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র হাতে চলেছে। চারদিকে এই অস্ত্র দেখে মুস্তফা সারওয়ার উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন, শান্তি শৃংখলা ফিরে আসবে তো!

যশোর সার্কিট হাউসে ক্যাপ্টেন হুদার কাছে অস্ত্র জমা দেয়া হলো। পথে দেখলাম, ট্রাক ভর্তি করে হানাদার বাহিনীর সদস্যদের নেয়া হচ্ছে। জনগণ এদের মেরে ফেলতে চায়। বহু সাবধানে ও কড়া প্রহরায় এদের ভারতে নেয়া হয়।

ভারতীয় বাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার কোর অতি দ্রুত পুল, কালভার্ট মেরামত করে দেয়। কোথাও বেইলী ব্রিজ তৈরী করে দেয়া হয়।

বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে ছিলেন মুস্তফা সারওয়ার। রওশন আলী সহ কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা এসে আমাদের সাথে দেখা করেন। আমরা বেনাপোল সীমান্তে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রীকে স্বাগত জানাই। আমি ও মুস্তফা সারওয়ার সার্কিট হাউসের কক্ষে পাক সামরিক অফিসারের ব্যবহৃত পিস্তল ও কাপড় চোপড় পাই।

সীমান্তের ওপার থেকে মানুষ আসা শুরু হয়েছে। সর্বস্তরের মানুষ আসছে কে কার আগে স্বাধীন বাংলাদেশ দেখবে। শিল্পী মুস্তফা আজিজ বলেন, তিনি আমার একটি স্কেচ করবেন। তার ভাই মুস্তফা মনোয়ার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ছিলেন।

স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে প্রধান মন্ত্রীর গাড়ী আসলো। হাজার হাজার মানুষ 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিয়ে অভ্যর্থনা জানান। বিশাল জন সভায় প্রধান মন্ত্রী নতুন উদ্দীপনা নিয়ে দেশ গড়ার আহ্বান জানান। সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাম্প্রদায়িক দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। রাতে প্রধান মন্ত্রীর গাড়ীতে কলকাতা ফিরে আসি।

ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম
জুন, ১৯৮৩।

মৌলভী আসাবুল হক

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পর আমরা গ্রামে গ্রামে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করি। চট্টগ্রামের এম এ হান্নান ও এম এ মান্নান সাহেব এবং পটিয়া জেলার আওয়ামী লীগের কর্মীদের সাথে এক যোগে কাজ করে যেতে থাকি। এদিকে আনুমানিক ২১/২২শে মার্চ তারিখের রাতে পাক বাহিনী হঠাৎ করে চট্টগ্রাম নেভাল বেইস এর শ্রমিকদের ওপর গুলি চালায়। আমরা এর প্রতিবাদে মিছিল বের করলে পাক বাহিনী বাধা দেয়। ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে তিনজন পাক সেনা নিহত হয় আর আমাদের পক্ষেও কয়েকজন নিহত ও আহত হয়। মূলতঃ এই ঘটনার পর থেকেই পাক বাহিনীর সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সময় আমাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল স্থানীয় রেষ্ট-হাউজ। আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে এম, এ, হান্নান, এম, এ, মান্নান, জহুর আহমদ চৌধুরী, ছাত্র নেতা ইউসুফ সহ আমরা অস্ত্রাগার লুন্ঠন করি।

২৬শে মার্চ সকাল ৮টায় আমরা ঢাকার সংবাদ জানতে পারি। পটিয়ায় এসে দেখি সেখানে লোকে লোকারণ্য। ডাঃ ফারুখ কয়েকজন ই পি আর নিয়ে কাপ্তাই চলে যান এবং কয়েকজন পাঞ্জাবী সৈন্য হত্যা করে পুনরায় পটিয়া চলে আসেন। পাঞ্জাবী সৈন্যরা যাতে আমাদের এলাকায় প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য প্রতি রাস্তার মোড়ে চেকপোষ্ট বানানোর ব্যবস্থা করে আমি ২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম শহরে চলে যাই। রেষ্ট হাউসে বিভিন্ন নেতা ও কর্মীর সঙ্গে আলোচনা করে সমগ্র শহর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যবস্থা করি এবং ক্যান্টনমেন্ট অবরোধ করি। কয়েক জন পলায়নপর পাঞ্জাবীকে ধরে হত্যা করা হয়। ঢাকা হতে বিপুল সংখ্যক পাক সৈন্য চট্টগ্রাম আসে এবং কুমিরাতে আমরা তাদের প্রতিরোধ করি। কিন্তু তারা টিকতে না পেরে পিছু হটতে বাধ্য হয়। অবশ্য দুইদিন পরই সমগ্র শহর পাক বাহিনীর আয়ত্বাধীনে চলে যায়।

এরপর আমরা পটিয়াতে চলে আসি। তখন পটিয়াই ছিল আমাদের প্রধান কেন্দ্র। ডাঃ মান্নান, প্রফেসর নুরুল ইসলাম চৌধুরী, মেজর জিয়া ও আমি

বেতারের ট্রান্সমিটার এনে পটিয়া মাদ্রাসায় স্থাপন করি। এখান হতে মেজর হারুনের নেতৃত্বে আমরা হানাদারদের মোকাবেলা করি এবং ১২/১৪ দিন যুদ্ধ চলে। এই সংঘর্ষ চলাকালে আমি প্রধান রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় অসংখ্য লাশ দেখতে পাই। পাক বাহিনী আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে আমাকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু ফেরার পথে একটা পাক বাহিনীর গাড়ী আমাকে উঠিয়ে মিউনিসিপ্যাল অফিসে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। কিন্তু জনৈক মেজর জিজ্ঞাসাবাদের পর আমাকে ছেড়ে দেয়। দু'দিন শহরে থাকার পর আমি পটিয়া চলে আসি। এর মধ্যে ক্যাপ্টেন হারুন আহত হলে তাকে চিকিৎসার জন্যে চিরিঙ্গা পাঠানো হয়। এরপর আমি পটিয়া ক্যাম্পে কাজ করতে থাকি। ১৬ই এপ্রিল শুক্রবার সকাল আটটায় নিজ বাড়ীতে যাই। এদিন দুপুর পর্যন্ত বিমান থেকে গুলি চালানো হয়। এর ফলে পশ্চিম পার্শ্বের মোড়ে কতগুলো দোকান ধ্বংস ও বেশকিছু সংখ্যক লোক নিহত হয়। স্থানীয় মসজিদে গিয়ে দেখি মসজিদ রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে। মাদ্রাসার দু'জন মৌলবী ও কিছু-সংখ্যক ছাত্র মারা গিয়েছে। কলেজেরও যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়। বিজ্ঞান ভবনের পূর্বপার্শ্বে পটিয়া থানার সংগ্রাম পরিষদ নেতা অধ্যাপক ফজলুল করিম ও আরো কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে দেখা হয়। ঐদিন কালুরঘাট হতে পটিয়া পর্যন্ত যে সমস্ত বাংলা বাহিনী ছিল সবাই যে যেদিকে পারে পালিয়ে যায়। আমি আশে পাশের যুবকদের একত্রিত করে আলাপ আলোচনা করি। এর পরের দিন একটা গ্রেনেড নিয়ে শহরে গমন করি এবং বিকেল তিনটায় বাসায় গিয়ে উপস্থিত হই। হানাদার বাহিনীর কয়েকটা ট্রাক সে সময় চকবাজারের দিকে যাচ্ছিল। রাত সাতটার দিকে ষ্টীম লণ্ড্রীর ছাদ থেকে আমি একটা ট্রাক লক্ষ্য করে গ্রেনেডটি ছুড়ে মারি। ট্রাকটি কয়েকজন হানাদার ও অস্ত্রশস্ত্র সহ সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। আমি ঐ ছাদেই শোয়া অবস্থায় ছিলাম। অন্যান্য ট্রাক হতে পাক সৈন্য রাত একটা পর্যন্ত গুলি চালায়। আশে পাশের সব দোকান পুড়িয়ে দেয়। তারা সরে পড়লে আমি অতি গোপনে হাটতে হাটতে সকালে পাথরঘাটা পৌছি। দুইদিন দুইরাত হেটে মিরেরশরাই পৌছি। তারপর অতি কষ্টে ২১শে এপ্রিল শ্রীনগর সীমান্ত পার হই। সেখানে মিরের-শরাই-এর এম, পি মোশাররফ হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এর পরের দিন ছাগলনাইয়ার প্রাক্তন এম এন এ ও সাবেক পটিয়া কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। পরের দিন বাসে করে বেলুনিয়া যাই। সেখানে পাক বাহিনী ও আমাদের বাহিনীর সঙ্গে যে সংঘর্ষ চলছিল তাতে আমি অংশ নেই। দু'জন আহত ই পি আরকে নিয়ে বেলুনিয়া হাসপাতালে চিকিৎসার পর ক্যাম্পে পৌছিয়ে সাবরুমে যাই। সেখানে এম, এ, হান্নান, এস, এম, ইউছুফ, মির্জা মনসুর, স্বপন কুমার চৌধুরী, চট্টগ্রাম জেলা ছাত্র লীগের সভাপতি হাসেম, চট্টগ্রাম কলেজের ভি পি জামালউদ্দিন এবং সাবের আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়।

তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে বাংলাদেশ হতে যুবকদেরকে এনে গেরিলা ট্রেনিং দিয়ে বাংলাদেশে পাঠানো হবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমরা উপস্থিত কয়েকজন লোক এবং কয়েকজন ই, পি, আর নিয়ে একটা ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করি। এই ক্যাম্প পরিচালনার জন্যে হাসেম, মন্টু, মহিউদ্দিন ও আমি রইলাম। বাকী কয়েকজন আলাপ আলোচনার জন্যে আগরতলায় চলে গেলেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে আরো কিছু সংখ্যক লোক এসে আমাদের এই ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগ দেন। এসময় আগরতলা থেকে এস, ডি, ও ও আরো কয়েকজন সরকারী কর্মকর্তা আগমন করলে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে রেশনের ব্যবস্থা করি।

কিছুদিন এভাবে ক্যাম্প চললো। কিন্তু ভারতে আগমনকারী বাঙ্গালীদের মধ্যে সবাই শরণার্থী হিসেবে আসতো। ট্রেনিং নেয়ার লোকের অভাব উপলব্ধি করে আমি চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র লীগ ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের তালিকা নিয়ে বাংলাদেশের উদ্দেশে রওয়ানা দেই। প্রায় ১মাস ১৭দিন পায়ে হেটে চট্টগ্রাম জেলার মিরেশসরাই থানা হতে টেকনাফ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি, মাইওনী ও ফটিকছড়ি থানায় ঘুরে ঘুরে সকল কর্মীর ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ নেয়ার সংবাদ দেই। এর মধ্যে দেখতে পেলাম একমাত্র মৌলভী সৈয়দ আহমেদ ও শাহজাহান ইসলামাবাদী ছোট ছোট আক্রমণ পরিচালনা করছেন। ১মাস ১৭দিনের ভ্রমণের মধ্যেই কয়েকজন ছাত্র নিয়ে পটিয়া তহশীল অফিস, ষোলশহর তহশীল অফিস, আনোয়ারা থানা তহশীল অফিস ও আরো কয়েকটি তহশীল অফিস জালিয়ে দেয়া হয়। প্রফেসর নূর মোহাম্মদ ও ওবায়দুল্লাহ মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে আমি হারিনা ক্যাম্পে যাই। এর মধ্যে কয়েকজন যুবককে আমি ভারতে পাঠাই। কিন্তু পথিমধ্যে মিজো ও পাঞ্জাবীদের দ্বারা আক্রমণে হারুন ও ফরিদ নামক দু'জন যুবক নিহত হয়। বাকী যুবকরা ভয়ে ফিরে আসে। বাংলাদেশ থেকে নিরাপদে কিভাবে যুবকদের ভারতে নিয়ে যাওয়া যায় সে জন্যে মেজর রফিক, ক্যাপ্টেন এনাম, ক্যাপ্টেন মাহফুজ, এম, এ, হান্নান, সাবের, ইউসুফ, অধ্যাপক নূর মোহাম্মদ প্রমুখ ব্যক্তিদের নিয়ে এক আলোচনা সভা বসে। এই আলোচনার পর মেজর রফিক আমাকে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ প্রতিটি থানার মানচিত্র নেয়ার দায়িত্ব দেন। কোঅপারেটিভ বুক সোসাইটি হতে সমগ্র চট্টগ্রামের মানচিত্র সংগ্রহ করি। প্রত্যেক সি ও এর কাছ থেকেও মানচিত্র সংগ্রহ করি এবং লোক মারফতে ওপার বাংলায় মেজর রফিকের কাছে প্রেরণ করি। এসময় আমার খালুর সঙ্গে শহরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরাফেরা করি এবং অনেক পাক সৈন্যের সঙ্গে পরিচয় হয়। একদিন ব্রিগেডিয়ারের অফিসে ঢুকে দু'টো আর্মী ম্যাপ সংগ্রহ করে সেখান থেকে সরে পড়ি।

এর কয়েকদিন পরে দক্ষিণ চট্টগ্রাম থেকে ৪৪/৪৫ জন ছেলে এবং উত্তর চট্টগ্রাম থেকে ৪০/৪৫ জন ছেলে সংগ্রহ করে তাদেরকে ভারতে প্রেরণ করি।

আমিও ভারতে চলে আসি। সঙ্গে আনা আর্মী ম্যাপটা মেজর রফিককে প্রদান করি। যে সব ছেলে ট্রেনিং নেয়ার জন্যে এসেছিল তাদের প্রতি সাতজনের একটি গ্রুপ করে মোট ৩৬টি গ্রুপ তৈরী করি। প্রত্যেক গ্রুপে একজন কমাণ্ডার ছিল। তারপর মেজর রফিকসহ চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে তিনটি চ্যানেল খোলা হয় এবং কয়েকজন গাইড নিযুক্ত করা হয়। ফটিকছড়ির দায়িত্ব দেয়া হলো জহরুল হককে এবং মিরেরসরাই এর দায়িত্ব দেয়া হল নুর মোহাম্মদকে। তিনজন গাইড নিযুক্ত করা হলো এবং প্রত্যেকটি গ্রুপ হতে একজন করে কুরিয়ার নিযুক্ত করা হলো। প্রত্যেক গ্রুপকে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হয় এবং সমস্ত গ্রুপের প্রধানের দায়িত্ব দেয়া হলো সার্জেন্ট এ, এইচ, এম, মাহি আলম চৌধুরীকে। তারপর সবাইকে শপথ গ্রহণ করানো হলো। মেজর রফিকুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন এনাম, ফ্লাইট লেফটেনেন্ট সুলতান, হান্নান, অধ্যাপক নুর মোহাম্মদ, রফি সাহেব, সাবের সাহেব, আজগরী, জালালউদ্দিন প্রমুখ নেতৃবর্গ এখানে উপস্থিত ছিলেন। পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস বানচালের প্রতিজ্ঞা নিয়ে ৩রা আগস্ট আমরা বাংলাদেশে প্রবেশ করি। প্রথমে পাগলাছড়িতে মিজোদের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ হয়। এতে বেশ কয়েকজন মিজো মারা যায় এবং বাকী মিজোরা পালিয়ে যায়। রাজবাড়ীতে পাক বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ১১জন পাঞ্জাবী ও ২জন মিজো মারা যায় এবং একটা জীপ ধ্বংস হয়। তৃতীয় সংঘর্ষ হয় ফটিকছড়ির বিবিরহাটে। উক্ত সংঘর্ষে সাত জন পাঞ্জাবী, ১৪জন মুজাহিদ মারা যায়। পাঞ্জাবীরা তখন পিছু হটতে বাধ্য হয়। রাউজান কলেজের সামনে চতুর্থ সংঘর্ষে ৫জন পাক সেনা নিহত হয়। দু'টি চাইনিজ স্টেন, তিনটি চাইনিজ রাইফেল, ৫টি ব্যায়নেট এবং এক পেটি গুলিও আমরা পাই। পঞ্চম সংঘর্ষ হয় গোমদণ্ডী স্টেশনে। এই সংঘর্ষে ৪০/৪৫জন রাজাকার নিহত হয়। হাবিলদার ফজলুও নিহত হন। মুন্সিরহাটের ষষ্ঠ সংঘর্ষে ৮জন রাজাকার ও দু'জন দালাল নিহত হয়। কয়েকজন রাজাকারের বাড়ীও পুড়িয়ে দেয়া হয়। সারোয়াতলীতে সপ্তম সংঘর্ষে ৩৫জন রাজাকার নিহত হয়। ২০টি রাইফেল, একটি এল, এম, জি তিন পেটি গুলি আমরা উদ্ধার করি।

১৪ই আগস্টকে বানচাল করার জন্যে আমরা ১৩ই আগস্ট পতেঙ্গা থেকে মধুনাঘাট পর্যন্ত বিদ্যুৎ পাওয়ার স্টেশনের টাওয়ার গুলো নষ্ট করে ফেলি। ঐদিন রাতে আমরা বিভিন্ন স্থানে ৩৬টি মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শত্রুর ওপর আঘাত হানি। একই রাত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যেমন—পাহাড়তলী পাঞ্জাবী ক্যাম্প, দেওয়ানহাটের ক্যাম্প, চকবাজার ক্যাম্প, লালদীঘির পশ্চিমের স্থান, চাকতাই ক্যাম্প, কালুরঘাট ক্যাম্প, দোহাজারী ও পটিয়া ক্যাম্প, বিবিরহাট ক্যাম্প, রাউজান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ক্যাম্প গেরিলা পদ্ধতিতে অপারেশন চালাই। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় ঐরাত্রে বিভিন্ন অপারেশনে ১২৫জন পাঞ্জাবী, ২৩০জন রাজা-

কার মারা যায়। ফলে পাঞ্জাবী, রাজাকার ও দালালরা গ্রাম ছেড়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও থানাগুলোতে আশ্রয় নেয়। দিনের বেলা তারা বিরাট দল বেঁধে গ্রামে গ্রামে গিয়ে বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিতো এবং মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করতো। এই পরিস্থিতিতে আমরা পাক বাহিনীর ক্যাম্প আক্রমণের পরিকল্পনা করি। একদিন ভোর সাড়ে চারটায় আমরা থানা আক্রমণ করি। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্যে পাক সৈন্যরা প্রস্তুত ছিল না। ফলে প্রায় ২০০জন পাঞ্জাবী ও রাজাকার মারা যায় এবং থানার বহু পুলিশ ও রাজাকারকে আমরা আটক করি। বেশীর ভাগকে হত্যা করা হয়। থানা থেকে ২০ পেটি বুলেট, ২৫০টি রাইফেল, তিনটি এল, এম, জি উদ্ধার করি। এখান থেকে আমরা খরনা রেলওয়ে স্টেশনে রাজাকার ঘাঁটি আক্রমণ করি। কিছু সংখ্যক রাজাকার নিহত হয়। ধলঘাট মিলিশিয়া ক্যাম্প আক্রমণ করি এবং ১৪জন মিলিশিয়া নিহত হয়। ৩টি চাইনিজ স্টেন, ৫টি চাইনিজ রাইফেল, ৫টি রাইফেল, ৩হাজার বুলেট, ২টি রিভলবার উদ্ধার করি। কদুরখিল (?) গ্রামের রাস্তায় আমরা বেশ কয়েকটি রাইফেল উদ্ধার করি। সার্জেন্ট আলমের পায়ে গুলি লাগলে আমরা কমলাছড়ি পাহাড়ে আশ্রয় নেই। তখন গ্রুপ কমাণ্ডার মহসীন, শাহজাহান ইসলামাবাদীও আমার সঙ্গে ছিলেন।

কমলাছড়িতে মোস্তাক আহমদ ও পটিয়া থানার আনসার কমাণ্ডার আবদুল আলীমের সংগে দেখা হয় এবং তাদের সংগে আমি একটি বৌদ্ধমন্দিরে অবস্থান করি। সেখানে ই পি আর বাহিনীর সুবেদার মেজর টি এম আলী এবং তার অধীনে ১৫০—২০০ জন ই পি আর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ান ছিলেন। কিন্তু সুবেদার আলী আমাকে বন্দী করে রাখেন। অবশ্য তিনিদিন বন্দী রাখার পর মেজর রফিকের সুপারিশ পত্র পেয়ে টি এম আলী আমাকে ছেড়ে দেন। কমলাছড়ির বৌদ্ধ মন্দিরে অবস্থান কালে আমি ধোপাছড়িতে মোখলেসুর রহমান, সুলতান আহম্মদ কুসুমপুরী পটিয়ার এম সি এ এর নেতৃত্বে বেশ কিছু সংখ্যক ই পি আর ও স্থানীয় যুবক ও ছাত্রদের দুটি গ্রুপ নিয়ে অবস্থানের সংবাদ শুনি। তাজউদ্দিন সরকারের নির্দেশ মোতাবেক কুসুমপুরীকে ভারতে যেতে অনুরোধ করি। কিন্তু ব্যবসা সংক্রান্ত কারণে তিনি যেতে অস্বীকার করেন। তখন বাধ্য হয়ে আমি কমলাছড়িতে ফিরে আসি। সার্জেন্ট আলমকে চিকিৎসার জন্যে কমলাছড়িতে রেখে আমি শাহজাহান ইসলামাবাদী, মহসীন আবুল হোসেন প্রমুখদের নিয়ে পটিয়ার দিকে আসি। পটিয়ার রেল স্টেশনের কাছে রাজাকার ঘাঁটিতে আমাদের সংগে রাজাকারদের সংঘর্ষ বাঁধলে ৩জন রাজাকার নিহত হয়। সেখান থেকে তিনটা রাইফেল, একটা এল এম জি, তিনটা মাইন উদ্ধার করি। তাছাড়া প্রায় ৩ হাজার গুলিও আমরা পাই। অপারেশন শেষ করে একটা দলসহ আমি আমার নিজ গ্রামের বাড়িতে অবস্থান করি কিন্তু আমরা গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার একদিন পর পাক সেনারা গৈরলা গ্রামখানা জ্বালিয়ে দেয়। তাছাড়া ধলঘাটে রাজাকার মুজাহিদ ও পাক ফৌজ অকথ্য অত্যাচার চালায়। ধলঘাটবাসীদের অনুরোধে

সাড়া দিয়ে আমরা তাই ধলঘাট রেলওয়ে স্টেশনের পাঞ্জাবী ঘাঁটি আক্রমণ করি। স্টেশনে আগত শেষ ট্রেনটি আমরা যাত্রীদের নামিয়ে পুড়িয়ে দেই। তারপর ঘাঁটির ওপর অবিরাম গুলি বর্ষণ করি। পাক ফৌজের ঘাঁটি থেকে আমরা জি—৩ গান, ২৭টা স্টেনগান, ৩টা এল, এম, জি, ১১টি রাইফেল, ৩টা রিভলবার ও ৭হাজার গুলি উদ্ধার করি। এখান থেকে নিজ গ্রামে যাই। গ্রামের কয়েকজন দালাল পটিয়া থেকে পাঞ্জাবী ডেকে গ্রাম খানা ঘেরাও করে। আমরা পালিয়ে যাই এবং আরাকান রোডের পাশে গোপনে অবস্থান নেই। পাক বাহিনী সেপথে যাওয়ার সময় আমরা গুলি করি। এখানে ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং বাম হাতে গুলি লাগলে আমি আহত হই। সার্জেন্ট আলম এই আক্রমণের নেতৃত্ব দেন। এই আক্রমণের পর আমরা পটিয়ার জিরি গ্রামে চলে যাই। জিরি গ্রামে এসে দেখতে পেলাম পশ্চিম আনোয়ারা থানার গ্রামাঞ্চলে রাজাকার, আলবদর ও পাক ফৌজের নিদারুণ নির্যাতনে জন-জীবন অতীষ্ঠ হয়ে পড়েছে। তখন সার্জেন্ট আলম সাহেবের নেতৃত্বে পশ্চিম পটিয়ায় অপারেশন চালানোর পরিকল্পনা নেই। এ সময় ভারত থেকে ৪০জনের একটা ফ্রগম্যান গেরিলা বাহিনী মেজর রফিক ও এম এ মান্নান সাহেবের দু' খানা পত্র নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে। তাদের সংগে পরামর্শ করে আমরা চর লইক্ষ্যা চাকতাই হতে পতেঙ্গার বঙ্গোপসাগরের মোহনা পর্যন্ত যেসব ষ্টিমার ও জাহাজ ছিল সে গুলো মাইন দিয়ে ধ্বংস করার পরিকল্পনা নেই। পরিকল্পনা মোতাবেক ফ্রগম্যান-দের নিয়ে মাইন লাগিয়ে ষ্টীমার ফাটিয়ে দিলে পাক বাহিনী বেপরোয়াভাবে গুলি চালায়। আমরাও এর জবাব দেই। এভাবে ১১দিনে আমরা ৫টা জাহাজ ধ্বংস করতে সক্ষম হই।

হাফেজ মৌলভী আসাবুল হক
গ্রাম : নাইখাইল, ডাকঘর : পেড়লা
পটিয়া, চট্টগ্রাম।
মে, ১৯৭৩

এ এম এ মুহিত

নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ের সময় থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে বাংগালীরা সংগঠিত হতে থাকে। নিউইয়র্কের ইস্ট পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকা ঘূর্ণিঝড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা নিয়ে কথা তুলে আর বাংগালীদের জন্য সাহায্যের আবেদন করে। কাজী শামসুদ্দিন আর ড: আলমগীর মার্চ মাসে স্বাধীনতার দাবী উঠান, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মান-বাধিকার লংঘনের নালিশ করেন আর জাতিসংঘের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন করেন। ২৫শে মার্চ গণহত্যা শুরু হলে এই লীগ নাম পরিবর্তন করে এবং জুন মাস পর্যন্ত বাংগালী সমাজের প্রতিনিধির ভূমিকা পালন করে। ২৫শে মার্চের পরে শহরে শহরে লীগের শাখা গড়ে ওঠে তবে তারা সকলেই নিজস্ব কার্যক্রম অনুযায়ী

এগুতে থাকে। সমন্বিত সংগঠন গড়ে উঠতে কয়েক মাস চলে যায়। তবে নিউ-ইয়র্কের লীগ অব আমেরিকাই বাংলাদেশ আন্দোলনে অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করে।

মার্চ মাসে যখন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে পাকিস্তানের সামরিক শাসকের আলাপ আলোচনা শুরু হয় তখন স্বাভাবিকভাবে আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠি। আমাদের মধ্যে এই ধারণা ছিল যে, সংকট কাটিয়ে ওঠা যাবে এবং এর ফলে বাংগালীরা ও বাংলাদেশের মানুষ তাদের অধিকার লাভ করবে। এখানে বলা দরকার যে, সামরিক বাহিনী বাংগালীদের ওপর ঝাপিয়ে পড়তে পারে এরকম একটি আশংকা আমরা করেছিলাম। কিন্তু যখন আলোচনা শুরু হয় তখন আমাদের মনে হয়েছিল যে এই ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কম।

২৫ তারিখ ভোর ৪টার দিকে আমেরিকার প..রাষ্ট্র বিভাগের একজন বন্ধু আমাকে ফোন করে খবর শুনতে বলেন। আমার নিজের বাসায় কোন রেডিও ছিল না ... আমি গাড়ীতে গিয়ে রেডিও শুনি এবং ২৫শে মার্চের রাত্রির ঘটনা জানতে পারি। খবরটি শোনার পর একটা কথাই আমার বার বার মনে হচ্ছিল এবং সেটি হচ্ছে 'পাকিস্তানের মৃত্যু ঘটেছে'। দূতাবাসের অবস্থা কিছুটা অদ্ভুত ছিল কারণ আমরা দেশ থেকে সঠিক বা পুরো খবর পাচ্ছিলাম না। অতএব আমাদের প্রতিক্রিয়াও কিছুটা ভিন্ন হচ্ছিল। পাকিস্তানী কর্মচারীরা তখন বেশ হতবাক। তারা মোটেই জারিজুরি খাটাচ্ছিল না, বরং বলা যায় যে কিছুটা চুপচাপই ছিল।

২৯শে মার্চ সোমবার ওয়াশিংটনে বাংগালীদের একটি সমাবেশ এবং বিক্ষোভ মিছিল হয়। কেপিটল হিল, হোয়াইট হাউস, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভবনের সামনে এই সমাবেশ হয়। প্রায় দুই শত মানুষ আসে এবং এদের মধ্যে বেশ কিছু সরকারী কর্মচারী এবং গবেষক ছিলেন। যথা জনাব সাফদার, জনাব খোরশেদ আলম, জনাব রহিম, অর্থনীতিবিদ মহিউদ্দিন আলমগীর, শামসুল বারি, ডঃ ইউনুস এবং আরো বেশ কয়েকজন। এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, এই সমাবেশ আয়োজনে দূতাবাসের নিম্ন পদস্থ কর্মচারীদের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু তারাই ফোনের মাধ্যমে বেশীরভাগ যোগাযোগ স্থাপন করেন। সমাবেশ শেষ করার পর আমার বাসায় প্রায় ৭০ জন মিলিত হন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আমরা আলোচনা করি।

পাকিস্তান দূতাবাসের অর্থনৈতিক কাউন্সিলর হিসেবে আমেরিকার সরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন মহলে আমার যোগাযোগ ছিল এবং আমি সিদ্ধান্ত নিই যে, এদের সংগে আমার সংযোগগুলি আন্দোলনের পক্ষে ব্যবহারের চেষ্টা করবো। স্টেইট ডিপার্টমেন্টে ক্রেইগ ব্যাক্সটার আমাদের সংগে সব সময় যোগাযোগ রেখেছিলেন। তিনি বহু তথ্য আমাদের দেন যেগুলো আমাদের আন্দোলনের পক্ষে আরো সহায়ক হয়ে উঠে। টাউনসেণ্ড সোয়েজি এইড দফতরে বাংলাদেশ ডেস্ক এর দায়িত্বে ছিলেন তিনি আমাদের আন্দোলনের এমনই সমর্থক ছিলেন যে আমেরিকার নীতির প্রতিবাদে

পদত্যাগ করেন। এছাড়া আরচার ব্লাড, যিনি ঢাকায় কনসাল জেনারেল ছিলেন বিভিন্ন ধরণের যে সব তথ্য প্রেরণ করেন সে সব কাহিনী ওয়াশিংটনে প্রকাশ পেলে আমাদের আন্দোলন আরও জোরদার হয়। এপ্রিলের শুরুতে হারভার্ডের ম্যাসন, মার্গলিন ও ডর্ফম্যান বাংলাদেশ সমস্যার ওপর একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। এই প্রতিবেদন বাংলাদেশের সপক্ষে জনমত গড়তে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। মার্গলিন ও পরে ডর্ফম্যান আলমগীর মহিউদ্দিনকে নিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে কংগ্রেসে জোর তদবির চালান। পয়লা এপ্রিল সিনেটর কেনেডী, সিনেটর হ্যারিস আর সিনেটর কেসের দফতরে আমি হাজির হই। এদের সংগে যোগাযোগে আমার দুই বন্ধু, ওয়াশিংটন পোস্টের রণ কোভেন এবং বিশ্ব ব্যাংকের মাইল ম্যাক্কুলক আমাকে সাহায্য করেন। এরা সবাই, এবং পরে সিনেটর মনডেল বাংলাদেশের সপক্ষে জোরালো বিবৃতি দেন। আমার বেশীরভাগ সময় কাটত বিশ্ব ব্যাংক, স্টেট ডিপার্টমেন্ট, এইড, কংগ্রেস আর সংবাদপত্রের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ আলোচনায়। আমি তাদের এটাই বুঝাবার চেষ্টা করতাম যে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান কোন দিনই এক হবে না এবং এটা করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত পাকিস্তানকে হত্যাকাণ্ড বন্ধ করে বাংলাদেশের সংগে রাজনৈতিক সমঝোতায় আসতে বাধ্য করা। আর এটা সম্ভব সাহায্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। কারণ পাকিস্তান যতই সাহায্য পাবে ততই সে তার হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাবে।

এপ্রিল মাস পর্যন্ত আমি আমার কাজ নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাই কিন্তু দূতাবাসের ব্যবস্থায় এর পর পরিবর্তন হয়। এই সময় বাঙালী প্রতিরোধের শেষ কেন্দ্রস্থল ভেংগে যাওয়ার পর পাকিস্তানীরা নিশ্চিন্ত হয় যে অবস্থা তাদের পুরোপুরি পক্ষে চলে গেছে এবং তারা তখন আমাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে।

৮ই এপ্রিল 'শাহীন' এবং 'ময়নামতি' নামে দু'টি পাকিস্তানী জাহাজ থেকে কয়েকজন বাঙালী নাবিক পালিয়ে যান। তখন জাহাজগুলো বালটিমোরে অবস্থান করছিল। তাঁরা আমার সংগে যোগাযোগ করেন। এ সময় কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরির জনাব গ্রিনোর সংগেও যোগাযোগ হয়। তিনি তাঁদের উদ্ধার করেন এবং উকিলের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেন যিনি তাদের থাকার ব্যবস্থা করেন।

১৩ই এপ্রিল বি, বি, সির মাধ্যমে জাকারিয়া চৌধুরী ঘোষণা করেন যে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এথেকে আমরা অনুভব করি যে আন্দোলন এবার নতুন পর্যায়ে শুরু হবে। জাকারিয়া চৌধুরীর সংগে আমার টেলিফোনে যোগাযোগ হয় এবং তিনি দীর্ঘায়িত মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে উপদেশ দেন। এখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৬ই এপ্রিল একটি সম্মেলনে আমি পাকিস্তানী প্রতিনিধি হিসেবে যাই এবং সেখানে তুরস্কের প্রতিনিধির সাথে আমার প্রচণ্ড বাক-বিতণ্ডা হয়। এই বাক-বিতণ্ডার বিষয় ছিল তুরস্ক কর্তৃক পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দান। এর তিনদিন পর আমাকে এই সম্মেলন থেকে প্রত্যাহার করা হয় এবং আমার চলাফেরার ওপর বিধি নিষেধ আরোপ করা

হয়। এক কথায় আমাকে যতদূর সম্ভব অন্যদের সংগে যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আমি তবুও আমার কাজ চালিয়ে যেতে থাকি। আমি ১২টার সময় বের হয়ে যেতাম এবং প্রায় চারটার দিকে অফিসে ফিরতাম। এই সময়টুকুতে আমি আমার যোগাযোগ রক্ষা করে কাজ চালিয়ে যেতাম।

২৭শে এপ্রিল বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ম্যাকনামারার সংগে আমার যোগাযোগ হয়। আমি পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধের জন্য আবেদন জানাই। তাছাড়া বিশ্ব ব্যাংকের সহকারী পরিচালক গ্রেগরি ভোটার সংগে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে থাকি। তিনি বাংলাদেশের বিষয়টি দেখাশুনা করতেন। তাছাড়া ইউ এস এইডের মিঃ ডন ম্যাকডোনাল্ড এর সংগেও যোগাযোগ অব্যাহত থাকে।

১৩ই এপ্রিল দূতাবাসের কর্মচারী এবং আরো কয়েকজন চাঁদা তুলে হারুন রশীদকে কলকাতায় পাঠান সংবাদ সংগ্রহ এবং সঠিক অবস্থা জানতে। হারুনুর রশীদ বিশ্ব ব্যাংকে চাকুরী করতেন। তিনি বাংলাদেশ আন্দোলনে অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করেন। তিনি কলকাতা গিয়ে মুজিব নগর সরকারের সাথে যোগাযোগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন এর সাথেও দেখা করেন। তিনি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন। ফিরে এসে তিনি খুব একটা উৎসাহব্যঞ্জক সংবাদ দিতে পারেন নি। তিনি জানান যে, অবস্থা এখনো পরিষ্কার নয় এবং আন্দোলন ভারতের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাচ্ছে না। এ সময় আমেরিকান সোসাইটি ফর ইন্টারন্যাশনাল 'ল' এর বার্ষিক অধিবেশনে প্রফেসর গাটলিয়ের ঘোষণা করেন যে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে মানব অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে। এই সম্মেলনে আমি যোগ দিই কিন্তু দূতাবাস অন্য একজন পাকিস্তানীকে প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করে। এপ্রিল মাসের ২৬ তারিখে নিউইয়র্ক দূতাবাস থেকে জনাব মাহমুদ আলী বাংলাদেশের পক্ষে তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করেন। এমনিতেই তাঁর প্রতি পাকিস্তানী সরকার প্রসন্ন ছিলেন না যেহেতু তিনি সে বছর জাঁকজমকের সাথে একুশে ফেব্রুয়ারী পালন করেছিলেন। পাকিস্তানী গোয়েন্দা বাহিনী সেই থেকে তাঁর পেছনে লেগেই ছিল।

মে মাসের প্রথম পক্ষেই বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ৯ই মে জনাব এম, এম আহমেদ ওয়াশিংটন পৌঁছুন। ১১ই মে পাকিস্তান সমস্যার ওপর কংগ্রেসে "গ্যালাগার শুনানী" শুরু হয়। ১২ই মে জনাব রেহমান সোবহান একটি প্রেস কনফারেন্স করেন এবং সেটি অত্যন্ত সফল হয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনের পর জনমত আমাদের আন্দোলনের পক্ষে আরো তীব্র হয়ে উঠে এবং প্রচুর প্রচার হয়। একই সময় দূতাবাসের সহকারী শিক্ষা অফিসার জনাব এ আর খান গ্যালাগার শুনানীতে উপস্থিত থাকার জন্য চাকুরীচ্যুত হন। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে "বাংলাদেশ লবী" সংগঠিত ও জোরদার হয়ে উঠে। বিভিন্ন প্রভাবশালী মহলে চাপ প্রয়োগ আরো তীব্র এবং ফলপ্রসূ হতে থাকে।

এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল একটিই। তাহল পাকিস্তানকে প্রদত্ত সামরিক এবং অন্যান্য সাহায্য বন্ধ করা।

জনাব এম এম আহমেদ ওয়াশিংটনে এসে কয়েকটি কাজ করার চেষ্টা করেন। তিনি সব জায়গায় প্রচার করতে থাকেন যে অবস্থা যত খারাপ বলা হচ্ছে মোটেই ততটা খারাপ নয়, আওয়ামী লীগের সমর্থন সর্বব্যাপী নয়, তাছাড়া বিভিন্ন মহলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জানান যে পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান একান্ত প্রয়োজনীয়। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা মার্চের 'গণ্ডগোলের' ফলে খারাপ হয়ে গেছে। অতএব ঋণ শোধের সময়সীমা বাড়িয়ে দেয়া হোক।

জনাব এম এম আহমেদ এর সঙ্গে পূর্ব থেকেই আমার আলাপ ছিল এবং তাঁর সাথে এক দীর্ঘ বৈঠক হয়। সেখানে আমরা খোলাখুলিভাবে আলাপ করি। তিনি খোলাখুলি বলেন যে, নির্মম এবং দুঃখজনক ঘটনা চতুর্দিকে ঘটেছে ব্যাপকভাবে। সবার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ এবং বাঙ্গালীদের মনোভাব সহজে অনুমেয়। মার্চের ঘটনার পর যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে তা সারানো সত্যিই একটি সমস্যা হবে। তিনি আরো বলেন যে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর করতে আসলেই আগ্রহী। তিনি একদল মধ্যপন্থী আওয়ামী লীগের লোকজন খুঁজছেন এবং অবশ্যই ৬ দফাকে যতদূর সম্ভব মেনে নেয়া হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে ইয়াহিয়া খান আসলেই কি যা চেষ্টা করছেন তা করতে পারবেন। তিনি বলেন যে সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত কোন উত্তর দিতে পারছেন না। সেটি একটি কঠিন সমস্যা বটে। এম, এম আহমেদ আরো বলেন, মার্চ মাসে যখন ইয়াহিয়া খান এবং শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা চলছিল তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে আওয়ামী লীগের প্রস্তাবগুলো কার্যকরী কিনা। তিনি বলেছিলেন যে, প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করা সম্ভব তবে সামান্য যৌক্তিকীকরণের প্রয়োজন রয়েছে। যেমন প্রতিরক্ষার জন্য শিল্পখাত এবং কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন কেন্দ্রের হাতেই থাকবে। বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপারে দুটি এ্যাকাউন্ট তখনই সম্ভব নয়, তবে ভবিষ্যতে হতে পারে। বিদেশী সাহায্য সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা প্রদেশ ভিত্তিক হওয়া উচিত নয়। তবে কেন্দ্রীয়ভাবে সাহায্যকারীর সাথে আলাপ শুরু করার আগে ভিন্ন প্রদেশের প্রয়োজন এবং দাবীগুলো সম্পর্কে একমত হওয়া যেতে পারে ও তার ভিত্তিতে আলোচনা হতে পারে। ইয়াহিয়া খান তাঁকে ভুট্টোর সঙ্গে আলাপ করতে বলেন। কিন্তু ভুট্টো কেবল মাত্র রাজনীতি নিয়েই আলাপ করতে চান। তিনি বলেন যে তার মতে ভুট্টো প্রস্তাবগুলো মেনে নিতে কোন ক্রমেই রাজী ছিলেন না। যদিও তিনি (এম এম আহমেদ) আমাকে জানান যে ২৫শে মার্চের হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণাই ছিলনা যে এমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে,

আমার বিশ্বাস, তিনি ঢাকা ত্যাগের আগেই তার আভাস পেয়েছিলেন। ব্যক্তিগত পরামর্শ হিসেবে তিনি আমাকে জানান যে দেশে ফিরে যেতে চাইলে আমি কেন্দ্রীয় সরকারে যুগ্ম-সচিব হিসেবে কাজ করতে পারি।

মে মাসের শেষের দিকে আমেরিকার কংগ্রেসে ফরেইন এ্যাসিসটেন্স এ্যামেণ্ডমেন্ট প্রস্তাব পেশ করা হয়। সিনেটে স্যাক্সবি-চার্চ প্রস্তাবে পাকিস্তানে সব সাহায্য বন্ধ করার দাবী করা হয়। আর হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভে গ্যালাগার প্রস্তাবে একই দাবী উত্থাপন করা হয়। এদিকে দূতাবাসের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়ে। বহু লোককে চাকুরীচ্যুত করা হচ্ছিল। আমরা দেশের কোন খবরই পাচ্ছিলাম না এবং আমাদেরকে কোন কাজও করতে দেয়া হচ্ছিল না। বহু পাকিস্তানীকে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং তারাই সব কাজ করতো। এ সময় দূতাবাসের উপ-প্রধান জনাব এনায়েত করিম হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তিনি ছিলেন বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্বোচ্চ কর্মকর্তা।

২৯শে মে শনিবার বিচারপতি চৌধুরীর সাথে নিউইয়র্কে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। একই সময় জনাব এফ আর খানের নেতৃত্বে শিকাগোয় ডিফেন্স লীগ অব বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। মোটামুটি এরকম চিন্তা করা হয় যে এই সংগঠনটি আমেরিকার বিভিন্ন বাঙ্গালী সংগঠনের সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করবে। ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টারও এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটারিতে যে সমস্ত আমেরিকান ডাক্তার কোনও না কোন সময়ে কাজ করতেন তারা এই সংগঠনে সক্রিয় ছিলেন। সবার সাথে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, মাহমুদ আলী (নিউইয়র্কে) গঠিত সংগঠনকে আর্থিক সাহায্যদান করা হবে এবং আমি কোন একটি বাঙ্গালী সংগঠনে ১৫ই জুন যোগদান করবো। ৬ই জুন শিকাগোতে জনাব এফ, আর খানের বাসায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালী আন্দোলনকারী সংগঠনগুলো সবাই উপস্থিত হয়। এই সভাতেই ডিফেন্স লীগ অব আমেরিকা আনুষ্ঠানিকভাবে জন্মলাভ করে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, জনাব খানের বহু ইহুদী বন্ধু আর্থিকভাবে এই আন্দোলনকে সাহায্য করেন।

এই সভায় আমি কয়েকটি সমস্যার কথা উল্লেখ করি। প্রথমটি হচ্ছে নিউইয়র্কে মাহমুদ আলীকে যে সাহায্য দেয়ার কথা ছিল তা দেয়া হয়নি। দ্বিতীয়তঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের বিভিন্ন সদস্য বারবার দূতাবাসের কর্মচারীদের ওপর চাপ দিচ্ছিলেন আনুগত্য প্রক' ' করার জন্য, কিন্তু নিজেরা আমেরিকাবাসী হওয়া সত্ত্বেও ছদ্মনাম ব্যবহার করছিলেন। আমি প্রশ্ন করি যে তাঁরা যখন নিজেরাই ছদ্মনাম ব্যবহার করছেন তাহলে কিভাবে আশা করেন যে দূতাবাসের কর্মচারীরা আনুগত্য প্রকাশ করবেন। অবশ্য এখানে উল্লেখ্য যে তাদের কর্মকাণ্ড বা সিদ্ধান্তে আমি নিজে খুব একটা প্রভাবিত হইনি যেহেতু আনুগত্য প্রকাশের সিদ্ধান্ত আমি আগেই নিয়েছিলাম।

এর মধ্যে দূতাবাসে আমার পদ বিলুপ্ত করা হয় এবং আমাকে পাকিস্তানে বদলী করা হয়। বস্তুতঃপক্ষে শিকাগোর সভা থেকে ফিরেই আমি এই খবর প ই। এ সংবাদ পাওয়ার পর আমি আমার সিদ্ধান্ত এবং বক্তব্য জানিয়ে সরাসরি ইয়াহিয়া খানকে একটি চিঠি লিখি। বলা বাহুল্য এই চিঠির কোন উত্তর আমার কাছে আসেনি। ৩০শে জুন মুজিব নগর সরকারের প্রতি আমার আনুগত্য প্রক'শ করি। আমার বাসা বেসরকারীভাবে দূতাবাসে পরিণত হয় এবং আমি মুজিব নগর সরকারের পক্ষে কাজ শুরু করি। তবে আমার সিদ্ধান্তের খবর সাময়িকভাবে গোপন রাখা হয় যেহেতু আমার কিছু সহকর্মীও আনুগত্য প্রকাশ করতে আগ্রহী ছিলেন এবং তাদের কিছু সময়ের প্রয়োজন ছিল।

জুন মাসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল কংগ্রেসে বাংলাদেশের ঘটনাবলীর ওপর শুনানী। জন রোডি ঢাকা থেকে ফিরে এই শুনানীতে স্পষ্ট বিবৃতি রাখেন। তিনি হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে মার্কিন সাহায্য সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার সপক্ষে মন্তব্য রাখেন। এই শুনানী ও আরো অনেক কর্মকাণ্ড থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে মার্কিন সরকারী নীতির বিপক্ষে একটি প্রভাবশালী মহল বাংলাদেশকে সরাসরি সমর্থন করছেন। ৫ই জুলাই মুজিব নগর সরকার সমস্ত বাঙ্গালী কুটনীতিককে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য আহ্বান জানান। আমেরিকায় অবস্থিত বেশীরভাগ কুটনীতিক সিদ্ধান্ত নেন যে, আগস্ট মাসের প্রথমদিকে মুজিব নগর সরকারের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ করবেন। এই সব তথ্য আমি মুজিব নগর সরকারকে জানাই। এ সময়ের মধ্যে জনাব এনায়েত করিম দ্বিতীয়বারের মতো. হৃদরোগে আক্রান্ত হন। এই ঘটনা মানসিকভাবে অনেক বাঙ্গালী কুটনীতিককে দুর্বল করে দেয়। সবার মধ্যে "কি হবে কি হয়" একটা ভাব দেখা যায়। আমি মুজিব নগর সরকারকে আবার জানাই যে অবস্থার অবনতি ঘটেছে এবং অনেকে আনুগত্য প্রকাশ নাও করতে পারেন।

এতদিন পর্যন্ত আমি জনসমক্ষে কোন বক্তব্য রাখিনি কিন্তু এই অবস্থা দেখে আমি সিদ্ধান্ত নিই যে এবার খোলাখুলি কাজ করতে হবে। সিনেটর কেনেডি আমাকে আমন্ত্রণ জানান একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর বদলে উপস্থিত হবার জন্য। ২৭শে জুলাই এন বি সি টেলিভিশনের 'কমেন্টস' অনুষ্ঠানে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাখ্যা করি কেন পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করেছি। অনুষ্ঠানটি ১লা আগস্ট প্রচারিত হয়।

পাকিস্তান এ সময় কিছু বাঙ্গালীকে তাদের পক্ষে প্রচারের জন্য আমেরিকায় পাঠায়। ওয়াশিংটনে যারা এসেছিলেন তাদের মধ্যে দু'জনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় জুলাই এর প্রথম দিকে। জনাব মাহমুদ আলী তো বলে বসলেন যে গণহত্যা বলে কিছু হয় নি। শুধু দুষ্কৃতিকারীরা কিছু মারা গেছে আর

বাঙ্গালীরা বিহারীদের মেরেছে। তিনি আরও জানালেন যে অবস্থা আয়ত্বের মধ্যে আর শেখ মুজিবের কোন জনপ্রিয়তা নেই। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে তার আত্মীয় সিলেট হাসপাতালের সুপার ডাঃ শামসুদ্দিনকে কে বা কেন হত্যা করেছে। তিনি অবলীলাক্রমে মিথ্যে কথা বললেন যে বেখেয়ালী গোলাগুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি আমাকে দেশে ফিরতে উপদেশ দিলেন। তবে এও বললেন যে কেন্দ্রীয় সরকারে গেলে ভাল হয়। তার কথাবার্তায় আওয়ামী লীগ, আর বিশেষ করে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে তার উষ্মা ও ক্ষোভ প্রকাশ পেল। তিনি দূতাবাসের হুকুম মত বিভিন্ন লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন আর সংবাদপত্রে চিঠিপত্র লিখেন। জনাব হামিদুল হক চৌধুরীকে খুন খারাবীর বিবরণ দিতে বেশ বস্তুনিষ্ঠ বলেই মনে হলো। তিনি বললেন যে বিহারীরা বাংগালীদের খুব মেরেছে আর সেনাবাহিনী জুলুম করেছে। সব পরিবারেই কিছু না কিছু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা প্রাণ হারিয়েছে। যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে সেটা সারতে অনেক দিন লাগবে। কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে ভাব করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। কিছুদিন হয়তো দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে থাকতে হবে। তার মূল কথা ছিলো, দোষ যারই হোক, ভারতের সঙ্গে বাঙ্গালী মুসলমানের বন্ধুত্ব হতে পারে না। আমি যখন তাকে বললাম যে বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই হবে আর কিছুদিন পরে সেখানে আমরা ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে পারবো। তখন তিনি রাগের সঙ্গেই বললেন "তোমাদের বাংলাদেশে আমাকে পাবে না।" আমি হেসে বললাম, "আমরা তাহলে জেনেভায় বসেই বিগত দিনের স্মৃতি আলোচনা করবো"। হক সাহেব অনেক গন্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বিশ্বব্যাংক বিশেষভাবে কি করতে পারে, কি উপদেশ তিনি এ ব্যাপারে মিঃ ম্যাকনামারাকে দিতে পারেন। দূতাবাস তাকে নানা কাজ করতে বলে ও তার জন্য চিঠিপত্র তৈরী করে দেয়। কিন্তু তিনি তার নিজের ইচ্ছায়, নিজের ঢংএ পাকিস্তানের প্রচার কার্য্য করেন।

বাঙ্গালী কূটনীতিক জনাব এস এ করিম দূতাবাসের কাজে বিদেশে গিয়েছিলেন। তিনি নিউইয়র্ক পাকিস্তান মিশনের দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন এবং মার্কিন মুল্লুকে যত বাঙ্গালী কর্মকর্তা ছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র। তিনি প্রথম থেকেই আমাদের সংগে সব সময় যোগাযোগ বজায় রাখতেন। তিনি আফ্রিকা সফর শেষ করে ওয়াশিংটনে আসেন। তিনি এসে তার সহকর্মিদের বুঝালেন যে পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করার আর কোন যৌক্তিকতা নেই আর বাংলাদেশ সরকারের ডাকে সাড়া দিতে কোন দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই। তিনি বলিষ্ঠভাবে একে একে সব কর্মকর্তাদের সংগে আলোচনা করে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। সর্বশেষে সমস্যা হলো অসুস্থ জনাব এনায়েত করিমকে নিয়ে। তিনি অত্যন্ত

অসুস্থ ছিলেন এবং তার চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন ছিল। তাঁর এই অবস্থা তার সহকর্মিদের মনে দুর্বলতা এনে দেয়। পরিশেষে ঠিক হলো যে করিম দম্পতির সংগে সরাসরি আলাপ করাই ভালো। কিন্তু বেগম করিম এবং জনাব এনায়েত করিম উভয়ে অত্যন্ত সাহস দেখান। জনাব করিম বলেন যে তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি বলেন "আমি আপনাদেরই সাথে আছি"।

৩রা আগষ্ট মুজিব নগর সরকারের পররাষ্ট্র সচিব জনাব মাহবুব আলম চাষী ও তার সহকারী তৈয়ব মাহতাবের সাথে আমার কথা হয়। এছাড়া বিচার-পতি চৌধুরীর সাথেও আমি যোগযোগ করি। ৪ঠা আগষ্ট এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করি আমি এবং ওয়াশিংটন পোষ্ট পত্রিকার ন্যাশনেল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের সম্পাদক রোনাল্ড কোভেন এতে আমাকে সহযোগিতা করেন। তিনি ও নিউইয়র্ক টাইমস এর বেনজামিন ওয়েলসকে একদিন আগে আমি জানিয়ে দিই যে সম্মেলনে আমার সব বন্ধু তাদের আনুগত্য পরিবর্তন ঘোষণা করবেন। একই সময় প্রেসিডেন্ট নিক্সন-এর একটি প্রেস কনফারেন্স হচ্ছিল যার ফলে আমাদের আনুগত্য প্রকাশের সংবাদ ততটা ব্যাপক প্রচার লাভ করেনি। তবে এই সাংবাদিক সম্মেলনে নিক্সন বলেন যে আমেরিকা সব সময় "পশ্চিম পাকিস্তানে"র পাশে থাকবে। তাঁর এই বিশেষ শব্দ ব্যবহার সবারই কানে লাগে এবং এটি ব্যাপক প্রচার লাভ করে। ৫ই আগষ্ট জনাব এম, আর সিদ্দিকী আমেরিকায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে আগমন করেন। ৩রা আগষ্ট গ্যালাগার সংশোধনী পাশ হয়। যদিও সিনেটে এর ভবিষ্যত কি হবে তা নিশ্চিত ছিল না তবুও এটি ছিল একটি বিরাট বিজয়। ১৯শে আগষ্ট টরনটোতে অক্সফ্যাম আয়োজিত একটি বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্যার হিউ কিননীসাইড এতে সভাপতিত্ব করেন আর বৃটেনের জুডিথ হার্ট, ভারতের জেনারেল চৌধুরী, প্রফেসর নুরুল হাসান এবং কানাডার বহু সংসদ সদস্য এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব-গুলো সুবিখ্যাত "টরনটো ডিক্লারেশন" হিসেবে পরিচিত। এই সম্মেলনে জনাব এম আর সিদ্দিকী ও আমি বাংলাদেশের তরফ থেকে উপস্থিত ছিলাম।

এর কিছুদিন পর শেখ মুজিবের বিচার সম্পর্কিত খবর আসে। আমরা এর বিরুদ্ধে জোর তৎপরতা চালাতে থাকি। এর বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হয়ে ওঠে। বেশ কিছু কংগ্রেস সদস্য বিবৃতি দেন এবং এমনকি মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে এনে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে আমরা ব্যস্ত ছিলাম বিভিন্ন জায়গায় সভা সমিতি করার মধ্যে। অনেকগুলো বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাথে আমাদের যোগাযোগ ছিল এবং আমরা সেই সব জায়গায় গিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের

পটভূমি ও প্রবাহ ব্যাখ্যা করতাম। ৩ রা সেপ্টেম্বর ডাঃ মালিক গভর্ণর হন। কিছুদিন পর একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে শেখ মুজিবকে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে যা পরবর্তীকালে মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

লস্ এঞ্জেলস, সানফ্রান্সিসকো, ডেনভার এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা সভা করি। ফিলাডেলফিয়ার একটি প্রতিষ্ঠান "ফ্রেন্ডস্ অব ইস্ট বেংগল" খুবই সক্রিয় ছিল। সেখানে সুলতানা ক্রিপেনডরফ এবং মাজহারুল হক একটি "টিচ-ইন" এর ব্যবস্থা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক মিঃ চার্লস কান এর উদ্যোক্তা ছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কয়েকজন পাকিস্তানীও এতে বাংলাদেশের সমর্থনে অংশ গ্রহণ করেন যথা জনাব এজাজ আহমদ। পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য সাহায্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে ঐ সময়ে। সিনেটে এ বিষয়ে তর্কবিতর্ক চলে। অনেকেরই মত ছিল যে খাদ্য সরবরাহকে রাজনীতির উর্দ্ধে রাখা উচিত। আমরা যুক্তি দেখাই এ সাহায্য দিলে যে হত্যাযজ্ঞ চলছে তা কখনো বন্ধ হবে না। বরং এতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সাহায্যই হবে।

একই সময়ে পাকিস্তান সাহায্য গ্রুপের মিটিং শুরু হয়। আমরা বিভিন্ন মহলে এর বিরুদ্ধে তদবির করতে থাকি। হারুনুর রশীদ ও রেহমান সোবহান এ ব্যাপারে খুব সচেষ্ট ছিলেন। পাকিস্তান চাচ্ছিল তাদের দুশো চল্লিশ মিলিয়ন ডলার মওকুফ করে দেয়া হোক। আমেরিকা এতে রাজী হচ্ছিল না এবং চাপ দিচ্ছিল একশ মিলিয়ন ডলার দাবী থেকে কমিয়ে নেবার জন্যে। শেষ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই মিটিং শেষ হয়। এখানে একটা বিষয় বলা দরকার। ইউ, এস, এইডের প্রতিনিধি মরিস উইলিয়াম প্রথমে পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ঢাকা সফরের পর তিনি বোধ হয় মত পরিবর্তন করেন। পরবর্তীকালে এন্ডারসন পেপারস থেকে দেখা যায় যে পাকিস্তান সমর্থন নিতান্তই ওপরের তলার ব্যাপার ছিল। প্রেসিডেন্ট নিক্সন আর তার উপদেষ্টা হেনরী কিসিঞ্জারই সে কার্যক্রমের হোতা ছিলেন।

আগেই বলেছি জুন মাসের দিকে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার স্থাপিত হয়। প্রথমে এটা পরিচালনা করেন মিসেস আনা টেইলর আর ডেভিড ন্যালিন। বাংগালীদের মধ্যে রাজ্জাক খান ও তার বন্ধুবর্গ এবং মহসীন সিদ্দিকী এটা চালাতেন। এর প্রধান কাজ ছিল কংগ্রেসে লাবি করা ও বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে সহায্য করা। এই সেন্টারের সংগে বাংগালী জামান (রুচি) এবং মাকিন ডেভিড ওয়াইজব্রডের নামই প্রচার লাভ করে। এরা জুন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের জন্মলগ্ন ও তৎপরবর্তীকাল পর্যন্ত সক্রিয় থাকেন। আমেরিকার বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা এই সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখেন। বিভিন্ন এলাকা থেকে ছাত্র ও শিক্ষকেরা দল বেধে ওয়াশিংটনে এসে কেপিটল হিলে

লবি করে যেতে এই সংগঠনের সাহায্য নিতেন। বোস্টন, ইণ্ডিয়ানা, টেকসাস, শিকাগো, নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, ওহিয়ো, সানফ্রানসিসকো, লস এঞ্জেলেস এবং আরো অনেক জায়গা থেকে বাঙালী ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকরা নির্দিষ্ট নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ওয়াশিংটনে এসে লবি করতেন। আমরা সব সিনেটর এবং কংগ্রেসম্যানদের ফর্দ বানিয়ে নিশ্চিত করতাম যে সবাইকে আমাদের বক্তব্য বলার সুযোগ হয়েছে। মূলতঃ মার্কিন নাগরিকরাই বেশী করে লবি করতো, বাংগালীরা তাদের সংগ দিতেন। আমার মনে হয় লবি দল হিসেবে আমরা বেশ সংগঠিত ও সুসংহত ছিলাম। আর এতে ছিল বাংলাদেশ মিশন ও ইনফরমেশন সেন্টারের যৌথ প্রচেষ্টা। আমার মনে পড়ে কোনদিন বিকেলে হয়তো কেউ আমার বাসায় রাত্রি যাপনে আসলেন আর পরের দিন সকালেই কেপিটল হিলে চলে গেলেন এবং সেখান থেকেই বিকেলে বিদায় নিয়ে তার কর্মস্থলে ফিরে গেলেন। এরা নিজের ইচ্ছায় আসতেন, দেশপ্রেম তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। অক্টোবরে লবির কাজ ছিলো উঁচু কারণ, তখন টারগেট ছিল বৈদেশিক সাহায্য বিল।

সেপ্টেম্বরের শেষে অথবা অক্টোবরের শুরুতে বিচারপতি চৌধুরীর নেতৃত্বে জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল পাঠানো হয় এবং আমিও তাতে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। পাকিস্তান এইড কনসরটিয়ামের সভা শেষে আমি নিউইয়র্কে প্রতিনিধি দলে যোগ দিই। আমরা বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করি এবং আন্দোলনের পক্ষে ৪৭টি সমর্থনসূচক বিবৃতি সংগ্রহ করি। কমবেশী সব দেশই আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল এবং সবাই চাচ্ছিল একটি রাজনৈতিক সমাধান। এ সময়ের একটি বিশেষ ঘটনা আমাকে আলোড়িত করে। ১৪ই অক্টোবর 'বেলমণ্ট প্লাজা' হোটেলে রাত ৯টা/১০টার দিকে ডঃ এ আর মল্লিক, ডঃ মফিজ চৌধুরী এবং আরো কয়েকজন একসাথে বসে আলাপ করছিলাম। এমন সময় খবর এলো যে মোনায়েম খান মারা গেছেন। আমরা আনন্দে হর্ষধ্বনি করে উঠি। এমন সময় হঠাৎ করে মল্লিক সাহেব গম্ভীরভাবে বললেন যে, দেখো, যুদ্ধ আমাদের কি রকম করে ফেলেছে। একটি মানুষের মৃত্যুতে আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠি।

৮ই নভেম্বর পাকিস্তানে সব ধরণের অস্ত্র সাহায্য বন্ধ করে দেয়া হয়। ১০ই নভেম্বর "পাকিস্তান অর্থনৈতিক সাহায্য" বিল পাশ হয়। এ বিলে বলা হয় যে, যতদিন পর্যন্ত রিফিউজিদের ফিরে যাবার মতো অবস্থা সৃষ্টি না হবে ততদিন কোন অর্থনৈতিক সাহায্য করা হবে না।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল "গেলাগুটসকি প্রস্তাব"। এই প্রস্তাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমে পাকিস্তানের ওপর চাপ প্রয়োগ করা।

নভেম্বরের শেষে সীমান্তবর্তী এলাকায় গোলাগুলি শুরু হবার পর বিভিন্ন মহলে অন্য ধরণের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যেতে লাগলো। তখন সবাই চিন্তা করছিল কিভাবে রক্তক্ষয় বন্ধ করা যায়। সেটা বাঙালীদেরই হোক বা পাকিস্তানী বা

রাজাকারেরই হোক। এছাড়া পুনর্বাসন নিয়েও চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। এমন কি মুজিব নগরের নেতৃত্ব একটি স্বাধীন দেশ পরিচালনা করতে পারবে কিনা তা নিয়েও কিছু কিছু প্রশ্ন উঠে। আমার মনে পড়ে সিনেটর স্যাক্সবি, যিনি এই আন্দোলনের একজন গোঁড়া সমর্থক ছিলেন, আমাকে একদিন ডেকে বললেন, "আমাকে আশ্বাস দাও যে, দেশ স্বাধীন হলে তোমরা তা পরিচালনা করতে পারবে"।

ডিসেম্বর মাসে যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন আমরা এক প্রকার নিশ্চিত ছিলাম যে যুদ্ধে আমরা জয়ী হবই। যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে একটা ঘটনার উল্লেখ করা যায়। অক্টোবর মাসের দিকে সারওয়ার মুর্শেদ খানের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনা-বাহিনীর প্রধান এর পক্ষ থেকে একটি চিঠি আসে। এতে ছিল বিমান বাহিনী গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র এবং ভারী কামান-গোলার একটি বিশদ বিবরণ কিন্তু এই বিবরণ বা প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের তালিকা খুবই উদ্ভট ছিল যেহেতু এই সব সংগ্রহ করা ছিল অসম্ভব এবং এর জন্য যে অর্থ প্রয়োজন হতো তাও আমাদের ছিলনা। অবশ্য যুদ্ধে ভারত যে আমাদের সাহায্য করবে তা আমরা সহজেই অনুমান করেছিলাম। জুন মাসে বোস্টনের ফিরোজের উদ্যোগে বেশ কিছু কম্যুনিকেশন যন্ত্র-পাতি আমরা মুজিব নগরে পাঠাই। বোধ হয় এতেই ধারণা হয়েছিল যে ভারী অস্ত্র-শস্ত্র পাঠাতেও আমরা সক্ষম হব। নভেম্বরের শেষেই মনে হয়েছিল যে সরাসরি যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবি কিন্তু পাকিস্তান যে সেই যুদ্ধ শুরু করবে এমন নির্বুদ্ধিতার আশংকা আমরা মোটেই করিনি।

যুদ্ধকালীন অবস্থায় কিছু পাকিস্তানী আমাদের মুজিব নগর সরকারের সাথে একটি সমঝোতায় আসতে চেষ্টা করে। তাদের কয়েকজন জানায় যে, এই প্রস্তাব ভুট্টোর মস্তিষ্ক প্রসূত। তারা বলে মুজিবকে ছেড়ে দেয়া হবে যদি শেখ মুজিব সরাসরি জাতিসংঘে এসে পূর্ব পাকিস্তানের ভূখণ্ড থেকে সব বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের আহবান জানান এবং তার আহবানে ভারত সাড়া দেয়। এমতাবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের সংগে একটি রাজনৈতিক সমঝোতায় এসে বাঙালীদের সব দাবী মেনে নেবে। প্রস্তাবটি অত্যন্ত চতুর বলে আমাদের মনে হয়েছিল। আমরা উত্তরে জানাই যে সর্ব শক্তি বলতে আমরা ভারত এবং পাকিস্তান উভয়কে বুঝি। ছেড়ে যেতে হলে উভয়কে যেতে হবে একসাথে। কিন্তু এই আলোচনা সরকারী পর্য্যায়ে পৌছুবার আগেই বন্ধ হয়ে যায়।

১১ই ডিসেম্বর আরেকটি প্রস্তাব নিয়ে পাকিস্তানীরা উপস্থিত হয় এবং সমঝোতার জন্য চাপ দেয়। তারা এই প্রস্তাব পেশ করার জন্য বিচারপতি চৌধুরীর সংগে দেখা করার চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি পাকিস্তানীদের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে একটি ভীতিপূর্ণ ঘটনা ছিল চট্ট-গ্রামের উদ্দেশে সপ্তম নৌবহরের যাত্রা। আমার বিশ্বাস যদি কংগ্রেসে ব্যাপারটা ফাঁস না হয়ে যেত তাহলে হয়ত বা সত্যি সত্যি নৌবহর চট্টগ্রামের নিকট এসে যেত।

এ সময় আমরা সবাই ঢাকার অবস্থা নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত ছিলাম। কংগ্রেস সদস্য কোরম্যান কর্তৃক আয়োজিত একটি ভোজসভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। সেখানে এশিয়ার ব্যাপার নিয়ে গবেষণারত মার্কিন বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশ হয়। সেদিন আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল নতুন বাংলাদেশ কেমন হবে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ও অত্যাচারে নিপীড়িত জাতিকে কিঅবস্থায় আমরা পাব আর কি করে এর পুনর্বাসন করা যাবে। ১৬ তারিখ দেশ স্বাধীন হলো এবং ১৮ তারিখে জানতে পারলাম বাংলাদেশের বহু বুদ্ধিজীবীকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। সেদিন আমি ইয়েলে গিয়েছিলাম, অধ্যাপক নুরুল ইসলামকে ঢাকার পথে বিদায় দিতে।

বোস্টনে একদল বাংগালী মার্কিন বন্ধুদের সহায়তায় স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিক রূপরেখা প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন অক্টোবরের দিকে। মহিউদ্দিন আলমগীর, হারুনর রশিদ, ভুঁইয়া, মতিলাল পাল এরা এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেন। অধ্যাপক ডর্ফম্যান ও হার্ভার্ড পপুলেশন সেণ্টার এবং অধ্যাপক নুরুল ইসলাম এই উদ্যোগের সংগে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। বিশ্ব ব্যাঙ্কে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন এ কাজে আমাদের সাহায্যে আসে। মার্চ মাসেই বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্বন্ধে আমি একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছিলাম। ইস্ট পাকিস্থান পরিকল্পনা বিভাগের তৈরি পুনর্গঠন পরিকল্পনাও আমাদের হাতে আসে। এই সবের ওপর ভিত্তি করে আমরা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করি। অধ্যাপক নুরুল ইসলাম এই খসড়া নিয়ে বাংলাদেশের পথে পাড়ি দেন দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই।

মুজিব নগর থেকে মন্ত্রিপরিষদ সচিব তওফিক ইমামের কাছ থেকে সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ পরিকল্পনা বোর্ড স্থাপনের খবর পাই। বোর্ডে যোগদানের জন্য অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, আনিসুর রহমান ও হারুনুর রশীদের প্রতি আহবানও আসে। এই প্রসংগে খাদ্য ও দুর্ভিক্ষের ওপর সিনেটের রিফিউজী সাব কমিটির জন্য আমাকে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হয়। এই সাব কমিটির জন্য পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধেও আরেকটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করি ডিসেম্বরে। ঐ মাসে বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো সম্বন্ধেও একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করার সুযোগ আমার হয়। এ সব কাজে বিশ্বব্যাঙ্ক এবং ইউ, এস, এইডের কর্মকর্তাদের সাহায্য ও হারুনুর রশীদের সর্বক্ষণিক সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ করছি। মোটামুটিভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য নানা ধরণের প্রস্তুতির প্রয়োজন আমরা বিদেশে থেকেও অনুভব করি আর তার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা নিই।

আব্দুল মুহিত
৩০ জানুয়ারী, ১৯৮৪

এম আর সিদ্দিকী

It was 1st March, 1971. News came on the Radio that the elected National Assembly will not meet. Sheikh Mujibur Rahman was in a meeting in Hotel Purbani. He was enraged. He came out and declared hartal on 2nd for Dhaka and on 3rd for the rest of the country. A meeting was called for 7th March at Race Course Maidan. He declared that there will be no co-operation with the Government. No one will pay any taxes and duties. No bank will pay out any fund without clearance from local Awami League Chief. The struggle began.

In Chittagong I was the president of District Awami League. Soon an Action Council (Sangram Parishad) was formed and I was elected Chairman of the Action Council. All non-Bengali firms had to take clearance from me to draw money from the bank. Even the Army Officers' family needed permission from us to leave East Pakistan. Bengalees got very agitated and started demonstrating by processions and slogans. In Chittagong there is a large Bihari community living in the Railway colony While a procession was passing by the Bihari colony they were attacked with lathis, swords and gu s. Each Bihari family was supplied with guns by pakistani authorities which was not known to the Bengali residents. Many Bengalees were injured and killed. Riots broke out between the Biharis and Bengalees. Riots got worse every day. Army was deputed in the area. The contingent was headed by Col. Chowdhury, an East Pakistani who apparently tried to protect the Bengalees They were soon removed and replaced by a West Pakistani contingent who started siding with the non-Bengalees. Armed forces set up Head quarters at the Government Circuit House. The Navy joined forces.

When a lot of Bengalees dead and wounded were being brought in from Pahartali area to Medical College Hospital I went personally to the Circuit House seeking their protection. They assured help. When I asked for a lift to my house they put me in a Navy truck which was heading straight to Bihari colony. I was sure they were going to hand me over to the Biharis to be killed. I told them to stop but they would not listen. At one point another military truck was coming from the opposite direction. When they slowed down to exchange information, I seized the opportunity and jumped out of the truck to safety.

Situation in Dhaka and rest of Bangladesh was worsening everyday and was getting more and more tense. Non co-operation with the Government was more or less complete and universal. A kind of parallel Government came to be functioning.

Meantime President Yahya Khan proposed a dialogue with Awami League and flew into Dhaka on 15th with all military colleagues and leading political leaders of West Pakistan like late Zulfiqar Ali Bhutto. While the dialogue went on they started flying in Army personal by plane load in civilian clothes and by ships.

In Chittagong Major Rafique then Capt. of the EPR contacted us and convyed that the entire EPR Officers and Jawans will be with us. He undertook to contact his counterparts in Rangamati, Kaptai, Cox's Bazar and arrange for their joining the fight as soon as the signal is given to them.

In the Cantonment Brigadier Mazumdar was in charge. He sent Captain Amin Ahmed Chowdhury to be in touch with us every night and pledged their support. The then D. C. Mustafizur Rahman and SP ..... of Chittagong also pledged their support. The S. P. was later killed by Pak Army for Collaboration with Awami League.

One Ship M. V. 'Swat" carrying arms, ammunition, explosives and soldiers arrived Chittagong. Being alerted Awami League Action Committee urged the port workers not to unload the ship. Army tried to force the workers at gun point but without success They asked the EPR Jawans to shoot which they refused. Then the Army shot 7 EPR Jawans on the spot. Then they ordered the Army in the Cantonment to clear the ship. Brig. Mazumdar asked for advice as to what he should do. I could not take a decision as refusal to obey would amount to mutiny and open confrontation with Pak Army. I straightway drove to Dhaka on 23rd march for consultation with Bangabandhu and for his instruction. I met him in his house. He said he was hoping there will be a satisfactory conclusion of the dialogue and he does not think there will be a war as long as Yahya was there as president I told him that war has started in Chitttagong and I see all preparation for a full scale attack. He asked me to hurry back to Chittagong to mobilise all forces there and defend Chittagong. In case of an attack he will escape to Chittagong and join us in the fight. I enquired when to give the green signal to Army, EPR, police and civil administration He was not sure. Col. Osmani was called in for consultation and he suggested that when the Radio stops broadcasting we should take that as the zero hour. But I said that could happen due to power failure. Then he asid when they try to disarm Bengalees we should take that the war has started and resist. However I rushed back to Chittagong but too late. Brig. Mazumdar and Capt. Amin by that time was lifted by helicopter and brought to Dhaka. Chittagong Cantonment was placed in command of a non-Bengalee Officer.

The Army unloaded the arms from 'Swat' and tried to take them to the Cantonment but people blocked their way every inch by road blocks. Firing took place but the Army was forced to store the arms in the Halishahar transit camp.

Twenyfifth situation was very tense in Chittagong. We did not know what was happening In Dhaka. At around 7-00 p. m. I managed to contact Sheikh Shaheb through his neighbour Mr. Mosharaff Hossain and Mr. Naeem Gouhar. He asked them to tell me that talks had failed. Ask Army, EPR and police not to surrender arms and give a call to people to give resistance. After this all communication with Dhaka was cut off.

The Sangram parishad discussed the situation and decided to go into hiding and go into action On 26th morning at about 6-30 a. m. my wife Latifa received a phone call from Mr. Moinul Alam (Ittefaq Correspondent in Chittagong) who gave her a message from Bangabandhu received through wirless operators of Chittagong The message read "Message to the people of Bangladesh and to the people of the world. Rajarbagh police camp and peelkhana FPR suddenly attacked by Pak Army at 24 -OO hours. Thousands of people killed. Fierce fighting going on. Appeal to the world for help in our freedom struggle Resist by all your means. May Allah be with you. Joy Bangla. Message from Sheikh Mujibur Rahman". This message was passed on to me immediately. The Sangram parishad immediately discussed the message and decided to annource the appeal over the radio. By this time the radio station at Agrabad was already inaccessible becuse of the presence of Pak Army. We Collected Mr. Belal Chowdhury Mr. Sultan Ali and other staff of Radio Pakistan Chittagong who suggested broadcasting the message from the Kalurghat relay station. A draft of the announcement was made in Bengali by Dr. Abu jafar and others and it was decided that Mr. M. A. Hannan, General Sctretary of District Awami League would read out the announcement. Accordingly on 26th March at 2-30 p.m. Mr. Hannan read out the historical announcement in the name of Sheikh which is known as the Declartion of Independence. Based on this later Bangladesh Government decided to observe 26th as the National Day. Major Zia and his troops were placed to guard the kalurghat Radio Station. Next day on 27-th March Zia went on the air and declared himslf the President and gave a call for freedom fight. This confused the Awami Leaguers and the public. Mr A. K. Khan who heard the news said that it will be interpreted as an Army coup and there will be no support nationally or internationally. He made out a rew draft in English. Major Zia realised the

mistake and read out the new draft saying Sheikh Mujibur Rahman was the president and the call was on his behalf.

Full scale fight started. Army tank was brought out but people created road blocks, put fire on the tarmac forcing the army to abandon the tank and retreat into the Cantonment. Inside the Cantonment Beluch Regiment killed Col. M.R. Chowdhury and nearly two third of Bengalee Officers and Jawans. Some of the men and Officers escaped with their arms through the hills. The Eighth Bengali Regiment which was stationed at CDA market was ordered to leave for Karachi. Major Ziaur Rahman along with other Bengali Officers conferred and killed the non-Bengali Colonel and joined the liberation forces. The Awami League organised an attack of the Cantonment under the leadership of Major Zia. EPR police and Awami League volunteers along with about 400 mercenary forces of Arakan Raja totalled about 2,000. The attack did not take place.

On 27th March Pakistan Government Sent a big column from Comilla to join the beseized army in Chittagong Cantonmant. We received the information through the telephone system of the Railway Stations. With the help of Noakhali Awami League we immediately built up road blocks all the way, the biggest one being at Shovapur bridge where we blew up part of the bridge. However, the column proceeded slowly removing the road blocks. The deserting EBR forces and EPR volunteered to intercept and ambush this column at Kumira. Under the leadership of Capt. Bhuyan & Capt. Rafiq we arranged for food and other necessities. The ambush did take place forcing the column to abandon all the vehicles and the survivors running into the hills for safety. They lost a senior Officer of the Pak Army. Our forces then proceeded north and came in control of the road upto Feni River.

The liberation forces took position in different parts of the city preventing the enemies progressing from Chittagong Airport and Comilla side. They were fighting for every inch of the land. Then the Navy and Airforce joined in. The Navy shelled from the sea and PAF started strafing and bombing our strongholds and bazars. Our boys started retreating through the hill tracts towards the border of India but fighting all the way.

I was approached by Major Zia to collect ammunitions from India without which they could not continue the fight. With the help of some Hindu friends who knew the border well I managed to cross the border at Sabrum on 30th March alohg with Mr. Jahur Ahmed Chowdhury, Mr. Ataur Rahman Khan and Mr. Abdullah Al-Haroon. We were received well by the Indian border Police, was given food and then taken to

Agartala to their chief. I was asked various questions and pointed out certain positions on the map of Chittagong. I identified them as being our troop concentrations. Then he told me that they intercepted Pak Army instructions to bomb these places. Later we came to know that these places were bombed on that day. On my request for ammunitions they arranged some supplies but said I must contact the Government at Delhi and get their clearance.

A large number of MNAs, MPAs arrived Agartala from Chittagong, Noakhali and Comilla. They all pressed me to form a Provisional Government so that we could officially negotiate with the Government of India. But I refused as none of the Senior Leaders like Syed Nazrul Islam, Khondakar Mushtaque, Tajuddin Ahmed, Kamruzzaman, Mansur Ali etc. have arrived yet. It was their prerogative to form a Government in the absence of Sheikh Mujibur Rahman.

I was then taken to the Chief Minister of Tripura, Mr. Sachindra Singha. He immediately talked to Mrs. Gandhi on phone. After discussion he suggested that I should go to New Delhi for talks. That day Dr. Anisur Rahman and prof. Rahman Sobhan reached Agartala. I requested them also to accompany So passage was arranged for us under assumed Hindu names. After we arrived Delhi I was taken to a house where Officers from Home and Foreign Ministry and also Dr. Triguna Sen, ex-Education Minister and others met me. An appointment was made with the Prime Minister for the following. In the evening I was told another leader from Bangladesh has arrived there. To my pleasure and relief I found Mr. Tajuddin accompanied by Barrister Amirul Islam. I talked to them for a while and requested Mr. Tajuddin to meet the Prime Minister so that I could fly back to the front to our forces next morning which I did.

Few days later M/s. Tajuddin and Amirul Islam arrived Agartala. By that time Syed Nazrul Islam and Khondakar Mushtaque Ahmed also arrived Agartala. The question of forming a Government was then taken up seriously. We expected that Syed Nazrul Islam, being next to Sheikh Mujib as 1st Vice-President, will head the Government as Prime Minister but Mr. Tajuddin said he had already told Mrs. Gandhi that he was the Prime Minister and our creditability will be gone if we change it. Khandakar Mushtaque Ahmed did not agree and most of MNAs also disagreed. As a result a deadlock arose.

All morning went. Everybody was getting impatient. At that point I went to Syed Nazrul Islam and asked what was his final stand. He said

when Mr. Tajuddin wants to be Prime Minister let him be in the interest of the movement. I have no personal ambition. It was decided that they will all go back to Calcutta and have the Cabinet announced there and then come back to Agartala.

Meantime thousands of refugees started arriving Agartala. They had to be identified, provided accommodation and food. We were given a room to set up an office which came to be known as "Joy Bangla" Office. We started registering all refugees and giving them identity cards. Camps were being set up all around Agartala. An MNA or MPA was put in charge of each camp. Rations were arranged. While doing these the uppermost anxiety in our mind was how to fight back the Pakistani and with the war. Col. M A G Osmani, being the Seniormost retired Army Officer was put in charge of the liberation Army. The whole front was divided into Sectors and one Major was made the Sector Commander. Major Dutta in Sylhet Sector, Major Zia in Chittagong Sector, Major Khaled Mosharraf in Comilla Sector and Major Shafiullah in Mymensingh Sector in the Eastern Zone. While they were all engaged in fighting in the front we were responsible for providing them with rations, tents and arms.

It was felt that if we have to win the war we must build up a 'Mukti Bahini' in addition to our regular Army. Plans were drawn up to train 1,00,000 youngmen from the refugees to fight. Separate Youth Camps were soon set up and arrangements were made for trainers. While these arrangements were being negotiated with Indian Government we asked our Sector Commanders if they could start the training. Only Major Khaled Mosharraf volunteered to train the boys and also to share his ration with these boys until their ration was arranged. It was this first batch of boys who were first sent inside the country as commandos.

In Agartala Mr. Mahbub Alam Chashi and Mr. Taheruddin Thakur were assisting me full time. In the Office Mr. Taufiq Imam, C S P was made the Secretary General. He was D. C. Rangamati but joined liberation struggle and came over to Agartala with us. A kind of regular civilian Government in exile was functioning.

Sadhin Bangla Betar Kendra

Bengali Officers of Radio Pakistan while fleeing to India took with them one 5-Kilowatt Transmitter. This was set up in Agartala started functioning as Sadhin Bangla Betar. Prof. Mohd. Khaled, MNA, was put in charge of developing programmes for the broadcast. Since the transmitter was not powerful enough to cover all parts of Bangladesh, we requested the Indian Government to lend us a more powerful transmitter. Event-

ually a 50-Kilowatt Transmitter was arranged but was set up in Calcutta. So the broadcast shifted from Agartala to Calcutta.

After installation of the Cabinet I went to Calcutta and found that things were not quite organised. I suggested to Syed Nazrul Islam, Mr. Tajuddin and Khondakar Mushtaque Ahmed that they should set up regular office like a Government. They said they do not have anybody there to help them. I promised to help with Officers from Agartala. The Foreign Minister's Office was then set up on the first floor of Deputy High Commission and Mr. Mahbub Alam was posted there as Foreign Secretary. I sent Mr. Taufiq Imam to be Cabinet Secretery to Mr. Tajuddin and Mr. Asaduzzaman was appointed as Finance Secretary.

I was made "In Charge" of the Eastern Zone and I was given a seal of "Ganaprojatantri Bangladesh Sarkar" with authority to operate all bank accounts .. d other funds. Mr. Chashi started contacting all Bengali Officers in Pakistan Embassics asking them to defect and join the exile Government. There was instant response and a large contingent of senior officers in the Washington Embassy was ready to defect. I was then requested by the then Foreign Minister to take over as the first Ambassador of the exile Government to USA aud Canada. I left for USA in july, 1971. We took a floor in an office block on Connecticut Avenue which was the first Embassy of the Government of Bangladesh. I was not officially recognised as an Ambassador as they did not recognise Bangladesh but I was allowed to register as a Head of Mission so that I could carry on the Political lobbying legally. Although the Government of the United States was a friend of the Government of Pakistan we received tremendous support in the US Press, Congress, senate, Universities and general public because of the righteousness of our cause and because of the universal disapproval of the genocide carried out by Pakistan forces. Some Americans who lived in Bangladesh formed themselves into a group and set up in Washington. "The Bangladesh Information Centre". Mention must be made of Dr. Greenough, Dr. David Nalin, Tom Dine, Anna Taylor. Among the Politicians Senator Church, Senator kennedy, Senator percy, Senator S be, Congressman Gallagher took up our cause as a crusade and their offices became our eampaign centres. It was the Saxbe-Church amendment which stopped military aid to Pakistan.

Bengalees in every city in USA formed themselves into an Association and started helping our cause by all possible means including raising of funds. Mention here must be made of Mr. F.R. Khan, the famous Architect, who was the president of Bangladesh Foundation in Chicago. In the Emb-

assy, Minister Enayet Karim, Counsellor Kibria, Economic Counsellor Muhith and press Counsellor Abu Rushd Matinuddin and syed Moazzem Ali all engaged in extensive lobbying as in an election campaign Shunning all official diplomatic protocals.

Came 16th December, 1971. Pakistani forces surrendered. Bangladesh became free of enemy occupation. We got worried about the fate of Sheikh. Finally on lst Jauary, 1972 he telephoned me there. I could not accompany him but returned a few days later. Breath of freedom was in the air and it felt like a new life again.

It was a memorable event meeting Bangabandhu who welcomed me with his warm embrace. Later I was asked to join his cabinet as Minister for commerce and Foreign Trade.

M. R. Siddiqi
March, 1984

এম এ হান্নান

দেশের অন্যান্য স্থানের মত চট্টগ্রামেও ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের দিনগুলোতে অসহযোগ আন্দোলন চলে। ৩রা মার্চ পাহাড়তলী এলাকার শরৈহপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব খলিল উল্লাহ সওদাগরের নেতৃত্বে ছাত্র শ্রমিক ও জনগণের একটি মিছিল পাহাড়তলী অয়ারলেস কলোনী সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে জয়বাংলা ধ্বনিসহ প্রদক্ষিণ করার সময় রেলওয়ের বিহারী শ্রমিকরা আধুনিক অস্ত্র দ্বারা অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে এবং অয়ারলেস কলোনী ও ফিরোজ শাহ কলোনীতে বাঙালীদের বাড়ী ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। পাঞ্জাবী সৈন্যরা ছদ্মবেশে বিহারীদেরকে সাহায্য করে। হামলায় মিছিলকারীদের মধ্যে কয়েকজন আহত হয় এবং কয়েকজনের মৃত্যু ঘটে।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমান ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও খন্দকার মোস্তাক আহমদকে চট্টগ্রামে পাঠান। তাঁরা উক্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখেন এবং আহত ও শহীদ পরিবারবর্গকে কিছু নগদ অর্থ প্রদান করেন।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় চট্টগ্রাম জেলায় পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।

এম, আর সিদ্দিকী ও জহুর আহমদ চৌধুরী যুগ্ম আহবায়ক; এম, এ, হান্নান, এম, এ মান্নান এবং অধ্যাপক মোঃ খালেদ সদস্য ছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে অর্থাৎ ২৫শে মার্চ পর্যন্ত সমগ্র চট্টগ্রাম জেলায় সরকারী, বেসরকারী অফিস আদালত ও স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকে। এ

সময় জেলা সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে চট্টগ্রাম জেলায় সকল মহকুমা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। সংগ্রাম কমিটির মাধ্যমে অবসর-প্রাপ্ত সামরিক অফিসার, জোয়ান ও আনসারদিগকে একত্রিত করা হয় এবং বেশ কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ জোগাড় করা হয়।

২৪শে মার্চ চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টে অবস্থান রত 'সোয়াত' জাহাজ হতে সকাল ৮ ঘটিকার সময় পাক-সামরিক জোয়ানরা অস্ত্র-পাতি ও গোলাবারুদ নামানোর কাজ শুরু করে। আমি এম, এ, হালিমের কাছ থেকে এ সংবাদ পাই। সংবাদ পাওয়ার পর আমি নিউ মোরিং পোর্টে চলে যাই। পরে টিম ট্রাফিক ম্যানেজার গোলাম কিবরিয়া, তৎকালীন পুলিশ সুপার ও ডেপুটি কমিশনারের সাথে অস্ত্র না উঠানোর ব্যাপারে আলাপ করি কিন্তু তারা তাদের অপারগতার কথা জানান। তবে পোর্ট ট্রাস্টের শ্রমিক নেতা নবী মিস্ত্রী ও চিটাগাং স্টীল মিলের ম্যানেজার জাহেদ সাহেব অস্ত্র ও গোলা বারুদ নামানোর ব্যাপারে বাধা দেয়া ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সার্বিক সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। তাৎক্ষণিকভাবে নবী মিস্ত্রী মাইক দ্বারা শ্রমিক ও যুবকদের যার যা আছে তা নিয়ে নিউ মোরিং পোর্ট ঘেরাও করার আহবানের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক হাজার ছাত্র, শ্রমিক জনতা নিউ মোরিং পোর্ট ঘেরাও করে ফেলে। পাক-বাহিনীও বাধা দেয়ার জন্য কামান ও মেশিন গান তাক করে রাখে। বিকেলে অবস্থা বেগতিক দেখে ফায়ার ব্রিগেড ময়দানে উত্তেজিত জনতাকে নিয়ে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। উক্ত জনসভায় সালেহ আহমদ (এম, এন, এ), মোশারফ হোসেন (এম, পি, এ), এম, এ মজিদ (এম,এন,এ) বক্তৃতা করেন। আমি সভাপতির ভাষণ দেই। সেখানে উত্তেজিত জনতাকে চট্টগ্রাম সেনানিবাস হতে পোর্ট ট্রাস্ট পর্যন্ত পথে বেরিকেড সৃষ্টি করার আহবান জানানো হয়। অল্প কয়েক ঘন্টার মধ্যে কয়েক হাজার লোক শহরের ও শহরতলীর সকল পথে বেরিকেড সৃষ্টি করে। উদ্দেশ্য হলো যে পাক-বাহিনী কোন অবস্থাতেই যেন অস্ত্র বা গোলাবারুদ ভর্তি ট্রাক বা গাড়ি সেনানিবাসে নিয়ে যেতে না পারে। এ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি ২৪শে মার্চ রাত্রে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে টেলিফোনের মাধ্যমে জানাই। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পাক হানাদার বাহিনী গুলিবর্ষণ করে। গুলিবর্ষণে প্রায় ৩০ জনের মৃত্যু ঘটে। ২৪শে মার্চ রাত্রে পাক বাহিনী বেরিকেড ভাঙ্গতে সমর্থ হয় এবং অস্ত্র বোঝাই ট্রাক নিয়ে সেনা নিবাসের দিকে অগ্রসর হয়।

২৫শে মার্চ চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ ও জেলা সংগ্রাম পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে কুমিল্লা সেনা নিবাস হতে একটি আর্মি কনভয় (Army Convoy) চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এ সংবাদ পেয়ে মিরের শরাই থানার এম, পি, এ জনাব মোশাররফ হোসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের সুভপুর সেতু নষ্ট করে দেয়ার জন্য পাঠানো হলো। কিন্তু কোন Explosive না থাকায় এ প্রচেষ্টা আংশিক ভাবে সফল হয় মাত্র।

২৫শে মার্চ রাত্রে আবার আমরা এম আর সিদ্দিকী সাহেবের বাড়ীতে চট্টগ্রামের সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মিলিত হই। রাত ১০টার সময় শেখ মুজিবুর রহমান এম, আর, সিদ্দিকী সাহেবের নিকট একটি জরুরী সংবাদ দেন। সংবাদটির মূল বিষয়বস্তু ছিল পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

তারপর, আমি ও সভার সকল সদস্যবৃন্দ ডেপুটি কমিশনার সাহেবের বাংলোতে আসি এবং বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রেরিত সংবাদের কথাও বলি। কিন্তু ডেপুটি কমিশনার বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করেন। সেখানে পুলিশ সুপার শামসুল হক সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর আন্তরিকতা ও সহানুভূতি প্রকাশ করলেন।

ডেপুটি কমিশনার হতে সাড়া না পেয়ে আমরা সংগ্রাম পরিষদের সদস্যগণ স্টেশন রোডস্থ রেস্ট হাউসে আসি এবং স্থির করা হয় যে প্রতিরোধ আন্দোলন-কে বাস্তবায়িত করার জন্য কয়েকজন সদস্য সমন্বয়ে এক একটি ইউনিট তৈরী করে শহরের বিভিন্ন স্থানে দায়িত্ব বণ্টন করে দেয়া হবে। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তৎক্ষনাৎ প্রত্যেক সদস্য স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হন।

রেস্ট হাউস থেকে আমরা ই, পি, আর হেড কোয়ার্টারে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। তৎকালীন ই, পি, আর অফিসের হেড ক্লার্কের সাথে আমাদের টেলিফোনে আলাপ হয়। তাকে জরুরী সংবাদ ও সার্বিক পরিস্থিতি সর্ম্পকে একটি ধারণা দেই। তার মাধ্যমে ক্যাপ্টেন রফিক-কেও সংবাদ ও সার্বিক পরিস্থিতি সর্ম্পকে অবগতি করানোর জন্য বলা হয়।

কাপ্তাই ই. পি, আর শাখাতেও টেলিফোনে যোগাযোগ করা হয়। ক্যাপ্টেন হারুন তার পরদিন সকালেই সমস্ত শাখার জোয়ানদিগকে নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে ক্যাপ্টেন রফিকের সাথে এসে মিলিত হবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি সকালে আসিয়া কালুর ঘাটে পৌঁছেন।

২৫শে মার্চ গভীর রাত্রে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট হতে টেলিফোনে আওয়ামী লীগ অফিসে বলা হয় সেনানিবাসের চার পাশে বেশ কিছু ছাত্র-যুবক ও উৎসাহী জনতাকে পাঠানোর জন্য। সংবাদ পাওয়া মাত্র মাইক যোগে সকলকে অবহিত করা হয়।

২৬শে মার্চ খুব সকালে আমি আতাউর রহমান কায়ছার ও এম, এ, মান্নান সহ সেনানিবাসের দিকে যাই। পথিমধ্যে পাঁচলাইশ থানার সম্মুখে বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ানদিগকে দেখতে পাই। উক্ত রেজিমেন্টের অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমান তার কোম্পানী নিয়ে কালুর ঘাটের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। এখানে আমরা জানতে পারি যে সেনানিবাসের E. B R. সেণ্টারে প্রশিক্ষণরত বাঙ্গালী

জোয়ানদিগকে রাত্রে পাক-বাহিনী হত্যা করেছে। আমরা কালুর ঘাটে যেয়ে জানতে পারলাম যে, জিয়াউর রহমান বোয়ালখালী থানার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। আমরা মেজর জিয়াউর রহমান কে বোয়ালখালী থানার কুসুমডাঙ্গা পাহাড়ের নিকট তাঁর জোয়ানদের সহ দেখতে পাই; তাঁকে শহরের বর্তমান অবস্থা সর্ম্পকে জানাই এবং শহর সংলগ্ন এলাকায় শিবির স্থাপন করার জন্য অনুরোধ জানাই। তবে ২৭শে মার্চ তিনি কালুর ঘাট আসবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কাপ্তাই হতে আগত ক্যাপ্টেন হারুন ও ১৫০ জন ই, পি, আর মেজর জিয়াউর রহমানের সাথে একত্রিত হন।

কালুর ঘাট হতে চলে আসার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে রেডিও মারফতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার কথা প্রচার করতে হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৬শে মার্চ কালুর ঘাট ট্রান্সমিটার সেণ্টার হতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করি। প্রচারে আমাকে সহযোগিতা করেন রেডিও অফিসের রাখাল চন্দ্র বণিক মীর্জা আবু মনসুর, আতাউর রহমান কায়সার ও মোশাররফ হোসেন প্রমুখ এম, পি, এ ও এম, এন, এ গণ।

২৭শে মার্চ বিকালে মেজর জিয়াউর রহমানও রেডিও মারফত স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার পর ঘোষণার বক্তব্য নিয়ে জনমনে কিছুটা বিভ্রান্তি দেখা দেয়। তাই সেদিন রাত্রে আমি মীর্জা আবু মনসুর ও মোশারফ হোসেন ফটিকছড়িতে অবস্থানরত প্রাক্তন মন্ত্রী এ, কে, খাঁন সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি। পুণঃ ঘোষণার জন্য তিনি একটি খসড়া করে দেন। আমরা ফটিকছড়ি হতে কালুরঘাট ট্রান্সমিটার সেণ্টারে উপস্থিত হই। সেখানে মেজর জিয়াউর রহমানের নিকট আমি এ, কে, খান কর্তৃক লিখিত খসড়াটি দেই। পুনরায় ২৮শে মার্চ সকালে বঙ্গ-বন্ধুর পক্ষে মেজর জিয়াউর রহমান সর্বাধিনায়ক হিসেবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

২৮শে মার্চ বিকালে মেজর জিয়া তৎকালীন মেজর মীর শওকত ও অন্যান্য ব্যক্তি বর্গের সাথে সম্মুখযুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে আলোচনা করেন। সেদিন রাত্রে চট্টগ্রাম নৌঘাঁটি আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি ১০ খানা ট্রাক ও বাস যোগাড় করি এবং সন্ধ্যার দিকে সেগুলি হস্তান্তর করি। পরিকল্পনা মোতা-বেক তৎকালীন ফুলতলী বাংলা বাহিনী হেড কোয়ার্টার হতে বাংলা বাহিনীর জোয়ানগণ মীর শওকতের নেতৃত্বে রাত্রে কালুরঘাটে পৌছেন।

এখানে মীর শওকত আক্রমণ পরিকল্পনা নিয়ে জিয়ার সাথে পরামর্শ করেন এবং উভয়ই ফুলতলী হেড কোয়ার্টারে চলে যান। সেদিন নৌ-ঘাটি আক্রমণ করা যায়নি। পরের দিন ২৯শে মার্চ সকালে ফুলতলী বাংলা বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে গেলাম। মীর শওকত ও মেজর জিয়াউর রহমানকে সেখানে পাওয়া গেল না। জানতে পারলাম

এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে তাঁরা কক্সবাজার চলে গেছেন। এসময় তাঁদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল।

৩০শে মার্চ পাক-বাহিনী কালুরঘাট রেডিও ট্রান্সমিটার সেন্টার লক্ষ্য করে বিমান হামলা করে। সেখানে সুবেদার ছাবেদ আলী তাঁর প্লাটুন নিয়ে অবস্থান করছিলেন। বিমান হামলার পর শহরের বাংলা বাহিনীর জোয়ানগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। চট্টগ্রাম শহরে ই, পি, আর প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে। চক বাজারে ক্যাপ্টেন হারুন, ও লেঃ শমসের মবিন চৌধুরী তাঁদের প্লাটুন নিয়ে যুদ্ধ করেন। শমসের মবিন ও ক্যাপ্টেন হারুন চকবাজার ও কালুরঘাট যুদ্ধে আহত হন। অবশ্য পাক বাহিনী শমসের মবিনকে ধরে ফেলে। এ ভাবে পর পর কালুরঘাট, নয়াপাড়া, কাপ্তাই পাক-বাহিনীর কবলে চলে যায়। কিন্তু রামগড় বাগান বাড়ী, খাগড়াছড়ি, চিকন ছড়া, আমাদের দখলে ছিল। ২রা মে পাক-বাহিনীর তীব্র আক্রমণে রামগড়ও পাক বাহিনীর কবলে চলে যায়। বাংলা বাহিনীর সকল জোয়ান ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাবরুমে আশ্রয় নেয়। কয়েকদিনের মধ্যে হরিণা নামক স্থানে জোয়ানদের জন্য শিবির স্থাপন করা হয়। এখানে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও স্থাপন করা হয়। জুন মাসে হরিণা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ক্যাম্প প্রধানের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হয়। দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত আমি উক্ত শিবিরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। তাছাড়া পূর্বাঞ্চলীয় বে-সামরিক বিষয়াদি এবং সামরিক বাহিনীর লিয়াজো অফিসার হিসেবেও নিজ দায়িত্ব পালন করি।

এম, এ, হান্নান
(সভাপতি, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ)
২৭ আগস্ট, ১৯৭৩

ওয়াহিদুল হক

১৯৭১ সালের আন্দোলন হঠাৎ করে হয়নি। এর পেছনে সংগ্রাম ও চেতনার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এই ইতিহাসের সাথে সবাই পরিচিত। তবে আমার বিশ্বাস যে, সাংস্কৃতিক আন্দোলন এই চেতনা প্রবাহের ধারাকে এগিয়ে নিয়েছে সবচেয়ে বেশী এবং সাংস্কৃতিক কর্মীরা সবসময়ে এই আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে রাজনৈতিক কর্মীদের সাথে। নিজেদের বৃত্তে এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকেনি এবং এর চরিত্রও কেবলমাত্র কলা-ক্রিয়ার মধ্যে সীমিত ছিল না।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শত বার্ষিকী উপলক্ষে যে সব সভা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তার মূল সুর ছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা। স্বাভাবিক কারণেই পাকিস্তান সরকার এর বিরোধিতা করে। কিন্তু যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা

এই উৎসাহ উদ্‌যাপনে সৃস্টি হয় তা থামিয়ে রাখার মত শক্তি কারও ছিল না। এই উদ্‌যাপনের সরাসরি ফসল হচ্ছে 'ছায়ানট' যা পরে আমাদের গভীরতম বিশ্বাস ও মূল্যবোধ প্রসারের অন্যতম কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। অতএব বাঙালী-দের রাজনীতি সব সময় তার সংস্কৃতির ওপর নির্ভর করেছে। হয়ত বা অন্য যে কোন দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়েও।

১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর খবর আসে যে মহাপ্রলয় হয়েছে তখন প্রথমে খুব একটি কাউকে নাড়া দেয়নি। ঐই সময় আমরা কয়েকজন খবরের ভাষা থেকে বুঝি যে ওখানটায় একটা কিছু ঘটেছে। তাড়াহুড়ো করে 'দুর্যোগ নিরোধ কমিটি' গঠন করে নগ্ন পদযাত্রা শুরু করি রাস্তায় "ভিক্ষা দাওগো পুরবাসী" গানটা গেয়ে। আমরা তখনকার দিনেই প্রায় ৫০ হাজার টাকা ওঠান। এর মধ্যে দুর্যোগের ব্যাপকতার খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দুর্যোগবাসীদের সাহায্য করার জন্য আমরা ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাতেই কাজ করতাম। জায়গার নাম ছিল চর কাজল (রায় পুরা)। ৭ই মার্চ সেখানে ছিলাম। পরে ঢাকায় ফিরে এসে দেখি অবস্থা খুবই খারাপ খাদও কত খারাপ তা ধারণা করিনি।

পঁচিশে রাতে আমি আমার সংবাদপত্র অফিসেই ছিলাম। সারারাত ধরে শুধু আওয়াজ শুনেছি। ২৬ তারিখে বের হওয়া যায়নি। অতএব ২৭ তারিখে আমরা অফিস ত্যাগ করতে সর্মথ হই।

আমার গাড়ীতে করে আমরা প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই এবং বন্ধু-বান্ধবদের খবর নেই। কাউকে পাই, কাউকে পাইনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা দেখে আমি আমার সিদ্ধান্ত ঠিক করে ফেলি। ডঃ সরওয়ারের মাধ্যমে আমি কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যোগাযোগ করি এবং তাকে বলি এই মূহর্তে কি কাজ হওয়া উচিৎ তা যেন সবাইকে জানিয়ে দেয়া যায়। এর পর আমি জনাব রেজা আলীর (বিটিভী) সাথে যোগাযোগ করি। তিনি ছিলেন একটি রাইফেল ক্লাবের সদস্য। আমি তাকে বলি তার কাছে যা আছে তা আমাকে দেবার জন্য। রেজা আলী আমাকে ১২টা রাইফেল দেন। আমি এই অস্ত্র নিয়ে সাভার চলে যাই এবং দেওয়ান ইদ্রিসের কাছে দিই। তিনি ছিলেন উক্ত এলাকার একজন নেতা। ২৭ তারিখে আমার স্ত্রীকেও সেখানে দিয়ে যাই এবং পরে ঢাকায় ফিরে আসি।

মির্জা সামাদ একজন প্রবীন কমিউনিস্ট নেতা। তার সাথে আমার আলাপ হয় পরিস্থিতি নিয়ে। আমি বলি যে এই মূহর্তে আমাদের উচিত আওয়ামী লীগকে সাহায্য করা, অস্ত্র সংগ্রহ করা এবং প্রয়োজনবোধে ভারতীয় সাহায্য নিয়ে পাক-সেনাদের পরাজিত করা। আমার মনে হয়েছিল রাজনৈতিক কারণেই ভারত আমাদের পক্ষে থাকবে।

২রা এপ্রিল কামাল সিদ্দিকী, কাজী ইকবাল এবং আবুল খায়ের লিটুকে নিয়ে গাড়ীতে করে আমরা রওয়ানা হই। পথে সাভার থেকে আমরা হাসান ইমামকে তুলে নিই। তাঁর পরিবারও সাভারে ছিল দেওয়ান ইদ্রিসের গৃহে।

আরিচা দিয়ে আমরা নৌকা পথে ঝিনাইদহ যাই এবং আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ্য করি যে নদীর ওপারে 'জয় বাংলার' পতাকা উড়ছে। সেখানে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমার সাথে থানা পুলিশ অফিসার মাহবুবের আলাপ হয়। সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন তৌফিক এলাহী চৌধুরী, কামাল সিদ্দিকী এবং আরো কয়েকজন। জানতে পারি কামাল সিদ্দিকী প্রায় ১০০ পাকিস্তানী সৈন্যকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছেন।

মেহেরপুর বর্ডারে বি, এস, এফ, সৈন্যদের সাথে দেখা হয়। আরও দেখা হয় কানাডীয় সাংবাদিকদের সাথে। তাঁরা আমার একটি সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন যা পরে বহু জায়গায় প্রচারিত হয়। বি. এস, এফ-এর সহায়তায় আমরা কলকাতায় পৌঁছাই।

কলকাতায় গিয়ে রাজনৈতিক নেতা মনসুর হাবিবের বাসায় উঠি। এর পর দেখা করি ভবানী সেন এবং ইন্দ্রজীত গুপ্তের সাথে। তাদের বোঝাবার চেষ্টা করি যে ভারতীয় সেনাবাহিনী যদি যশোর দখল করে নেয় এবং দুর্গ স্থাপন করতে পারে তবে আমরা নিজেরাই যুদ্ধ করতে পারবো। এর মধ্যে লক্ষ্য করি যে যারা বাংলাদেশ থেকে এসেছে তারা এখনও একত্রিত হয়নি যদিও 'কিড স্ট্রিট'-এর এম, পি হোস্টেলে অনেকেই জমায়েত হয়েছে। আমার সাথে আওয়ামী লীগা'র দের কোন যোগাযোগ ছিলনা অতএব আমি হাসান ইমামকে বলি তাদের সাথে যোগাযোগ করতে। তখন আমি সিদ্ধান্ত নেই যে ঢাকায় ফিরে গিয়ে আমার পরিবারকে নিয়ে আসবো। ২৭ এপ্রিল ঢাকা পৌঁছি। লক্ষ্য করি যে শহরের চেহারা একেবারে পাল্টে গেছে। চারিদিকে থমথমে ভাব। মানুষ হাঁটাচলা করছে সন্ত্রস্তভাবে। সবার সাথে পরিচয় পত্র। মাঝে মাঝেই বিভিন্ন বাড়ীতে হামলা হচ্ছে এবং মানুষদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং তাদের প্রায় কেউই ফিরছে না।

এরই মধ্যে পালাবার একটা রুট মোটামুটি সৃষ্টি হয়েছে। শিবের বাজার হয়ে সোনাইমুড়ি দিয়ে বর্ডার পর্যন্ত যাওয়া যায়। অটো রিক্সা দিয়ে আমরা কয়েকজন এভাবে আবার সীমান্ত পার হলাম। কিড স্ট্রীট তখন বেশ লোকারণ্য। অমিতাভ দাশগুপ্ত (ভারতীয় বাম-পন্থী নেতা) এদের সাথে যেগোযোগ রাখতেন এবং তিনি চেষ্টা করেন আমাকে এদের সাথে কাজ করার সুযোগ করে দিতে কিন্তু তা সম্ভব হয়ে উঠেনা যেহেতু জানা যায় আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কারও প্রবেশাধিকার নাই।

এরপর মৈত্রী দেবীর সাথে যোগাযোগ হয়। তিনি এই পর্য্যায়ে বিরাট ভূমিকা পালন করেন। জানা যায় যে একটি বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। তাঁরই উদ্যোগে প্যাড ছাপানো হয়। স্ট্যাম্প ইত্যাদিও প্রস্তুত করা হয়। আরও খবর পাওয়া যায় যে বি, এস, এফ এর মাধ্যমে একটি বেতার ট্রান্সমিটারও পাওয়া যাবে।

এপ্রিলের শেষের দিকে খবর আসে যে 'জয় বাংলা' নামে একটা পত্রিকা বার হচ্ছে। এর অফিস বালু হাক-কাক লেনে। এও খবর শুনি আবদুল মান্নান এই পত্রিকার দায়িত্বে আছেন। জহির রায়হান তাঁর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন কিন্তু তাঁকে সাময়িকভাবে বহিস্কার করা হয়েছে। যা হোক বেতার কেন্দ্রের ব্যাপার নিয়ে আমরা আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ি। শামসুল হুদা চৌধুরী, মোস্তফা মনোয়ার, কামরুল হাসান, এম আর আখতার মুকুল এবং আমি একটি কমিটি গঠন করি। সার্কাস এভিনিউ এর একটি বাসায় আমরা বসতাম। ঠিক হয় যে জামিল চৌধুরী এবং মোস্তফা মনোয়ার বাজেট এবং কর্মী তালিকা তৈরি করবেন। তাঁরা তা প্রস্তুত করেন এবং হিসেব দাঁড়ায় মাসিক ১৮,০০০ টাকা সব খরচ ধরে। কিন্তু আওয়ামী লীগ মহলে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে বাজেট ধরা হয়েছে দৈনিক ১৮,০০০ টাকা। এই সব ঘটনার পর আমরা বেতার কেন্দ্র থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি নিজেদের ইচ্ছায়।

আমি আবার ঢাকায় আসি এবং কয়েকজনকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে যাই। এর মধ্যে পরিচিত হচ্ছেন বেনু এবং শাহীন মাহমুদ। কলকাতায় যাবার আগে তাদের বিয়ে দিয়ে তারপর নিয়ে যাই।

ততদিনে পশ্চিম বংগ শিল্পী সাহিত্যিক সহায়ক সমিতি গঠিত হয়েছে। দিপেন বিশ্বাস ছিলেন এর সংগঠক। অর্থও সংগৃহিত হয় এবং প্রায় সব শিল্পী-সাহিত্যিক এর সাথে জড়িয়ে পড়েন। যে সাংস্কৃতিক দল তৈরি হয় তার সভাপতি হন সানজিদা খাতুন, আমি হই পরিচালক। এর নাম দেয়া হয় 'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা'। মে মাসে এটা গঠিত হয়। স্কোয়ার্ডের সদস্য সংখ্যা ছিল একশ জনের মত।

১৪৪, লেনিন সরণীতে পি, পি, আই অফিসের একটি কক্ষে রিহার্সাল হোত। তিরিশ দিনের প্রতিদিনই রিহার্সাল হয়। ৩রা জুন প্রথম অনুষ্ঠান হয় রবীন্দ্র সদনে। শাহরিয়ার কবির রচিত 'রূপান্তরের গান' নামে একটি গীতি আলেখ্য। আলোক সজ্জা ও মঞ্চ সাজাবার দায়িত্বে ছিলেন মোস্তফা মনোয়ার। যদিও আমাদের সামর্থ সীমিত ছিল তবুও অনুষ্ঠান কল্পনাতীতভাবে সফল হয়। বহু সুধীজনের সামনে আমাদের এই অনুষ্ঠান প্রচুর প্রশংসা লাভ করে। আমাদের মনোবল দারুণ বেড়ে যায়। এর পর আমরা পাড়ায় পাড়ায় অনুষ্ঠান করে বেড়াতে থাকি। যে ডাকত আমরা যেতাম। পুজোর সময় প্রচুর অনুষ্ঠান করি। কলা মন্দিরেও আমাদের অনুষ্ঠান হয়।

তবে আমাদের প্রধান কাজ ছিল ক্যাম্পে ক্যাম্পে সংগীত পরিবেশন করা। বেনু এবং শাহীন মাহমুদ দলের নেতা ছিলেন। সকাল বেলা আমাদের একটি গাড়ীতে যতজন ধরতো ততজনকে পাঠানো হোত একটি ক্যাম্পে। সারাদিন প্রোগ্রাম করে তারা ফিরত আবার পরদিন যাবার জন্য। অনুষ্ঠান চলতো এক ঘন্টা ধরে। আমার অনুমান ২৫০টিরও বেশী অনুষ্ঠান করা হয়।

সেপ্টেম্বর মাসে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। প্রথম, বিভিন্ন শিল্পী ও সাহিত্যিকদের একত্রে করে একটি সংগঠন করা হয়। এর নাম দেয়া হয় 'লিবারেশন কাউন্সিল অফ দি ইনটেলিজেন্টসিয়া'। এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন অধ্যাপক এ, আর, মল্লিক। জহির রায়হান এবং আলমগীর কবীর এই সংগঠনে বেশ সক্রিয় ছিলেন।

জহির রায়হান ছিলেন একজন খাঁটি দেশ-প্রেমিক। কি প্রচণ্ড পরিশ্রমে সংগঠনের জন্য কাজ করেছেন তা বলা যায় না। একটা বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা যায়। একদিন হঠাৎ খবর পাওয়া গেল যে 'জীবন থেকে নেওয়া' ছবির একটা প্রিন্ট কলকাতায় এসেছে। সারাদিন খোঁজার পর পাওয়া গেল সেটি। শেরপুর এলাকার একটি সিনেমা হলের মালিক সাহস করে নিয়ে এসেছেন। মালিক জানালেন এটা তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং প্রিন্ট তিনি দেবেন না। তখন মীমাংসায় বসা হোলো। জনাব খায়ের (সংসদ সদস্য) এর দায়িত্ব নিলেন। ষাট হাজার টাকা নগদ দেওয়া হল মালিককে। এরপর ঠিক হোল ছবি দেখিয়ে যা আয় হবে তার অর্ধেক পাবে শিল্পীরা আর বাকিটা পাবে এম, সি, এ। জহির রায়হান নিজে কিছুই নিলেন না। মনে রাখা দরকার সবার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল।

একই মাসে জনাব তাহেরউদ্দিন ঠাকুর এসে বলেন যে দিল্লীতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হতে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের পক্ষে আমরা যাবো গান শোনাতে। ৩৫ সদস্যের একটি দল নিয়ে আমরা পৌঁছাই। আমাদের অনুষ্ঠান অসাধারণভাবে সফল হয়। মঞ্চ নির্দেশনায় মোস্তফা মনোয়ার আশ্চর্য রকম আবহ সৃষ্টি করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান যে কি রকম সাড়া জাগায় তা বলার নয়। অনুষ্ঠান শেষ হবার পর ভারতীয় গণ সঙ্গীতের দুই প্রধান পুরুষ বিনয় রায় এবং জ্যোতিন্দ্র মিত্র মঞ্চে আসেন এবং গান শোনান। সে অভিজ্ঞতা বলার নয়।

এভাবে আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম বিভিন্ন শিবিরে। একই সাথে চলছিল অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা। তখন ডিসেম্বর মাস। আমি গেলাম জহির রায়হানের কাছে এই ব্যাপারে আলাপ করার জন্য। তাকে খুব আনমনা মনে হচ্ছিল। আমি কথাটা তুলতেই তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ওয়াহিদ ভাই, এসবের প্রয়োজন হবে না। আমি ১৬ তারিখে ঢাকায় যাচ্ছি'। আমি এই কথার কোন কিছুই বুঝলাম না। কারণ, দেশ যে মাত্র ক'দিন পরই স্বাধীন হবে ভাবিনি। যখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয় যে দেশ স্বাধীন তখন আমি নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন সাহেবের সাথে ছিলাম। আনন্দে যে কি করেছি তা বলার নয়। ১৬ তারিখেই দেশ স্বাধীন হয়। সেদিনের কথা জহির রায়হান বলেছিলেন দু'সপ্তাহ আগে।

ওয়াহিদুল হক

মার্চ, ১৯৮৪।

কণিকা বিশ্বাস

২৫ শে মার্চ আমি গোপালগঞ্জ মহকুমার কাশীয়ানী থানার ওড়াকান্দি গ্রামে ছিলাম এবং সেখান থেকেই পাক বর্বরদের অমানুষিক নির্যাতনের সংবাদ জানতে পারি। জুলাই মাসের শেষ ভাগে ভারতে আগমনের পূর্ব পর্যন্ত গোপালগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান করি এবং আওয়ামী লীগ কর্মী ও যুবকদের সংগঠনের চেষ্টা করি। মে মাসের মধ্যেই আমরা বেশ শক্তিশালী হই এবং ৫ই মে গোপালগঞ্জ থানা ছাত্র লীগের নেতৃত্বে আমরা গোপালগঞ্জ থানা আক্রমণ করি। গোপালগঞ্জ থানা ইনচার্জ নিহত হয় এবং থানা থেকে ৮২টি রাইফেল সহ বহু গোলাবারুদ উদ্ধার করি। প্রথম দিকে গেরিলা যুদ্ধে আমরা সুবিধা করতে সক্ষম হলেও মে-র মাঝামাঝি প্রায় হাজার খানেক পাকসেনা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আমাদের এলাকায় প্রবেশ করলে আমাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। ১৬ই মে রবিবার পাক সৈন্যরা গোপালগঞ্জ থানার সাতপাড়া গ্রামে একাধারে পাঁচঘণ্টা গুলি চালায় এবং অগ্নিসংযোগ করে। এখানে ১০৩ জন নিরীহ গ্রামবাসী পাকসেনা কর্তৃক নিহত হয়। ঠাকুরবাড়ীর গর্তে একই পরিবারের ৮জনকে পাকসেনারা গুলি করে হত্যা করে।

১৮ই মে মকসুদপুর থানার ভেন্নাবাড়ী পাকসেনা কর্তৃক আক্রান্ত হয়। সমগ্র গ্রামে তারা আগুন ধরিয়ে দেয়। ছাত্রলীগ কর্মী অমলকে তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে হত্যা করা হয়। ভেন্নাবাড়ী ও রথবাড়ী এই দুই গ্রামের মধ্যের বিলই ছিল হত্যাকাণ্ডের কেন্দ্র। এখানে প্রায় ১৩২ জনকে পাক বর্বররা হত্যা করে। এছাড়া কদমবাড়ী, আনন্দপুর, বেদভিটা, মাদুকান্দি, আড়ুয়াকান্দি, তেলীভিটা, বৌলতলী, রঘুনাথপুর, গোলাবাড়িয়া এলাকায় পাক সেনারা গণহত্যা চালায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে কেবল সাতপাড়া গ্রামে ১০৩ জন, ভেন্নাবাড়ী গ্রামে ১৩২ জন লোককে হত্যা করা হয়। তাছাড়া কদমবাড়ীতে ৮ জন আনন্দপুরে ৫ জন, বেদভিটায় ১২ জন মাদুকান্দিতে ৪৫ জন আড়ুয়াকান্দিতে ২ জন, তেলীভিটায় ৭ জন বৌলতলীতে ১০ জন, রঘুনাথপুরে ১৪৪ জন এবং গোলাবাড়িয়াতে ১৫০ জনকে পাকসেনারা হত্যা করে। এদের অধিকাংশ গুলি করে হত্যা করা হয়। বাচ্চাদের তারা আছাড় মেরে বা বেয়নেট দিয়ে খুচিয়ে হত্যা করে।

দিন দিন আমাদের বাহিনীর অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকলে আমরা বেশ কয়েকজন উন্নত অস্ত্র এবং ভারতের সাহায্যের আশায় জুলাই মাসের ২য় সপ্তাহে ভারতাভিমুখে যাত্রা শুরু করি। সাতদিন পথ চলার পর অষ্টম দিন ভারতে পৌঁছি। ভারতের বালেশ্বরপুর, ব্যারাকপুর পল্লতাতে অবস্থান করি। কয়েকদিন পর মুজিবনগরে যাই এবং মুজিবনগরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

এর পর ঠাকুর নগর সলট লেক, হাসপুর, গয়া, হেলেঞ্চা, খড়েরমাঠ, প্রভৃতি স্থানের শরণার্থী শিবিরে সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করি। ৭২-এর মার্চের দিকে আমি দেশে ফিরে আসি।

শ্রীমতি কণিকা বিশ্বাস
জাতীয় সংসদ সদস্যা
(ফরিদপুর, সংরক্ষিত আসন)
৬ জুন, ১৯৭৩।

কাজী জাফর আহমদ

১৯৭১ সালে প্রকাশ্য রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) ও কৃষক সমিতি এবং আমাদের সরাসরি নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন ও পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সাথে জড়িত ছিলাম। আমি ছিলাম বাংলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি। আমাদের মূল সংগঠন ছিল 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি'। স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৬৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী আমরা এই গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করি। সে বৎসরেরই এপ্রিলে আমরা স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার কর্মসূচী পেশ করি। এতে পরিকল্পিত রাষ্ট্র কে 'পূর্ব বাংলা জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' আখ্যা দেয়া হয়। ১৯৭০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী ঢাকার পল্টন ময়দানে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) আয়োজিত এক সভায় অতিথি বক্তা হিসেবে আমরা এই কর্মসূচীর ভিত্তিতে রচিত ১১ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করি। এই অভিযোগে পাকিস্তানের সামরিক আইনের অধীনে আমাকে এবং রাশেদ খান মেননকে সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ও সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের আদেশ দেয়া হয়, মোস্তফা জামাল হায়দার ও মাহবুব উল্লাহকে দেয়া হয় এক বৎসরের কারাদন্ডাদেশ। আমরা আত্মগোপনে চলে যাই, অবশ্য মাহবুব উল্লাহ পরবর্তীকালে গ্রেফতার হন।

১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের আমরা বিরোধিতা করি। এর কারণ আমরা তখন রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানে আর বিশ্বাস করতামনা, তদুপরি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবননাশী নভেম্বরের জলোচ্ছ্বাস এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের ক্ষমার অযোগ্য উপেক্ষায় আমরা ছিলাম বিক্ষুব্ধ। অন্যদিকে ইয়াহিয়া ঘোষিত 'লীগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডারে'র অধীনে নির্বাচন এবং এতে বিজয় পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে বলে আমরা

বিশ্বাস করতাম না। তাই আমরা নির্বাচন বর্জনের আহবান জানাই এবং পাশাপাশি শ্লোগান তুলে ধরি ঃ 'শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-জনতা অস্ত্র ধরো, পূর্ব বাংলা স্বাধীন করো'। মাওলানা ভাসানীও নির্বাচন বর্জন করেন এবং ১৯৭০ সালের ৪ ডিসেম্বর পল্টন ময়দানের জনসভায় স্বাধীনতার আহবান জানান। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরংকুশ বিজয়ে অনেকে আশাবাদী হলেও আমরা বলেছিলাম পাকিস্তানী বিজাতীয় শাসক গোষ্ঠি যে কোন অজুহাতে পূর্ব বাংলার জনগণকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে দেবেনা। এজন্যই আমরা সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার আহবান জানাতে থাকি।

'৭১-এর মার্চে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে আমাদের তৎপরতা বেড়ে যায়। ৭ই মার্চ প্রচারিত এক প্রচারপত্রে আমাদের আহবান ছিল, 'আঘাত হানো, সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করো, জনতার স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েম করো'। মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণ আমাদের খুব আশান্বিত করতে পারেনি—সেদিনই তিনি সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করলে এত বিপুল রক্তক্ষয়কে এড়ানো যেতো। কয়েকজন সহকর্মী সহ আমি তাঁর সাথে দেখা করে সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা এবং সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশ্নে কথা বলি। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও ব্যক্তিগত সম্পর্ক আমাদের খারাপ ছিলনা। তিনি বলেন, 'তোমাদের গেরিলা যুদ্ধের দরকার নেই, আমি সব ঠিক করে দেবো। ওখানে আমি এখানে তাজউদ্দিন, তারপর দেখবে কি হয়'। এই কথায় স্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁকে খুব সিরিয়াস মনে হয়নি—আদৌ তিনি স্বাধীনতার কথা, সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনার কথা চিন্তা করছিলেন কিনা সে ব্যাপারে আমাদের সংশয় ছিল। অথবা এমন হতে পারে যে তিনি তখন ভাবছিলেন বিচ্ছিন্নতার কথা-- ক্ষমতায় যাবার পর দাবী আদায় করতে না পারলে তিনি হয়তো পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন। ইয়াহিয়া ভুট্টোর সাথে মুজিবের আলোচনার আমরা বিরোধিতা করেছিলাম, কারণ সারা পূর্ব বাংলা তখন জ্বলছে একটি মাত্র দাবীতে ঃ স্বাধীনতা। এই পরিস্থিতিতে আমাদের (বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন) উদ্যোগে ২৫ মার্চ বিকেলে পল্টন ময়দানে আয়োজিত জনসভায় সভাপতির ভাষণে আমি স্বাধীনতা সংগ্রামের ১৩ দফা কর্মসূচী তুলে ধরি। এই সভায় আমরা বলেছিলাম, আলোচনা ব্যর্থ হতে বাধ্য, আর তাই সারা দেশে অবিলম্বে গেরিলা বাহিনী গঠন করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে হবে। এটাই ছিল তৎকালীন 'পূর্ব পাকিস্তানের' পল্টন ময়দানের শেষ জনসভা। সভাশেষে এক প্রকাণ্ড মিছিল যোগে আমরা শহীদ মিনারে যাই এবং সেখানে শপথ গ্রহণ করি। কর্মীদের পাঠিয়ে দেই তাদের নিজ নিজ এলাকায়।

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী তাদের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড শুরু করলে আমি আশ্রয় নেই এদেশের প্রগতিশীল সিনেমা আন্দোলনের পথিকৃত শহীদ জহির রায়হানের বাসায়। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে

আমাকে তিনদিন আশ্রয় দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, জহির রায়হানের গাড়িটিও আমাদের দিয়েছিলেন ঢাকার বাইরে যাওয়ার জন্য। এই গাড়ি নিয়েই আমরা ঢাকা জেলার শিবপুর চলে যাই সেখানে আমাদের সংগঠনের নেতা আবদুল মান্নান ভুঁইয়া গড়ে তুলেছিলেন এক বিরাট গেরিলা বাহিনী। উল্লেখ করা দরকার যে জহির রায়হানের গাড়িটি যুদ্ধের গোটা সময়টাতেই শিবপুরে ছিলো এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা এটাকে বিভিন্ন কাজে লাগিয়েছিলেন।

শিবপুরে আমরা নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করে নেই। হায়দার আকবর খান রনো এবং রাশেদ খান মেননকে মাওলানা ভাসানীর সাথে যোগাযোগের জন্য টাংগাইল পাঠানো হয়। তাঁরা দেখা করতে পারলেও বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ পাননি, কেননা, ৩ থেকে ৫ এপ্রিলের মধ্যে পাক বাহিনী মওলানা ভাসানীর সন্তোষ এবং বিন্নাফৈরের দুটি বাড়ীই জ্বালিয়ে দেয়। মওলানা ভাসানী আত্মগোপনে চলে যান।

এদিকে আমার ওপর দায়িত্ব পড়েছিল নিজ এলাকা কুমিল্লার চিওরায় গিয়ে বাম এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করার জন্য। চিওরা ভারত সীমান্তের কাছাকাছি ছিলো। কিন্তু সেখানে গিয়ে জানতে পারি যে, আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যেই সীমান্ত অতিক্রম করে গেছেন।

২৫ বা ২৬ এপ্রিল আমি পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা দেবেন সিকদারের আগরতলা থেকে লেখা একটি চিঠি পাই। ওতে জানানো হয়েছিলো যে ৩০ এপ্রিল ভারতের জলপাইগুড়িতে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে বামপন্থীদের এক নীতি নির্দ্ধারণী সভা হবে, আমি যেন অন্য সকলকে জানিয়ে নিজেও চলে আসি। সভা নির্দিষ্ট ৩০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হলেও সেখানে আমাদের আকাংখিত নেতা মওলানা ভাসানী উপস্থিত ছিলেননা। জানানো হয় যে, মওলানা ভাসানীকে ভারত সরকার সীমান্ত এলাকা থেকে নিয়ে গেছেন। গ্রেফতার কিনা জানা যায়নি। ফলে সভায় উৎসাহ সঞ্চারিত হতে পারেনি। একটি মাত্র সিদ্ধান্ত সেখানে গৃহিত হয় যে, আমরা বামপন্থীরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করবো। পরবর্তী সভার তারিখ নির্দ্ধারিত হয় ২৯ ও ৩০ মে এবং এর স্থান নির্বাচন ও আয়োজনের দায়িত্ব অর্পিত হয় দেবেন সিকদার ও ন্যাপ সম্পাদক মশিউর রহমানের ওপর। এই সভায় আমি ছাড়া উপস্থিত অন্যরা ছিলেন হাজী মোহাম্মদ দানেশ, অমল সেন, মশিউর রহমান, দেবেন সিকদার, আবুল বাশার, ডাঃ মারুফ হোসেন, ডাঃ সাঈফ-উদ-দাহার এবং নজরুল ইসলাম। আমরা ফিরে আসি দেশের অভ্যন্তরে।

পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়, কিন্তু এতেও মওলানা ভাসানী উপস্থিত ছিলেননা। তাঁর লেখা একটি চিঠি পড়ে শোনানো হয় যাতে তিনি লিখেছিলেন যে, বাইরে বেরোনোর ব্যাপারে তাঁর অসুবিধা আছে, তিনি ভালো আছেন।

মওলানা ভাসানী আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে বলেছিলেন, তাঁর নির্দেশ ছিল আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশ নেয়ার জন্য। চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে গণচীন সহ কয়েকটি রাষ্ট্রের প্রধানদের নিকট তিনি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন সমর্থন চেয়ে। মওলানা ভাসানীর এই চিঠিটি এসেছিল ভারতের একজন দায়িত্বশীল নাগরিকের মাধ্যমে। এ প্রসংগে বলা দরকার যে কাগজে কলমে না হলেও পরোক্ষভাবে সুকৌশলে মওলানা ভাসানীকে বন্দী দশায় রাখা হয়েছিল।

এসভায় সভাপতিত্ব করেন দিনাজপুরের কৃষক নেতা প্রবরোদা ভূষণ চক্রবর্তী। বিস্তারিত আলোচনা শেষে মওলানা ভাসানীকে সভাপতি করে 'জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি' গঠন করা হয়। কমিটিতে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন দেবেন সিকদার (পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি), নাসিম আলী (বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-হাতিয়ার), অমল সেন (কমিউনিস্ট সংহতি কেন্দ্র), ডাঃ সাইফ-উদ-দাহার (কমিউনিস্ট কর্মী সংঘ) এবং আমি (কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি)। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে আওয়ামী লীগের প্রতি ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামের আহবান জানানো হয় এবং এব্যাপারে যোগাযোগের দায়িত্বলাভ করি আমরা। জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির ঘোষণাটি ভারত সহ বিভিন্ন দেশের পত্রপত্রিকার মাধ্যমে যথেষ্ট প্রচারলাভ করেছিলো। এতে বিভেদের নীতি পরিহার করে সকল বামপন্থী ও দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহকে আওয়ামী লীগের সাথে একযোগে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই-এ অংশ গ্রহণের আহবান জানানো হয়েছিলো। সিদ্ধান্ত অনযায়ী ১ জুন জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটির ঘোষণার কপি সহ আমি, রাশেদ খান মেনন, এবং হায়দার আকবর খান রনো কলকাতায় অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের সাথে সাক্ষাৎ করে স্বাধীনতাযুদ্ধে বাম পন্থীদের অংশ গ্রহণের প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করি। ধৈর্য্য ও সহানুভূতির সাথে বক্তব্য শুনলেও তিনি আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখতে অস্বীকৃতি জানান এবং সরকারের মুক্তিবাহিনীতে আমাদের কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকার করেন। কারণ হিসেবে তিনি হক-তোয়াহার নেতৃত্বাধীনে কমিউনিস্টদের শ্রেণী সংগ্রামের এবং স্বাধীনতা বিরোধী তৎপরতার উল্লেখ করেন, তাদের প্রচারপত্রের প্রসংগও টেনে আনেন। আমরা বলি যে হক তোয়াহারা যা করছেন তা নিজেদের দায়িত্বেই করছেন. এর সাথে বামপন্থীদের বিরাট অংশটি আদৌ জড়িত নয়। আপনি কেবল আওয়ামী লীগের সম্পাদকই নন, দেশেরও প্রধান মন্ত্রী এবং এজন্যেই জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে যে কাউকে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়া আপনার কর্তব্য। এ প্রসংগে জনাব তাজউদ্দিন জানান যে তাঁকে সিদ্ধান্তের আগে গোয়েন্দা রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে এবং আমাদের গোয়েন্দা সংস্থার অনুপস্থিতিতে নির্ভর করতে হবে ভারত সরকারের গোয়েন্দা রিপোর্টের ওপর। এই পর্যায়ে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়,এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ নেতা আবদুস সামাদ আজাদের

উপস্থিতি সে অপ্রিয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আমরা মর্মাহত হয়ে ফিরে আসি।

দেশে ফেরার পথে জুনের মাঝামাঝি আগরতলায় আমাকে ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' আটক করে নিয়ে যায় শিলং-এর একটি ডাক বাংলোয়। সেখানে আমাকে সাত দিন রাখা হয়। ঘটনাটিকে আমি গ্রেফতার বলবো না, কেননা, কোন খারাপ আচরণ আমার সাথে করা হয়নি। কিন্তু সাত দিন ব্যাপী অবিরাম প্রশ্নের মাধ্যমে আমাকে ব্যতিব্যস্ত রাখা হয়। আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান মিঃ সুব্রামনিয়াম। তিনি অবশ্য সমগ্র ব্যাপারটিকে 'নিজেদের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ আলোচনা' হিসাবে বোঝাতে চেয়েছিলেন। এই আলোচনায় দেশের অতীত ও বর্তমান রাজনীতিতে বামপন্থীদের ভূমিকা সহ বিভিন্ন প্রসংগ এসেছিলো। তিনি বারবার আওয়ামী লীগ এবং ভারতের প্রতি বামপন্থীদের মনোভাব সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলেন। আমি বলেছিলাম ঃ এই মুহূর্তে আমাদের প্রধান সমস্যা পাকিস্তানের সেনাবাহিনী, এর বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে চাই, আওয়ামী লীগের সাথে মতপার্থক্য সমূহ এখন আমরা তুলে ধরবোনা—তাদের সাথে আমাদের সমস্যা সমূহের মীমাংসা আমরা স্বাধীন দেশের মাটিতে করবো, যুদ্ধের মধ্যে বা ভারতের অভ্যন্তরে নয়। ভারতের সেনা বাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বা সম্ভাবনার প্রসংগে আমি বলেছিলাম ঃ ভারতের পক্ষে সেটা উচিত হবেনা, আমরা বাংলার মাটিতেই শত্রুদের খতম করবো। স্বাধীনতাকে আমরা ছিনিয়ে আনতে চাই, কারো অনুগ্রহে পেতে চাইনা।

অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের সাথে ব্যর্থ আলোচনার পর আমরা নিজেদের উদ্যোগে যেখানে যতটুকু শক্তি নিয়ে যেভাবে সম্ভব স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখি। মুজিব নগর সরকারকে আমরা অস্বীকার করিনি, কিন্তু তাই বলে প্রত্যক্ষ কোনো যোগাযোগও রাখিনি, সহযোগিতাও পাইনি। সরকার সম্পর্কে আমাদের প্রশ্ন ছিল, সমালোচনা ছিল, কেননা তারা আওয়ামী লীগের বাইরে বিশেষ করে বামপন্থীদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ প্রশ্নে অযৌক্তিক সংকীর্ণ নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এই নীতি আমাদের হতাশ করেছিল। একারণেই আমরা নিজেদের উদ্যোগে লড়াই চালিয়েছিলাম।

স্বাধীনতাযুদ্ধকালে আমাদের সংগঠনের নীতি ছিল দুটি ঃ

১। যেখানে সম্ভব বেংগল রেজিমেন্ট, ই পি আর এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত সরকারী মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে তাদের নির্দেশ মান্য করে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা এবং (২) কোথাও তেমন বাহিনী না থাকলে, কিংবা দলীয় সংকীর্ণতার কারণে যোগদান সম্ভব না হলে আলাদাভাবে 'গেরিলা ফৌজ' গঠন করে যুদ্ধ পরিচালনা করা। উল্লেখ্য যে, আমাদের সংগঠনের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর নাম ছিলো 'গেরিলা ফৌজ'। এর গঠন প্রণালী ছিল—পাঁচ

থেকে সাত জন নিয়ে একটি গ্রুপ, কয়েকটি গ্রুপ নিয়ে একটি স্কোয়াড এবং কয়েকটি স্কোয়াড নিয়ে গঠিত হতো এক একটি আঞ্চলিক ইউনিট। এব্যাপারে আমাদের নির্দেশ ২৫ মার্চের জনসভাতেই ঘোষণা করা হয়েছিল।

দেশের প্রায় সকল অঞ্চলেই আমাদের কর্মীরা মুক্তি বাহিনীর সাথে একযোগে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। সেটা সম্ভব না হওয়ায় বিশেষ কয়েকটি এলাকায় গেরিলা ফৌজ গঠন করতে হয়। এই এলাকাগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ

১। ঢাকা জেলার শিবপুর, মনোহরদী, রায়পুর ও কালিগঞ্জ নিয়ে গঠিত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মান্নান ভুঁইয়ার নেতৃত্বে গেরিলা ফৌজের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। এই এলাকায় যুদ্ধকালে অন্য কোন বাহিনী গঠিত হয়নি, এমনকি রাজাকার বা বদর বাহিনীও গঠিত হতে পারেনি। প্রসংগত, একটি দুঃখজনক ঘটনা ছিল ঃ মাঝে মাঝে মিথ্যে রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রবাসী সরকারের পক্ষ থেকে এখানে মুক্তি বা মুজিব বাহিনীকে পাঠানো হতো আমাদের যোদ্ধাদের নিরস্ত্র করার জন্য। প্রায় ক্ষেত্রেই উল্টোটি ঘটতো, কিংবা গেরিলা ফৌজের তৎপরতায় মুগ্ধ হয়ে আগত যোদ্ধারাও দলভুক্ত হয়ে যেতেন। এই এলাকায় আমাদের বিখ্যাত কমাণ্ডার ছিলেন পাকিস্তানের নৌবাহিনীর সাবেক সদস্য নেভাল সিরাজ। উল্লেখ্য যে যুদ্ধকালে এই এলাকাটি আমাদের সংগঠনের হেড কোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

২। কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ অঞ্চল। এখানে গেরিলা ফৌজের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ হাজার।

৩। টাংগাইলে প্রথম দিকে গেরিলা নেতা কাদের সিদ্দিকীর সাথে ভুল বোঝাবুঝি হলেও পরে মতৈক্যের ভিত্তিতে আমাদের প্রায় পাঁচ হাজার যোদ্ধা অংশ নেন। কাদের সিদ্দিকী দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের কর্মীরা তাঁর নেতৃত্বে অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন।

৪। খুলনা জেলার সাতক্ষিরায় সৈয়দ কামেল বখতের নেতৃত্বে প্রায় ২ হাজার সদস্যের গেরিলা ফৌজ গড়ে ওঠে। এখানে যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুজিব বাদের কথিত একদল লোকের হাতে বীর যোদ্ধা কামেল মৃত্যুবরণ করেন। এছাড়া বাগেরহাট সদর, বিষ্ণুপুর, রঘুনাথপুর প্রভৃতি এলাকায় গেরিলা ফৌজের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ হাজার। এই এলাকায় মুক্তি বাহিনীর সংখ্যা খুব কম ছিল।

৫। রাজশাহী জেলার আত্রাই অঞ্চলে আফতাব মোল্লার নেতৃত্বে প্রায় দুহাজার সদস্যের গেরিলা ফৌজ গড়ে ওঠে। সেখানে আমাদের গেরিলারা স্থানীয় মুক্তি বাহিনীর সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে অন্য এক বামপন্থী নেতা অহিদুর রহমানের সাথে তাদের সংঘাত হয়।

৬। ফরিদপুরের বোয়ালমারী এবং মাদারীপুরের একটি অঞ্চলে মি সাদেকুর রহমানের নেতৃত্বে কয়েকশত সদস্যের গেরিলা ফৌজ গড়ে উঠেছিলো

৭। চট্টগ্রাম শহর ও রাউজান এলাকায় শামসুল আলমের নেতৃত্বে কয়েকশ সদস্যের গেরিলা ফৌজ গড়ে ওঠে। এখানে মুক্তি বাহিনী বা নিয়মিত সেন বাহিনীর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়নি। এখানে আমাদের যোদ্ধারা প্রধানত চট্টগ্রাম শহর এলাকায় গেরিলা তৎপরতা পরিচালনা করেছিলেন।

৮। নোয়াখালীর ফেণী অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল কয়েকশত সদস্যের এক গেরি ফৌজ।

আগেই বলেছি ঃ কেবল সেই সব অঞ্চলেই গেরিলা ফৌজ গঠিত হয়েছি যেখানে সরকারী মুক্তিবাহিনী (বেংগল রেজিমেন্ট, ই পি আর সহ) ছিলনা কিংব থাকলেও সংকীর্ণতার কারণে আমাদের কর্মীরা ওতে যোগ দিতে পারেনি। দেশে অন্য সকল এলাকায় কর্মীরা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে অধিনায়কের নির্দেশে যুদ্ধ করেছেন—কোনো প্রকার দলীয় বিভেদাত্মক কার্যকলাপ তারা চালাননি সেই প্রেক্ষিতে যুদ্ধশেষে হিসেব অনুযায়ী সারা দেশে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আমাদের সংগঠনের কর্মীদের সংখ্যা সব মিলিয়ে ছিল প্রায় ত্রিশ হাজার। দেশের অভ্যন্তরে একমাত্র শিবপুর এলাকায় আমাদের নিজস্ব প্রশিক্ষণ শিবির ছিল। প্রশিক্ষণের ব্যাপারে যুদ্ধকালে যে ক'জন সামরিক অফিসার আমাদের সহযোগিতা করেছিলেন তাঁরা হলেন ঃ মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর আবুল মঞ্জুর, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর এম এ জলিল। এঁরা ছাড়াও মেজর হায়দার, ক্যাপ্টেন, মাহবুব ক্যাপ্টেন এনাম, ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন এবং ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের সহযোগিতা ছাড়া আমাদের কর্মীদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ কঠিন হয়ে পড়তো। প্রশিক্ষণের সাথে সাথে তাঁরা অস্ত্রের ব্যবস্থাও করতেন। মেজর জিয়ার জেড ফোর্সে আগস্টের দিক থেকে আমাদের প্রায় এক হাজার যোদ্ধা অংশ নিয়েছিলেন। এ ছাড়া যুদ্ধের শেষ দিকে আমরা দুটি প্রশিক্ষণ শিবির গড়ে তুলেছিলাম ঃ একটি কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম সংলগ্ন সীমান্তের ওপারে এবং অন্যটি কিশোরগঞ্জ সংলগ্ন সীমান্তবর্তী এলাকায়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যুদ্ধকালে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটির পক্ষে সরাসরি নেতৃত্ব বা যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিলনা, ফলে যেখানে কমিটির যে সংগঠন বেশী শক্তিশালী ছিল সেখানে অন্য সংগঠনের সদস্যরা তার অধীনে মিলিতভাবে যুদ্ধ করতো। সংগঠন হিসেবে আমাদের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি নিজেদের মধ্যে মোটামোটি নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে পারতো। যেখানে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি সেখানে পূর্বঘোষিত নির্দেশানুযায়ী কর্মীরা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। আমাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের কোনো পর্যায়েই সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেয়া হয়নি। জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল

স্রোতধারার সাথে আমরা মিশে গিয়েছিলাম। মাও সে তুঙের চিন্তাধারা আমাদের প্রেরণার অন্যতম উৎস হলেও যুদ্ধকালে গণচীনের ভূমিকার আমরা তীব্র সমালোচনা করেছিলাম। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ছিল আমাদের ঘোষিত শত্রু। সোভিয়েত ইউ-নিয়ন এবং বিশেষ করে ভারতের সাহায্যকে আমরা স্বাগত জানালেও সে প্রশ্নে আমাদের সন্দেহ ছিল, সংশয় ছিল। আমরা কোনো পর্যায়েই চাইনি যে ভারতের সেনাবাহিনী আমাদের যুদ্ধে সরাসরি অংশ নিক। ভারতের বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠন—বিশেষ করে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতা আমাদের অনেক উপকারে এসেছে। এই সাহায্য ছিল প্রধানতঃ নৈতিক। অনেক সময় তাঁরা আমাদের আশ্রয় এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁদের সাহায্যের ফলে শত্রুর হামলার কবল থেকে আমাদের জীবনও বেঁচে গেছে।

যুদ্ধ চলাকালে বেশ কয়েকবার আমার সাথে বাঙালী সামরিক অফিসারদের বিশেষ করে মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর খালেদ মোশাররফ এবং মেজর আবুল মঞ্জুরের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। আলোচনাকালে আমি তাঁদের মধ্যে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের একাংশের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিক্ষোভ লক্ষ্য করেছি। মুজিব বাহিনী সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। ভারতের সেনাবাহিনীর অযাচিত হস্তক্ষেপও তাদের ক্ষুব্ধ এবং নিরুৎসাহিত করতো বলে মনে হয়েছে। জুনের শেষে বা জুলাই এর প্রথমদিকে একদিন মেজর জিয়া আমাকে সাথে নিয়ে জীপ চালিয়ে ধর্মনগর থেকে করিমগঞ্জ গিয়ে ফিরেছিলেন। চার শ কিলোমিটার পথে প্রায় সাড়ে সাতঘণ্টা ব্যাপী আলোচনাকালে তিনি বলেছিলেন: ভারত চায়না যে বাংলাদেশে গেরিলা যুদ্ধ প্রলম্বিত হোক এবং এজন্যই আমার মনে হয় ভারতের সেনা বাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের অবসান ঘটাবে। কারণ ভারত একটি ব্যাপারে ভীত—গেরিলাযুদ্ধ প্রলম্বিত হলে তার নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের হাতে থাকবে না।

মেজর জিয়ার এই আশংকার সত্যতা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হই আগষ্ট মাসে। এই সময় কলকাতার একটি হোটেলে আমার সাথে আলোচনা হয় মুজিব বহিনীর দুই নেতা এবং আমার এককালীন বন্ধু ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ শেখ ফজলুল হক মনি ও সিরাজুল আলম খানের। মুজিব বাহিনী গঠনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলেছিলেন: আমরা নিশ্চিত নই যে মুজিব বেঁচে আছেন কিনা, কিংবা তিনি জীবিত অবস্থায় ফিরে আসবেন কিনা। যদি না আসেন তাহলে যে শুন্যতার সৃষ্টি হবে তার জন্যেই মুজিব বাহিনী—যাতে (পরিহাসচ্ছলে) তোমরা কিংবা সামরিক বাহিনীর কোনো বাঙালী অফিসার সে শুন্যতার সুযোগ নিতে না পারে। তাঁদের বক্তব্যে বোঝা গিয়েছিলো যে তাঁরা বেংগল রেজিমেন্টের কোনো কোনো কমাণ্ডার সম্পর্কে যথেষ্ঠ সংশয় এবং আশংকায় আছেন।

ভারতসহ বিদেশে অবস্থানরত বাঙালী প্রগতিশীলরাও আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। বিশেষ করে বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালীরা এব্যাপারে ছিলেন বিশিষ্ট ভূমিকায়।

কাজী জাফর আহমদ
মার্চ, ১৯৮৪।

ডঃ কামাল সিদ্দিকী

১৯৭০ সালের মাঝামাঝি আমি নড়াইলে এস, ডি, ও হিসেবে যোগদান করি। নড়াইলে আসার পর বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজ কর্মের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট-এর দায়িত্ব পালন করা অন্যতম ছিল। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সাথে আমার সম্পর্ক খারাপ হয়ে পড়ে যেহেতু রাজনৈতিক কর্মীদের আমি সবসময় জামিনে মুক্তি দিতাম। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এটা চাইতনা। এবং তাদের অনুরোধ বা উপরোধ উপেক্ষা করার ফলে তারা আমাকে শুভ নজরে দেখত না। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় আমি নড়াইলেই ছিলাম। এই নির্বাচনকে সৎ নির্বাচন বলা যায় এবং আওয়ামী লীগ সামগ্রিকভাবে সমস্ত আসনে জয় লাভ করে। নির্বাচনে জয়লাভ হলেও পরিস্থিতি আমার কাছে ভাল ঠেকছিল না। মার্চের প্রথমদিকে আমি ঢাকায় আসি এবং সামগ্রিক অবস্থা দেখে আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, পাকিস্তানীদের সাথে আওয়ামী লীগের আলোচনা ব্যর্থ হবে। আমার এ ধারণা একক ছিলনা। অনেকেরই এরূপ ধারণা ছিল। ৮ই মার্চ আমি নড়াইলে ফিরে যাই। সেখানেও উত্তেজনা বিরাজ করছিল এবং বিভিন্ন মিছিল ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে বাঙালীরা রাজপথে তাদের মনোভাব প্রকাশ করছিল।

২১ই মার্চ একটি ঘটনা ঘটে যায় ফলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়। ঐ তারিখে আমি ক্যান্টনমেন্টে কোন কাজে গাড়ি নিয়ে যাই। আমার গাড়িতে কালো ফ্ল্যাগ ছিল। এই ফ্ল্যাগ দেখা মাত্র পাহারারত সৈনিক চীৎকার করে আমাকে নামতে বলে এবং গুলি করতে উদ্যত হয়। গাড়ি থামাবার পর সে আবার বলে কালো পতাকা নামাও। আমি উত্তর দিই যে, কিছুতেই আমি কালো পতাকা নামাবো না। সৈনিকটি তখন বলে কালো পতাকাসহ ক্যান্টনমেন্টে প্রবেশ করা চলবেনা। আমি বলি, কালো পতাকা ছাড়া ক্যান্টনমেন্ট আমি ঢুকতে পারিনা এবং সেখানে থেকেই ফিরে আসি। এ ব্যাপারে আমি প্রেসে একটি বিবৃতি দিই। তোফায়েল আহমদও এই ঘটনার ওপর একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন

২৫শে মার্চ একটি জরুরী কাজে আমি খুলনায় অবস্থান করছিলাম। ২৫শের রাত্রির ঘটনার পর ২৬ তারিখে রূপসা নদী পার হয় আমি কালিয়ায় পৌছি। সেখানে একটি জনসমাবেশে আমি বক্তৃতা দিই এবং বলি যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আমাদের সবাইকে এখন লড়তে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হবার সিদ্ধান্ত ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। ১৪ই মার্চ ঝিনাইদহে আমরা কয়েকজন সরকারী কর্মচারী মিলিত হই। এর মধ্যে ছিলেন তৌফিক এলাহি চৌধুরী, শাহ ফরিদ, মাহবুব (পুলিশ) এবং অন্য কয়েকজন। এখানে আমরা শপথ নিই যে, প্রয়োজন হলে দেশের জন্য আমরা অস্ত্র ধারণ করবো। ২৭শে

মার্চ নড়াইলে ফিরে এসে দেখি যে, অবস্থা বেশ খারাপ। নড়াইল কম বেশী জনশূন্য এবং লোকেরা অত্যন্ত ভীত। আমি একটি মাইক নিয়ে শহরের রাস্তায় নেমে পড়ি। এবং ৪ টায় একটি সমাবেশের আহবান করি। এই সমাবেশে আমি ঘোষণা করি, নড়াইল স্বাধীন বাংলাদেশের অংশ এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। যেহেতু রেডিওতে শুনেছিলাম জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধে সামরিক নেতৃত্ব দান করছেন আমরাও সৈনিক হিসেবে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করি। এই সভাতে কয়েকজন সংসদ সদস্য নিয়ে একটি যুদ্ধ পরিচালনা কাউন্সিল গঠিত হয়। কয়েকজন আনসার এবং সাধারণ মানুষদের নিয়ে সেনাবাহিনী গঠন করা হয়। মানুষের মাঝে যে কি বিপুল উৎসাহ এবং উদ্দীপনা ছিল তা বর্ণনা করা যায় না। নিম্ন বর্ণের বেশ কিছু হিন্দু শুধু মাত্র তীর ধনুক নিয়েই এই সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। যশোর এবং মাগুরা থেকে লোকজন এসেও এই গণবাহিনীর সদস্য হয়।

২৮শে মার্চ প্রায় চার লক্ষ লোকের এই বিশাল গণবাহিনী যশোর আক্রমণ করে। এই অভূতপূর্ব দৃশ্য পাকিস্তানীদের জন্য যথেষ্ঠ ছিল। তারা সহজেই বুঝেছিল যে, এই বিশাল জনস্রোতকে সামনাসামনি পরাস্ত করা সম্ভব নয়। এক কথায় তারা ভীতি ছড়িয়ে ছত্রভংগ হয়ে ক্যান্টনমেন্টে পালিয়ে যায়। বহু পাকিস্তানী সৈন্য আমাদের হাতে ধরা পড়ে। এখানে উল্লেখ্য যে এরই মধ্যে তারা লুঠতরাজ ও ধর্ষণে লিপ্ত হয়েছিল। বহু বিহারী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে যোগ দিয়েছিল। তাদের অনেকেই আমাদের হাতে মৃত্যু বরণ করে।

নড়াইলে ফিরে এসে আমরা জনগণকে সংগঠিত করার ভূমিকা গ্রহণ করি। সবাই এগিয়ে এসেছিল যার যা ছিল তা নিয়ে। খাদ্য-দ্রব্যের প্রশ্ন তো বাদই দিলাম। জনগণের মধ্যে তখন একটাই ইচ্ছা ছিল এবং সেটি হচ্ছে মার্চ করে আক্রমণ করা।

কিন্তু পাকিস্তানী সেনবাহিনীকে এত সহজেই হার মানানো সম্ভব নয়। তারা বিশাল কামান দিয়ে নড়াইলের ওপরে আক্রমণ চালায় এবং আমাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রায় তিনশত আনসার কামানের গুলিতে মারা যায়। এছাড়া বিমান বাহিনী প্রায় সারাক্ষণ নড়াইলের ওপর গুলি বর্ষণ করতে থাকে। আমি অন্যদের সঙ্গে সামগ্রিক অবস্থা বিশ্লেষণ করি। এবং সিদ্ধান্ত নিই যে, আমাদের যুদ্ধ বন্দীদের বিচার করা হবে। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ শোনা হয় এবং সাক্ষী গ্রহণ করা হয়। বিচারে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় এবং কয়েকশত বন্দীকে গুলি করে এই দণ্ড কার্যকর করা হয়।

আমরা পাকিস্তানী প্রশাসন যন্ত্রকে বিকল করে দিয়েছি, জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম এবং যুদ্ধের মনোভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি এবং এর ফলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয় যে, বিদ্রোহের প্রথম স্তর সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন জন-গণের মধ্যে যুদ্ধ ছড়িয়ে দেয়ার কাজ। আমি সরকারী কর্মচারীদের ছয় মাসের

বেতন দিয়ে বলি যে, অফিসে তারা যেন আর ফিরে না আসে। সক্ষম যোদ্ধাদের বলি সীমান্তের দিকে চলে যেতে যেহেতু নড়াইলকে আর রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। এর পর আমি নড়াইল ত্যাগ করি। আমার ইচ্ছা ছিল বাবা-মার সাথে শেষবারের জন্য একবার দেখা করা এবং সে উদ্দেশ্যেই আমি এপ্রিল মাসের ৭/৮ তারিখে ঢাকায় আসি। ঢাকায় আমাদের বাসার দিকে যখন রওয়ানা হচ্ছি তখনই আমার একজন পরিচিত লোকের সাথে দেখা হয়। তিনি আমাকে জানান যে, নড়াইলের সব ঘটনার খবরই ঢাকায় এসে পৌছে গেছে। সেনাবাহিনী জানে আমি বহু পাকিস্তানী হত্যা করেছি। যদি বাসায় যাই, আমাকে তো ধরে হত্যা করা হবেই, বাবা-মাও আর বাঁচবে না। একথা শোনার পর আমি স্কুটার নিয়ে নয়ার হাটের উদ্দেশে রওয়ানা হই এবং রাজবাড়ী হয়ে চুয়াডাংগার দিকে যেতে থাকি। পথের মধ্যে লক্ষ্য করি সব জায়গাতেই বিহারীরা অত্যন্ত তৎপর। চুয়াডাংগার উদ্দেশে যখন নৌকা করে যাচ্ছি তখন একটি বিমান এসে নৌকার ওপর গুলি ছোঁড়ে। আমি পানিতে লাফ দিয়ে জীবন রক্ষা করি এবং শেষে কলকাতায় পৌঁছি।

কলকাতায় গিয়ে কীড স্ট্রীটে সমবেত হই। এখানে বহু এম পির সাথে দেখা হয় এবং ১৭ই এপ্রিলের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার কথাও জানতে পারি। এর পরে পাকিস্তানী দূতাবাসের জনাব হোসেন আলী এবং আনোয়ারুল করিম চৌধুরীর সাথে দেখা করি এবং সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দিই। তাদের বক্তব্যও আমি শুনি। তবে আমার মনে হচ্ছিল যে, কলকাতায় আমার অবস্থানের কোন প্রয়োজন নেই, এবং আমি তখন খুলনা সীমান্তের গজাডাংগা ক্যাম্পে যোগদান করি। এই ক্যাম্পের প্রধান ছিলেন ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন।

মে এবং জুন মাস ট্রেনিং এবং ছোটখাট অপারেশন পরিচালনার মধ্যে কাটে। জুন মাসের শেষে জেনারেল ওসমানী এই ক্যাম্প পরিদর্শনে আসেন এবং আমার খোঁজ করেন। তিনি আমাকে বলেন যে, মুজিব নগর সচিবালয়ে আমার প্রয়োজন রয়েছে। তাঁর এই সিদ্ধান্তে আমার প্রবল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও করার কিছু ছিলনা। কারণ তিনি ছিলেন সর্বাধিনায়ক। আমি কলকতায় ফিরে আসি এবং প্রধান মন্ত্রীর সাথে দেখা করি। তিনি আমাকে সাধারণ প্রশাসন বিভাগের সচিব জনাব নুরুল কাদের খানের সংগে দেখা করতে বলেন। তিনি আমাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে যোগদান করতে আদেশ দেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব খন্দকার মোশতাকের সাথে এর পূর্বে আমার কোন আলাপ ছিলনা। যাই হোক তাঁর সঙ্গে আমি কাজ করতে শুরু করি। আমার প্রধান কাজ ছিল বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কূটনীতিকদের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করা। এছাড়া যারা বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করতে চাইতেন তাঁদের সংগে সরকারের যোগাযোগ করিয়ে দেয়া এবং বিভিন্ন আদেশ পৌঁছিয়ে দেয়া। পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে যে সকল আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব দেখা করতে আসতেন

তাঁদের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দেয়াও আমার কাজের অংশ ছিল। যেহেতু খন্দকার মোশতাক সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীও ছিলেন সেহেতু সংসদ সদস্যদের বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং বিভিন্ন সংসদীয় উপদল এবং গোষ্ঠীর সংগে যোগাযোগ রক্ষা করাও আমার দায়িত্বের মধ্যেই এসে পড়ে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের দিকে খন্দকার মোশতাক মুজিব নগর সরকারের ভেতর কোণঠাসা হয়ে পড়েন। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ ছিল যে, তিনি মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করছিলেন। অতএব, যদিও জাতিসংঘে প্রেরিত প্রতিনিধিদলে তাঁর নেতৃত্ব করার কথা ছিল কিন্তু তাঁকে বাদ দেয়া হয় এবং তাঁর স্থলে দলের প্রধান হিসেবে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে নিয়োগ করা হয়।

পরবর্তীকালে খন্দকার মোশতাকের ভূমিকা একেবারেই গৌণ হয়ে পড়ে। তিনি মুজিব নগর মন্ত্রী পরিষদের সদস্য হিসেবে বহাল থাকলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী মহলে তাঁর প্রভাব একেবারেই ছিলনা। যখন থেকে এই অভিযোগ সবার মধ্যে প্রচারিত হলো যে, তিনি মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সরকারের অনুমতি ছাড়া যোগাযোগ করেছেন তখন থেকে তিনি প্রায় গৃহবন্দী ছিলেন। একবার তিনি গঙ্গার পারে সান্ধ্য ভ্রমণের অনুমতি চেয়েছিলেন কিন্তু ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তা নাকচ করে দেন।

সংসদ সদস্যদের ব্যাপারে আমার প্রশাসনিক দায়িত্ব ছিল এবং সেই সূত্রে আমি জুলাই মাসে বাগডোগরায় বাংলাদেশের সংসদ সদস্যদের সভায় উপস্থিত ছিলাম। সেখানে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তা দেখে বিচলিত হওয়া ছাড়া উপায় ছিলনা। সদস্যরা নানাদলে উপদলে বিভক্ত ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সবার মনোভাব সমানভাবে সুদৃঢ় ছিলনা। এমন কি অনেক সংসদ সদস্য ও নেতারা পাকিস্তানে ফিরে গিয়ে আপোস করার পক্ষেও মত প্রদান করেন। এইসব দেখে আমার মনে হচ্ছিল যে, এরা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করতে গিয়ে হয়তো বা সবকিছু ভণ্ডুল করে ফেলতে পারেন। একক উদ্দেশ্যে সবাই কাজ করছিলেন না। পরবর্তীকালে অবশ্য ভারতীয় রণনীতির পাশে এইসব প্রশ্নের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমে আসে।

বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠন ও ব্যক্তিদের প্রতি আওয়ামী লীগের মনোভাব বৈরী ছিল। নীতি হিসেবে নয় কিন্তু বহু আওয়ামী লীগ নেতা এদের বিরোধিতা করতেন। যেমন শিবপুর এলাকায় বামপন্থী নেতা মান্নান ভূঁইয়া একটি মুক্ত অঞ্চল গড়ে তোলেন। এটি অনেক আওয়ামী লীগের লোকজন সহ্য করতে পারতেন না। এমন কি অবস্থা এক পর্য্যায়ে এতই খারাপ হয়েছিল যে, বহু সদস্য সরকারের কাছে দাবী তোলেন যে, মান্নান ভূঁইয়াকে হত্যা করা হোক এবং তাঁর সংগঠন ধ্বংস করে দেয়া হোক। অন্য একটি ঘটনা যেটা এখানে উল্লেখ করা যায় সেটি হচ্ছে, কিছু সংসদ সদস্যের মাধ্যমে ইসরাইলের অনুপ্রবেশের চেষ্টা। ইসরাইল সরকার ভারতীয় ডানপন্থী রাজনীতিকদের সংগে যোগাযোগ করেন। তাঁরা আবার বাংলাদেশের কিছু সংসদ সদস্যের মাধ্যমে ইসরাইলী সাহায্যের প্রস্তাব

নিয়ে আসেন। ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই খারাপ ঠেকে এবং আমি সরকারী কর্মচারীর দায়িত্ব বহির্ভূত একটি কাজ করি। আমি তথ্যটি সি পি এম-এর পত্রিকায় জানিয়ে দিই এবং খবরটি ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর ফলে ইসরাইলী লবীর তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়।

কলকাতায় মওলানা ভাসানীর সংগেও আমার দেখা হয়। তাঁর অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। তাঁর দেখাশুনা করার জন্য কেউ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। সেপ্টেম্বর মাসের দিকে তিনি কলকাতায় ছিলেন এক প্রকার বন্দীর মত। আমি নিজে থেকেই তাঁর জন্য কাপড়-চোপড়ের ব্যবস্থা করি। একটি ব্যপার বেশ মনে পড়ে। তিনি এসবের মধ্যেও তাল টুপির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমি সারা কলকাতা খুঁজে তাঁর জন্য এই টুপি সংগ্রহ করি।

এছাড়া মওলানা ভাসানীর বিভিন্ন বক্তব্য আমি মানুষের কাছে পৌছে দিতাম এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁর কাছে খবর নিয়ে যেতাম। যথা—উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হওয়ার অনুরোধ খন্দকার মোশতাকের পক্ষ থেকে আমি বহন করি। খন্দকার মোশতাক অবশ্য চেয়েছিলেন যে, মওলানা ভাসানী যদি এই পরিষদের সদস্য হন, তবে তাঁর নিজস্ব মতামত ভারত বিরোধী জাতীয়তাবাদ, আরো শক্তিশালী হবে। সেসময়ে অবশ্য খন্দকার মোশতাকের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়েছিল।

ডিসেম্বর মাসে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সব জল্পনা-কল্পনা এবং কোন্দলের সমাপ্তি ঘটে। ১৬ তারিখ দেশ স্বাধীন হয় এবং ১৮ তারিখ আমি খুলনায় ডি, সি, হিসেবে যোগদান করি।

ড: কামাল সিদ্দিকী
মার্চ, ১৯৮৪।

ডঃ কামাল হোসেন

Loss of men and territory in the 1965 war, with no gain to show for it, had already brought down Ayub's stock with the Punjabi army, since sizeable chunks of inhabited areas lost, as well as men, were Punjabi. The Tashkent Declaration through which Ayub attempted to salvage the situatian and obtain restoration of territories, instead of retrieving his own position, did further damage to it, since to the Punjabis, the Tashkent Declaration was presented as a 'sell-out', a measure of

appeasement towards India conceded under Soviet pressure. Bhutto, who by many, and indeed his own accounts, had been one of the men responsible for pushing Ayub into the unfortunate war, not only managed to escape from public censure for such a role, but also began to identify himself with the anti-Tashkent sentiment and to dissociate himself from it. The old punjabi politicians, who had been sitting it out in the wings since 1958, saw in this situation an opportunity to align themselves with a discontented army, together to undermine Ayub.

In the Eastern wing, the Bengalis had reacted entirely differently to the war. They had experienced a sense of total isolation, and felt exposed and undefended. It was little consolation to be told by Bhutto that the eastern wing's security had been left to assurances extended by the friendly Chinese. The Tashkent Declaration was therefore widely welcomed by almost all sections of the people in the East.

The Punjabi politicians became active in early 1966, seeking to rally opposition forces behind a demand for political concessions from Ayub and the formation of a 'national government'. They realised that pressure on Ayub would be truly effective if the Bengalis could be associated with this demand. Their keenness to involve Sheikh Mujib was recounted by Manik Mia (Tafazzal Hussain), the influential editor of the largest circulation Bengali daily Ittefaq. He had attended a meeting of Punjab opposition leaders in Iahore in early 1966. The assembled Punjabi leaders had urged a common opposition front to be formed against Ayub and assured that they were 'confident' that the Army would not stand in their way, giving the impression that the spoke on the basis af contacts with the Army. They wanted Manik Mia to persuade Sheikh Mujib to join this front. But Manik Mia knew that the question which would be put to him in Dacca was whether a change from Ayub to a central government consisting of another set of Punjabi leaders could redress the accumulaetd injustices suffered by the Bengalis. He therefore pointedly asked whether those present would agree to proposals for transfer of the capital, or one of the services headquarters to East Bengal or to replace parity in representation with representation on the basis of population. To this question the reply offered was : "Let us wrest away power from Ayub, and then we will see how to set about distributing it among ourselves.

The Bengalis had not forgotten that these politicians had in their day, in the first decade of Pakistan, systematically discriminated

against the Bengalis. 'One-Unit' and 'parity' had been their brain-child. There was, therefore, some scepticism about the advantage to East Bengal of forming a common front of the kind proposed. Such a front could have some appeal for Bengalis if certain specific prior commitments were made to the Bengalis on the question of province-centre relationships, or in other words, on the question of regional autonomy which the Bengalis demanded.

Soon after Manik Mia's return, Ayub came to Dacca at the end of January. He invited the Bengali opposition leaders to meet him. Among the leaders who were invited apart from sheikh Mujib, then president of the Awami league, were a number of the 'old guard' leaders, Nurul Amin, Yosuf Ali Chowdhury, Hamidul Huq Chowdhury and others. In informal consultations prior to meeting Ayub, Sheikh Mujib decided to press the other Bengali leaders to agree to a common charter of demands to present to Ayub. He further pressed that in this charter there should be included a number of specific points defining the quantum of autonomy which the Bengalis considered to be essential for securing their interest. This was the occasion on which a number of specific points were put down on paper. Tajuddin Ahmed who was then the General Secretary of the party, put these points down on paper. Sheikh Mujib pressed Nurul Amin to commit himself to them. Nurul Amin and the older leaders baulked at putting forward what they regarded as too radical a demand for a degree of autonomy which would be a 'red rag' to Ayub. This, according to them, would reduce the chances of Ayub conceding to more 'moderate' demands, such as 'democratisation of the Constitution', through introduction of direct elections on the basis of universal adult franchise, parliamentary form of Government and association of opposition elements in a 'national government'. Sheikh Mujib was firm and stated that if they were not going to commit themselves to these points—the precursor of the six points—he would present these himself. The meeting itself with Ayub ended in fiasco, since Hamidul Huq Chowdhury, who claimed to lead off as the spokesman on behalf of the Bengali leaders, was quickly disowned by Sheikh Mujib Ayub Left without any serious discussion taking place.

The Punjabi opposition leaders convened a national conference of opposition leaders in Lahore on 3 February. Sheikh Mujib was among the Bengali leaders who were invited to attend. Manik Mia pressed him to attend, for it was realised on all sides that his absence would mean that the most effective opposition force in the East was not rep-

resented at the Conference. Manik Mia continued to urge moderation and attempted to persuade Sheikh Mujib not to press the specific point on autonomy. Sheikh, however, remained determind to press these points.

At the Lahore Conference, when Sheikh attempted to present his 'six-point' programme, Chowdhury Mohammed Ali, who was in the chair ruled it out of order. He would not even allow it to be included in the agenda. It was loudly whispered that the 'six-point' programme was something which was being introduced with the 'encouragement' of the Government to divide the oppo ition leaders and to prevent opposoition unity.

Sheikh Mujib upon being denied the opportunity to present his proposals to the Conference, walked out and released the text of this statement to the Press The assembled opposition leaders were furious but realised that the Bengalis, as represented by Sheikh, would not go along with them in the absence of a prior commitment, on the quantum of autonomy. The Lahore meeting, therefore, broke up, with a clear division having emerged, between the Punjabi leaders (with feeble support ftom old-guard Bengali leaders on the one hand) and Sheikh Mujib representing the emerging Bengali nationalism, which expressed itself in a demend for substantial regional autonomy.

The Government was quick to appreciate and exploit the situation. By highlighting that a militant nationalist trend repersented by Sheikh Mujib and his 'six-point' had emerged among the Bengalis, the Government sought not only to discredit the Punjabi opposition leaders as much for their failure to forge a united east-west opposition front as for 'betraying' the Punjabi interest by associating with Sheikh Mujib, whose six-points presented a grave threat to that interest. The Government in this way aimed once again to restore unity among the West Pakistani (Punjab) ruling elite, which had become divided, and a section of which was seeking to secure its interest through an opposition role.

The fact that the Government could exploit this situation to its advantage has led to the unfounded allegation, made by such persons as Bhutto and S. M. Zafar, Ayub's Law Minister, that Sheikh Mujib had been influenced by persons close to the Government to present this programme so as to wreck opposition unity. This allegation was palpably false, as the savage repression by the Ayub Government of the six-point movement was to demonstrate.

The 'six-point formula' was' set out in a written statement which was to have been placed before the Lahore Conference. This statement was published under the title 'Six-Point Fromula—Our Right to Live by Sheikh Mujibur Rahman' on 23 March 1966. It was presented as a statement of "basic principles of a firm solution of the country's inter-wing political and economic problems". It was emphasized that these demands were "no new points invented afresh by me or any individual, but are in reality long standing demands of the people and pledges of their leaders awaiting fulfilment for decades."

The six-points as fromulated in this statement were :

Point 1 : "The Constitution should provide for a Federation of Pakistan in its true sense on the basis of the Lahore Resolution, and parliamentary form of Government with supremacy of legislature driectly elected on the basis of universal adult franchise",

Point 2 : "Federal Government shall deal with only two subjects, viz: Defence and Foreign Affairs, and all other residuary subjects shall vest in the Federating States."

Point 3 :..."Either of the two following measures (should be adopted) with regard to currency :

A. Two separate but freely convertible currencies for the two wings may be introduced, or

B. One currency for the whole country may be maintained. In this case, effective constitutional provisions are to be made to stop flight of capital from East to West Pakistan. Separate Banking Reserve is to be made and separate fiscal and monetary policy to be adopted for East Pakistan."

Point 4: "Power of taxation and revenue collection shall vest in the federating units and the Federal Centre shall have no such power. The Federation shall have a share in the state taxes for meeting their required expenditure. The Consolidated Federal fund shall come out of a levy of certain percentage of all state taxes."

Point 5: "(1) There shall be two separate accounts for foreign exchange earnings of the two wings;

(2) Earnings of East Pakistan shall be under the control of the East Pakistan Government and that of West Pakistan under the control of the West Pakistan Government ;

(3) Foreign exchange requirement of the Federal Government shall be met by the two wings either equally or in a ratio to be fixed;

(4) Indigenous products shall move free of duty between two wings;

(5) The Constitution shall empower the unit Governments to establish trade and commercial relations with set up trade missions in and enter into agreements with foreign countries."

Point 6: A militia or para-military force shall be set up for East Pakistan.''

Point No. I gave expression to the basic demand for a parliamentary form of government to which almost everyone was committed. It acquired special significance in the context of the fact that in 1966. Ayub was governing under a Constitution which provided for an all-powerful President in a 'presidential' form of government. The demand for a Federation "on the basis of the Lahore Resolution" underlined the important point that the Resolution had contemplated that the Muslim majority provinces would be constitued into "Sovereign, autonomous states". The Resolution thus provided the basis for the calim that the constituent units of 'Pakistan' as envisaged by that resolution would be 'sovereign'. From this it followed that any association between them could only be on the basis of an agreement freely and voluntarily arrived at : any federation which they agreed to form would be of such character as they agreed to give to it. There could be no 'preconceived' model which could be thrust on them. Any federal government would only have such powers as were 'conferred' on them by the sovereign constituent units. The sovereign units were free to concede as much as little to a federal government, and could not be compelled to cede more to it than they consented to. In forming a federation, the situation would not be one of a previously unitary system being transformed into a federal one, through devolution of certain powers on organs of the constituent units, as had taken place in British India under the Government of India Act, 1935, but a 'true federation' where the constituent units by their common consent created a federal Government by ceding to it, or conferring on it, some of its powers.

This basic position was, perhaps deliberately obscured in the twenty-four years following the partition of India in 1947, when those who took it upon themselves to impose a Constitution for Pakistan st-

ood things on their head by thinking in term of grants of power to the provinces, and not of 'sovereign', constituent units granting powers to any federal government which may be established by common agreement conferring power on that government. No doubt the ruling minority which had acquired control over the Central government vested with substantial powers as were granted to the central government under the Government of India Act, 1935, found it in its own interest to protect this position. Indeed their consistent effort was to strengthen the position of the central government, even further, in the name of national integration. Indeed the Indian Independence Act had provided that until the Constituent Assembly framed a Constitution of Pakistan (as also India) the Government of India Act would operate as a 'provisional constitution' and provide the framework for relations between provinces and the centre contributed towards obscuring the fact that the constituent units were in principle 'sovereign' and not 'provinces' enjoying devolved powers handed down by some all-powerful centre, as historically had been true of British India before 1947.

Point No. 2 provided for a two- subject centre, or if currency were to be included a three-subject centre ; The antecedents of this demand were there in the Cabinet Mission plan of 1946, which proposed a three-subject Centre, entrusted only with Defence, Foreign Affairs and Communication. The Grand National Assembly of Democratic Forces, a convention of political groups, in opposition to the government, which met in Dacca in early 1950, also proposed a federation, called the United States of Pakistan, in which the centre would only deal with three subjects : Defence, foreign Affairs and Communications. The United Front which had been formed by the opposition parties to contest the ruling Muslim League in the provincial elections in East Bengal in 1954, had as one of the points on its 21-point manifesto, that the constitution should provide for a federation in which the centre would only have three subjects : defence, foreign affairs and currency. Thus, the second point, in the six-point formula was a reiteration of a point which had been adopted as one of the basic points relating to the constitution, viz., distribution of powers between the centre and the povinces under a federal constitution.

Points No. 3, 4 and 5 were specifically aimed at securing for the region, for the Bengalis, control over their own resources and the powers of managing the economy. The feeling that East Bengal, despite being the majority province was not obtaining a 'fair deal', was wi-

dely shared since the earliest days of Pakistan. Initially, there was a feeling of being discriminated against in the allocation of federal fund, in the allocation of foreign exchange and in the matter of recruitment to public services by the central government. The conviction grew that East Bengal was not getting its due. From the middle of the fifties through the sixties this view was given sharper definition through statistical demonstrtion of economic disparity in the writings of Bengali economists. These writings had highlighted the discriminatory policies which had resulted in the marked disparity in the economic development of the two wings of Pakistan, the East having been prejudiced by systematic discrimination in favour of the western wing.

The principal instrument torough which a substantial transfer of rosources from the eastern to the western wing had taken place was perceived to be federal control over economic management. The main thrust of the six point scheme was therefore to regionalise economic management.

The germ of the six point proposal had appeared as early as 1962 in a pamphlet entitled The Challenge of Disparity Published in Dacca. It had urged that the only practical measures to redress disparity would be certain basic institutional changes which it outlined as follows : dismantling the Central planning Commission and replacing it by two powerful regional planning bodies, and the bifurcation of the Ministries of Finance and Economic Affairs. It was even suggested that aid requirements should be separately assessed region wise and that the regional bodies should actively participate in forming foreign aid policy. In this recommendation was the seeds of the idea of regionalising economic management i. e. transfer to the regions of the power to tax, the power to make fiscal and monetary policy, the power to plan and control resources and to conduct foreign economic relations.

The analysis of the economists had shown that the main instruments through which transfer of resources had been made from eastern to the western wing were control over foreing trade, foreign exchange and foreign aid. The foreign exchange earned through exports of jute and jute products from the East was consistently allocated for the economic development (including industrialisation) of the western wing. Projects in the eastern wing were not promoted with the foreign aid agencies with the same vigour as were projects in the western wing. vast investments in irrigation agriculture and industries of the western wing had kept on widening the disparity between the two wings.

It is important to understant this since when ultimately the six-point formula was proposed, the most unyielding resistance which was offered to it related to the points involving foreign trade and aid. The western ruling elite were not prepared to relinquish the instruments through which they had been able to dominate the economy.

Ayub's reaction, therefore, to the six-point programme, was to repress it with force. He levelled the six-point programme as a scheme for secession and declared that he would respond to it "with the language of weapons".

Sheikh Mujib and the Awami League, sensing the mood of the Bengalis, took the six point programme to the people and a mass movement began to grow in its support On April 18 Sheikh Mujib was arrested and on May 9 he was placed in detention under the Defence of Pakistan Rules. On June 7, 1966, a special protest day was observed in support of the six point movement Ayub s Government moved to suppress it with force. The demonstration was fired upon, claiming a number of lives. Large-scale arrests followed and the newspaper which was the main spokesman of the Bengalis the daily 'Ittefaq' was closed down, its editor arrested and its press forfeited.

In the face of such repression, the movement faced a setback The initial response was to take these matters to court-through writ petitions in the High Court.

At the end of Decemder 1967 the atmosphere suddenly became tense and the air was filled with rumours. Ayub Khan who was visiting the Eastern wing was due to visit the Dawood complex in Chandraghona in the Chittagong Hill tracts, suddenly cancelled his visit It was given out that the cancellation was due to apprehension of an assassination or kidnapping plot That the cancellation had been a last minute one was evident from the fact that Chittagong and the road to Chandraghona had been suitably decorated for the Presidential motorcade; but no motorcade had passed that route.

Sometime in the last week of December, a barrister colleague of mine, Amirul Islam, reported that he had interviewed a client in jail who complained of having been subjected to severe torture and bore marks of torture on his Person. He said that while subjected to torture he was pressed to implicate persons in a 'conspiracy' case. Amirul Islam was very worried and sought advice as to what he should do. It was

suggested to him that steps should be taken inmediately to bring this to the attention of the High court and press for a medical board to examine the person The same evening a petition was prepared to the High Court alleging torture and asking for a medical board to examine the victim. The petition created great interest, and the court was persuaded to constitute a medical board. The person in question was Kamaluddin Ahmad, who later was to be approver No. I in the 'Agartala Conspiracy Case'.

A few days later a series of arrests started. Ahmed Fazlur Rahman, Ruhul Quddus, Shamsur Rahman, all senior Bengali members of the Pakistan civil service, and a number of Bengali armed forces personnel were arrested. Ahmed Fazlur Rahman was the first of the Agartala Conspiracy case accused to seek a lawyer's interview, and named me as his lawyer. I met him in jail at the end of the last week of December 1967 or the first week of January 1968. He reported that immed iately after his arrest he had been taken to a flat in the new residential area of Banani in Dacca, where he was continuously interrogated for several days. The interogators wanted him to implicate persons in a 'conspiacy' case. While these arrests continued the atmosphere continued to grow tense Indeed, even lawyers acting for the arrested persons felt vulnerable to arrest. A habeas cropus application was moved for Ahmed Fazlur Rahman. The same day Barrister K.Z Alam approached me to move an application on behalf of Lieutenant Commander Moazzem, He was advised that different lawyers should appear for each of the arrested persons as a common legal front would tend to show 'links' between these persosn, an impression which should be avoided in a 'conspiracy' case. Ishtiaq Ahmed had then taken up Lieutenant-Commander Moazzem's case. Kamaluddin Hossain, Ruhul Quddus' brother-in-law, hnd taken up the petition for Ruhul Quddus. When the petition was moved in the High Court, the Government lawyers appeared and stated that some investigations were proceeding against these persons. The first of the Government press reports issued in early January did not name Sheikh Mujibur Rahman as an accusd. It was the official press release on January 20, which for the first time named Sheikh Mujibur Rahman as the principal accused.

For the next five months the entire case was covered by a blanket of secrecy. No information was given about the location of the accused who had by then been shifted from jail and placed in military custody. An Ordinance was promulgated to provide for trial by a Special Tribunal.

The special tribunal consisted of S A. Rahman, Judge of the supreme Court, and two Bengali High Court Judges, M R Khan and Maksumul Hakim. The trial seemed political from the very beginning. The main evidence presented was the testimony of approvers, who, when produced at the trial, alleged torture and tended to turn into 'hostile' witnesses.

Some time after the trial had commenced, Tom Williams QC MP, a British barrister engaged by Bengalis in London, arrived in Dhaka to join the team of defence counsel. Since there was already a full team of trial lawyers led by Salam Khan, it was arranged that Tom Williams should conduct the cross examination in the trial for one or two days and that thereafter he would serve a writ petition in the High Court. I was associated with Williams in the preparation of the writ petition and drafted the petition. The petition was moved by Williams and a rule was issued by the High Court. The High Court, however, declined to make any interim order. In the meantime Williams complained of being continuously shadowed by Ayub's police and intelligence men. His car was being followed, and worse was to come later, when his room was broken into and his luggage and papers ransacked. He was also served with a demand for payment of imcome-tax. Having spent about a week and suffered much harrassment, it was agreed that Tom Williams should return to England. His visit and participation in the case had served the purpose of drawing international attention to the case. Peter Hazelhurst, the new correspondent of the Times (London) helped in this by sending a series of reports on the case and in particular the harrassment to which Tom Williams had been subjected.

The progress of the case and the daily publication of the verbatim proceedings of the trial sustained a high degree of popular interest in the case. If the Ayub Government had thought that this case would discredit Sheikh Mujib, it had exactly the opposite effect. It generared sympathy, as Sheikh Mujib presented the image of a leader who was being victimised for championing the cause of the Bengali people. The grievances of the Bengalis also received extensive publicity and contributed towards heightening their sense of injustice.

Ayub had been seriously ill in the early part of 1968, and this had served to weaken his grip on the administration. Speculation about a possible successor had begun. The Army Commander-in-Chief and ambitious men in the wings, like Bhutto, saw in Ayub's debility an opportunity for themselves.

Towards the end of 1968, with grievances accumulating in both wings objective conditions were ripe for popular movement of against Ayub. In November 1968 police action against students in Peshawar triggered off demonstrations in which some students were iujured. Bhutto, then present in Rawalpindi, capitalised on this incident and a popular agitation began to develop.

In the first week of December 1968, at the end of a public meeting, Maulana Bhashani gave a call for a hartal (strike) on the following day, The hartal was widely observed and had a tremendous affect in galvenising popular forces in the eastern wing Political leaders met to decide further steps they should take and decided to call a province-wise hartal on December 13 Maulana's attempt to call for hartal on December 8 did nat prove to be a success. At a time when the proclamation of emergency was in force in the country, with the full vigour of the military to back it and with the entire resources of the government deployed to frustrate the hartal, its total success demonstrated the extent of popular opposition to the government. The people obviously were ready for a movement. The students who had always been the militant and activist elements responded rapidly to this situation and organised themselves to lead a popular movement. A Student Action Committee was formed with representatives of leading student organisations in East Pakistan. It was the formation of this Committee that brought Tofael Ahmed, the Vice President of the Dacca University Central Students Union (DUCSU), into prominence as he became the convener of this Committee.

The Students Action Committee produced an 11 point charter of demands. Indeed, a breakdown of the 11 point programme would show that under point No. 1 alone more than 15 separate demands relating to separate aspects of education were included, ranging from "Tuition fees must be reduced by 50 per cent", 'polyteennic students must be offered facilities of a condensed course," to such general demands as "the mothar tongue must be used as medium of instruction at all levels of education", and "education must be made compulsory and free up to class VIII." These were followed by a comprehensive charter of political and economic demands. The substance of the Six-Point programme of the Awami League was fully embodied, though with some interesting changes in formulation. It also called for full regional autonomy to be given to former provinces and for formation of a sub-Federation in the Western Wing. Implicit in this was a demand of dissolution of One Unit

Repeal of repressive laws and release of political prisoners was also included. Significantly, the withdrawal of the Agartala Conspiracy case was also demanded In foreign affairs, there was a demand for quitting CENTO, SEATO and "Pakistan-US Miltarary Pacts" and to formulate a 'neutral and independent foreign policy." In the economic sphere nationalisation of banks, insurance companies and all major industries including jute was demanded. For the peasants redusction of tax and land revenue was called for and a demand was included for writing off arrears of land and loans outstanding from peasants. The minimum price of Rupees 40 per maund of jute was demanded. For industrial workers fair wages and various welfare benefits were demanded together with repeal of "anti-worker black laws." Flood control measures were also demanded. The 11-point progrmme of students thus became a comprehensive charter of demands and with that before them, the students launched their movement.

Such a comprehensive charer of demands was significant on more counts than one. The inclusion of the substance of the six-point programmes meant that these were not only the demands made by one political party, but that these had enlisted support form all the major student groups having divergent political affiliation and thus had become the basic political demand of the entire people of East Pakistan. By spelling out the economic demands the students were ensuring that any successful political struggle must also bring about economic salvation of the people which lay in the adoption of socialistic measures. The foreign policy element in the charter also set the goal for the country to take an independent and non-aligned course.

The political leaders, in the meantime, were also holding meetings to chart out courses of action and were maintaining close contact with the students. With Sheikh Mujib and the front rank Awami League leaders in jail, it was left to Syed Nazrul Islam to represent the party in deliberations with other opposition leaders. Following a successful hartal on January 6, the opposition leaders both from the east and the west wing—representing the Awami League, National Awami party (Requisitionist), KSP, Awami League (PDM), Council Muslim League, Jamat-i-Islami, Nizam-e-Islam, and the National Democratic Front—met on January 10 in Dacca.

I returned from a meeting of the Central Bar Council in karachi to find that the leaders were still finding it difficult to agree upon a common charter of demands. The main obstacle to agreement arose

from unwillingness of the Punjabi leaders to endorse the Six-Point autonomy formula There was also reluctance to press for withdrawal of the Agartala Conspiracy case. The Awami League leaders insisted upon the inclusion of these points in the common charter as a condition for their participation in the Democratic Action Committee which was proposed to be set up.

These deliberations among the opposition leaders of the two wings reflected the divergence in the aims of the political leaders of the two wings. This divergence was glossed over at this stage by including a common demand for a "federal parliamentary Government" The 11-Point programme on the basis of which the students had launched their popular movement, however, had already incorporated the substance of the Six-Point programme as an integral part of their programme.

The popular movement continued to escalate. The Democratic Action Committee which had been formed called a "National protest Day" on January 17. It had decided, if necessary, to violate any orders prohibiting processions under Section 144 of the Criminal procedure Code. Indeed the Democratic Action Committee Leaders assembled in front of Bait-ul-Mokarram in the centre of the city and symbolically violated the Order under Section 144. This was significant enough since it was the first time that political leaders committed to constitutional politics had, by a deliberate act, violated the law. Students who represented the militant wing of the popular movement were not content with symbolic defiance. A massive procession of students set out from the University and was confronted by the police, who opened fire. A young student, Asad, was killed. The blood of martyrs is the most powerful fuel for popular movements After Asad had laid down his life the leadership of the movement virtually rested with the Students Action Committee rather than the DAC. The agitation intensified throughout the eastern wing and, despite the fact that a proclamation of emergency was still in force, massive demonstrations and processions became the order of the day. Policy firing claimed further young lives and the military were deployed to aid the police. Practically every order of the law-enforcing agencies was met with defiance, the curfew imposed in the cities was violated every now and then and, in some cases, a kind of resistance was put up against the army. In their attempt to enforce law and order the army resorted to indiscriminate firing that killed among others, a schoolboy in a procession, a housewife in her home, a child on her mother's lap and a university teacher within the premises

of his campus. The government had completely collapsed in the face of intense agitation. In the countryside the local action committees had virtually replaced the law-enforcing agencies. In the urban areas the student leaders were invited to settle disputes between the management and the labourers who were demanding higher wages and better working conditions

The popular agitation in the western wing had also been gathering momentum. It was clear that Ayub's government which had only a few months ago celebrated the completion of decade of progress under the army-man was now under heavy pressure from all corners to meet the demands of the people.

It was about this time that I came into contact in connection with a court case with Manzoor Quader, who was in Dacca as the Chief Prosecutor in the Agartala Conspiracy case Since he appeared to be disturbed by the mounting agitation, I took the opportunity to urge upon him that the Ayub Government should read the writing on the walls and concede to the popular demands rather than be guilty of offering the people 'too little too late'. He reacted by saying that he would press Ayub to concede to popular demands, but having said this, fell back to a defence of the 1962, Constitution of which he was the architect. He went to the length of claiming that 1962 Constitution had created conditions which had contributed to the launching of the present agitation and thus seemed to claim credit for the popular awakening.

Ayub Khan faced with this situation announced in his first-of-the month broadcast on February 1, 1969, that he would invite opposition political leaders for talks. These proposed talks soon came to be described as the 'Round Table Conference' Ayub addressed a letter to Nawabzada Nasrullah Khan, as representing the Democratic Action Committee, to invite opposition leaders for talks in Rawalpindi on February 17, 1969.

This move was seen as demonstrating the strength of the popular movement and the growing weakness of Ayub. The Democratic Action Committee called for lifting of the martial law and release of all political prisoners as a condition precedent for coming to the negotiation table. In this context the withdrawal of the Agartala Conspiracy case and the release of Sheikh Mujib acquired particular urgency. The most important component of the Democratic Action Committee in the East, the Awami League, made it clear that withdrawal of the case and release of Sheikh Mujib would be for them the minimum condition for joining the talks.

The Punjabi leaders of the Democratic Action Committee and indeed some of the old guard Bengali leaders showed some ambivalence about pressing for withdrawal of the Agartala Conspiracy case and release of Sheikh Mujib. In discussion with Awami League, they hinted at legal difficulties and urged that the release of Sheikh Mujib and withdrawal of Agartala Conspiracy case could be secured during the talks. It was clear that their opposition stemmed mainly from their realisation that Sheikh Mujib's participation meant that the Six-Point programme would become central to any negotiated Political settlement. It was however realised, particularly by the other Bengali leaders that any attempt on their part to arrive at a settlement, by-passing the Six Point demands or Sheikh Mujib, would be repudiated by the Bengali people and leave them completely compromised Awami League continued to be firm about Sheikh Mujib's release as a precondition for participatian. Under such pressure, the Democratic Action Committee raised this matter with Ayub. Ayub parried by saying that since Sheikh Mujib was under trial, there were "legal difficulties" involved.

I was in close touch with the opposition leaders and in particular with Manik Mia, Editor of the datly 'Ittefaq'. Having come close to him since June 1966 when he had been detained and the Ittefaq had been closed down and I had been engaged to take up these matters in the High Court. Manik Mia's house was the meeting place of the opposition leaders and in particular of the political and student leaders. Manik Mia attached importance to Sheikh Mujib's release and to his participation in the Round Table Conference. In discussion with him I indicated that legal manoeuvres could be initiated to assail the trial and thereby create further pressure for the release of Sheikh Mujib.

While all this was under way, I received a message that Sheikh Mujib wanted me to come to the court room, where the trail was taking place. I hastened on the following day to meet him in the Court Room. Sheikh Mujib appeared disturbed by the position adopted by Abdus Salam Khan, his Chief Defence Counsel, who represented the break away (PDM) wing of the Awami League. Salam Khan had begun to press Sheikh Mujib not to insist on withdrawal of the case or his release as precondition for Awami League's participation in the Round Table Conference. He had, it appeared, even extended a veiled threat that he would not be able to conduct the defence further if Sheikh maintained a "rigid position." Sheikh Mujib was angered by this and urged that I should formally enter appearance as a Defence Counsel and should also pursue legal steps to assail the trial. He also agreed that steps might be taken

obtain assistance from A. K. Brohi, who had appeared in the Ittefaq case. I acted on these instructions.

With the movement acquiring greater and greater strength, the police and indeed Governor Monem Khan and his civil administration itself began to recede into the background. It was General Muzaffaruddin, the General Officer Commanding, who began conspicuously to appear as the representa tive of the Islamabad authorities. It also seemed that Yahya, the Commander-in-Chief of the Army had begun to seek a direct appreciation of the situation in the East through his General Officer Commanding. I recall Muzaffaruddin in a meeting in January with Manik Miah impressing on him that Yahya had asked for an appreciation of the situation from him and he also believed that a political solution should be attempted. He undertook to convey any views that were expressed to Yahya. It seemed very significant that Yahya, who was Commander-in-Chief. had already begun to take what appeared to be independent initiatives. The importance of the withdrawal of the Agartala Conspiracy Case so that Sheikh Mujib would be free and only then could negotiations for a political settlement commence, was impressed upon the General Muzaffaruddin almost within 24 hours, reported that he had conveyed to Yahya the points made to him and that Yahya had indicated that if a leagal way could be found for Sheikh Mujib's release, this could be considered.

I was urged by Manik Mia to take legal measures to assail the trial. With this end in view, I flew to Karachi for legal consultations with Brohi and arrived in Karachi on February 14, on which a nation-wide hartal was being observed, and was impressed to see that life was completely paralysed in Karachi. I had to walk on foot from my hotel to Brohi's residence. Brohi readily agreed to help in formulating a legal attack on the trial but said that he must come to Dacca to examine all the papers, including the evidence so far recorded in the case. I flew to Dacca the same evening and Brohi arrived the following morning. After going through the parpers, it was found that a strong point was available to challenge the legal validity of the trial. By now, it was clear that the proclamation of emergency was being revoked. Upon the revocation of that proclamation, the fundamental rights provisions of the 1962 Constitution would once again become operative. As soon as this happened, it would be argued that the trial could not proceed on the ground that the special tribunal, with its special procedures, violated the fundamental right guaranteeing equality before the law and equal protection

of the law to all citizens. A notice was therefore drawn up to be served on the Government, calling upon it to withdraw the case and to release Sheikh Mujib and other accused. Brohi together and myself presonally handed over this notice to Manzoor Quader. Manzoor Quader considered that there was substance in the point raised and undertook immediately to contact Ayub on the telephone.

While this matter was being discussed with Manzoor Quader, he received a telephone call and appeared visibly agitated at what was reported to him over the telephone He informed that he had just been told that Sgt. Zahurul Haque, one of the accused in the Agartala Conspiracy case, had been shot dead by a military guard and that two other accused persons had been injured His agitation showed that he understood the gravity of the situation. It was clear that there would be popular outrage when this news would be revealed. I was personally very upset because Sgt. Zahurul Haque was the brother of a friend and colleague, Advocate Aminul Haque, who had indeed, only a few days earlier, obtained my commitment to appear to present arguments on behalf of his brother. The urgency of the need for compliance with the notice served on him was impressed on Manzoor Quader.

Zahurul Haque's funeral was fixed for the afternoon. Immmediately after the janaza (funeral prayers) at Paltan, I accompanied by a number of friends, left for the Azimpur burial-ground. At least two hours had passed and the body still did not arrived. This had begun to cause concern. It was learnt that the processionists, while trying to get some flowers from the garden of a minister's house, had been fired upon. Some of the processionists, outraged by this had attacked the house occupied by the ministers, and followed it with attacks on other official residences, including one occupied by the presiding judge of the Agartala Conspiracy case, and set them on fire.

Immediately after the burial, I proceeded to the hotel where Brohi was staying and witnessed many houses burning on the way. I found Manzoor Quader with Brohi. He said that he had already spoken to Rawalpindi but had received no reply. Manzoor Quader was emphatic that the trial could no longer continue in view of the popular emotions released by the death of Zahurul Haque, which had already led to the burning of the residence of the presiding judge. Manzoor Quader claimed that it was no longer realistic to expect that the trial could continue. He even made a philosophic point, namely that the object of a trial was to convince the public that accused persons were guilty and that therefore justice demanded that they be punished. In a case, where the public had

already made up its mind that the accused were not only 'not guilty but were 'heroes', as was evident from their behaviour, there was little point in continuing with the trial. It was agreed that both Manzoor Quader and Brohi would leave for Rawalpindi the following morning and pursue the matter of the legal notice served on the Government to withdraw proceedings and to release Sheikh Mujib and the other accused persons. Two days had already passed and no response had been received Brohi had left for Karachi and informed me over the telephone that the notice was still being studied by the Law Ministry.

Obviously the Round Table Conference could not start on 17 February and in view of the mounting tension I was urged to travel to Rawalpindi to make further efforts to secure the release of Sheikh Mujib. Tajuddin Ahmed, who had just been released from jail, Amirul Islam and myself reached Rawalpindi on 17 February. An air of crisis prevailed since Sheikh Mujib had not been released and consequently the Democratic Action Committte was unable to sit at the Conference table with Ayub. Manzar Bashir, an Advocate, who was associated with the opposition, volunteered to see the Law Minister Zafar late at night to find out the position. I was informed almost at midnight that he could see Zafar the next morning. Zafar made some noises about "legal difficulties" but when pressed to respond to the legal notice, he said it was not only a matter of law but of a political decision at the highest level.

It was impressed upon him that the notice merited a clear reply and that one should be given without further delay. He said the matter was being considered by the Cabinet the same morning and that he would let me have a reply by mid-day. He also asked for a further notice or a summary of the notice to be given to him. Within an hour a fresh notice was sent to him. At around 12.30 Zafar telephoned me to say that he would meet him at the hotel where he was staying. He came and reported that after protracted discussion, the Cabinet had decided in the negative, namely that they could not accede to the demand contained in the notice. My reaction was one of indignation, which I shared with Manzoor Quader, who appeared on the scene. He, too, expressed displeasure at the negative attitude of the Government. He said he would talk to me later in the afternoon and then he began to talk to Zafar.

That afternoon Manzoor Quader telephoned to ask me to see him in his room in the same hotel. He had barely entered his room when Zafar arrived. They (Manzoor Quader and Zafar) then proposed that the Government was ready to make an announcement that Sheikh Mujib

could join the Round Table Conference as "a free man." When asked to clarify the legal position, Zafar was reticent and said that this was the only formula which he could persuade the Government to accept. They urged that I should convey this to Sheikh Mujib.

Tajuddin, Amirul Islam and myself flew to Dacca via Lahore & Karachi, as that was the only route by which Dacca could be reached by the following morning. We were met by Asghar Khan at the airport at Lahore and Brohi at the airport in Karachi. Manzoor Quader had assurad me before departure that he would try to see Ayub in the course of the evening once again to press him to accept the demand contained in the notice.

It was the night of the 18/19 February A telephone call was made to Manzoor Quader from the Karachi airport. Manzoor Quader explained that he had been sitting throughout the evening to meet Ayub but was told that Ayub was engaged in a meeting He expressed his amazement at the fact that Ayub was still closeted in a meeting even though it was past midnight. He said that was perhaps the only time when he had wanted to see Ayub and been unable to do so. He confided that in the circumstances it seemed that some very extra ordinary meeting was taking place.

It later transpired that this was the fateful meeting in which Ayub had called in his three Service Chiefs. Ayub urged the Service Chiefs to support proclamation of martial law and the deployment of the military to suppress the popular movement. The Service Chiefs refused to go along. Obviously Ayub had become a political liability and as events were to show, Yahya had his own ambitions. If the army had to be used to suppress the people, it would do so to serve the aims of Yahya and the coterie around him and not those of Ayub and his collapsing Government.

Yahya's adviser has corroborated this version of evidence when he reported on the meetings between Ayub and the armed forces leaders in February 1969 as follows:—

> As I gathered from Yahya himself after I joined his cabinet in 1969, a series of meetings between Ayub and the top armed forces leaders took place in February 1969. This account was also substantiated by General Akbar and by some members of the Presidential House staff, who can sometimes provide a better account of the "inside story." The chiefs of the

Army, Air Force and Navy and their aides had joint and separate meetings with Ayub. The most crucial meeting took place in mid-February when the three chiefs (General Yahya, Air-Marshal Nur khan and Vice-Admiral Ahsan) were to tell Ayub to work for "a political settlement" and not to rely on the military forces to suppress the revolutionary movement. The most interesting part of this crucial conference was: who was to break the unpleasant truth to the boss?—there was pause, hesitancy and silence. Ahsan of the Navy would not take the initiative, as he wanted to maintain his posture of neutrality; for Yahya it was a delicate time—Ayub had made him Commander-in-Chief, by-passing a few senior generals. Ultimately, the task fell to the outspoken chief of the Air Force, Nur Khan. The army chiefs agreed to use the armed forces only to the minimum extent needed to keep the administration functioning and prevent the situation from being exploited by any foreign country presumably India.

For Ayub the advice to seek a political solution must no doubt have come as a shock. After being the unchallenged chief of the armed forces for the last eighteen years (1950-68), he was being repudiated by them. He is reported to have told a visiting dignitary, "perhaps they are now tired of seeing my face"

While this abortive encounter was taking place between Ayub and the Service Chiefs, My colleagues and I were travelling to Dacca to report to Sheikh Mujib on what had transpired at Rawalpindi.

Immediately on arrival at the Airport, Manik Mia received us and we proceeded to the Cantonment When Sheikh Mujib was told of Zafar's proposal that he could proceed to Rawalpindi on the basis of an announcement that he was a 'free man,' Sheikh Mujib immediately rejected this as an unacceptable proposition He said how was it possible for him to leave on this basis as his position would be that of a fugitive from custody and people would be free to shoot him down as they had shot Zahurul Haque He said a legal notice had already been served assailing the trial, and it was for them to accept it. Also, he would not countenance walking out while the other accused remained in custody.

When I informed General Muzaffaruddin of this, he said that he should speak to Zafar over the telephone. Zafar was then told that the formula suggested by him was unacceptable to Sheikh Mujib and that whether he could accept the notice or the matter would be proceeded

with in the High Court and the High Court could make an order of release. Zafar said that he would telephone after some time. He telephoned to say that the High Court procedure would be time-consuming and instead the Tribunal could be asked to sit and to grant an interim order to release Sheikh Mujib and this would be in the nature of a release on bail.

Sheikh Mujib was informed of this development. He said that there was no question of his applying for bail. In the meantime, the two Bengali judges of the special tribunal had been brought to the Cantonment and also one of the prosecuting lawyers, who proposed that Sheikh Mujib may be released on bail. When my colleague, Amirul Islam, went to Sheikh Mujib to inform him of this development, Sheikh Mujib firmly rejected the proposal to release him on bail. He was infuriated by a report which had been broadcast while Amirul Islam was talking to him, to the effect that Sheikh Mujib was being released on bail.

Hearing that Sheikh Mujib might be released that evening, thousands of people had started walking down the Airport Road to the Cantonment. In view of Sheikh Mujib's firm refusal to be released on bail, a military vehicle had rushed out with loudspeakers to inform the people that no release was taking place in that evening. In the meantime, Khawja Shahabuddin and Admiral A. R. Khan, members of Ayub's cabinet, had arrived in Dacca As I was leaving Sheikh Mujib after reporting to him that we had told the tribunal of his position, Admiral A R. Khan and Khawja Shahabuddin were seen entering to talk to Sheikh Mujib.

It was clear that Ayub was floundering. In retrospect, it is evident that the Service Chiefs had made it clear to him that a military option was not open to him He therefore had to negotiate with political leaders. This option was only available to him if Sheikh Mujib would be released, since negotiations excluding him, would have little relevance so far as the eastern wing was concerned.

The next morning at about 11. 30 the report spread through Dacca that Sheikh Mujib was released. They had fallen back on the formula waich had been suggested a month earlier in the legal notice that the trial was constitutionally invalid and therefore the entire trial had to be abandoned.

Sheikh Mujib emerged as a great National Hero and the unquestioned leader of the mass movement which had developed in East Bengal. He took the position that he would only consider going to Rawalpindi for the Round Table Conference after he had addressed the people in a

public meeting in Dacca and received their mandate. A mammoth public meeting of over a million pledged their support to his Six-Point autonomy demand and conferred on hin the title of 'Bangabandhu' (The friend of Bengal).

Sheikh Mujib then obtained from them a 'mandate' to go to the Round Table Conference, where he said that he sould place the demands of the Bengali people. He pledged that if these demands were not accepted, he would return and continue the movement but would not compromise.

Sheikh Mujib, accompanied by party leaders, left for Rawalpindi to join the opening session of the Round Table Conference. I was asked to accompany the delegation By a curious coincidence, Bhutto and Sheikh Mujib were travelling by the same plane to Lahore Bhutto and his colleagues were in the first class, while Sheikh Mujib and his delegation were in the economy class. This gave Sheikh an opportunity for the obvious dig that the Awami League was really the party of the people, while the People's Party was the "big people's party". Bhutto had met Sheikh Mujib in Dacca, and taken the position that he would not go to the Round Table Conference (RTC), as he felt that it was bound to fail. It is noteworthy in this context that Moulana Bhashani had taken the same position. I recall the meeting between Nawabzada Nasrullah and Moulana Bhashani in February, when Moulana while reiterating that he would not go to the RTC, but he wished it success for if any good came out of it, he would share in it He had then raised his hands and prayed for the success of RTC.

At Lahore airport separate groups had come to receive Bhutto and Sheikh Mujib. Among those to receive Sheikh Mujib were Air Marshal Asghar Khan and General Azam. Bhutto suggested that Sheikh Mujib should come down from the plane together with him. Those who had come to receive Sheikh opposed this. Bhutto therefore disembarked from the plane and boarded a truck, which, followed by a substantial crowd, left the airport. Sheikh Mujib and his party then came down and, followed by a very large crowd, left in a separate procession towards the city, where a short stop-over had been arranged.

The party reached Rawalpindi the same evening. A meeting of the Democratic Action Committee (DAC) was held, but because of the constraints of time no substantive discussions could be held. The following morning the formal opening of the Round Table Conference took place Since Eid-ul-Azha was in the offing and need was felt for

consultations among participants, it was agreed that the Conference should be adjourned for about 10 days to reconvene on 10 March. It was decided that the Democratic Action Committee should meet in Lahore for a couple of days, before the Round Table Conference was resumed, in order to enable the participants to consult and formulate a common negotiating position.

On returning to Dacca, Sheikh Mujib suggested that I should sit with a working group of "experts" (mainly economists and other academics) to formulate constitutional proposals to give effect to the Six-Point Scheme. This was felt to be necessary to meet the criticism that the Six-Point Scheme was unworkable, and that no viable federal structure could be designed around it. The werking gurup held several meetings during which specific constitutional proposals, and alternative negotiating positions were formulated. Attempts were made to anticipate the objections which would be raised and to prepare answers to them.

Sheikh Mujib left with his eolleagues for Lahore on 6 March 1969 I was asked to join the delegation in Lahore and to proceed to Rawalpindi, as an adviser. It was also supposed that Dr. Sarwar Murshid and Dr. Muzaffar Ahmed Chowdhury should be requested to join the delegation. Upon reaching Lahore, it was learnt that it was proving difficult for agreement to be reached on a common charter of demand, as a basic divergence was emerging between the leaders representing the different regions.

Sheikh Mujib had avoided attending the DAC meeting, and stayed back in his hotel room on the ground of indisposition. In fact, he was keeping away from the discussions, which were tending to run into an impasse, as the Punjabi leaders were vigorously opposing the inclusion of the Six Point autonomy demand in the common charter of demands. It was argued by the Awami League supprted by National Awami party that the agreed eight points of the Democratic Action Committee covered both the questions of regional autonomy and the undoing of One Unit, since the Democratic Action Committee had committed itself to a "federal parliamentary government." It was urged that the "federal" character had to be spelt out and for that purpose it was necessary for the Democratic Action Committee to take a position on the question of regional autonomy and dissolution of One Unit. Chaudhri Muhammad Ali, a redoubtable Punjabi, a former senior civil servant, indeed a former prime Minister, consistently opposed the adoption of a

common position on regional autonomy or dissolution of One Unit. When it was put to him that it was necessary to spell out what was meant by 'federal', he countered by arguing that everyone knew what 'federal' meant and in any case, the meaning could be looked up on the Oxford Dictionary! Sheikh Mujib and the Awami League supported by the National Awami Party insisted on the inclusion of the Six-Points demand for autonomy in the common charter of demands as a condition for their participation in the Round Table Conference. They pointed out that the Conference had been convened under the pressure of a mass movement. This movement had articulated its constituational demands, which were set out in the 11 point programme. This included regional autonomy on the basis of the Six Points formula and dissolution of One Unit.

As a result of such a polarisation within the Democratic Action Committee, a meeting of the East Pakistan Regional Democratic Action Committee was hurriedly convened at Chamba House. It was impressed upon all the Bengali representatives that, given the state of public opinion in the East and the tempo of the 11 point movement, the Bengalis at least should adopt a common position on Bengali demands and in particular the demand for full regional autonomy. A unanimous resolution was adopted, making a five-point recommendation to the Central Democratic Action Committee. Among these five points were full regional autonomy and dismemberment of One Unit. The Central Democratic Action Committee had set up a special Committee to hammer out if possible, a common position on regional autonomy. This committee had, however, deadlocked, since the Punjabis had steadfastly opposed regional autonomy on the basis of Six-Points. Metaphysics and jurisprudence were invoked to argue that neither the Democratic Action Committee nor Ayub's legislature had a 'mandate' to deal with the question of regional autonomy. This was countered by the argument that the Democratic Action Committee and the legislature had as much competence to deal with regional autonomy as it did to consider other constitutional amendments which were being proposed.

In the meantime I had thought it would be useful to strengthen the team of experts by the addition of economists. Dr Anisur Rahman who was then Professor of Economics at Islamabad, was invited to join the team in Lahore. He, together with Professor Wahidul Haque, who was also in Islamabad and Dr. Muzaffar Ahmed Chowdhury, who had arrived from Dacca, joined the team on the following day.

Following the deadlock in the sub-committee, the Punjabi leaders, including Moulana Maudoodi, Mumtaz Daulatana and Chaudhry Muhammad Ali, came to Sheikh Mujib's room in the evening on March 8, and pressed that the 'six-point' autonomy demand should not from part of the common charter of demands. Sheikh Mujib was firm on the point that he and his party could not join the Round Table Conference unless they could press their demand for regional autonomy on the basis of the Six-Point formula. When some of the Punjabi leaders argued that the Six-Point scheme was unworkable, Sheikh Mujib said that he had brought with him experts who could sit with any experts which they (the Punjabi leaders) might nominate to discuss in detail the implications of the Six-Point formula. It was at that point that we were sent for. A brief discussion was held between Chaudhri Muhammad Ali and some of Sheikh Mujib's experts. Chaudhri Muhammad Ali struck a posture that these issuses were "too complex" for him and said that their side was not "lucky enough" to have to many experts.

A points of crisis was reached when the unyielding Punjabi leaders, adamant in their refusal to include the Six-Points autonomy formula in the common charter of demane, were confronted with an uncompromising Sheikh Mujib, who indicated that unless the Six Points were included, he would return to Dacca the following morning instead of proceeding to Rawalpindi for the Round Table Conference. The Pathan and Baluchi leaders were prepared to support inclusion of the Six-Point demand and appreciated the Bengali support which was being extended to their demand for dissolution of One Unit. There was intense discussion through the evening of March 8 with Air Marshal Asghar Khan, acting as a go-between. Finally a compromise formula was evolved, under which the committee as a whole would present a minimum common charter of demands, leaving each party represented on the committee, free to press its own separate demands. Thus Sheikh Mujib and the Awami League would be able to present their demands before the Round Table Conference. It was on this basis that Sheikh Mujib agreed to attend the Round Table Conference.

Sheikh Mujib left for Rawalpindi on March 9 by road, and after instructing us to prepare a comprehensive statement elaborating the demand for regional autonomy on the basis of Six-Points. Throughout the day, work continued on the draft, which was taken to Rawalpindi on the evening of March 9. In this statement Sheikh Mujib, while supporting the common demand for establishment of a federal parliamentary democracy and direct elections on the basis of universal adult franchise, put forward the demand for regional

autonomy as defined in the Six-Point formula. In this statement each of the six points were defined with precision and elaborated on the basis of the formulations which had been made by the expert working group Support was expressed for dismemberment of One Unit and it was urged that the representation in the federal legislature should be on the basis of population—one man one vote. As a demonstration of Awami League's intentions to engage in serious negotiations, Sheikh Mujib proposed that a committee of experts be set up, composed of experts to be nominated by each side, to work out the implications of granting regional autonomy on the basis of the Six-Point formula. His team of experts was fully prepared to enter into such negotiations. In addition to the experts who had accompanied him, Dr. Nurul Islam, then Director of the Pakistan Institute of Development Economics, had also been alerted and stood in readiness to join the team, should negotiations have to be conducted in a committee of experts

Upon arrival in Rawalpindi I found that Manzoor Quader was also in Rawalpindi. He contacted me and informed that he had been asked by Ayub to be available in Rawalpindi, as an adviser. When told about Sheikh Mujib's proposal that a committee of experts should be set up to engage in serious negotiations, he welcomed this proposal and hoped that such a committee would be set up and in that event he expected to be on such a committee from the government side.

As events were to show, the Punjabi reaction was to close their ranks and to refuse even to discuss the Six Points formula It is known that the Punjabi oppositson leaders were constantly in meeting with Ayub and his Law Minister Zafar. Indeed, even before Ayub himseif raised objections to the Six-Point formula, Chaudhri Muhammad Ali, in his opening statement, stated that the Democratic Action committee's demand for a federal parliamentary government did not envisage change in the parity basis of representation or dismemberment of one unit. He also contended that the Round Table Conference was not competent to go into these questions.

Dr, Nurul Huda, then provincial Finance Minister, was member of Ayub's team. He, however, maintained contact with the Awami League advisers and provided some "inside reports" on what was going on in the Government camp. According to him, there was considerable division of opinion between the'hawks', who did not wish to concede anything on the demand for autonomy or dismemberment of One Unit and opposed even the formation of a committee of experts, while the 'doves'

favoured the formation of a committee of experts to discuss regional autonomy. Zafar and Admiral A.R. Khan ware named as the 'hawks, with Doha supporting them. It was reported that Manzoor Quader, however, was supporting the formation of a committee, as was Dr. Huda himself.

I was also maintaining contact with Manzoor Quader. When I met him on March 11, Manzoor Quader reported that he was supporting the formation of a committee of experts. He then mentioned that he had been examining the Six-Point formula and found difficulty with the point which called for two separate currencies. When told that in the statement presented at the Conference, an alternative proposal for a single currency within a federal reserve system has been put forward, he expressed surprise, since, in the transcript which he had received from the Cabinet Division this alternative proposal had not been mentioned. I informed him that Sheikh Mujib had made a written statement and copies had been distributed and therefore was no scope for such a major error in the transcription. He expressed dismay, and requested that a copy of Sheikh Mujib's statement may be given to him. This was obtained and handed over to him. The reports of March 11 were that, on balance the government side was said to be leaning in fevour of serious discussion on the regional autonomy issue and the formation of a committee of experts. Ayub was expected to make his opening statement on March 12.

Nothing of substance happened on March 12, since that day was taken up by protracted altercations between Admiral A.R. Khan and Air Marshal Asghar Khan.

In the evening of March 12 reports began to be circulated by Dr. Huda and others, that 'the hawks' were beginning to gain the upper hand. Subsequently, it was confirmed that a meeting had been held on the night of March 12 at which the anti-autonomy elements i.e. Punjabi opposition leaders as well as the 'hawks' on the Government side had sat together and decided to resist any concessions being made on regional autonomy or dismemberment of One Unit.

On March 13, Ayub, looking weary and exhausted, read out a statement which made it clear that he had been prevailed upon by the 'hawks'. According to an official, who was involved with these negotiations, Ayub had little freedom for maneouvre, as Yahya and the Army had by then decided to take over and were directing the negotiations behind the scene. Since the emergence of the Army as the real power had been

recognised, Sheikh Mujib had a separate meeting on 12 March with Yahya and impressed upon him the importance attached by Bengalis to regional autonomy on the basis of the Six Point Scheme. Yahya had maintained an accommodating posture, and insinuated that Ayub and Monem Khan had in their view been wrong in replying with the 'language of weapons' to the Six Point demand, rather than in dealing with it politically. [illegible] this meeting as part of the preparation by Yahya for [illegible]. While he ostensibly expressed the hope that the negotiations at the Conference might succeed, he wanted [illegible] the Army's pressure to ensure their failure [illegible] condition for a take-over by him.

Ayub [illegible] award. In a statement [illegible] of the arguments of Chaudhri Muhammad Ali [illegible] he [illegible] to respond to the demand [illegible] One Unit. He announced [illegible] 1962 Constitution to provide [illegible] and direct elections [illegible]. Ayub sought to justify his inability [illegible] regional autonomy and 'one unit' on [illegible] questions which could only [illegible]. Subsequent events were to prove [illegible] since when 21 months later [illegible] constituted, the same [illegible] questions were too 'fundamental' [illegible] and should be resolved outside [illegible]. No sooner had Ayub read out his award [illegible] without waiting for a show of consultation [illegible] Action Committee hastened to [illegible]. It was then quite clear that the anti-autonomy forces had succeeded in shutting the door to negotiations on regional autonomy. Sheikh Mujib rejected the award. On returning from the Conference Hall, Sheikh sat with his senior colleagues to decide on the line of action to be followed. A press conference was called for 3 p.m. I was asked to prepare a statement for the press—the key points were to be rejection of the award, withdrawal from DAC and for the movement to go on. The atmosphere was tense. While on the one hand, messages were being sent, one conveyed by Manzoor Quader to me that efforts were still being made to see if negotiations could be resumed,

the air was filled with rumours that the military was getting ready to take over.

At the press conference, Sheikh Mujib announced the withdrawal of the Awami League from DAC and declared that the mass movement would go on. The Democratic Action Committee was declared dissolved the same evening.

Sheikh Mujib called [illegible] he was anxious to gauge the popular reaction, [illegible] would support his decision [illegible] movement. The public reaction [illegible] demonstrations in Dacca [illegible] who had acquiesced in [illegible] the six point movement [illegible] for the Bengali [illegible]

Ayub [illegible] the people [illegible] of doing business with [illegible] after the breakdown of the [illegible] the six-point demands [illegible] give effect to [illegible] National Assembly [illegible] Mujib [illegible] Bengali, if such [illegible] could be expected to support the [illegible] that such amendment would [illegible] Mujib assured him [illegible]

Sheikh Mujib immediately [illegible] called his team of advisers [illegible] as quickly as possible [illegible] night and day, to [illegible] amendments to the 1962 Constitution [illegible] formula and dismember one unit [illegible] amendment bill embodying these [illegible] National Assembly by the Awami League members [illegible] with him to Rawalpindi, and an advance copy [illegible] 2? March. Before these amendments could be [illegible] National Assembly, Ayub's response was to abdicate, [illegible] unwillingness to preside over the disintegration [illegible] who had been preparing in the wings [illegible] The 1962 Constitution was abrogated, the National Assembly [illegible] and Martial Law was proclaimed.

Yahya had inherited the task of protecting the power structure which had been threatened by the mass upsurge. By the imposition of Martial Law, he had bought time. In his first speech he committed himself to transfer power to the elected representatives of the people. Shortly thereafter he began a round of bilateral consultations with political leaders. Sheikh Mujib proposed a Constituent Assembly consisting of elected representatives of the people, in which representation should be on the basis of population, as the only proper way, and indeed the only method acceptable to the Bengalis, for framing a Constitution.

Twenty two years had passed without the constituent units of Pakistan having agreed upon the basis on which they were to live together. The British had transferred power to a sovereign constituent assembly. This assembly had been dissolved through the intervention of the Punjabi army in October 1954. The 1956 Constitution had been adopted in circumstances which raised questions about the representative character of the body which adopted it. There was also little doubt that one-unit and parity between east and west as well as the particular distribution of powers between the centre and the regions were in effect inposed upon that body by threats of martial law. The 1962 Constitution had been promulgated by a presidential proclamation. The demand for a properly elected Constituent Assembly constituted on the basis of population was one of the points in the 21-point election manifesto of the United Front which had swept the polls in East Bengal in 1954. Now this fundamental issue, namely that the basis for living together among the different constituent units of Pakistan should be determined by the elected representatives of the people, could no longer be eluded. The punjabi army had no legitimate basis to rule Pakistan. Indeed, it is not without a touch of irony, that the Pakistan Supreme Court ruled sometime in 1972, after the holocaust in Bangladesh, that Yahya was a usurper and that his assumption of power had been unconstitutional.

The Punjabi leaders who had argued in Ayub's Round Table conference that only elected representatives would be competent to decide on such fundamental questions as the content of regional autonomy now changed their tune. Some among them began to press for the restoration of the 1956 Constitution, with a few amendments which were to be negotiated in a conference of political leaders. Others pressed for a promulgated Constitution like the 1962 Constitution The prospect of a punjabi minority being outvoted in any national body of elected representatives the nightmare of the Punjabis since the day Pakistan

came into being was deeply disturbing to them. The Pathans and Baluchis and large sections of Sindhis concentrated on pressing for the immediate dismemberment of one-unit.

Yahya perceived that naked military rule could not be continued indefinitely in the face of the roused populace. He had to find some basis to legitimise his rule and to contain the pressures in both wings. His real challenge lay in the east where a strident Bengali nationalism had united the entire people behind a single leader. It had been made clear by Sheikh Mujib that the 1956 Constitution would be totally unacceptable to the Bengali poeple, as would any Constitution, promulgated by a decree. The consent of the Bengali people could only be secured to a Constitution framed by a Constituent Assembly consisting of directly elected representatives of the people. The punjabi elite when threatened by an elected majority had tended to rely upon the army to secure their interests. They clearly received the threat posed by a Constituent Assembly, which might enact a Constitution which would denude the Centre of those powers which they regarded as a vital importance to them, in particular control over economic resources. The military which had been accustomed to steadily increasing defence expenditures no doubt shared this anxiety.

Faced with this situation, Yahya appeared to make certain concessions. On 28 November 1969, he declared that he would promulgate a legal frame work for setting up a Consituent Assembly. He conceded the principle of one man, one vote, or representation on the basis of population. This was to give the Fastern Wing 169 seats in an Assembly of 313. He also announced his decision to dismember one-unit. The concession on one-unit was obviously aimed at defusing the main divisive issue in the west, and thus pre-empting the possibility of the anti-one-unit forces in Sind, NWFP and Baluchistan joining forces with the Bengalis in the Assembly. The ground was thus cleared for representatives of the western wing to close ranks, unitedly to face the Bengalis. A calculated risk had, however, been taken, namely that of a united body of Bengali representatives passing a Constitution which provided for regional autonomy on the basis of the six-point formula.

There is no doubt that this remained a source of major concern for Yahya. Some unusual provisions in Legal Framework Order, which was promulgated on 28 March 1970, reflected these anxieties and bore witness to tde reassertion of the role of the Army as the custodian of the interests of the ruling minority. Article 20 of the Legal Eramework

Order provided that the Constitution shall be so framed as to embody five fundamental principles which were enumerated. The fourth principle was formulated thus :

> All powers including legislative, administrative and financial shall be so distributed between the Federal governmeat and the provinces and the provinces shall have, maximum autonomy, that is to say maximum legislative, administrative and financial powers but the Federal Government shall also have adequate powers including legislative, administrative and financial powers to discharge its responsibilities in relation to external and internal affairs and to preserve the independence and territorial integrity of the country.

Article 25 provided that the Constitution Bill would have to be presented to the President for authentication. It was further provided that the Assembly would stand dissolved if authentication were refused.

This provision was seen by the Bengalis as formally investing the Punjabi minority and the Army with the power to veto decisions adopted by a majority in a soverign Constituent Assembly. Sheikh Mujib immediately declared that, while he welcomed the setting up of a Constituent Assembly, consisting of representatives elected by the people on the basis of one man, one vote, in his view such a body would be sovereign and could not be fettered in the exercise of its power to make a Constitution by provisions such as Article 20 and 25. He called for the repeal of these provisions, and stated that in any event, such restrictions on people's sovereignty were illegitimate and invalid.

Yahya proceeded with preparations for holding elections. He had made certain careful calculations. As noted earlier, the decision to dismember one-unit was aimed to unite the representatives of the western wing in opposing the Bengali demand for autonomy on the basis of six-points. He had further provided that if the Assembly could frame a Constitution within 120 days it would be transformed into a National Legislature for five years ; if it failed within that time limit to frame a Constitution, it would stand dissolved. This was expected to provide a strong incentive for members to arrive at a compromise —to compromise, it was hoped, on the demand for autonomy to the extent considered necessary by the ruling minority. If such a compromise were not arrived at, the President could refuse to authenticate. Apart from this, Yahya calculated that no party would get a clear majority in the eastern wing In other words, that the Bengali majority would be fragmented, leaving him enough room to manipulate and manoeuvre. This was a technique effectively used by the ruling minority

in the fifties, and Yayha was encouraged to feel that this could serve him equally well. He was encouraged also by reports of the elderly Bengali politicians, like Hamidul Huq Chowdhury, that Awami League would not win a strong majority.

As the pre-election campaign went on, it began to be increasingly clear that Awami League seemed to be emerging as a party with near universal support. Other parties began to sense that a groundswell was developing which was likely to give Awami League a sweeping majority. They, therefore, began to urge postponement of elections.

The occurrence of floods around August, provided an opportunity for leaders of different parties to press for postponement of the election date, which was October 5 1970. They felt that postponement of the elections might give them a chance to make up some ground. Their efforts to secure a postponement were successful. The date of the election was shifted from October 3 to December 7, 1970: The postponement, however acted in favour of the Awami League. The larger time enabled Sheikh Mujib to embark on a more extensive tour and personally to reach people in all parts of Bangladesh. Also, during this period, an event occurred which had a special impact upon the people and ultimately upon the election results, namely, the cyclone and tidal bore of November 1970, which swept the coastal areas of Bangladesh.

The magnitude of devastations and the death toll made it into a disaster which attracted headlines all over the world. The inaction displayed by Yahya and the Central Government was noticed both in the country and outside. Yayha stopped in Dacca on his return journey from China just after the cyclone, but did not stay back. Relief operations launched by the Government were slow and inadequate. This also provided Sheikh Mujib and the Awami League with an opportunity to demonstrate both the capabilities in meeting such a situation and also to ventilate the sense of outrage felt by the Bengali people against the Central Government.

Other parties again raised a chorus for postponement. The Awami League had voiced in the strongest possible terms, its opposition to such a postponement move. Indeed, Sheikh Mujib characterised such efforts at postponement as a conspiracy to obstruct transfer of power and warned that any such move would be resisted by the people. He stated that a million lives had already been lost and, if necessary, Bangalees would sacrifice a million more to frustrate the conspirators and to seize power, so that the people could be masters of their own destiny.

In the face of this situation. Yahya held back from further postponement. Only elections in the cyclone-affected areas (involving 17 seats) were postponed. Elections proceeded in accordance with the original schedule on December 7, 1970, in other places.

Awami League won 167 out of 169 seats in the East in a house of 315. The overwhelmingly decisive election results, giving an absolute majority to Sheikh Mujib, was a clear verdict in favour of Sheikh Mujib, the Awami League and its Six-Point programme This result clearly put Yahya's whole strategy in dire disarray. He had obviously banked upon fragmented representation in the East, so that he would be free to manipulate and manoeuvre. He was now confronted with an absolute majority. He thus found that the initiative had totally passed out of his hands and his power to manoeuvre was all but lost. He had counted on a fragmented representation from the East ; indeed. he was faced with a monolithic majority. That such were his calculations is not only an inference from circumstances but has been corroborated by West Pakistani leaders and by foreign leaders in whom Yahya confided.

In the elections in the West, Bhutto had emerged with 83 seats out of 131 with majorities only in the Provinces of Sind and Punjab. Bhutto's initial reaction to these results was revealing. His very first statement in the wake of elections was that no constitution could be made except with the agreement of the People's Party. He asserted that Sind and Punjab were "bastions of power." This was followed by the statement that "majority alone does not count in national politics." It was clear that he saw that the only way to contain the Bengali majority in the National Assembly was to confront it outside the Assembly. There he could supplement his strength from the one source upon which the ruling minority had always fallen back in order to deal with the Bengali majority, namely the army. It was the same pattern that had manifested itself throughout the 24 years of Pakistan. A minority unable to contain a majority within any democratically constituted representative institution had always fallen back upon military force. The Awami League had an absolute majority ; they could not concede the veto which Bhutto claimed. Yahya at this stage maintained an apparently conciliatory posture. It would seem that towards late December, the position might have been that Yahya would make his own independent and preliminary attempt to negotiate with the Awami League to press for modification of the Six-Point formula, so as to secure the interest of the ruling elite and of the army. If he would succeed. then he, together perhaps with other

(West Pakistani Polititicians), might close ranks and Bhutto might find himself totally isolated.

While Yahya might have harboured such thoughts, Bhutto, it appeared, was busy with a section of the Generals. According to a version published by one of Yahya's advisers, Bhutto had an important ally, General Peerzada, the Principal Staff Officer of the President. It seems that General Gul Hassan and some others who survived the purge at the end of 1971 after Bhutto took over were part of this group. Their attitude at the time was significantly summed up by a general who after a sumptous dinner at Government House in Dacca is reported by another Pakistani Army Officer to have declared: "Don't worry...we will not allow these black bastards to rule over us"

Yahya come to Dacca in the middle of January. There was an initial meeting between Yahya and Sheikh Mujib at which meeting Yahya appeared to be maintaining an outwardly conciliatory posture but nonetheless sought clarifications about the Six-Point programme. This was obviously how he intended to open negotiations on the substance of Six-Points.

Yahya's adviser records that a detailed exercise had been done in Islamabad about the implications of Six-Points and indeed even a draft constitution had been prepared in December 1970. Therefore the request for explanation was, in fact, a polite invitation to negotiate on the substance of Six-Points. Sheikh Mujib and the Awami League were not prepared to enter into such negotiations. The lections had been declared a referendum on Six-Points by Mujib in June. The popular verdict was decisive. Sheikh Mujib had announced that 'Six-Points' was now the property of the people and that he had no authority to compromise on the substance of Six-Points. This position had been declared in the mammoth public meeting held in early January, when all Awami League members elected to the national and provincial assemblies had taken oath not to conpromise on the Six Points. Yahya met Sheikh Mujib along with his senior colleagues Syed Nazrul Islam, Tajuddin Ahmed, Mansoor Ali, Khandker Mushtaque Ahmed, and A H M Kamaruzzaman. They proceeded to explain the Six-Point programme. They sought to assure Yahya that the Six-Point scheme was workable and that it would be worked out so that the limited powers and functions that were left with the Centre could be discharged within the framework of constitutional provisions which would ensure the necessary resources to the centre for the purposes of its allocated functions. It was explai-

ned that constitutional provisions would ensure that foreign exchange and revenue resources needed by the Centre would be automatically received by the Centre which would thus not be at the mercy of the regions.

After this meeting, I was asked by Sheikh Mujib to meet Peerzada separately to explain the Six-Point programme. At this meeting, it was obvious that the main anxieties were with regard to the foreign exchange and revenue resources for the centre. Anxiety was also expressed about the control of froeign trade and aid by the regions. It was explained that contitutional provisions could ensure that a portion of the revenue and foreign exehange collected would be automatically appropriated by the Central Government: About foreign trade and aid, it was explained that negotiations on these matters would be considered by the regions, within the framework of the foreign policy of the country. It was also pointed out that conflict could not possibly take place since the Awami League would be in control of the Central Government as well as the Government in the East. Peerzada maintained a non-commital position, but significantly he went on to say that Yahya had also to carry (West Pakistan) with him and therefore it would be desirable for Awami League to reach an agreement with Bhutto. He said that a constitution which supported the Awami League as well as People's Party would sail through the Assembly and accelerate the transfer of power. Peerzada's parting remarks indicated that Bhutto, ·Peerzada and at least a section of the army were in contact.

It is significant that straight from Dacca, Yahya flew straight to Larkana. Though it was described as a 'shooting' trip, some of the Generals, a fair part of the ruling junta, also flew into Larkana and an important meeting had taken place, confirmed by Bhutto in his Great Tragedy. There is little doubt that strategy was being evolved how to contain and frustrate the Bengali majority which had emerged in the elections. It was announced that Bhutto would be visiting Dacca shortly. Other West Pakistani leaders also begen to come to Dacca—Nawab Akbar Khan Bughti, Moulana Noorani and Sardar Shaukat Hayat Khan.

Bhutto arrived in Dacca on 27 January. Several rounds of talks were held between Sheikh Mujib and Bhutto while separate parallel meetings were held between the Awami League team and the People's Party team consisting of J. Rahim, Sheikh Abdur Rashid, Hanif Ramay, Abdul Hafeez Pirzada and Rafi Raza. The Awami League team consisted of Syed Nazrul Islam, Tajuddin Ahmed, Mansoor Ali, Khandker Mushtaq Ahmed, A H M Kamruzzaman and myself. In the discussions between

the teams, the Awami League members had thought that the discussions would focus on the substance of the six-point formula. The Awami League invited the People's Party leaders to state their objections against six-points. They were assured that detailed explanations would be presented on each of the points with a view to remove any misgivings they might have about them. The People's Party team, however, led by Rahim, instead of raising specific issues, launched into abstract discussions about the meaning of 'socialism.' Rahim launched into an exposition of the need for a strong centre in order to build 'socialism.' In this context, he referred to the strong centre in the Soviet Union and other socialist countries as being essential for central planning. The Awami League members pointed out to him that such comparisons were not relevant. Instead, they pressed him specifically to turn to the six point scheme. The recollection of this meeting is that there was a marked reluctance to engage in discussions on the specific issues raised by the six point scheme Nor was any alternative constitutional scheme presented. The discussions therefore were totally unstructured and there was no real communication. I chided Hafiz Peerzada that as a lawyer he should appreciate the need to be more precise in discussions. He was urged to persuade his colleagues to proceed in discussions point by point and to specifically state their objections, so that specific replies could be given. He reacted by making a jocular remark that Rahim was an old man who had to be indulged and that they would be prepared for fuller discussion when they came to Dacca for a second round of talks in February. Bhutto's main concern, Sheikh Mujib, had requested to his colleagues as to whether he could be President, if he became Prime Minister ; and what other posts could be secured by him and his parts if they were to form a coalition.

At the conclusion of the January talks, Bhutto addressed a Press Conference in Dacca stating : "We have genuine difficulties and we need time at least up to the end of February to make a comment on it." He also stated that "it was not necessary to enter into the Constituent Assembly with an agreement on different issues because negotiations could continue even when the House was in session." It was significant that when asked whether the Awami League with its present absolute majority in the House was oompetent to frame a constitution, Bhutto said ; "Legally speaking they can but the question has to be decided by the House as to whether the Constitution will be adopted by a simple majority or by two-third majority. Since the question of making a Constitution

and our geographical position is peculiar, the majority adopting the Constitution should include the concensus."

At the time of leave-taking, Bhutto's delegation members indicated that they would return for consultations with their party eolleagues in the different Provinces of West Pakistan and after such consultations they would return for further discussions with the Awami League in February, 1971.

The events of February 1971 and the postures which the People's Party began to strike made it clear that they were not working towards resumption of dialogue but towards precipitating a crisis and ultimately, confrontation.

On 2nd February 1971, an interesting event took place. An Indian Airlines Plane was hijacked to Lahore by two young men discribing themselves as Kashmiri Freedom Fighters. The reaction of Bhutto and his People's Party to this event was to lionise these young men. Bhutto himself garlanded them and they were taken in a triumphal procession through the streets of Lahore. This also provides an occasion for a diatribe by Bhutto against India.

I clearly remember the reaction of Sheikh Mujib and the Awami League The blowing up of the hijacked plane. even more than the hijacking itself, gave rise to suspicion. The suspicion was that elements interested in averting transfer of power to elected representatives were bent on creating abnormal conditions. A statement was issued by Sheikh Mujib deploring the blowing up of the Plane stating :

> Prompt and effective step by the authorities could have been taken to prevent its occurrence It should have been realised that at this critical juncture in the nation's life, the creation of abnormal conditions can only serve the interest of saboteurs. I would urge the Government to hold an enquiry into this matter and to take effective measures to prevent interested quarters from exploiting the situation for their nefarious ends.

For some weeks the two young 'commandos" contnued to be lionised. The People's party immediately mounted a campaign directed against Awami League for deploring the hijacking and the blowing up of the plane. The Awami League's office in Lahore was attacked. Indeed, it began to be said that the divergent reactions to the hijacking of the Awami League and the People's party showed up how difficult it might be to evolve a common foreign policy—this in context of the fact that foreign affairs under the Six-Point scheme was to be a Federal subject.

Reacting to the pressure that Awami League should make non specific comments on the hijacking, Sheikh Mujibur Rahman pointed out that this could hardly be expected when the Government had not taken any steps to brief him on Precisely what had happened, even though he was admittedly the leader of the majority party. An interesting foot note is provided by the fact that Alvie, the Additional Foreign Secretary appeared in Dacca on 1 March, 1971 and sought an appointment on 2 March, 1971 to brief Sheikh Mujib about the hijacking incident. Since 2 March marked the beginning of 'Non Cooperation Movement', Alvie found that his mission had been overtaken by events.

An important consequence of the hijacking that India suspended all overflights over Indian territory by Pakistani aircraft. This meant that the only route by which ai craft could come from the West to the East was all the way around over the southern tip of the Indian Peninsula over Ceylon, thus almost trebling the distance and the travelling time. This also meant making a military solution in the East very much more expensive and difficult, should the junta be disposed to opt for this.

The abortive talks with Bhutto and the delay in convening of the Session of the National Assembly had begun to feed the fear that Yahyh and the military junta might be seeking some pretext for not calling the National Assembly.

The suspension of the overflights did mean that troop movements, movements of arms and supplies to the military in the East would be impeded ; thus affecting their capabilities.

It can now be recorded that the possibility of a Declaration of In dependence was actively considered by Sheikh Mujib in a close door meeting with main party leaders in early February 1971. The delay in the convening of the Assembly inevitably led Awami League to consider its own options. A vanished Declaration of Independence was seen as an option. Careful calculations had to be made of the magnitude of the military response to such a Declaration and the capacity of the people to withstand such an onslaught and to overcome it Some calculations were made of existing military strength. The suspension of the overflight and the difficulty this created for augmenting men and material was also taken into account

I was asked to draw up a draft Declaration of Independence The text used as a precedent was the American Declaration of Independence which recited the injustices perpetrated by the British Crown as jus ifying

the act of declaring Independence. A draft was duly prepared and handed to Sheikh Mujib around February 10, which he then kept with him. Tajuddin had been associated in this drafting and he was also to outline the plan of action for implementing the decision to declare independence, should this course of action have to be adopted. The essentials of the plan, as discussed, were that massive popular demonstrations would be launched in the main cities. Hundreds of thousands of people would be out on the streets. While this would sufficiently distract the military, the main targets would be the Radio Station, the Secretariat and Governor's House, where the Governor should be prevailed upon to make an announcement formally transferring power to the elected representatives.

In the meantime, Awami League kept pressing for convening the National Assembly. In a joint meeting of all Awami League members elected to the National and Provincial Assemblies and members of its Working Committee was called on 13 February 1971, where "decisions would be taken on our future course of action." It was widely believed that this meeting on 13 February would be called upon to consider the option of Declaring Independence. I remember a Foreign diplomat asking him on the eve of this meeting "are you going to declare UDI at this meeting ?"

On the very morning when the joint meeting was to take place and the atmosphere was already one of rising anger at the delay in convening the National Assembly, Yahya announced that the meeting of the National Assembly would be held in Dacca on 3 March, 1971.

Bhutto's reaction to this announcement was to take a further step towards the crisis. In a statement in Peshawar on 15 February, 1971, he expressed his Party's inability to attend the National Assembly Session on 3 March in Dacca, in the absence of an understanding for 'compromise or adjustment' on the Six-Points. He further went on to say that his party-men would be in jeopardy in going to East Pakistan, stating that he could not be "a party in a position of double hostage because of Indian hostility and non-acceptance of the Six-Points. On 16 February in Karachi, Bhutto stated that "his Party's decision not to attend the ensuing session of the National Assembly was unshakeable and irrevocable."

On 17 February, Bhutto stated in Karachi that "under present circumstances, it was pointless for the people's party to attend the ensuing National Assembly session. Bhutto said that his party had tried its best to work out some agreed settlement and understanding with Awami League but now "there is no room for further

negotiations with the Awami League." Of the Six-Points of the Awami League, Bhutto stated that "the most difficult was the one pertaining to foreign trade and foreign aid."

Thus Bhutto's statement showed a clear hardening of his position and was in contrast to the statement made by him at the end of January in Dacca, when he had stated that further negotiations would be conducted with Awami League and that such negotiations could be held even within the National Assembly. Instead, there was now a refusal to come to the National Assembly and an assertion that there was no room for further negotiations with the Awami League.

The apprehension of the Bengalis that the position of the military junta or at least a section of the junta, was hardening and that Bhutto may be linked with them, was reflected in a question put to Bhutto by the Press which prompted Bhutto to deny that his party's becision not to attend the Assembly did not have any blessings from the present regime. He said that there was no question of any agreement "behind the scenes" between him and anybody else. That this apprehension, and the question put by the press, were well founded, appears from a recent account from one of Yahya's advisers, who writes that by the middle of February :

> Bhutto, by this time, knew his bargaining strength, powerful members of the junta were with him rather than with Yahya. As pointed out earlier, Yahya had a free hand in formulating a scheme for the transfer of power and holding elections, but the junta adopted a policy of 'wait and see'; if Yahya was successful in maintaining the unity of the country by whatever constititutional devices, well and good, but from late January when Yahya had his abortive talks with Mujib, the junta was not prepared to remain as a passive spectator of the political and Constitutional issues. From January, the process of decision-making changed...it is my assumption that in Februarv, like Ahsan, Yahya might also have been replaced by Hamid; he would not perhaps have been unhappy to go, but for some reasons the junta had to carry on with Yahya, so Yahya continued to play his role on an untenable situation.

In the third week of February an atmosphere of crisis prevailed. Around 19 February, military movements were noticed in Dacca and a machine gun nest appeared in the mound in front of the National Assembly building in Dacca. This led Sheikh Mujib urgently to summon party leaders to a meeting to review this development. Some of the

student leaders were also present at the meeting. I was present at this meeting where reports were brought that a great deal of activity was noticed [illegible] Cantonment [illegible] apprehension that some military action was [illegible]. Faced with this situation, it was felt that no one should stay in his house that night and in the event of a military operation being launched, everyone was to leave Dacca and to mobilise the people in the countryside to resist. No military operation, however, took place, but tension continued to mount.

On 21 February (Shaheed Day), the atmosphere was tense and emotionally charged. There was once again the expectation that at the meeting at Shaheed Minar, Sheikh Mujib might declare Independence. At that meeting, however, Sheikh Mujib stated that the Bangalee people were united and determined and that if their demands were not conceded then they would shed blood to realise their aspirations.

In the meantime, various delegations representing other West Pakistani parties were arriving in Dacca for discussions. The position taken by the Awami League in these discussions was that while they were committed to making a Constitution on the basis of Six-Points, they would certainly discuss all aspects of the draft with other political parties and seek to dispel any misgivings that they might have about the impact of the Six-Points scheme on the legitimate interests of the Punjab, Sind, NWFP and Baluchistan or the viability of the Federal Government. A major Press Statement was made by Sheikh Mujib on 24 February, in which the Awami League's position was clearly explained. It was believed that just about this time a crucial meeting of the junta was held. Yahya's adviser's report of this meeting is as follows :

> After the fateful Larkana talks, the army junta met formally at Rawalpindi in mid-February to discuss the political situation. It was at this meeting that the junta decided to challenge Mujib if he presisted in his uncompromising attitude, but significantly it ignored Bhutto's provocative speeches. Bhutto was now regarded by the hawkish generals like Hamid, Omar and Gul Hasan, as well as by his trusted friend Peerzada, as the defender of the "national interests" of Pakistan, as interpreted by the ruling elite. It was at this meeting that the junta decided to dissolve the cabinet whose members had already expressed their desire to be relieved after the election. But at the cabinet meeting on December 8, 1970, Yahya decided to continue with it as some of its members were useful in acting as links with

Mujib, while he needed the services of some others as long as constitutional dialogue persisted. But now Yahya's hold over the junta, which had never been absolute, was declining because of his failure to modify Mujib's policy. Both Ahsan and Yahya were discredited Ahsan wanted to be relieved and the junta decided that he should be replaced by a hawk, Lieutenant General Tikka Khan The cabinet was also dissolved on February 17, but within forty-eight hours Yahya invited some of its members, including myself, to continue as his advisers. Instead of a council ministers he wanted to have a council of advisers. (But the Bengali members of the proposed council—with one exception - Ahsanul Huq, declined to continue any longer. Of the West Pakistan members of the cabinet, only Cornelius decided to stay).

The Awami League's Constitution Drafting Committee was working night and day to finalise the darft constitution bill and long meetings were being held to complete this task before 1 March. Yyhya was expecting to reach Dacca on 1 March and we were told by Sheikh Mujib that an advance copy of the draft constitution was to be delivered to him on that date.

While the Constitution Drafting Committee was engaged in this task, a senior Bengali Government official brought a message that a decision had already been taken to postpone the National Assembly ssession. He advised that Sheikh Mujib should immediately see Governor Ahsan to remonstrate with him. Sheikh Mujib was informed of this and the same morning he met Ahsan who also appeared to be disturbed by this report. Sheikh Mujib informed Ahsan that such postponement would be seen by the Bengali people as a conspiracy to deprive them of their rights as a majority, and the situation would explode. Ahsan promised to convey this to Islamabad. Later he confirmed that he had conveyed this view but there was no change in the decision. Indeed, he said that he had on his own suggested that if there was to be a postponement, it should be for a specific number of days and not for an indefinite period. In a speech on 28 February, Sheikh Mujib said that if any individual member of the Assembly said any reasonable thing, it should be accepted. On that day, Bhutto, in a long statement stated that he had narrowed down his disagreement to foreign trade and foreign aid, and that he could not give in on foreign trade and aid. He concluded by saying that either the Assembly Session should be postponed or 120 day time limit for Constitution-making should be removed.

Yahya's adviser's account of the immediate background of the postponement shows that Bhutto was by now, working jointly in tending with the military junta. His report states :

So Yahya continued to play his role in an untenable situation. Following Bhutto's threat, the National Assembly, which had been scheduled to meet on March 3, was postponed indefinitely. Yahya's announcement on March 1 on the postponement of the Assembly could not have been more provocative or tragic. When I asked him about it on March 5, he looked vacant and helpless ; I was convinced he had only been a signatory to it. Bhutto and Peerzada were reported to have drafted the statement. Yahya, unlike on previous occasions, did not broadcast it ; it was only read out over the radio.

Before Yahya left Rawalpindi for Karachi to persuade Bhutto to go to Dacca so that the National Assembly might not be postponed, he had already sent Peerzada, Ahsan and Yakub on the same mission to persuade Bhutto to attend the National Assembly. He gave Bhutto a solemn promise that if Mujib were to "thrust a Six-Point constitution" against the wishes of the majority of the West Pakistan members and if his constitutional darft would mean splitting the country, he would at once prorogue the assembly ; however nothing could satisfy Bhutto. when it became evident that as a result of Bhutto's threat of boycotting the assembly, the majority of the West Pakistani Assembly members would not attend the session, Yahya decided to postpone the summoning of the assembly, but he wanted to issue a statement which should cause the least provocation possible in East Pakistan. Though I was no longer a member of his Cabinet, Yahya asked me to prepare a statement in a conciliatory vein. I immediately began to draft the proposed statement, which ran as follows :

In view of the complete deadlock between the two principal parties representing East and West Pakistan respectively, I am constrained to postpone the meeting of the National Assembly on March 3, 1971. I would however wish to make it absolutely clear that the postponement will not exceed two or three weeks and during this short period, I shall make all endeavours to bring rapprochement between the elected representatives of the two regions of our country. As you will recall, I have often said in the past and I want to reaffirm that I have no desire to

impose a constitution either on East or on West Pakistan against the wishes of the people. A true federal constitution, to which the political parties and my regime are all committeed, cannot be framed without the concensus of various federating units. I shall be the happiest person when a concensus on a federal union is arrived at, and on my part I assure my nation that I shall spare no efforts to achieve this supreme goal.

I sincerely hope and appeal to my brethren in East Pakistan to appreciate the gravity of the situation and allow me this short period of two or three weeks to work for an agreed formula. Insha Allah (By the Grace of God) we shall overcome this difficulty. Let us remember Quaid-e-Azam's immortal seying "Pakistan has come to stay;" let us all dedicate ourselves to the fulfilment of the desire of the Father of the Nation.

I personally handed over the darft of the statement at Islamabad airport as Yahya was leaving for Karachi. He subsequently gave it to Peerzada, who, in alliance with Bhutto, torpedoed it, I still feel regret that I did not accompany Yahya to Karachi. My reluctance was due to the fact that I was no longer a member of the cabinet, I also expressed my inability to accept his offer of being an "adviser." By accompanying Yahya to Karachi, I would have caused unnecessary speculation about my links with Yahya. But I now realise that Yahya's great weakness was his ficklemindedness; he approved my draft but in my absence, when Bhutto and Peerzada presented another draft, Yahya, true to his weak personality, accepted the provocative one. Though I cannot provide documentary evidence of this, I heard from the personal staff of the President, including the Military Secretary, that Yahya was most reluctant to sign the statement prepared by Peerzada in collusion with Bhutto. But the pressures were strong and Yahya yielded.

Clear and unambiguous signals had been conveyed to Yahya through Governor Ahsan that postponement of the Assembly would lead to a political explosion in the East. Ahsan confirmed that he had been transmitting these signals. On the night of February 28, there were still indications that Yahya might arrive in Dacca on March 1. The usual procedures which preceded the arrival of the president in Dacca were under way. The plane from Karachi which arrived on March 1, however, did not carry Yahya. A government official who travelled on that plane reported that the departure of that plane had been twice

delayed in Karachi as it was expected that Yahya would avail of that flight. Ultimately he had decided to stay back. It was reported that there had been extensive discussions with Bhutto on that night.

The entire Constitution Drafting Committee of the Awami League were assembled in the party office to put the finishing touches on the draft constituition bill The Committee was still working to a 1 March dateline, and had very nearly completed its work, when one of the party workers came in to report that an important Radio broadcast was to be made at 1 p. m Work stopped and Sheikh Mujib and other party leaders then joined members of the Constitution Drafting Committee. A radio set was brought in order to enable them to hear the broadcast.

At 1305 hours the voice of a radio announcer read out the text of a statement ascribed to Yahya, The operative statement was that it had been decided to "postpone the summoning of the National Assembly to a later date" It was thus an indefinite postponement. The reason given was that an accepted consensus on the main provisions of the future Constitution had not been arrived at between political leaders. He referred to a political confrontation between the leaders of East Pakistan and those of the West and that "with so many representatives of the people of West Pakistan keeping away from the Assembly . if he were to go ahead with the inaugural session on the 3rd March, the Assembly itself could have disintegrated." It was further stated that 'it was imperative to give more time to the political leaders to arrive at a reasonable understanding on the issue of Constitution making and that as soon as the environment became conducive to constitution-making, a session of the Assembly would be called."

In other words, Yahya clearly signified that the ruling minority would have a veto on Constitution-making and indeed unless there was a prior understanding with them, the Assembly would not be convened. The Bengalis, despite being a majority in the Assembly, thus were to be reduced to impotence.

The reaction of those listening to this broadcast was one of total outrage. There could be no greater affront to the Bengali people than was contained in that brief statement. Indeed, it was evident within minutes that the sense of outrage that was felt by everyone in the party office was widely shared by the people Government employees were walking out of the Secretariat and other Government offices; banks, Insurance and other commercial concerns, were also emptying out. A cricket match had been on in the stadium. No sooner had the spectators

heard of the radio announcement, they trooped out of the stadium. The students were already out in the streets in spontaneous demonstrations.

Sheikh Mujib, on hearing the broadcast, directed that all parliamentary members of the Awami League should assemble at Hotel Purbani at 3 p. m., when he would address them on the future course of action.

There was no doubt that a decisive moment had been reached in our history. It was clear that the ruling minority was not prepared to submit to the Bengali majority and had thrown down a challenge. They had a mechanised army equipped with tanks and supported by an Air Force. As against this, on the Bengali side, there was the near total unity of 75 million people, who reacted with a shared sense of outrage and a common determination not to submit. Yet they were unarmed and in any head on confrontation it was clearly perceived that a huge price in human life would be exacted.

It was clear that there was only one course for the Bengalis—a reaction of defiance. Thus, the threat of confrontation was now imminent. It was not known whether the military onslaught might not begin that very day. By the time I reached the Purbani Hotel, militant processions were seen advancing towards Purbani Hotel from different directions. The militance of the processions was evident from the fact that almost everyone had a bamboo or a stick in his hand and slogans were for 'Independence.'

In the context the reaction of the people was not surprising. The high hopes aroused in them by the success of the mass upsurge of 1969 were dashed to the grounds, first, by the failure of the Round Table Conference, and then, by the imposition of the second martial law. It was again with a great deal of hope and a measure of bitterness against the central authority for its unsympathetic handling of the situation following the cyclone that they went to the polls and recorded their verdict. The protracted negotiations since the results of the elections were announced left them with little faith either in the goodwill of the military government or of its power-base in the Punjab. The announcement of the postponement of the National Assembly eroded their faith both in the constitutional process and in the unity of Pakistan. Their experience of 1969 had given them a self confidence and now they were determined to play a more active role in shaping the course of history. The goal thus set was independence and they demanded the politicians to lead them to this destination.

The Awami League Parliamentarians were already assembled by 3 p. m. Sheikh Mujib, flanked by party leaders, arrived at 3. 20 p. m.

The atmosphere was tense. Hundreds of international pressmen were gathered outside. Sheikh Mujib declared :..."only for the sake of the minority party's disagreement the democratic process of Constitution-making has been obstructed and the National Assembly session has been postponed sine die. This is most unfortunate. As far as we are concerned, we are the representatives of the majority of the people and we cannot allow it to go unchallenged.

He announced a Non-Cooperation Movement. A programme of action was announced for the next six days. A total strike in Dacca on 2 March, a country-wide strike on 3 March and a public meeting on 7 March, 1971.

The initial challenge to the postponement of the National Assembly was, thus, presented in the form of a Non-Cooperation Movement. In essence, this meant that no Bengali should co operate, in any way, with Yahya or the military. Sheikh Mujib's statement on 2 March, 1971 declared: "It is the sacred duty of each and every Bengali in every walk of life, iucluding Government officials not to co-operate with anti-people forces and indeed to do everything in their power to foil the conspiracy against Bangladesh. It was also declared that "representatives—elected by the people are the only legitimate source of authority. All authorities are expected to take note of this fact."

The task of the coming days was to direct the Non-Cooperation Movement so that it could achieve its object of paralysing the administration but at the same time ensure that essential services and the economic life of the Eastern wing was not disrupted.

It was decided that directives should be issued centrally. Mr. Tajuddin, Amirul Islam and myself were entrusted with the task of drafting directives and issuing them after having these approved by Sheikh Mujib and party leaders.

The first directive issued on 2 March, called for a province-wide hartal from 3 to 6 March, 1971 from 6 a. m. to 2 p. m. in all spheres, including Government offices, Secretariat, High Court and other Courts. Some Government and autonomous corporations, like Post Offices, Railways and other communication services, transport (private and public), mills, factories, industrial and commercial establishments and markets. Exemptions were extended only to: ambulance, press cars, hospitals, medical shops, electricity and water supply. The offices, the Courts, the industries, totally came to a halt.

Each evening the military declared a curfew which was systematically defied. The army opened fire on some af the defying crowds and a number of casualties took place. It appears, however, that General Yakub, the military commander, was pressing for reinforcements, as in his view, the forces available to him were not adequate to suppress with a popular movement which had acquired massive proportions. It is said that it was this military judgement which had led him not to take the Non-Cooperation Movement head on, but to await arrival of reinforcements. In any event, he was replaced in the first week of March by Gen. Tikka Khan, who had acquired a reputation for carrying on a ruthless operation against civilians in Baluchistan.

At a meeting organised by students on 3 March, Sheikh Mujib demanded that the military should be pulled back to the barracks and power should be handed to the elected representatives of the people. If the people were denied self rule and suppressed by force, the people would not hesitate to sacrifice their lives. He also called for launching a 'no tax' campaign.

The same evening there was a radio announcement from Islamabad proposing a sort of round table conference of politcal leaders to be convened by Yahya in Dacca on March 10. The junta had begun to sense the magnitude of the movement which was underway. The call of a round table conference seemed only a further provocation, since this would mean that a party enjoying the absolute majority in the National Assembly would have to sit at a round table conference with other leaders whose claims and credentials to be there at all would be highly questionable. In the meantime, curfews and firing upon unarmed civilians continued.

I remember the pressure for an immediate rejection by Sheikh Mujib to this radio announcement. There were one or two voices suggesting that this proposal may not be rejected immediately but that the situation may be observed before a response is given. Some others suggested that at least the response may be deferred till the following day. Sheikh Mujib, however, reflecting the prevailing mood, decided that an outright rejection should be announced immediately. I was asked to prepare a statement for immediate issuance and within minutes the invitation to a Conference was termed as 'a cruel joke' and rejected. Attention, both inside and outside the country, was now rivetted to the meeting fixed for Mardh 7. Foreign commentators had begun to predict that UDI would take place on March 7.

In the meantime, thet Non-Cooperation Movement surged ahead. In view of the continued total compliance with the directive to continue the general strike, it soon became evident that in order to sustain a protracted movement, it would be necessary to ensure that essential services were maintained and certain essential economic activities were allowed to be continued, so that the people were saved from undergoing avoidable hardship. Since the Non-Cooperation Movement had started on 1 March, many government and non government employees had not been able to draw their salaries. Many who had received salaries by cheques had not been able to encash them. People from all walks of life came forward actively to support the Non-Cooperation Movement, pointing out the problems which were being thrown up, and suggesting ingenious solutions to them.

In order to meet problems as they arose, further directives were issued on March 4. These directives had now to be in the form of positive instructions, that is, it not merely asking people to refrain from doing certain things but specifically directing them to do certain actions or carry out certain functions, in accordance with the guidelines issued by the Awami League This was the first step towards the Awami League assuming the functions of a de facto Government in the Eastern wing. Thus, on March 4, specific directives were issued that government offices, where employees had not as yet been paid their salaries, should function between 2-30-p.m and 4-30 p. m only for the purpose of disbursing salaries. It was also directed that banks should function within the hours of 2-30 p.m. to 4-30 p.m. for the purpose of cash transactions within Bangladesh only in respect of salary cheques not exceeding 1500 rupees.

Since it was apprehended that opening of banks may lead to flight of funds to the West, it was specifically directed that no remittance should be effected outside Bangladesh and the State Bank was directed to take necessary action in this connection, The time was deliberately specified to be from 2-30 p m. to 4-30 p.m., rather than in the morning, so that it would be clear to all that the offices were not opening in the normal course, but specifically under the directives of, and in accordance with the instructions issued by the Awami League. Further exemptions were issued to cover the cars of doctors, press cars, also fire services and local and trunk telephones within Bangladesh. These directives were strictly complied with and offices and banks functioned between 2-30 p.m. and 4-30 p m. for the purpose. Further directives were issued to allow food godowns to remain open beyond 4-30 p.m. if necessary to complete delivery.

Members of some Trade Unions reported that in some cases a cheque for a substantially larger amount than 1500 rupees was required to be drawn representing the total wage bill of all the workers in an establishment, who were then paid in cash. In order to meet these cases, directives to the banks were modified further to provide that a cheque for an amount higher than 1500 rupees may be drawn provided that the wage register showing the total amount to be drawn was produced along with the cheque. Indeed, since this also created administrative difficulties it was in turn provided that such a cheque for an amount higher than 1500 rupees may be paid if it was certified by the trade unions of the industrial establishments concerned

On March 6, I was contacted by a group of Civil Servants, led by Sanaul Haque, saying that they had decided collectively to declare their support to Sheikh Mujib and would like to call on him to state that henceforward they would act upon the directives of the elected representatives. I arranged a meeting at which delegation of civil servants led by Sanaul Haque, formally declared their commitment to comply with the directives of the Awami League. Sheikh Mujib directed that they should liaise with me and that the three who had been entrusted with the task to preparing directives should meet daily with the civil servants. This became the nucleus of the administration which was to run affairs in the Eastern wing of the coming weeks.

On March 6, a meeting was called of the Working Committee members of the party at the residence of Sheikh Mujib to consider the position to be adopted at the public meeting on March 7. There were expectations inside the country that a declaration of Independence would be made on March 7. Indeed, the students and the younger elements strongly favoured such a declaration. In fact by March 7, there was little doubt among party members that Independence alone could be an acceptable goal. Anything less would not be acceptable to students, the younger elements and indeed large sections of politically conscious people. But the burden of responsibility still lay with Sheikh Mujib and the party in this matter. The full implications of making a declarations of Independence on March 7 had to be carefully weighed.

Unilateral Declaration of Independence would mean directly engaging the full force of the military. They would not only have found the pretext for using force but would hit out with everything they had in order to impose their will by force. Could an unarmed population absorb the

shock of such an onslaught and emerge victorious ? What would be the reaction of the outside world ? Would Governments come forward to recognise independent Bangladesh ? Would an independent Bangladesh Government be able to hold out for long enough in the face of an organised military onslaught to obtain such recognition ? Apart from that, given the different global and regional interests of the powers, would they accord recognition and accept the emergence of an independent Bangldesh ? These were among the many questions to which anxious consideration was given. In the meeting Sheikh Mujib heard different opinions which were expressed by different members and reserved judgement. The whole range of views was expressed. While the meeting was in progress, Yahya came on the air and broadcast a statement. It was a particularly provocative statement and highly offensive to Bengali sentiment. It blamed Sheikh Mujib and the Awami League for the prevailing situation. There was a menacing undertone from the statement.

> While realising that an application of adequate force can effectively bring the situation under control, I have deliberately ordered the authorities in East Pakistan to use the absolute minimum force required to stop the law breakers from loot arson and murder ...
>
> "finally let me make it absolutely clear that no matter what happens, as long as I am in command of the Pakistani Army foaces, I will ensure complete and absolute integrity of Pakistan. Let There be no doubt or mistake on this point. I have a duty towards millions of people of East and West Pakistan to preserve this country. They expect this from me and I shall not fail them. I will not allow a handful of people to destroy the homeland of millions of innocent Pakistanis. It is the duty of the Pakistan army forces to ensure this integrity, solidarity and security of Pakistan, a duty in which they have never failed.

Translated into less pompous language, the message was that Yahya believed that there wes a military solution possible of the situation, and that he regarded himself as possessing both the authority and the capability to adopt any measure and to resort to any degree of force he considered necessary for the purpose of "protecting the integrity of Pakistan".

The threat contained in this message was clear. On the conclusion of this broadcast Sheikh Mujib direcied that the meeting of the work-

ing committee members may be adjourned till late that evening and that in the meantime, he would decide on the line to be adopted the following day.

The burden of a decision rested squarely upon him. Sheikh Mujib asked the senior party leaders, M/s. Tajuddin Ahmed, Syed Nazrul Islam, Khondaker Mushtaq Ahmed, Capt. Mansoor Ali, A H M. Kamaruzzaman, for consultations. I was also called to join them. The implications of making an explicit declaration of Independence were carefully weighed. The fact that such a declaration would provide the army the opportunity they were seeking for a military onslaught was clearly preceived. It was decided that such an opportunity should be denied to them. At the same time, the momentum of the movement must be maintained and pressure should be kept on Yahya to proceed to transfer power to the elected representatives of the people. It was calculatad that if the tempo of the movement could be sustained and the unity of the people consolidated then it would become evident to Yahya and the military junta that use of military force could not result in their gaining any objective. It was therefore decided that the position to be taken should not be an explicit declaration of Independence. In order to exert pressure on Yahya specific demands would be made, and the movement would be sustained in support of these demands, with 'Independence' as its ultimate goal These demands would include withdrawal of army to the barracks, stopping further movement of troops from West to the Eastern wing and an enquiry into the killings. Sheikh Mujib directed that the two major demands should be highlighted, namely the immediate withdrawal of Martial Law and immediate transfer of power to the elected representatives of the people.

I was asked to prepare the draft of a formal statement embodying this position, which would be released to the press after the public meeting of March 7. In view of the improtance of the pronouncement it was decided that a written text should be kept ready to be released to the Press after Sheikh Mujib delivered his speech on March 7. A draft text was prepared by the same evening. The draft presented had included the point about termination of Martial Law and transfer of power to the elected representatives of the people and the last paragraph was as follows :

> The objective of the present phase of the struggle is the immediate termination of Martial Law and the trnasfer of power to the elected representatives of the people. Till this objective

is attained, our non-violent Non-Cooperation Movement must continue.

Sheikh Mujib directed that the text should be kept under the charge of Tajuddin and should be personally issued by him after making any amendments as may be necessary in the light of the speech as actually delivered.

The historic speech of March 7 lasted only 19 minutes The operative sentence in that was: "Our struggle now is for independence, our struggle now is for freedom." Also the immediate termination of martial law and transfer of power to the elected representatives were put forward as specific demand. The written text which was released, was accordingly amended by Tajuddin to include these two points as specific demands Thus, although independence was clearly set as the goal, Sheikh Mujib stopped just short of a formal declaration since it was clear that the army had been mobilised and had conspicuously taken up positions at different vantage points in the city in order immediately to strike, should such a declaration of independence be made. It may be mentioned that late the previous night (March 6) a Brigadier had called with a message from Yahya Khan, saying that he expected to come to Dacca soon and would hope to arrive at a settlement which would satisfy the Bengalis. This was a curious communication and was seen as trying to soften the offence given by his radio broadcast and at the same time, trying to influence the position to be taken by Sheikh Mujib at the March 7 meeting. I was also seen as an attempt to create an alibi for himself; thus, if a declaration of independence were made, Yahya could turn round to the world and say that he had offered to go to Dacca and reach a peaceful settlement but it was Sheikh Mujib who had declared UDI and precipitated the use of force. This was another consideration in Sheikh Mujib's holding back from a formal declaration on March 7

A further programme of action for the following week was announced. The 'no-tax" campaign was to continue Further exemptions and specific directives were announced on March 7, and March 9, to allow essential economic activities to continue. It was directed that railways and ports may functeon, but railway workers and port workers were directed not to co operate if railways or ports were used to mobilise forces for the purpose of coordinating repression against the people, The March 8 directives contained a number of specific directives to banks. These followed a round of meetings with Bengali bankers who reported numerous genuine difficulties which were being faced by parties. These new directives authorised

banking transactions for purchase of industrial raw materials for running mills and also bona fide personal drawings of up to rupees 1000·00. In order to ensure that certain "essential" economic activities were maintained it was directed that relevant Government offices should remain open for purposes of supply of fertiliser and diesel to power pumps. It was also directed that food supplies, supply of coal to brick fields and distribution of jute and rice seeds should be maintained.

A further meeting with bankers and with A K N Ahmed, a senior Bengali state Bank official, who came from Karachi, was held in order to work out a series of directives ...

Yahya arrived in Dacca on March 15, Sheikh Mujib met him on the morning of March 16. The meeting lasted for about an hour. When Sheikh returned, he called the senior leaders. I was also called in. Indeed for the coming weeks this was the procedure where after every meeting with Yahya or his advisers, a meeting was held to review the discussions. Sheikh Mujib reported that Yahya had begun by offering explanations for his action in postponing the National Assembly. Sheikh Mujib had charged him with a serious lapse in failing to consult Sheikh Mujib, who was the leader of the majority party before taking such a decision. Yayha then stated that he would like to find a way out of the present situation, whereupon Sheikh had told him that in view of all that happened and the mood of the people, nothing short of acceptance of the demands raised by him on March 7, in particular immediate withdrawal of Martial Law, and transfer of power to the elected representatives of the people, would suffice. Yahya then said that he had been advised that there were legal difficulties in withdrawing martial law before a constitution was framed. Sheikh Mujib thereupon had said that he would ask his legal experts to meet Yahya's advisers to discuss this matter and convince them that no legal difficulty would arise.

Following this, Sheikh directed that I should meet Lt. Gen. Peerzada the same evening, to discuss this point about the supposed legal difficulty. I met Peerzada that evening, and availed of the opportunity to charge Peerzada that they had been guilty of gross impropriety in postponing the Assembly in the way in which it had been done and told him that this had been taken as an affront to the entire Bengali people. He appeared uncomfortable and defensive. He then came to the question of the demands for immediate withdrawal of Martial Law and transfer of power to the elected representatives. He argued that if Martial Law were withdrawn before any Constitution were framed, then there would

be a legal vacuum I immediately countered this argument by saying that during the interim period between the withdrawal of Martial Law and the adoption of a Constitution, an Interim Arrangement's Order (in effect a provisional Constitution) could be in force and this could be promulgated by President Chief Martial Law Administrator, by the same Order, which he revoked Martial Law. This argument was to feature prominently in the ensuing negotiations

On the following morning, March 17, Sheikh Mujib met Yahya and reiterated his demand for withdrawal of Martial Law and transfer of power to elected representatives Yahya again mentioned legal difficulties and stated that he has sent for Justice Cornelius, now his legal adviser, to consider these questions A meeting between Yahya's advisers and the Awami League team was proposed On the evening of 17 March, Syed Nazrul Islam, Tajuddin Ahmed and myself were deputed to sit in negotiations with Yahya's advisers namely Peerzada, Cornelius and Col Hassan (the Judge Advocate General) The meeting commenced with Peerzada observing that the discussions between Sheikh Mujib and Yahya that morning had proceeded on the basis that Yahya would make a Proclamation He listed certain basic elements which were to go into such a Proclamation as had emerged from these discussions. According to him, Sheikh Mujib had proposed that a Constitution for the Eastern Wing should be drawn up by the Members from the Eastern Wing separately and a Constitution for the Western Wing may be drawn up by the Members from the West and then after they should sit together to make a Constitution for Pakistan It was also indicated that provision should be made for the East to enjoy autonomy on the basis of Six-Points In the Western Provinces would enjoy autonomy to the extent enjoyed by a Province under the 1962 Constitution, the additional powers to remain with the Centre Cornelius suggested that such an Instrument—a Provisional Constitution—should be brought into force by a Resolution of the National Assembly. It was then suggested that it would be best before the drafting of the Instrument was taken in hand, for the advisers of both sides to sit in a plenary meeting with Sheikh Mujib and Yahya so that basic guidelines could be obtained from them

It is not correct as stated in the Pakistan Government White Paper that on March 17, a Martial Law Regulation had already been drafted providing for setting up of Council of Ministers to aid and advise the Governors of the Provinces or that such a regulation had provided for the Martial Law to recede into the background The discussion, in fact, were exploratory

and most of the time was spent in going over the ground relating to the question of legal vacuum which according to Cornelius and Peerzada would occur if Martial Law were to be revoked before a Constitution was adopted. The counter-argument was put that an Interim Arrangements Order could be brought into force by a Proclamatian, which would provide the bridge between the withdrawal of Martial Law and the adoption of a Constitution.

It is now on record that following the meeting of March 17 Yahya Khan asked General Tikka Khan to "get ready" and, accordingly, on the morning of March 18, Major-Generals Khadim Hussain Raja and Rao Farman Ali prepared the blueprint for Operation Searchlight—the codename given to the plan for a military crackdown all over the province to be effective on March 25.

On the morning of 19 March, Sheikh Mujib had another meeting with Yahya and emphasized that the only solution was for withdrawal of Martial Law and transfer of power to the elected representatives. An Interim Arrangements Order could be in force during the interim period. Such an Order could be made by a Presidential Proclamation. The same evening Yahya's advisers sat with the Awami League team.

It is not correct, as the Pakistan Government White Paper states, that the President's team had provided a Martial Law regulation to meet the demands of the Awami League "as far as was legally possible." There was no indication of the existence of any such Martial Law Regulation having been drafted. Indeed, the following morning a good deal of time was taken up over the argument as to the legal vacuum and it was only, thereafter, that the question of drafting of any Instrument at all came up in the discussion.

On the morning of 20 March, Sheikh Mujib met Yahya. On this occasion Sheikh Mujib took with him Syed Nazrul Islam, Tajuddin Ahmed, Capt. Mansoor Ali, Khandaker Mushtaq Ahmed, A. H. M. Kamaruzzaman and myself. On Yahya's side, Peerzada, Cornelius and Col. Hassan were present.

On the previous day, while army trucks dad been passing through Tongi, they had been attacked by the people, and an exchange of fire between the army and the people had taken place. Indeed, it was one of the first instances of the people having offered armed resistancec to the military. The White Paper also reports that people had obstructed what the White Paper calls 'the normal movement of army supplies by Pakistani Ship M.V. Swat', when to the Bangalees these 'supplies' represented arms

intended to massacre the people. The atmosphere was tense. In some excitement, Yahya sa'd, although he had come to negotiate and that he had ordered the army to exercise restraint, he could not tolerate movement of 'military supplies' being obstructed by the Awami League. Sheikh Mujib also reacted strongly, saying that while negotiations were going on, it was expcted that the army should remain in the barracks. Yahya countered by saying that even if they stayed in barracks, the movement of army supplies must continue. Sheikh Mujib then stated that the movement of such army personnel in trucks was a provocation to the people since earlier there had been so many incidents where innocent unarmed civilians had been fired upon by military personnel. Indeed, very near Jaydevpur where the latest encounter had taken place only a few days earlier, innocent young unarmed persons had been fired upon by army personnel killing some of them, so that the emotions of the local people had been aroused. Sheikh Mujib urged that, given the roused feelings of the people, the army should not offer provocations. He also said that you know if unarmed people kept being shot at, ultimately they may also be forced to take up arms to shoot back, therefore, it was desirable that there should be a political solution and no further blood-shed.

This strong statement by Sheikh Mujib seems to have had some effect on Yahya, who then reverted to the question of a political solution, by saying that he was a simple man and although he was ready in principle to accept Sheikh Mujib's demands, he had been told by this experts that the withdawal of Martial Law before a Constitution came into force wold create a legal vacum. Cornelius picked up this point and read a short lecture on Constitutional Law and the need for there to be an ultimate source of authority in any legal system. I immediately countered by saying that there need be no such vacuum if an Instrument was promulgated by Yahya in the form of an Interim Arrangements Order which would be valid and remain in force till such time as the Constitution was adopted. Since arguments on this point tended to go on, I thought there might be a way out by suggesting that this point could be examined by a Constitutional expert, such as A K Brohi, whose views would be adopted by them. I knew that Brohi was in Dacca and was confident that his opinion would support the Awami League position, since it was legally sound. I also knew that Cornelius specially respected Brohi and was therefore likely to accept this suggestion. My assessment proved to be right, for Cornelius reacted by saying that such an opinion would be helpful. I undertook to obtain and forward such an opinion. Sheikh

Mujib turned to Yahya and said that it was for experts to find a way to give effect to the political decision which they would arrive at. "If we agree to give the necessary directions it will be the duty of experts to give effect to them" he asserted.

It was then proposed that the basic points which were to be incorporated in the proposed document to be drawn up should be noted down. These were to be worked out in the draft proclamation :

a) Withdrawal of Martial law
b) Transfer of power to elected representatives
c) Enjoyment of greater autonomy by the Eastern Wing
   (It was emphasized that this must be on the basis of the Six-Point scheme)

It was agreed that the President's Advisers would sit with the Awami League team the same evening to discuss how to give effect to this decision.

Yahya then raised the point that he thought that it would be necessary for him to consult West Pakistan leaders. Sheikh Mujib said that this was a matter for him and he was free to proceed as he wished. Yahya said that he considered it essential for him to seek concurrence of the West Pakistani political leaders as otherwise the responsibility would be too much for him. He also said that he wanted a signed letter from all the political leaders requesting him to make a Proclamation.

Yahya then said that he proposed to invite the West Pakistani Leaders, and in particular Bhutto. Sheikh Mujib said that the President was free to do so and that was a matter for him to decide. Sheikh Mujib, however, said that he would not directly meet Bhutto but that Yahya could meet him separately. This was in part an expression of resentment at the way in which Bhutto and his party had conducted themselves during and after the discussions held barely six weeks earlier. A more important reason was that Bhutto and Yahya were seen as basically representing the same interests, and, therefore, to allow them to negotiate separately would result in conceding to them a significant negotiating advantage.

I suggested that a working draft should be prepared by the government side, since they could draw upon the resources of the Law Ministry. It was suggested that the Legal Draftsmen of the Minitry of Law be sent for. A copy of the draft was to be sent to the Awami League team as son as it was ready.

On the morning of 21 March I was sent for by Sheikh Mujib. He and and Tajuddin were in the midst of a discussion and he put to me a view that

he had been giving thought to the matter of transfer of power and he thought that it would be expedient to Press for immediate transfer of Power only in the provinces and that, given the mood of the Bangalee people, it would not be advisable for Awami League to be seen to take over power at the Centre. It seems there were several reasons which weighed with him in coming to this conclusion :

(1) The mood particularly among the students was that the people's movement should not be compromised and that Awami League should not for the sake of 'power' compromise on its demands. Taking power at Centre could well be projected as such a compromise. Indeed some of the student leaders who had met Sheikh Mujib earlier, made this point forcefully.

(2) Taking Power at the Centre in the absence of a Constitution would expose Awami League to the risk of being ineffective at the Centre and thus discrediting themselves even before the Constitution could be framed,

(3) Taking power in the Province only would be a formula whereby the Awami League could consolidate its Position in the East without assuming responsibility for the Centre, which responsibility it would find difficult to discharge having regard to the preponderance of the Punjabi bureaucracy and the army.

(4) This would also enable Awami League an opportunity to muster the resources of the provincial Government, and in particular the police and the EPR, to face a situation of armed confrontation, the possibility of which had begun to loom large.

It appeared that Yahya might himself go along with this formula, since he could thereby retain his position at the Centre. Accordingly, Sheikh Mujib and Tajuddin sought an immediate meeting with Yahya. They told Yahya that in the present circumstances provision should only be made for transfer of power in the provinces.

In the meantime, an exhaustive written opinion was formulated and signed by Brohi. This was delivered to Col. Hassan. The Pakistan Government White Paper is therefore guilty of blatant falsehood in asserting that Awami League failed to produce a Constitutional Expert to support the point regarding the legal validity of the draft Proclamation.

On 21 Mareh a draft Presidential Proclamation said to be prepared by Col. Hassan was ready and a person was sent to collect it. This draft was examined by the Awami League team. It had obviously been prepared hurriedly. Interestingly enough, it had provided for Members from the Eastern wing to sit as a separate committee to frame provideb for Members provisions

relating to that wing and similarly for Members from the Western wing to sit as a separate committee. It provided that the proclamation of Martial Law would stand revoked from the day on which Ministers of the provincial governments took oath. Upon scrutiny of this draft, the Awami League team found that the draft was incomplete in many respects and imprecise in a number of formulations. First of all, it was their view that the revocation should be more prompt and should not be a long-drawn-out process taking effect on the taking of oath by Provincial Ministers, a process which could be Protracted, given the fact that five provinces would be involved. It was felt that the proclamation should take effect more promptly. The Awami League team suggested a formula whereby the Proclamation would take effect on appointment of Provincial Governors, or on expiry of 7 days from promulgation, whichever was earlier.

Bhutto, in the meantime, had arrived on the afternoon of 21 March. I remember when the revised draft was presented, Cornelius had been moved to say that this was indeed an improved and more complete draft. I immediately stated that this should not be described as the Awami League draft. The entire task of drafting should be regarded as a joint exercise. A clause by clause reading of the amended draft proclamation then began. Peerzada mentioned that he would be meeting Bhutto's advisers and had earlier indicated that a copy of the revised draft had been sent to Bhutto.

In Bhutto's own language the position on his arrival was as follows :

> At 7.30 that evening I met President Yahya Khan, at President House. The President informed me of the series of meeting he had held with Sheikh Mujibur Rahman from the 16 to the 20. In view of the headway made, Sheikh Mujibur Rahman had addressed a Press Conference on the 18 in which he said that progress had been achieved. As a result, the experts of the Awami League and of the President had held discussions on the proposed Constitutional arrangements. The President proceeded to inform me about the proposal made by the Awami League leader.
>
> The salient features of the proposal were that Martial Law be withdrawn immediately and power transferred in the five provinces without affecting a similar transfer in the Central Government. According to this proposal the President would continue running the Central Government as was being done at the time or, if he so chose, with the assistance of advisers not drawn from the peoples' representatives. It was also proposed

that the National Assembly be divided ab initio into two committees, one for West Pakistan comprised of the elected representatives from West Pakistan and the other for Bangladesh in Dacca. The committee would prepare their separate reports within a stipulated period and submit their proposals to the National Assembly. It would then be the task of the National Assembly to discuss and debate the proposals of both the committees and find out ways and means of living together. Under an interim arrangement, which was to be an amended form of the 1962 Constitution, East Pakistan would be given autonomy on the basis of Six Points and the Provinces of the West wing would have powers as provided in the 1962 Constitution, but would be free to work out their quantum of autonomy according to a mutuatly acceptable procedure, subject to the Paesident's approval. The entire scheme was to be published in the form of a Presidential Proclamation.

Bhutto then goes on to state that :
After narrating the proposal, Yahya told me (Bhutto) that he had made it clear to Sheikh Mujib that Yahya's concurrence to the proposal would be subject primarily to Bhutto's agreement, but that he (Yahya) would be more satisfied if the other leaders of West Pakistan would give their consent.

On the morning of 22 March, Sheikh Mujib called on Yahya to resume discussions while the written text of the draft proclamation was under discussion between the two teams. The White Paper's account that the President prevailed upon Bhutto himself to meet Sheikh Mujib is not true. Indeed, Sheikh Mujib, when he had gone for a meeting with Yahya, found Bhutto present and took the opoortunity to draw him aside to have a few words with him. According to Sheikh Mujib he suggested to Bhutto that it would be better for them to talk outside in the verandah so that they may not be overheard Bhutto's own account of this meeting is the following words

On the morning of the 22nd I arrived at President House a few minutes before the appointed time. Mujibur Rahman arrived promptly at 11 O' clock. We greeted each other and exchanged a few formal words.

After that we were escorted to the President. Once again there were formal greetings. ..

Mujibur Rahman then turned to the President and asked him if he had given his final approval to the proposals of the Awami League. The President reminded him that it was necessary for me also to agree and for that reason I was present at the discussions. On that Mujibur Rahman remarked that the proposals had been communicated to the President and it was for the President to convince me, and went on to say that once Mr. Bhutto agreed in principle to the proposals, they could hold formal discussion, but until then the discussions were of an informal nature and on leaving the President he would tell the press that he had met the President and that Mr. Bhutto also happened to be present. The President replied that this was not good enough, but Mujibur Rahman remained adamant. ...

As we entered the Military Secretary's room on our way out, Sheikh Mujibur Rahman asked General Mohammed Umar, General Ishaque, the Military Secretary to the President and the President's Naval aide-de-camp who were sitting in the room, to leave as he wanted to talk to me. I was a little surprised by this sudden change of attitude on his part. He grasped me by the hand and made me sit next to him. He told me that the situation was very grave and that he needed my help to overcome it. At this point, thinking the room might be bugged, we walked out to the verandah towards the back of the house and sat in the portico behind the President's salon.

Sheikh Mujibur Rahman repeated that he told me in the Military Secretary's room, and went on to say that things had now gone too far and there was no turning back. According to him the best way out was for me to agree to his proposals. He emphasized that there was no other alternative. He told me that he now realised that the People's Party was the only force in West Pakistan and the other politicians of West Pakistan were wasting his time. He volunteered the information that he had rebuked all of them except Khan Abdul Wali Khan, whose party at least represented one province, when they called on him. He said that he was now convinced that it was essential for the two of us to agree. He told me I could do whatever I wanted in West Pakistan, and he would support me. In return I should

leave East Pakistan alone, and assist him in ensuring that the Awami League's proposal materialised. He suggested that I should become the Prime Minister of West Pakistan and he would look after East Pakistan. According to him this was the only way out of the impasse. He cautioned me against the military and told me not to trust them : if they destroy him first, they would also destroy me. I replied that I would much rather be destroyed by the military than by history. He pressed me to give my consent to his proposal and to agree to the setting up ab initio of the two committees. ..

I told him that I would naturally give my most careful thought to his proposal and do everything possible to arrive at a fair settlement. However, whatever the final shape of the proposal, it should be passed by the National Assembly, if necessary in the form of a resolution authorising the issuing of the Presidential Proclamation. I further informed him that I was not prepared to give any letter in connection with proposals made outside the Assembly ...

Mujibur Rahman rejected the idea of the Assembly meeting at all, even briefly. Whatever the nature of the arrangement he was now determined to have it concluded in full without the National Assembly sitting as an Assembly for the whole country. After expressing those views he got up to leave. I accompanied him to his car and we said goodbye to each other. This was my last meeting with the Awami League leader.

Bhutto's account confirms the basic position that was being maintained by Sheikh Mujib. The point, however, that is made about Bhutto's own insistence that the National Assembly must first meet and approve the inter arrangements though subsequently asserted, had not at this stage been present. For after this encounter between Sheikh Mujib and Bhutto, the impression conveyed both inside and outside was that there was the glimmering of a possibility of political settlement. Indeed, Sheikh Mujib in reporting to the Awami League team this encounter, said, he felt that Yahya and Bhutto may have realised that it was in their best interest to have a solution along with the lines that had been proposed. Their position at least in the Western wing was thus safeguarded. Yahya

would remain president, Bhutto would get power in Punjab and Sind and since the Constitution for the Western wing would be made by a committee consisting of members from the west, Bhutto's party would in effect dominate that committee. I remember some foreign correspondents also saying that the 'two committees' approach may just be what Yahya and Bhutto wanted in order to secure their position in the west. The 22nd was a day of mild optimism as the hint of a possibility of a settlement appeared to be in sight.

In the evening of 22 March, the Awami League team went through the draft proclamation in my office, where Sheikh Mujib and other party leaders came and a careful reading was given to the entire draft since it seemed that such a draft may ultimately become a proclamation. Throughout the night of 22 March work went on to prepare a finished draft.

March 23 was an extraordinary day. This had previously been celebrated as 'Pakistan Day.' This was the day, however, when thousands of Bangladesh flags were on sale. I remember as I drove our of my office at 6 a. m. in the morning, with copies of the revised draft, I bought a Bangladesh flag at the Nawabpur railway crossing. I arrived at Sheikh Mujibur Rahman's house at about 7 in the morning with the revised draft. Soon many processions came there and hoisting of a Bangladesh flag in his house took place. Indeed, most of the houses and cars bore Bangladesh flags.

The Awami League team drove into president's house at 11-30 that morning with a Bangladesh flag on their car. The hostile reaction of military officers at president's House when they saw the flag was all too visible.

When the Awami League team enterd, they were told that M M Ahmed and some other financial experts had been brought over by the Government to examine the implications of the financial and economic provisions. Indeed, M M Ahmed started by saying that he thought that the Six Point scheme could be given effect to with some minor practical adaptations. Peerzada proposed that M M Ahmed may sit with the Awami League financial experts and mentioned the name of Nurul Islam.

Indeed, the Awami League financial experts, Nurul Islam, Anisur Rahman, Rehman Sobhan and others had been meeting daily at Nurul Islam's house and in fact, the financial and economic provisions in the Awami League revised draft had been votted by them. The Awami League team did not, however, wish to accept this proposal for a separate meeting between financial experts as it was seen as a time-killing manoeuvre. The Awami League team had begun to sense that Yahya's advisers were trying to prolong discussions on each clause and this was clearly seen as a dilatory tactic. In the evening sitting of 23 March, M. M. Ahmed produced a number of written slips by way of amendments and insertions to the draft. Even in respect of foreign trade and aid, M. M. Ahmed showed some flexibility. He said foreign trade could be left with the Eastern wing without any difficulty. About aid, he said the difficulty could be overcome if foreign policy aspects were left with the Centre. About the reconstruction of the State Bank, he said this also could be done and that in the interim period the Dacca branch of the State Bank could function as the Reserve Bank of Bangladesh. There could also be a bifurcation of the foreign exchange account the earnings generated by exports from the Eastern wing could be maintained in an account with the Dacca branch. Bifurcation of tax collection presented a more complex problem, and it was agreed that the Awami League team would present a practical scheme to deal with this matter in the interim phase.

The Awami League team itself left to join their economic experts who had been meeting continuously at Professor Nurul Islam's residenece. The amendments prepared by M M. Ahmed were discussed and carefully formulated provisions dealing with the collection, management of the foreign exchange current, as well as mode of dealing with foreign aid negotiations were prepared for presentation to the government side of the meeting later that evening.

On the evening of March 23, when the Awami League team returned to resume discussion on this economic provision, they learnt that Yahya had been away from President's House for the whole day. Indeed, Peerzada mentioned something about his being in the Cantonment and subsequent evidence was to show that March 23 had been the day when the 'Generals' had been meeting. Now we know for certain that

it was at this time that the plan for operation Searchlight wa given final approval and that two of its authors personally undertook helicopter rides on 24 March to pass the instructions to Brigade commanders of their trust outside Dacca. The inference from these circumstances seems irresistible that the discussions which M.M. Ahmed was having with the Awami League team regarding financial and economic provisions were being prolonged by the government side merely to consume time and to provide a cover while real preparations were afoot in the Cantonment for implementation of a 'military solution'. By the morning of 24 March, the Awami League team had concluded discussions of this economic provision and for all questional purposes a clause-by-clause reading of the entire draft Proclamation. When the Awami League team was leaving for the evening session on March 24, Sheikh Mujib indicated that for the name of the State, we should propose 'Confederation of Pakistan'. He indicated that we should explain that this was necessary to meet the sentiments of the people. This proposal in part reflected the intensity of the popular sentiment for independence, here particularly as this was articulated by the young militants who were in the vanguard of the mass movement which was surging ahead.

When this proposal was put to the government side, they strongly objected arguing that this represented a fundamental change in our stand. We argued that a change in the name did not amount to a fundamental change when all the substantive provisions remained intact, so that a limited but viable federal government had been adequately provided for. Cornelius seemed to appreciate the argument, but countered with the Proposal that perhaps the word "Union" could be taken as a substitute for "Confederation". The Awami League then re-iteratd its position, stating, however, that this point of difference related to a single word, and if the issue was not resolved, this matter could be resolved at the meeting of Sheikh Mujib and Yahya later, when the final draft was placed before them for their consideration.

The Awami League team could also sense that the situation outside was becoming very grave as the Army had moved to unload the M V Swat in Chittagong by using military force and hundreds of thousands of civilians were blocking their path in the road leading up to the Chittagong Port. Reports of mititary operations also came in from Rangpur.

Reports were also reaching Dacca that the army was preparing to launch an onslaught It was therefore felt that the 24th evening meeting should be a conclusive one, where the discussion should be brought to a close as there was little point in further prolonging technical discussions.

In the evening, the reading of all the clauses and the schedules of the draft was concluded. I then asked Peerzada, with a note of urgency, as to when the draft could be finalised? From the Awami League side it was proposed that I should sit with Cornelius that very night to finalise the draft, so that it could be put up before Sheikh Mujib and Yahya the next morning. Cornelius was agreeable but Peerzada held him back, saying "No, we have some discussions this evening, you may meet tomorrow morning." When I suggested that a time may be fixed on the following day, Peerzada again intervened to say that this could be done over the telephone and that he would be contacted over the phone. Then Peerzada turned to me and said, "When do you think the Proclamation should be made?", to which I replied that it should have been made 'the day before yesterday' and that the way things were going (I had in mind the situation in Chittagong and Rangpur, where the army had fired on civilians and Bengali policemen) time may be running out It was in this context that Tajuddin said that Awami League team thought that they had exhaustively discussed everything and there was nothing more to discuss. All that remained to be done was for a draft to be put before Sheikh Mujib and Yahya for their ultimate approval. Once approved, the Proclamation could be promulgated. This statement of Tajuddin has been sought to be misconstrued to make it appear that it was Awami League that broke off the negotiations. In fact, this was far from the truth. Since exhaustive discussions had taken place, what is required was finalisation of a draft to be put up before Sheikh Mujib and Yahya. I waited for a telephone call throughout the fateful 25th. This telephone call never came, Indeed, when I finally took leave of Shaikh Mujib at about 10.30 p m, on 25 March, Sheikh Mujib asked me whether I had received such a telephone call. I confirmed to him that I had not. A onslaught was launched by the army that night upon the Bangalee people, and the genocide and the bloodbath, the avoidance of which was the principal objective of holding the negotiations and seeking a negotiated political settlement, began.

ডঃকামাল হোসেন

১৯৭৪ ।

খন্দকার আসাদুজ্জামান

যদিও সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সম্পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তবুও অনেকের মত আমার মনেও দ্বিধা ছিল যে আসলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ আদৌ ক্ষমতা লাভ করবে কিনা? বিশেষ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবার পরেও যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করা নিয়ে পাকিস্তানীরা বিভিন্ন অজুহাতে গড়িমসি করতে লাগলো তখন এই ধারণা আমার আরো দৃঢ়বদ্ধ হয়। সবই মনে হচ্ছিল একটা সাজানো ব্যাপার, একটা সুদৃশ্য চালবাজি, যার মাধ্যমে গভীর কিছু ঢেকে রাখার প্রচেষ্টা চলছে।

আমি সে সময় রাজশাহীর জেলা প্রশাসক ছিলাম। জানুয়ারীর পরে আমাকে প্রাদেশিক সরকারের অর্থ-বিভাগের যুগ্ম-সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়। আমি ঢাকায় এসে সার্কিট হাউসে উঠি এবং চারিদিকে খোঁজ খবর রাখতে থাকি। বাইশে ফেব্রুয়ারী যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ভেংগে দেয়া হয় তখন আমার আশংকা আরো ঘনিভূত হয় যে অবস্থা হয়তোবা খুব খারাপ, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে এবং এই সবই যুদ্ধ তারই পূর্ব প্রস্তুতি। যখন সংসদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হয় তখন বলা যায় আমরা এক প্রকার নিশ্চিত যে দুর্যোগ সামনেই রয়েছে। এই সময় যে গণআন্দোলনের জোয়ার বয়ে যাচ্ছিল তাতে প্রায় সবাই সামিল হয়। সবাই চাইছিল কোন না কোন ভূমিকা পালন করতে। আমরা যারা সরকারী চাকুরি করতাম এবং একই সাথে দেশ-সচেতন নাগরিক ছিলাম, তারা বিশেষভাবে আলোচনা করতে থাকি বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কি ভূমিকা হওয়া উচিত।

একটি সভায় আমরা একসাথে মিলিত হই এবং আলোচনার পর কয়েকটি সিদ্ধান্ত এবং ঐক্যমতে উপনীত হই। আসন্ন দুর্যোগ যে অভাবনীয় কিছু সেটা সবাই ধারণা করে এবং বুঝতে পারে এই চক্রান্তের পিছনে একটা উদ্দেশ্য কাজ করছে—সেটি হচ্ছে বাঙালীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে শেষ করে দেয়া। যে ভাবেই হোক অসহযোগিতা বা প্রতিরোধ করতেই হবে। দেশ ও জাতির সংকট এমনই তীব্র যে সরকারী বেসরকারী ছাপ প্রয়োগের কোন অবকাশ নেই। সমস্যা এবং বিপদ গোটা জাতির। আমাদের এই সভা অনুষ্ঠিত হয় জনাব সানাউল হকের বাসায়। জনাব সালাহউদ্দিন, জনাব মুজিবুল হক এবং আরো কয়েকজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা ঘটনার গতিধারা পর্যালোচনা করতে থাকি। খুব সহজেই অনুমিত হয় যে প্রস্তুতি পর্ব চরমে উঠেছে। এম, ভি সোয়াতে অস্ত্র এসে গেছে। আমার মনে হচ্ছিল যে ভয়াবহ কিছু ঘটার শুধু বাকি। যখন জয়দেবপুর, চাটগাঁ এবং আরো কয়েকটি জায়গায় সেনাবাহিনী মানুষ হত্যা করছে তখন ঘটনা কোন্ দিকে মোড় নিচ্ছে তা পরিষ্কার হতে থাকে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি ২৩ তারিখে আমার গ্রামের বাড়ী টাংগাইলের উদ্দেশে রওয়ানা হই। সেখানে গিয়ে বিভিন্ন স্তরের নেতাদের সাথে আলাপ হয়। ২৪ তারিখে আমার শ্যালিকা ঢাকা ছেড়ে আসে এবং আমাদের জানায় যে, ঢাকা এখন একটা ভয়ের শহরে পরিণত হয়েছে। ২৫ তারিখে আলোচনা ভেংগে যায়। ২৬ তারিখে ঢাকার ঘটনা আমরা জানতে পাই। এই ঘটনা শোনার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা একত্রিত হন এবং সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেন আগামী কর্মসূচীর। আমাকেও এই সভায় যোগদান করতে আহবান করা হয় এবং সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। আমি উক্ত পরিষদের পরামর্শদাতা হিসেবে যোগদান করি। জনাব বদিউজ্জামান এই সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি হন। ঘোষণা করা হয় বাংলাদেশ স্বাধীন এবং এই স্বাধীনতা রক্ষার্থে আমরা সর্বাত্মকভাবে লড়বো।

আমি আমার বক্তব্য রাখি এবং বলি, যে সব মানুষ এলাকায় আছে তাদের দু'টি ভাগে বিভক্ত করতে হবে। যথা ট্রেনিং প্রাপ্ত এবং ট্রেনিং বিহীন। এছাড়া আমরা পুলিশ ও আনছারদেরও যোগদান করতে অনুরোধ জানাই। এই ভাবে বিভিন্ন কর্মীশিবির খোলা হয়। মূল সমস্যা অবশ্য একটাই, সেটা হচ্ছে অস্ত্র। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে ডি, সি, এবং পুলিশ অফিসার উভয়ই অনুপস্থিত। তাঁদেরকে সংবাদ দেয়া হয় এবং তাঁরা এসে এই আন্দোলনে যোগদান করেন। এদিকে ট্রেসারীর দায়িত্বে যিনি ছিলেন তিনি বলেন যে তাঁর নিজের অবস্থা বাঁচানোর জন্য একটা কিছু লিখিত দেয়া উচিত। ওই এলাকার সর্বোচ্চ সরকারী কর্মচারী হিসেবে আমি তাঁকে লিখিতভাবে আদেশ দেই। চারিদিকে সাড়া পড়ে যায় এবং সবাই আন্দোলনে অংশ গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করে। এক কথায় সবাই জড়িয়ে পড়ে কোন না কোন কাজে। এটা অত্যন্ত আনন্দজনক এবং অনুপ্রেরণাদায়ক হলেও নিয়ম শৃংখলার সমস্যা সৃস্টি হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আমরা যতদুর সম্ভব সুসংগঠিত ভাবে এই আন্দোলন গড়ে তুলতে চেস্টা করি। আমি বুঝেছিলাম যে সরাসরি ট্রেনিং এর ব্যবস্থা না করলে অথবা অস্ত্রের সঠিক ব্যবহার না হলে অবস্থা অসুবিধাজনক হতে পারে। এই সময় টাংগাইলের ছাত্র-নেতা কাদের সিদ্দিকী আমার সাথে দেখা করেন এবং বলেন যে তিনিও কিছু ছেলেকে ট্রেনিং দিচ্ছেন এবং আমাকেও এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। ... খবর নিয়ে জানা যায় যে জেলা সদর দপ্তরে বি, ডি, আর ক্যাম্প আছে এবং সেখানে প্রচুর অস্ত্র আছে। আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করি।

তারা আমাদের জানান যে, কোন ভাবে তাদের কাছ থেকে অস্ত্র নেয়ার চেস্টা করলে তারা শুধু দেবেনইনা বরং সংগ্রামেও যোগদান করবেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তাদের ওপর একটা ভুয়া আক্রমণের ব্যবস্থা করি। প্রায় সাথে সাথেই বি, ডি, আর সৈন্যরা পাকিস্তানীদের বন্দি করে এবং আমাদের সাথে যোগদান করে। এই ঘটনাটি ঘটে ২৮শে মার্চ তারিখে। আমরা সে সময় শুনতে

পাই যে মেজর শফিউল্লাহ জয়দেবপুর থেকে বাঙালী সৈন্যদের নিয়ে বের হয়ে গেছেন এবং ময়মনসিংহের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। সিরাজগঞ্জ থেকে উক্ত এলাকার কর্মকর্তা জনাব শামসুদ্দীন আসেন। তিনি জানান যে সাংগঠনিক দিক থেকে তারা অনেক এগিয়েছেন কিন্তু তাদের কোন অস্ত্র নেই। আমরা জানাই যে আমরা ৫০টা রাইফেল তাদের দিতে পারি।

আমাদের নিজেদের এলাকায় আমরা আমাদের সীমিত সংখ্যক অস্ত্র বিলি করি। যতদূর সম্ভব সেই ভাবে আর যেখানে যেখানে ট্রেনিং হচ্ছে সেখানে একটা দুটা করে অস্ত্র দেয়া হয়। এই সময়ে ময়মনসিংহএর অবস্থা জানার চেষ্টা করি। আমরা জানতে পারি যে সেখানকার ই, পি, আর বাহিনীও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। শহর প্রায় জনশূন্য। অবশ্য সাংগঠনিক তৎপরতা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জেলা প্রশাসকের বাসায় পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। হাসান আহমদ এবং সিরাজউল্লাহ ছিলেন এই এলাকার সরকারী কর্মকর্তা। উক্ত সভায় রফিকউদ্দিন ভুঁইয়া এবং সৈয়দ আব্দুস সুলতান উপস্থিত ছিলেন আমাদের সাথে। আমরা তাদেরকে জানাই টাংগাইলে কি ধরণের কর্মতৎপরতা চালানো হচ্ছে। আলোচনার পর ঠিক হয় যে যদি প্রতিরোধের প্রশ্ন আসে তবে আমরা মধুপুরেই প্রতিরোধ করবো যেহেতু রণকৌশলের দিক থেকে এই জায়গা আমাদের সবচেয়ে সুবিধাজনক মনে হয়। সমস্যা অবশ্য তখনও একটাই ছিল, অস্ত্র কোথায় পাওয়া যাবে।

টাংগাইল এসে খবর পাই যে পাক-সেনারা টাংগাইল অভিমুখে আসছে। পরে আবার খবর আসে যে মির্জাপুর পর্যন্ত এসে তারা ফিরে চলে গেছে।

ই, পি, আর-এর কিছু সৈন্য নিয়ে আমি মির্জাপুরের উদ্দেশে রওয়ানা হই। আমরা কালিহাতিতে এসে থামি এবং আমি মির্জাপুর গিয়ে সংসদ সদস্য শওকত আলী খানের সাথে দেখা করি। তিনি আমাদের বক্তব্য শোনেন এবং একমত হন যে প্রতিরোধ করলে মির্জাপুরের আগেই করতে হবে। এরপর মেয়েদেরকে কুমুদিনী কলেজ এবং হোস্টেল থেকে চলে যেতে বলা হয়। কালিয়াকৈর পর্যন্ত গিয়ে অনুসন্ধান চালানো হয়। ঠিক হয় পাক-সেনাদের গতি-বিধির ওপর চোখ রাখা হবে। ৩রা এপ্রিল গোলাগুলির আওয়াজ পাই। নাটিয়াপাড়া নামে একটা জায়গায় পাকিস্তানীরা আক্রমণ চালিয়েছে। কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধ হয় এবং তারপর আমাদের সৈন্যরা পিছু হটে [illegible]ল শুরু হয় হত্যাযজ্ঞ এবং গ্রাম পোড়ানো। আমি টাংগাইলে এর আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম আক্রমণ হলে কোথায় যেতে হবে।

আমাদের প্রধান কাজ ছিল অস্ত্র হেফাজতে রাখা। কাদের সিদ্দিকী এই কাজের দায়িত্বে ছিলেন। গিয়ে দেখি তিনি দুটো ট্রাকে অস্ত্র বোঝাই করছেন। নতুন সদর দপ্তরের উদ্দেশে আমরা রওনা হই। আমি সিদ্ধান্ত নেই যে

আমার পরিবারকে গ্রামের বাড়ীতে রেখে আসবো, একসাথে থাকবোনা। এখানে বলা যেতে পারে যে এক এলাকা থেকে আর এক এলাকায় আমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। খবর পেলাম টাংগাইল পাকিস্তানীরা দখল করে নিয়েছে। তখন ঠিক করি যে জামালপুর যাবো। সেখানে এম, পি, নিজামউদ্দীনের সাথে দেখা হয়। অস্ত্রের অভাব পুনর্বার প্রকটভাবে জানতে পারি। এরপর আমি নিজ পৈত্রিক নিবাসে যাই। গিয়ে দেখি ডাইনামাইট দিয়ে সেটা উড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং জানতে পারি যে আমাকে ধরিয়ে দেবার জন্য ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় সিদ্ধান্ত নেই সিরাজগঞ্জ যাওয়াটাই শ্রেয় হবে। সিরাজগঞ্জ আমাদের গ্রামের ঠিক উল্টো দিকেই অবস্থিত। আমরা হেঁটেই পার হয়ে যাই। এর মধ্যে একটি ঘটনা ঘটে যায়। ডি, সি-র স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন এবং তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হন। আমার পরিবারও তাঁর সাথে ঢাকার দিকে রওয়ানা হয়। বাবার ধারণা ছিল সেটাই ভালো হবে। পথিমধ্যে তাঁরা গোপালপুরে এসে জানতে পারেন যে কারফিউ জারি রয়েছে। রাত্রে ওখানকার থানার ও, সি, এসে জানায় যে আমার নামে গ্রেফতারী পরওয়ানা রয়েছে এবং আমাকে পেলে পাকসেনারা হয়ত সবাইকেই হত্যা করবে। তারা কোন রকমে সেখান থেকে ফিরে আসেন। আমরা আবার সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকি। জানতে পারি পাকিস্তানীরা আরিচা পর্যন্ত এসে গেছে। তখন আমরা বগুড়ার উদ্দেশে রওয়ানা হই। এর মধ্যে নগরবাড়ীর পতন ঘটে ১১ই এপ্রিলে।

উল্লাপাড়ায় গিয়ে দেখি বি, ডি, আর এর সেনারা ট্যাংক আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমি বগুড়ায় চলে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি শহর প্রায় জনশূন্য। হঠাৎ একটা বিমান [illegible] দেখি। পরে কিছু অফিসারের সঙ্গে দেখা হয়। বগুড়া তখনও মুক্ত। এরই মধ্যে পাকিস্তানীদের সাথে দুটো সংঘর্ষ হয়েছে। এখানে সংগ্রাম পরিষদ সব দায়িত্ব পালন করছিল। তবে কতদিন এই প্রতিরোধ টিকিয়ে রাখা যাবে তা নিয়ে সবাই চিন্তিত ছিল। এম, আর, আখতার মুকুলের সাথে দেখা হয় সেখানে। তিনি ঢাকার খবর দিলেন। তিনিও আমাদের সাথে জয়পুরহাটের দিকে রওয়ানা হন। সেখানে আমাদের পরিবারের লোকজনকে রেখে আমরা কয়েকজন ১৬ই এপ্রিল হিলি উপস্থিত হই ভারতীয় সীমান্তে। বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোকজনদের সাথেও সেখানে দেখা হয়। অস্ত্রের প্রকট অভাব সহজেই পরিলক্ষিত হয়।

আমরা সীমান্ত পার হয়ে ভারতীয়দের সাথে যোগাযোগ করি এবং অস্ত্র-সাহায্য কামনা করি কিন্তু সেসময় কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। তাদের কাছে নাকি কোন আদেশ ছিল না আমাদের সাহায্যের ব্যাপারে। অবশ্য আমরা নিজেরাও জানতাম না যে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়েছে।

এমন সময় খবর এলো যে জয়পুরহাট দিয়ে পাকিস্তানীরা আসছে হিলির দিকে। সেখানে মুকুল সাহেব ছিলেন, খবর পাঠালাম আমার এবং তাঁর নিজের পরিবার সহ হিলি চলে আসতে। কিন্তু খবর পাঠানোর বহুক্ষণ পরও কাউকে না আসতে দেখে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ি। তখন কিছু লোক এবং অস্ত্র নিয়ে জয়পুরহাটের দিকে যেতে থাকি। পথিমধ্যে পাঁচবিবির কাছে হঠাৎ জীপ গাড়ীর আলো দেখি এবং তারপরই সবার সাথে দেখা হয়। জানতে পারি যে মুকুল সাহেবকে যে কোন কারণেই হোক পাঞ্জাবী বলে সন্দেহ করা হয় এবং অন্য-দেরকে বিহারী মনে করা হয়। তাদেরকে থানায়ও নিয়ে যাওয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত ও. সি-র কথায় জনতা তাদেরকে মুক্তি দেয়। রাত ১২ কি ১টার দিকে আমরা সীমান্ত পার হই। আমার মানসিক অবস্থা যে কি ছিল তা বলার নয়। ভীষণ মন খারাপ। এভাবে যে দেশ ছাড়তে হবে তা কোনদিন ভাবিনি। তাছাড়া মুজিবনগর সরকারের কোন সংবাদ আমি তখনও জানতাম না।

মালদহ পৌঁছে ডি সি-র সাথে দেখা করি। শুনলাম অন্য কয়েকজনও এসেছেন এই পথ দিয়ে। তাঁর কাছে কোন নির্দেশ আসেনি তবে তিনি আমাকে মুজিবনগর সরকারের সংবাদ দিলেন। পরের দিন মুকুল সাহেবের সাথে কোলকাতায় উপস্থিত হই এবং জনাব নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ ও কামরুজ্জামানের সাথে দেখা করি। তাদের সঙ্গে সরকার গঠন নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়। জনাব নুরুল কাদের খানের সাথে কথা হয় এবং আমাদের দুজনকে একটি সরকারের কাঠামো তৈরী করার দায়িত্ব দেয়া হয়। কিছুদিন পর আমাদেরকে সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

এর কয়েকদিন পরই জনাব হোসেন আলী মুজিবনগর সরকারের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করেন। আমি অর্থ সচিব নিয়োজিত হই এবং দূতাবাসের একটি কক্ষে আমার দপ্তর স্থাপন করি।

আমাদের অর্থের মূল উৎস ছিল বিভিন্ন ট্রেজারী থেকে লব্ধ টাকা। এর সঙ্গে যোগ হয় হোসেন আলী সাহেবের নিয়ন্ত্রণাধীন দূতাবাসের টাকাগুলো। একাউন্ট রক্ষা করা এবং সরকারী অর্থের অডিট করা আমার বিভাগের প্রধান কাজ ছিল।

মুজিবনগর সরকারের কাজ ছিল প্রধানত দুটি—এক, যুদ্ধ করা ; দুই, শরণার্থী-দের দেখাশুনা করা। আমাদের দায়িত্ব ছিল ভারতীয় সরকারের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে শরণার্থীদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করা। এই সাহায্য ছিল প্রধানত ভারতীয়। কিন্তু রিলিফ ক্যাম্পগুলো ছিল আওয়ামী লীগ নেতাদের হাতে।

আমরা মাঝে মাঝেই এই শরণার্থী শিবিরগুলোতে যেতাম। সেখানকার অবস্থা ছিল অবর্ণনীয়। আমার জীবনে এত মানুষকে এত কষ্টে জীবন যাপন

করতে আমি দেখিনি। তবে ভারতীয় এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা এই দুরবস্থা কিছুটা লাঘব করার জন্য বহু কাজ করেছে।

সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায় ছিল মুক্তি ফৌজ গড়ে তোলা। ছেলেদের প্রশিক্ষণ দান ছিল এই কর্মসূচীর প্রধান অংশ। এই লক্ষ্যে "যুব নিয়ন্ত্রণ বোর্ড" গঠিত হয়। উইং কমাণ্ডার মীর্জা এর প্রধান ছিলেন। ফ্লাইট লেঃ রেজা তাঁকে সহায়তা করতেন। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হয়। লাখ লাখ তরুণ ও যুবক এসে তাতে যোগদান করে। এই যুব শিবির গুলোকে মুজিব-নগর সরকারের অর্থে চালানো হোত। শিবির এলাকা থেকেও চাঁদা সংগ্রহ করা হোত কিন্তু সব খরচ 'ফাইনানসিয়াল রুল' অনুযায়ী হোত। একটি প্রতি-ষ্ঠিত সরকার যে নিয়মে তার টাকা বরাদ্দ ও খরচ করে, আমরা যতদূর সম্ভব, সেই ভাবেই করতাম। এখানে উল্লেখ্য যে, সরকারী কর্মচারীদের সর্বোচ্চ বেতন ছিল পাঁচশত টাকা। যুদ্ধের খরচের ব্যাপারে সরাসরি সিদ্ধান্ত নিতেন মন্ত্রী পরিষদ। এটি আমাদের বিষয় ছিল না।

জোনাল এডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল গঠন ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই আঞ্চলিক প্রশাসনিক এলাকাগুলো যেমন সেই এলাকার সব দায়িত্ব বহন করতো তেমনি এদের প্রায় সামগ্রিক অর্থ যোগানোর দায়িত্ব ছিল আমাদের বিভাগের। তবে আমরা খুব টেনে খরচ করতাম যেহেতু আমাদের অর্থ ছিল কম এবং কেউই বলতে পারতো না যুদ্ধ কতদিন চলবে। পরবর্তীকালে বাংলা-দেশ সরকার আমাদের সব হিসাবের সঠিক হিসাব গ্রহণ করে।

কিছু কিছু মুক্ত এলাকায় সীমিতভাবে ব্যবসা বাণিজ্য চালু করা হয়ে-ছিল। এর একটি কারণ ছিল শত্রুকে জানানো যে আমরা ক্রমে প্রশাসন দখল করে নিচ্ছি। এছাড়া বেসরকারী কোন সংগঠন বা কোন দলের হাতে ক্ষমতা যাতে না যায় সে জন্যও। এই সব কাজেও আমাদের দপ্তর সাহায্য করতো ও নিয়ন্ত্রণ রাখতো।

মুজিবনগর সরকার একটি প্লানিং বোর্ড স্থাপন করেছিল। এই প্রতিষ্ঠানকে বলা যেতে পারে আগামী বাংলাদেশের একটি প্রতিবিম্ব স্বরূপ। যে সব পরি-কল্পনা এখানে তৈরী হয় তা ছিল সমগ্র মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলক। বিভিন্ন ধরণের পরিকল্পনা তৈরী হয় বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। এই পরিকল্পনাগুলো ছিল স্বাধীন দেশের জন্য—সেই স্বাধীনতা যত দ্রুতই আসুক বা দীর্ঘকাল পরেই আসুক।

অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে একটা ব্যাপার পরিষ্কার করা যেতে পারে। জোনাল এডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল গুলোকে কিছুটা স্বাধীনতা দেয়া হোত অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে। একই সাথে এটাও লক্ষ্য করা তাদের দায়িত্ব ছিল যে অন্য কোন

সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান যেন চাঁদা সংগ্রহ অভিযান না চালায়। কেবলমাত্র তাদের চাঁদা সংগ্রহই বৈধ ছিল এবং তারাই সেই অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

তবে আমরা এটাও জানতাম যে বিচ্ছিন্ন যেসব মুক্ত এলাকা ছিল বা যেখানে যোদ্ধারা ছিল সেখানে চাঁদা ওঠানো হবে। আমরা খবর পেতাম যে চাঁদা সংগ্রহ হতো খুবই সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে। সাধারণ মানুষরা এই সব ক্ষেত্রে নিজেরাই এগিয়ে এসেছে সব ধরণের সাহায্য নিয়ে। জোনাল এডমিনি-স্ট্রেটিভ কাউন্সিল এর ব্যাপারে আর একটা কথা বলা যায়। সেটা হচ্ছে এই বিভাগকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হত তাদের কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য। কেননা এই ব্যাবস্থা ছাড়া তাদের পক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বহন করা সম্ভব ছিলনা। প্রায় সব ধরণের সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার তাদের ছিল। আমরা মুজিবনগর সরকার পরিচালনা করতাম সম্পূর্ণ নিজেদের শক্তি ও সামর্থের ওপর। আমাদের সংগে ভারতীয় সরকারের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত আনুষ্ঠানিক এবং প্রয়োজন ভিত্তিক। সরাসরি কোন যোগাযোগ খুব কমই হোত। লিয়াজোঁ অফিসারের মাধ্যমে আমাদের কাজ সমাধা হোত এবং প্রয়োজনীয় তথ্য আদান প্রদান করা হতো।

আমরা জানতাম মুক্তিযুদ্ধে সৈন্যবাহিনীই প্রধান ভূমিকা পালন করবে তবে আমরা একই সাথে সচেষ্ট ছিলাম একটি সক্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠা করতে। যাতে প্রয়োজনের সময় আমরা একটি কার্যকরী সরকার তৎক্ষণাৎ চালু করতে পারি। প্রায় সব টাকা পয়সা প্রদান করা হতো চেকের মাধ্যমে। এখানে বলা যায় যে সমগ্র মুজিবনগর সরকারের অধীনে এক হাজারেরও বেশী কর্মচারী ছিল। আমাদের টাকা পয়সা বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যাংকেও রাখা হতো—যদিও সরকার হিসেবে আমাদের কোন আনুষ্ঠানিক অস্তিত্ব ছিল না। যুদ্ধ সম্পর্কিত গোপনীয়তা চরম ভাবে রক্ষা করা হতো। খুব কম লোকেই জানতো যুদ্ধ কখন শুরু হতে পারে যদিও সবার কম বেশী একটা ধারণা ছিল যে যুদ্ধ বাধবেই। যেমন আমরা ১৯৭২ সালের বাজেটও প্রস্তুত করি যা পরে প্রয়োজন হয়নি। এখানে উল্লেখ্য যে আমাদের কাছে যে অর্থ ছিল তা আমাদের হিসেবে দু'বছর পর্যন্ত সরকার পরিচালনার জন্য যথেষ্ট ছিল। এরপর অবশ্য নতুন অর্থ সংগ্রহের প্রশ্ন আসতো। আমরা অবশ্যই চাইছিলাম সমস্যার দ্রুত সমাধান। আমাদের মনে হতো যে মুক্তিবাহিনী একা যুদ্ধ করলে কয়েক বছর লাগবে এবং এ যুদ্ধ ভারতীয় সাহায্য নিয়েই করতে হবে। যদি যৌথ কমাণ্ডের অধীনে যুদ্ধ হয় তবে তা হবে ক্ষণস্থায়ী এবং কম ক্ষয়ক্ষতিপূর্ণ। এটি ছিল যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের ধারণা।

উপসংহারে বলা যায় সময়টা ছিল একেবারেই বিশেষ ধরণের। নিজেদের শুধুমাত্র সরকারী চাকুরে বলে কখনও মনে হয়নি। আমরা ছিলাম মুক্তি-

যুদ্ধের একটি অংশ। কোন কষ্টই বড় কষ্ট ছিলনা। কোন ত্যাগের প্রশ্নে ছিলনা দ্বিধা। কখনও ভাবিনি আমাদের কি হবে। একটা কথাই কেবল মনে হতো—কাজটা যে করেই হোক সমাধা করতে হবে। তার জন্য যা করার দরকার সবই করতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম অন্য সবার মত।

খন্দকার আসাদুজ্জামান
মার্চ, ১৯৮৪।

জয় গোবিন্দ ভৌমিক

১৯৭১ সালের মার্চ মাস। আমি তখন ঢাকায় জেলা ও দায়রা জজের দায়িত্বে নিয়োজিত। আমার কোয়ার্টারটা ছিল পুরানো সার্কিট হাউস চত্বরে। আমার বাসার কাছেই কাকড়াইলে অবস্থিত সেন্ট্রাল সার্কিট হাউস। সেখানে স্থাপিত হল পাক বাহিনীর আঞ্চলিক হেডকোয়ার্টার। মিলিটারীর খট্ খট্ পায়ের শব্দে আর বন্দুকের আস্ফালনে বুক কেঁপে কেঁপে ওঠে।

২৬শে মার্চ রেডিও মারফত ফরমান এলো থানায় বন্দুক জমা দাও। পায়ে হেঁটে কাঁপতে কাঁপতে বন্দুক হাতে নিয়ে গেলাম রমনা থানায়।

২৮শে মার্চ সবাইকে ৯ টায় নিজ নিজ অফিসে অবশ্য হাজির হতে হবে। পুরানো সার্কিট হাউস চত্বর থেকে ঢাকা কোর্টের দূরত্ব আনুমানিক ৪ ½ মাইল। গাড়ী ঘোড়া চলছে না। লোকজন প্রাণের ভয়ে গ্রামাঞ্চলে পায়ে হেঁটে চলেছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। পায়ে হেঁটে জীবনকে হাতে নিয়ে আমিও চললাম পুরানো ঢাকার জজ কোর্ট চত্বরে অফিসিয়াল দায়িত্ব পালন করতে। আমার সঙ্গে ছিলেন আমারই ব্যাচমেট তৎকালীন ঢাকাস্থ এডিশনাল জেলা জজ আতিয়ার রহমান সাহেব। আমরা আদালত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলাম বহু কষ্টে কারণ, দারোয়ান বা নাইট গার্ডরা প্রাণ ভয়ে কোথায় যে পালিয়েছে তার ঠিকানা নেই। তৎকালীন নেজারত খানায় আগুন লাগান হয়েছে। ফলে অনেক মুল্যবান দলিল পুড়ে গেছে। পশ্চিম দিকের তিন তলা ইমারতটি যেখানে কিছু-দিন আগেও সাময়িকভাবে জজ সাহেবের এজলাস বসত সেখানে নীচতলায় মিটি মিটি আগুন জ্বলছিল। আমরা বহুকষ্টে মুল্যবান মামলার রেকর্ডগুলি সরিয়ে এনে একটা টেবিলে জমা করি। কোন ঘরে আমরা প্রবেশ করতে পারিনি, কারণ দারোয়ানরা তালা লাগিয়ে পালিয়েছে। পরে বহু চেষ্টায় কাচের জানালা ভেঙ্গে দুএকটি অফিস কক্ষে প্রবেশ করি। মুন্সেফ, সাব জজ, এডিশনাল জজ সাহেবরা সকলে একটি কাগজে তাদের নাম লিখে আমার হাতে দিয়ে অফিসের হাজিরার দায়িত্ব পালন করেন।

এমনিভাবে কয়েকদিন কাটিয়ে দিলাম। পথের হয়রানি লেগেই আছে। পাকসৈন্যরা সবার কাছে পরিচয়পত্র চায়—আমরা পাকিস্তানের দুষমণ কিনা জানতে চায়। তাই সবার নামে একটি করে 'আইডেন্টিটি কার্ড' প্রদান করতে হল যাতায়াতে যাতে করে বিঘ্ন না ঘটে। কিন্তু প্রধান হিসেবে আমার নাম দস্তখত করলাম অস্পষ্টভাবে, পাক সেনারা যাতে জানতে না পারে যে আমি একজন হিন্দু। কারণ তাদের ধারণা হিন্দুরা কাফের এবং তারাই যত অনিষ্টের মূল। কোর্ট কাচারী তখন নামেই চলছিল। মক্কেল নেই, লোকজন প্রাণের ভয়ে কোর্টে আসত না। আমার ছোট একটা ফিয়েট মটর কার ছিল। ঐটায় তখন কোনমতে কোর্টে আর বাসায় যাতায়াত করতাম। গাড়ীর ভেতর রাখতাম 'জিন্নাহ ক্যাপ' যাতে করে কেউ টের না পায় আমি একজন হিন্দু জজ। আর কাগজে লিখে নিয়ে তিন চারটা কলেমা মুখস্থ করে আওড়াতাম যাতে আমি পাক-সেনাদেরকে বুঝাতে পারি আমি একজন সাচ্চা মুসলমান।

সেনা পরিবেষ্টিত হয়ে প্রতিনিয়ত মৃত্যুভয়ে ভীত অবস্থায় কয়েকটি দিন কাটিয়ে দিলাম কোন মতে। এর মধ্যে একদিন তৎকালীন জুনিয়র এডভোকেট জনাব জি.এ খান এসে বললেন, 'স্যার শীঘ্র ঢাকা থেকে অন্যত্র চলে যান। আপনার নাম মিলিটারী জজের তালিকায় ৩ নং এ দেখলাম। ওরা 'কম্বিং অপারেশন' শুরু করতে যাচ্ছে।

সংবাদটা বড়ই করুণ। বুকটা কেঁপে উঠলো। ঢাকা ছেড়ে কোথায় যাব? ঢাকা জেলার না চিনি গ্রামগঞ্জ, না চিনি পথঘাট। চারিদিকে মিলিটারী আর মিলিটারী। মৃত্যুর দিন গুনছিলাম। ঠিক এই সময় এডভোকেট আলী আমজাদ সাহেবের শ্যালক এ, এ সরোয়ার [খোকন] এসে হাজির। তিনি আমাদের অতি পরিচিত ছেলেমেয়েদের খোকন ভাই। তিনি বললেন কোন ভয় নেই, গাড়ী রেডী আছে, পথঘাট সব ঠিক আছে, বৈদ্যের বাজার দিয়ে কুমিল্লা হয়ে আগরতলায় পৌঁছাতে মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যাপার, বেলা ১০টায় রওয়ানা হলে সন্ধ্যার আগেই আমরা পৌঁছে যাচ্ছি, অতি সহজ ভাষায় বলে ফেললেন। আমিও তার কথা সহজভাবেই বিশ্বাস করে মুক্তির পথ খুঁজে পেলাম।

কয়েকটা হাতব্যাগের মধ্যে সোনাদানা, টাকা পয়সা, কয়েকটা মূল্যবান জামা কাপড় পরে নিয়ে ২/৩ দিনের মধ্যেই ঢাকা ছাড়ার সংকল্প করলাম। আশপাশের অফিসাররা জানতে পারলে সমূহ বিপদ হবে। তাই কাউকে কিছু বলিনি। খোকন মিয়ার প্ল্যান অনুযায়ী আমি বেলা ১০টার আগেই আমার মটর কারে জজ কোর্টে চলে গেলাম। আমার পরিবারবর্গ খোকন মিয়ার কোন বন্ধুর গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। ১০-১৫ মিঃ এর মধ্যে অপর একটি মটর কার এসে হাজির যেটি তাদেরকে ডেমরা ঘাটের নিকট পৌঁছে দিল। আর আমি ১০-৩০ মিঃ মধ্যে ঢাকা জজ কোর্ট হয়ে রওয়ানা হলাম ডেমরা ঘাটের দিকে।

ড্রাইভার সাহাবুদ্দিনকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়ে খোকন মিয়ার সাহায্যে আমার গাড়ী নিয়ে ডেমরার দিকে ছুটলাম। অফিসে রেখে গেলাম একটা ৬ দিনের 'ক্যাজুয়াল লীভ' এর দরখাস্ত। প্ল্যান মত ডেমরায় গিয়ে পরিবারবর্গের সংগে মিলিত হলাম। গাড়ী দুটিকেই ফিরিয়ে দিলাম।

বহু কষ্টে স্কুটার যোগাড় করে আমরা গিয়ে বৈদ্যের বাজার পৌছাই। তখন বেলা প্রায় ৪টা। খোকন মিয়ার কথানুযায়ী কোথায় সন্ধ্যার আগেই গিয়ে ভারতের আগরতলায় পৌছাব, তা না হয়ে বৈদ্যের বাজারেই পড়ে রইলাম বিকাল অবধি। চিন্তায় অধীর হয়ে পড়লাম। সমূহ বিপদের ঘনঘটা দেখতে পেলাম। এখন উপায় ?

অসুস্থ স্ত্রীকে সঙ্গে এনেছি। প্রায় না খেয়েই রওয়ানা দিয়েছি কোন্ সকালে। ছেলেমেয়েরা ক্ষুধায় ছটফট করছে। খাবার জিনিষের মধ্যে পেলাম কিছু লিচু। তাই কিনে নিলাম। বেলা ৫টার দিকে দেখলাম, দূর থেকে একটা লঞ্চ আসছে। তাতে লোক ভর্তি. স্থান হবে না। লঞ্চটি তীরে ভিড়লোনা। আমবা একটা ছোট ডিঙ্গিতে উঠে আস্তে আস্তে লঞ্চের কাছে গিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে কোন মতে শরীরকে ঢুকিয়ে দিয়ে ক্যাবিনের ভেতরে প্রবেশ করলাম। রাতে ৮-৩০ মিনিট নাগাদ যখন কুমিল্লা জেলার রামচন্দ্রপুর আসলাম, তখন লঞ্চের সারেং বলে উঠলো, যারা হিন্দু আছেন তারা যেন সেখানে নেমে যান। তাদেরকে আর নেয়া যাবে না। তখন অনেকে সেখানে নেমে গেল। আমরা নামলাম না, কারণ আমরাতো হিন্দুর পরিচয় দিচ্ছিনা। যখন রামকৃষ্ণপুর পৌছলাম তখন রাত সাড়ে ন'টা। একটি বন্দরের মত জায়গা। সর্বত্র গভীর নিঝুম অন্ধকার। দু'একটা কুপি বাতি দোকানের মাঝখান থেকে জ্বলছে। আমরা নেমে পড়লাম। খোকন মিয়া আমাদেরকে গাইড করছেন। আমরা সবাই ভয়ে কাঁপছি। কিন্তু খোকন মিয়া আশ্বাস দিয়ে বলে উঠলেন, কোন ভয় নেই। একটা বুড়ো মাঝিকে ডেকে বললেন, 'এই মাঝি, কামাল্যা গ্রাম চেনো ? ঐ গ্রামের চৌধুরী বাড়িতে যাব, তাদের ইষ্টি কুটুম ঢাকা থেকে এসেছেন।' সে কুমিল্লা জিলার কামাল্যা গ্রামের চৌধুরী বাড়ী চেনে।

আমাদেরকে নৌকার ছৈ-এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে মাঝি নৌকা বেয়ে চললো। সামনে একটা কুপি বাতি জ্বলছে টিপ টিপ্ করে। ভয়ে আমরা জড় সড়। কখন যে ডাকাতের পাল্লায় পড়ি। দু'একটা হাঁক ডাকও কানে গেলো। কিন্তু আমরা নিশ্চুপ।

যখন কামাল্যা গ্রামে এসে পৌছালাম তখন রাত প্রায় ১টা। ক্ষিধেয় আধমরা হয়ে গেছি। চৌধুরী বাড়ী গিয়ে উঠলাম। খোকন মিয়া কানে কানে বলে দিল, ঢাকার জজ সাহেব। একটা অল্প বয়েসী ভদ্র মহিলা সেই রাতেই আমাদের জন্য

দুটো ডাল-ভাত রেঁধে দিলেন। আমরা পরম তৃপ্তির সাথে তা খেলাম। রাত ভোর হতে বেশী বাকী ছিলনা। আমরা একটা ভাংগা বেড়ার ঘরে আশ্রয় নিলাম এবং কোন মতে একটু চোখ বুঁজলাম। পরদিন যাব, কিন্তু কোন নৌকা মিললো-না। তাই সেদিন কামাল্যা গ্রামেই থাকতে হল। খুব ভোরে রওয়ানা হব। কিন্তু খোকন মিয়ার তাগিদ নেই। তিনি গ্রামে কানা ঘুষা শুনেছেন, আমরা হিন্দু, কয়েক সের সোনাদানা এবং বহু টাকা পয়সা নিয়ে ভারতে পাড়ি জমাচ্ছি। কিন্তু এ খবর তিনি চেপে গেছেন, যাতে আমরা ঘাবড়িয়ে না যাই। তিনি শুধু বলে উঠছেন, চা নাস্তা না খেয়ে যাচ্ছিনা। যাক, বেলা ৭-৩০ মিঃ দিকে নৌকা যোগে রওয়ানা হলাম আগরতলার দিকে। কিন্তু দু'মাইল পথ না যেতেই আলগি গ্রামে একদল দুষ্কৃতকারী সোরগোল করে ছুটে এলো নৌকার দিকে লাঠি হাতে। আমাদের কাছে যা কিছু টাকা পয়সা সোনাদানা ছিল তা প্রায় লুঠ হয়ে গেল। এখন উপায়? ঢাকায় ফিরলেও মৃত্যু অবধারিত। তাই এগিয়েই চললাম, সামান্য কিছু পথের সম্বল নিয়ে যা আমার স্ত্রীর কাছে একান্ত গোপনে রাখা ছিল।

নৌকার মাঝি ৪।৫ মাইল যাবার পর আর এগোতে সাহস পেলনা। সামনে নাকি পাক সেনার আস্তানা। কুমিল্লার একটা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার নিকট নামিয়ে দিল। কিছুই চিনিনা। জানলাম, সেখান থেকে মুরাদনগর থানার অধীন বাংগুরা গ্রাম নাকি বেশী দূরে নয়। তখন খোকন মিয়া একই কারদায় সাহস দিয়ে বলে দিল, কোন ভয় নেই। বাংগুরা'র চেয়ারম্যান যে তার এক আত্মীয় কথাটা আদৌ হয়ত সত্য নয়। তবু ভরসা পেলাম। তারপর সেখান থেকে ৩/৪ মাইল পথ বহুকষ্টে পায়ে হেঁটে গিয়ে উঠলাম বাংগুরা ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের বাসায়। সেখানে আমার পরিচয় গোপন রাখলাম। চেয়ারম্যান সাহেব বয়স্ক মুসলিম লীগ নেতা। তিনি সর্বদা পাকিস্তানের খবর শুনছেন। বিশিষ্ট ভদ্রলোক। আতিথেয়তার ত্রুটি করেননি বিন্দু মাত্র। তাঁর এক ছেলে সেখানকার হাই স্কুলের শিক্ষক। তিনি একটা নৌকা ঠিক করে দিলেন এবং একজন শ্মশ্রুমণ্ডিত মুরুব্বিমত লোককে সঙ্গে দিয়ে দিলেন যাতে পথে কোন অসুবিধে না হয়।

সেখানে রাত কাটিয়ে ভোরে রওয়ানা হলাম। কিছুদূর যাবার পর আবার একদল গুণ্ডা দ্বারা আক্রান্ত হলাম। কিন্তু ঐ মুরুব্বি লোকটা চেয়ারম্যানের লোক বলায় কোনমতে রক্ষা পেলাম। এমনিভাবে দুর্গম বিপদসংকুল পথ অতিক্রম করে আমরা কোনমতে পাহাড়ী পথ ধরে ভারত ভূমিতে প্রবেশ করলাম। দেখলাম বহুলোক পায়ে হেঁটে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে দলে দলে ভারতে প্রবেশ করছে। ঐ ভারত সীমান্তে আমার পরিচয় দিয়ে নাম শরণার্থীদের তালিকাভুক্ত করে জীপযোগে রওয়ানা হলাম আগরতলায়,—সেখান থেকে ১০/১২ মাইল

পুরে। আগরতলায় বাংলাদেশী শরণার্থীদের জন্য ক্যাম্প খোলা হয়েছে। অনেক পরিচিত নেতা এবং অফিসারের সাথে দেখা হল। মনে কিছুটা সান্ত্বনা অনুভব করলাম।

প্রায় ৩ দিন ৩ রাত আগরতলায় 'বিবেকানন্দ' হোটেলে কাটিয়ে সকালে রওয়ানা হলাম ধর্মনগরের দিকে। আঁকা বাঁকা পাহাড়ী পথ ধরে বাসযোগে প্রায় ১২৫ মাইল পথ অতিক্রম করে এসে পৌছালাম ধর্মনগর রেল স্টেশনে। সেখানে জয়বাংলার লোকে লোকারণ্য। সবাই ট্রেনের অপেক্ষায় আছে। রাত ৮ টায় ট্রেন ছাড়ে। কোন মতে এক দালালের সাহায্যে জানালার ফাঁক দিয়ে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় প্রবেশ করলাম। বসবার কোন স্থান নেই। লোকের চাপে জীবন প্রায় যায় যায়। তবু জীবন যায়নি। ঐ ট্রেনে চেপে এগোতে লাগলাম। 'জয় বাংলা'র কোন লোকই টিকিট কাটেন। আমরাও বিনা টিকিটেই রওয়ানা হলাম। কেউ আমাদের কাছে টিকিট চায়নি। লামডিং ও শিলিগুড়িতে ট্রেন বদল করলাম। ধর্মনগর রেল স্টেশন থেকে রওয়ানা হয়ে, তিন দিন তিন রাত ট্রেনে কাটিয়ে অবশেষে এসে পৌছালাম শিয়ালদহ স্টেশনে। মনে হল জীবন ফিরে পেয়েছি। পরে লোকাল ট্রেন ধরে কৃষ্ণনগরে এক আত্মীয়ের বাসায় এসে আশ্রয় নিলাম।

কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে কলকাতায় এসে আমাদের হাইকমিশন ভবনে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, জয়বাংলার লোকের সমাগম। একজন পরিচিত ভদ্রলোক বললেন, স্যার এসেছেন, শীর্ঘ আপনার বায়োডাটা ফরমটা পূরণ করুন। দেখলাম দলে দলে লোক বায়োডাটা ফরম পূরণে ব্যস্ত। আমিও আমার জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ঐ ফরম পূরণের মাধ্যমে রেকর্ড করলাম। পরে আমার পরিচিত খন্দকার আসাদুজ্জামান (প্রাক্তন সি,এস,পি) ও আরও কয়েকজন পদস্থ অফিসার ও এম পি-র সাথে দেখা হল। তাঁরা আমার আগেই এসে মুজিবনগর সরকারের কাজে নিয়োজিত হয়েছেন। আমোকে দেখে তাঁরা খুব খুশী হলেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণের সংকল্প দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করে সে দিনের মত বিদায় নিলাম।

এক সপ্তাহ পর আবার কলকাতায় আসলাম বাংলাদেশ হাইকমিশন চত্বরে। অনেক চেনা মুখ পেলাম এবার। আমাদের দেশের অনেক অফিসার ডাক্তার উকিলের সমাগম। সবাই প্রাণের ভয়ে দেশ ত্যাগ করে এসেছেন, অনেকেই চাকুরির আশায় সেখানে ঘোরাফেরা করছেন। একজন ভদ্রলোক আমাকে ডেকে বললেন, শীর্ঘ আমাদের ট্রেজারী অফিসার জনাব মাখনলাল মাঝির (তৎকালীন ই,পি,সি,এস) সাথে দেখা করুন, আপনি কিছু এলাউন্স পাবেন। পকেট শূন্য। কিছু প্রাপ্তি যোগের কথা শুনে মনটা মেতে উঠলো। গেলাম মাখনলাল মাঝির

সাথে দেখা করতে। তিনি বললেন, আমার নাকি ২৫০ টাকা প্রাপ্য। যারা মুজিবনগরে সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত নাই অথচ 'পূর্ব পাকিস্তানে' সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন তারা সর্বোচ্চ ৫০০ টাকার অর্দ্ধেক (অথবা পূর্বে ৫০০ টাকার কম বেতন পেলে তার অর্ধেক) এলাউন্স হিসেবে পাবেন। তাই তিনি ২৫০ টাকা গুণে আমার হাতে তুলে দিলেন। টাকাগুলি কিন্তু সব পাকিস্তানী মুদ্রায় দেয়া হল। ঐ গুলি ভরতীয় মুদ্রায় বদল করে নিতে হবে। পাকিস্তানী মুদ্রা ও ভারতীয় মুদ্রার হার তখন প্রায় এক পর্যায়েই ছিল। টাকাগুলি ভাংগিয়ে নিয়ে আনন্দিত মনে ফিরে এলাম কৃষ্ণনগরে, সেখানে আমরা আশ্রয় নিয়েছি।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, মুজিবনগর সরকারের হাতে অনেক পাকিস্তানী মুদ্রা জমা পড়েছিল মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য। অনেক অফিসার ও সংগ্রামী জনতা পূর্ব পাকিস্তানের অনেক ব্যাংক, ট্রেজারী থেকে বেশ কিছু টাকা নিয়ে গিয়ে ঐ সরকারের হাতে জমা দেয়। সেই জমাকৃত টাকা থেকে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে কিছুদিন অফিসারদেরকে এলাউন্স হিসেবে দেয়া হতো। তারপর মে মাসের মাঝামাঝি কি জুনের প্রথম দিকে, পাকিস্তান সরকার ১০০ ও ৫০০ টাকার পাকিস্তানী নোট অচল ঘোষণা করেন। ফলে মুজিবনগর সরকারের নিকট জমাকৃত প্রচুর নোট অকেজো হয়ে পড়ে।

১৯৭১ সনের মে মাসের শেষের দিক। মুজিবনগর সচিবালয় থেকে একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম প্রেরণ আমার নামে, বায়োডাটায় দেয়া কৃষ্ণনগরের ঠিকানায়। আমাকে অতি শীঘ্র সচিবালয়ে দেখা করতে বলা হয়েছে। সেই মতে পরদিনই কলকাতায় চলে আসলাম। ৮ নং থিয়েটার রোডে অবস্থিত মুজিবনগর সচিবালয়। সেখানে গিয়ে দেখি তৎকালীন সচিবালয়ের সচিব জনাব নূরুল কাদের খান আগরতলায় টুবে গেছেন এবং তাঁর অবর্তমানে অর্থ ও স্বরাষ্ট্র (ইন্টিরিয়ার) সচিব খন্দকার আসাদুজ্জামান সাহেব সংস্থাপন বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে জানলাম তৎকালীন মন্ত্রীবর্গের ক্যাবিনেট মিটিংয়ের সিদ্ধান্তের কথা। আমার মতামত পেলে তাঁরা আমাকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে নিয়োগদান করবেন। আমি এই সিদ্ধান্তের কথা জেনে, সানন্দে মত দান করলাম। কয়েকদিন পর, ভারতীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে এবং সমগ্র রিলিফ অপারেশন প্রত্যক্ষভাবে দেখাশুনার সুবিধার্থে পদটিকে সচিব হিসেবে আখ্যায়িত না করে রিলিফ কমিশনার হিসেবে নিয়োগদান করেন। ফলে রিলিফ কমিশনারকে একদিকে যেমন সচিবের দায়িত্ব পালন করতে হতো, অন্যদিকে আবার রিলিফ অপারেশনের দিকটাও দেখতে হতো।

পাক বাহিনীর নির্মম অত্যাচারে বাংলাদেশের ১ কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল ভারতে। এই এক কোটি জনগোষ্ঠির ত্রাণকার্য পরিচালনা করা সহজসাধ্য নয়। বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রচেষ্টায় এই লোকদের থাকা

খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে খাদ্য বস্ত্র কম্বল প্রভৃতি ত্রাণ সামগ্রী এসেছে। মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে রিলিফ কমিশনার হিসেবে আমার প্রধান দায়িত্ব ছিল ভারত সরকারের সাথে সংযোগ রক্ষা করা এবং ত্রাণ সামগ্রী বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরগুলিতে যাতে যথাযথভাবে পৌছে যায় এবং তা সুষ্ঠুভাবে বণ্টিত হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখা। এ ব্যাপারে আমাকে বিভিন্ন ক্যাম্প (শিবির) পরিদর্শন করতে হয়েছে। তৎকালীন ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যাবলী নিয়ে ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উর্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বৈঠকে বসতে হয়েছে। এক্ষেত্রে ভারত সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সচিব মিঃ কল্লহান্ ও অতিরিক্ত সাচব মিঃ লুথরা-র নাম উল্লেখ করতে চাই।

অনেক মুক্তিযোদ্ধা ও অসহায় শরণার্থীকে তৎক্ষণিক বিপদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তৎকালীন বিপ্লবী সরকারের মন্ত্রী জনাব এ,এইচ,এম, কামরুজ্জামানের পরামর্শক্রমে কিছু কিছু আথিক সাহায্যও দেয়া হয়েছে।

জনাব মোঃ হোসেন আলী সাহেব ছিলেন তৎকালীন কলকাতাস্থ পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনার। তিনিই সর্ব প্রথম পাকিস্তান দূতাবাস কর্মীদের মধ্যে তৎকালীন বাংলাদেশ বিপ্লবী সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন এবং তিনিই বাংলাদেশের প্রথম হাই কমিশনার হিসেবে কলকাতায় নিয়োজিত হন।

প্রথম অবস্থায় তাঁরই সহায়তায় মুজিবনগর সচিবালয়ের পত্তন হয় কলকাতাস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন ভবনে। অল্প কিছুদিন পরই সচিবালয়টি স্থানান্তরিত করা হয় ৮নং থিয়েটার রোডের একটা বড় বাড়ীতে। প্রধানত এখান থেকেই মুজিবনগর সচিবালয়ের কাজ পরিচালিত হোত। এখানেই বসতেন তৎকালীন বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, অর্থমন্ত্রী সৈয়দ মনসুর আলী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক আহমেদ এবং ত্রাণ, পুনর্বাসন ও স্বরাষ্ট্র (ইন্টিরিয়ার) মন্ত্রী এ,এইচ,এম, কামরুজ্জামান সাহেব। শেষ পর্যায়ে সচিবালয়ের কর্মচারীর সংখ্যা বেশ কিছুটা বেড়ে যাওয়ায় স্থান সংকুলানের জন্য সচিবালয়ের অধিকাংশ বিভাগ স্থানান্তরিত করা হয় বালিগঞ্জ এলাকায় শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায় রোডে একটি বড় বাড়ীতে।

মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বীর সন্তানদের প্রতিদিনের কৃতিত্বের কথা আমাদের সচিবালয়ে নিয়মিত সরবরাহ করা হোত। মাঝে মাঝেই ক্যাবিনেট মিটিং বসতো এবং মুক্তিযুদ্ধের ফলাফল নিয়ে আমরা পর্যালোচনায় বসতাম। এদিকে আমাদের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী স্বর্গীয় তাজউদ্দিন আহমদ এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি স্বর্গীয় সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঐ সময় দিল্লীতে ভারতের প্রধান মন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ও অন্যান্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সংগে কয়েকদফা উচ্চ পর্যায়ের

আলোচনায় বসেন এবং পরে পরস্পরের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চুক্তিতে উপনীত হন।

যখন ভারত সরকার ১৯৭১ সনের নভেম্বর মাসের মধ্যেও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেন না তখন অনেকের মধ্যেই হতাশা ও বেদনার সুর লক্ষ্য করেছি। তারপর ৬ই ডিসেম্বর সত্য সত্যই যখন ভারত সর্ব প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে তখন আমরা সবাই আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ি।

এরপর সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য ১৬ ডিসেম্বর ভারত সরকারের পক্ষ থেকে একটা উচ্চ পর্যায়ের জরুরী বৈঠক ডাকা হয় সকাল ১০ টায়, কলকাতাতে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন একজন উর্ধতন সিনিয়র সিভিল সার্ভেন্ট মিঃ আর গুপ্ত। সেখানে আরও উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের বহু উর্ধতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সর্বজনাব রুহুল কুদ্দুস, নুরুল কাদের খান, খন্দকার আসাদুজ্জামান আমি নিজে এবং আরও কয়েকজন। সভা চলাকালীন আনুমানিক বেলা ১২ টার দিকে হঠাৎ বৈঠক কক্ষের টেলিফোনটি বেজে উঠলো।

মিঃ গুপ্ত টেলিফোনটি ধরলেন এবং সবার সামনে টেলিফোনের বার্তা জানিয়ে দিলেন--- বললেন, আপনাদের জন্য শুভ সংবাদ, পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে। এ সংবাদে আমরা সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লাম। এই পরিস্থিতিতে আমরা বাংলাদেশে গিয়ে কি কার্যক্রম গ্রহণ করব সেই বিষয় নিয়ে অল্প কিছু সময় আলোচনার পর বৈঠক সমাপ্ত হয়।

এই বৈঠকের পরপরই আমরা তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ সাহেবের সংগে সচিবালয়ে তাঁর কক্ষে গিয়ে মিলিত হই। আমাদের পক্ষে পাক-আর্মির আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য কাকে ঢাকায় পাঠানো যায় এই নিয়ে জল্পনা হলো। আমাদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠলেন, 'স্যার, প্রধান মন্ত্রী হিসেবে আপনারই উপস্থিত থাকা উচিত। পরে সিদ্ধান্ত হল সেনা-বাহিনীর এ আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে আমাদের পক্ষে উপস্থিত থাকা উচিত একজন মিলিটারী অফিসারের। তখন জেনারেল ওসমানীকে পাঠানোর কথা উঠলো। কিন্তু তিনি যে তখন কলকাতার বাইরে! উপায়? তৎক্ষণাৎ আমাদের বাংলা-দেশ সেনাবাহিনীর সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড জনাব এ কে খন্দকার এয়ার ভাইস মার্শাল সাহেব বলে উঠলেন, 'স্যার আমি প্রস্তুত আছি'।

তারপর তাঁকেই দুপুরের এক বিশেষ ফ্লাইটে ঢাকায় পাঠান হোল আত্মসমর্পণের সেই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য।

৩০ শে ডিসেম্বর ১৯৭১। ভারতীয় একটি বিমান যোগে আমাদের ত্রান ও পুনবাসন মন্ত্রী জনাব এ, এইচ, এম কামরুজ্জামান, প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ-এর স্ত্রী জহুরা তাজউদ্দিন ও অন্যান্য সহ আমি দম দম বিমান বন্দর থেকে বহু আখাঙ্খিত স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা হলাম

১লা জানুয়ারী ১৯৭২ সনে আমি ঢাকায় এসে সচিবের মর্যাদায় বাংলাদেশের রিলিফ কমিশনার হিসেবেই কাজে যোগদান করি।

মুজিব নগর সচিবালয়ে যাঁরা মুখ্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁদের প্রধান কয়েকজনার নাম হলো ঃ

জনাব নুরুল কাদের খান, সেক্রেটারী জেনারেল, এডমিনিস্ট্রেশন; জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান, সচিব, অর্থ ও স্বরাষ্ট (ইন্টিরিয়ার) মন্ত্রনালয়; বাবু জয় গোবিন্দ ভৌমিক, রিলিফ কমিশনার; জনাব আবদুস সামাদ, সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়; জনাব তৌফিক ইমাম, সচিব, মন্ত্রী পরিষদ; জনাব, ডঃ টি হোসেন, সচিব স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়; জনাব হান্নান চৌধুরী, সচিব, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; জনাব, আবদুল খালেক, পুলিশের আই, জি; জনাব ওয়ালিউল ইসলাম, ডি এস, জেনারেল এডমিনিস্ট্রেশন; জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ, ডি এস, জেনারেল এডমিনিস্ট্রেশন জনাব মামুনুর রশিদ, ডেপুটি রিলিফ কমিশনার; জনাব সাদত হোসেন, পি এস, ফাইন্যান্স মিনিস্টার; জনাব কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী, পি এস, ফরেন মিনিস্টার; জনাব কাজী লুৎফুল হক, পি এস, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি; জনাব খায়রুজ্জামান চৌধুরী, ডি, এস, ফাইন্যান্স; জনাব আকবর আলী, ডি, এস; জনাব আহমদ আলী, ডি, এস, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়; জনাব মাখন লাল মাঝি, ট্রেজারী অফিসার; ধীরাজ নাথ, পি এস, ত্রাণ ও পুর্নবাসন মন্ত্রী; জনাব শিলাব্রত বড়ুয়া, অফিসর অন স্পেশাল ডিউটি; (আরও অনেকে)।

শেষ পর্য্যায়ে জনাব রুহুল কুদ্দুস সাহেব (প্রাক্তন সিনিয়ার সি, এস, পি,) মুজিবনগর সচিবালয়ে যোগদান করেন। কিছু দিনের মধ্যে সেক্রেটারী জেনারেল পদটি তুলে দিয়ে তাঁকে প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় তখন নুরুল কাদের খান সাহেব শুধু সংস্থাপন বিভাগের সচিব থাকেন।

জোনাল এডমিনিস্ট্রেশনে যারা বিভিন্ন জোনে মুখ্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁদের প্রধান কয়েকজনের নাম হল ঃ জনাব ফয়েজ উদ্দিন আহমেদ; জনাব এস, এ, সামাদ; জনাব সামছুল হক; জনাব কাজী রফিক উদ্দিন; জনাব বিভুতি ভূষণ বিশ্বাস; জনাব আবদুল মোমেন; (আরও অনেকে)

সব শেষে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। অনেককেই মন্তব্য করতে শুনি যে, যারা মুজিবনগরে গিয়ে সরকারের চাকুরীতে নিয়োগ লাভ করেছেন তারা মহাসুখে দিন কাটিয়েছেন। কথাগুলি মোটেই সঠিক নয়। তাদের অধিকাংশই নিদারুন দুঃখ দুর্দশার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। তাদের না ছিল সুস্থ থাকার পরিবেশ, না ছিল আর্থিক সংগতি। মন্ত্রী থেকে প্রথমশ্রেণীর অফিসার পর্যন্ত সবাইকে দেয়া হোত সর্বমোট ৫০০/ টাকা, মাসিক এলাউন্স হিসেবে। তাই দিয়ে অফিসারগণ কোন মতে তাদের পরিবারসহ থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিতেন। মন্ত্রীবর্গ ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির জন্য অবশ্য থাকা খাওয়ার অন্য

ব্যবস্থা ছিল। সবার সঠিক খবর বলা কঠিন। তবে একান্ত ব্যক্তিগত হলেও আমি বলতে চাই বাংলাদেশের রিলিফ কমিশনার হিসেবে নিয়োজিত থাকাকালীন আমি আমার এক পুত্র সমেত ৯৩/১এ বৈঠকখানা রোডে এক মেসে এক সিটে থাকতাম। মাসিক ভাড়া ৮ টাকা। কোনমতে কলকাতার মত স্থানে নিজেকে চালিয়ে বাকী টাকা পরিবারের জন্য পাঠাতে হোত। কষ্ট করেছি কম নয়। তবু একথা বলব, আমরা অনেকের চেয়েই ভাল ছিলাম। আমাদের মনে বুক ভরা আনন্দ ছিল। দেশকে স্বাধীন করবো। স্বাধীনতাযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে আত্মনিয়োগ করবার সুযোগ কজনের ভাগ্যে জোটে। তাই আমরা ধন্য।

জয় গোবিন্দ ভৌমিক

জুন, ১৯৮৪।

দেওয়ান ফরিদ গাজী

৭ই মার্চ থেকে এপ্রিলের ২৮ তারিখ পর্যন্ত আমি সিলেটের বিভিন্ন স্থানে সংগ্রাম পরিষদ গঠন, স্বেচ্ছাসেবক, আনসার, সাবেক ই, পি, আর, পুলিশ, ছাত্রকর্মীদের সহযোগে সিলেটের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্যবস্থা করি। সিলেট শহর, গোপালগঞ্জ, মৌলভীবাজার, শেরপুর প্রমুখ স্থানে প্রতিরোধ যুদ্ধ পরিচালনায় সক্রিয় অংশ নেই। মেঘালয়ের করিমগঞ্জে অবস্থানকালে আমি প্রায় ৩ হাজার মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন করে তাদের থাকা খাওয়া ও ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করি। আমি বাংলাদেশ সরকারের বেসরকারী উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করি। যুদ্ধ পরিচালনা এবং জনমত সৃষ্টি প্রভৃতি দায়িত্বও পালন করি। উত্তর-পূর্ব জোনের প্রশাসনিক পরিষদের প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করি। মিত্রবাহিনীর সহযোগে যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে জকিগঞ্জ, খামাইঘাট, গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর, বিয়ানীবাজার প্রভৃতি স্থান সমূহ একের পর এক দখল করে আমরা দখল কৃত বাংলাদেশে প্রবেশ করি এবং প্রতিটি জায়গায় বেসামরিক প্রশাসন গঠন করি।

গোয়াইনঘাট এবং জৈন্তাপুর এলাকা খান সেনারা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে এবং সদর থানার উত্তরাঞ্চলও বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ২৬শে মার্চ খানসেনারা সিলেট শহরে ত্রিশ জনেরও অধিক লোককে হত্যা করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কুতুবউদ্দিন, আবদুল মুসাব্বির, পঞ্চা বাবু ও পাচু সেন। নয়মাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো শেরপুরের যুদ্ধে ক্যাপ্টেন আজিজের সাহসিকতা। এই যুদ্ধে ক্যাপ্টেন আজিজ মাত্র কজন সৈন্য নিয়ে খান সেনাদের একটি বিরাট বাহিনীর সংগে দীর্ঘ সাত দিন ধরে প্রাণ পণে যুদ্ধ করেন।

দেওয়ান ফরিদ গাজী

গণপরিষদ সদস্য

(সাবেক এম, এন, এ, সিলেট-৮)

২৪ জুন, ১৯ ৩।

দেবব্রত দত্ত গুপ্ত

১৯৭১ সনের ২৩শে মার্চ পর্যন্ত আমি নোয়াখালী চৌমুহনী কলেজে অধ্যাপনা করেছি। ২৩শে মার্চ সন্ধ্যায় আমি তৎকালীন কিছু স্বাধীনতা সংগ্রামী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছ হতে জরুরী নির্দেশ পেয়ে কুমিল্লা শহরে চলে আসি এবং ২৫শে মাচ স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়ার অব্যবাহিত পরেই, শহর ছেড়ে কুমিল্লার মুরাদনগর থানার চুড়লিয়া গ্রামে চলে যাই। গ্রামে স্বাধীনতার স্বপক্ষে জনমন গঠন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাজ শেষ করে ১৫ই এপ্রিল'৭১ কুমিল্লার গ্রামাঞ্চলের বেশ কিছু সংখ্যক যুবক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ, বুড়িচং থানার নাইঘর নয়নপুর হয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বক্সনগরে গিয়ে পৌঁছি। তারপর বক্সনগর হতে সোনামুড়া হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলাতে যাই এবং সেখানে যুদ্ধকালীন বাংলাদেশ মিশন ও প্রশাসনিক দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করি। সে সময় বাংলাদেশ সরকারের পূর্বাঞ্চলীয় বেসামরিক প্রশাসনিক দপ্তর ছিল আগরতলা কৃষ্ণনগর এলাকায় কয়েকটি বাড়ীতে। অবশ্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তখন আগরতলা শহরের 'কুঞ্জবন' এলাকায় এবং ছাত্র নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই অবস্থান করতেন আগরতলার গোলবাজারের "শ্রীধর ভিলায়"।

যেহেতু আমি অধ্যাপনা জীবনে বাংলাদেশের ভাষা-সংস্কৃতি, জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে বিভিন্নভাবে জড়িত ছিলাম সুতরাং তৎকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক ও অন্যান্য পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ আমাকে ডঃ হাবিবুর রহমান সহ পূর্বাঞ্চলের যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর প্রশিক্ষণ, সমন্বয় সাধন এবং পরিচালনার দায়িত্বের সাথে জড়িত থাকতে অনুরোধ করেন। আমিও এই ধরণের একটি পবিত্র সুযোগের সন্ধানেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। সুতরাং সুযোগ যখন এল, তখন এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে সানন্দে কাজে ঝাপিয়ে পড়লুম। সময়টা ছিল তখন ১৫ই মে, ১৯৭১ইং।

১৯৭১ সনের মার্চ মাসে, দেশের ভিতরে স্বাধীনতা সংগ্রাম তীব্র হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশের ছাত্র, শিক্ষক, যুবক, কৃষক, শ্রমিক, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের আবালবৃদ্ধ বণিতা নির্বিশেষে, হাজার হাজার মানষ স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে এবং বেঁচে থাকার তাগিদে, সীমান্ত অতিক্রম করে দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল দিয়ে, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে। বাংলাদেশের মানচিত্রের দিকে তাকালে এটা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায় যে, ভৌগলিক দিক দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য ও বাংলাদেশের সীমান্তের অবস্থান অত্যন্ত সন্নিকটবর্তী এবং সহজগম্য। ফলে মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীগণ, তুলনামূলকভাবে অন্যান্য অঞ্চল হতে এই অঞ্চল দিয়ে

অতি সহজেই স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশের সীমান্ত অতিক্রম করে, সীমান্তবর্তী বিভিন্ন বনাঞ্চলে এবং গ্রামে, আশ্রয় নিতে আরম্ভ করে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগলিক অবস্থান, রাস্তা-ঘাটের দুর্গমতা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধা মুক্তিযোদ্ধা এবং শরণার্থীদেরকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় এই অঞ্চলে আগমন করতে উৎসাহিত করেছিল। তাই যুদ্ধ আরম্ভ হবার অব্যবহিত পরে অর্থাৎ ১৯৭১ সনের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় হতেই পূর্বাঞ্চলীয় বাংলাদেশ সরকার এবং তৎকালীন লিবারেশন কাউন্সিল ভারত সরকারের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনা করে শরণার্থীদের জন্য আশ্রয় শিবির স্থাপন করার সাথে সাথে বাংলাদেশের ভেতর হতে আগত বিভিন্ন পর্যায়ের অস্ত্র প্রশিক্ষণার্থী লক্ষ লক্ষ যুবকের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যুবক প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সময় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক যুবকের জন্য ৩ ধরণের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপন করা হয়েছিল। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

১। অভ্যর্থনা কেন্দ্র (Reception Camp)

২। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (Youth Training Camp)

৩। সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (Army Training Camp)

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক এবং প্রশিক্ষণার্থী বিভিন্ন শ্রেণীর যুবকদের মধ্যে যে সব যুবক সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেনি বা সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুকও নয়, সে সব যুবককে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে, যুদ্ধ চলাকালে এবং পরবর্তীকালে যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশ গড়ার সৈনিকরূপে 'ভিত্তি ফৌজ' হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে, একটি স্কীম প্রণয়নের দায়িত্ব তৎকালীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তিদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিল ঃ

জনাব ডঃ হাবিবুর রহমান ওরফে ডঃ আবু ইউসুফ ; জনাব মাহবুব আলম ; জনাব তাহের উদ্দীন ঠাকুর , অধ্যাপক দেবব্রত দত্ত গুপ্ত।

উপরোক্ত এই কমিটির আহবায়ক হিসেবে কাজ করেছেন ডঃ হাবিবুর রহমান। ডঃ রহমান স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে তিতাস গ্যাসের জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বাংলাদেশ সরকারের গ্যাস, অয়েল ও মিনারেল রিসোর্সের ১৯৭৫ সন পর্যন্ত চেয়ারম্যান এবং সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জনাব মাহবুব আলম যুদ্ধের সময় পররাষ্ট্র সচিব এবং পরবর্তীকালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ সচিব, স্বনির্ভর, হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জনাব ঠাকুর যুদ্ধের সময় এম, এন, এ এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের

একজন পরিচালক ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছেন।

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে পরিচালনার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (মুজিব নগর) একটি 'ইয়থ ট্রেনিং কন্ট্রোল বোর্ড' গঠন করেছিলেন। অধ্যাপক ইউসুফ আলী, এই বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এই বোর্ডের তত্ত্বাবধানে মুজিব নগর, পূর্বাঞ্চল (ত্রিপুরা রাজ্য কেন্দ্রীক) ও পশ্চিমাঞ্চলের (পশ্চিম বঙ্গ কেন্দ্রীক) এই দুইটি ইয়থ ক্যাম্প ডাইরেক্টরেট গঠন করা হয়েছিল। তবে, এই সময়ের মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো বিভিন্ন কারণে তেমন 'শক্ত' এবং 'মজবুত' হয়ে গড়ে উঠতে পারেনি। পশ্চিম অঞ্চলের যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন জনাব আহমদ রেজা।

ইয়থ ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোর দৈনন্দিন কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নে উল্লেখিত পদগুলো সৃষ্টি করা হয়েছিল ঃ

ক্যাম্প প্রধান (১); উপ-ক্যাম্প প্রধান (১); ক্যাম্প তত্ত্বাবধায়ক (২); ছাত্র প্রতিনিধি (২); স্বাস্থ্য অফিসার (২); পলেটিকেল মটিভেটর (৪); ফিজিকেল ইনস্ট্রাকটর (৪)।

তাছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ে ইয়থ ক্যাম্প ডাইরেকটরেট যে সব ব্যক্তিকে নিয়ে গঠন করা হয়েছিল, তাঁদের নামও এখানে উল্লেখ করা হল ঃ

সর্বজনাব মাহবুব আলম, প্রকল্প সমন্বয়কারী; ডঃ হাবিবুর রহমান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ); অধ্যাপক নুরুল ইসলাম চৌধুরী, এম, এন, এ; জনাব মুজাফফর আহমদ, এম, পি, এ; জনাব খালেদ মুহম্মদ আলী, এম, এন, এ; জনাব বজলুর রহমান, রাজনৈতিক নেতা; অধ্যাপক দেবব্রত দত্ত গুপ্ত, উপ-পরিচালক এবং প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী; জনাব মোশারফ হোসেন, হিসাব রক্ষণ অফিসার।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, উপরোক্ত কার্যক্রম, পরিচালনা ব্যবস্থা ও আনুসঙ্গিক নীতি-পদ্ধতির মধ্যে পরবর্তীকালে কিছুটা পরিবর্তন এবং পরিবর্দ্ধন করা হয়েছিল। কিন্তু সে সব পরিবর্তন তেমন উল্লেখযোগ্য নয় বলে এখানে উল্লেখ করা হল না।

১। অভ্যর্থনা কেন্দ্র (Reception Camp)

স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্যে বিভিন্ন নদী, নালা, খাল-বিল সহ দুর্গম রাস্তা-ঘাট পায়ে হেঁটে ও নৌকাযোগে অতিক্রম করে ক্লান্ত, শ্রান্ত ও অবসন্ন

*ডঃ হাবিবুর রহমান, যুদ্ধের সময় ডঃ আবু ইউসুফ, এই ছদ্ম নাম ব্যবহার করতেন।

অবস্থায় যখন হাজার হাজার যুবক ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করত, তখন এই সমস্ত রিসিপশান ক্যাম্পের মধ্যে যুবকদেরকে ৭ দিনের জন্য ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হত। এই সময় যুবকেরা বিশ্রাম, খাওয়া, সাধারণ পোষাক, চিকিৎসা ও নিরাপত্তার সুযোগ লাভ করত। এইসব ক্যাম্পের পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার সাবিক দায়-দায়িত্ব সাধারণতঃ বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের ওপরই ন্যস্ত ছিল। তবে, অধিকাংশ দেশেই বাংলাদেশের পক্ষ হতে একজন এম, পি-এ/এম, এন, এ-কে, ক্যাম্প প্রধান/উপ-প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হত।

২। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (Youth Training Camp)

অভ্যর্থনা কেন্দ্রগুলোতে ৭ দিনের বিশ্রাম, খাওয়া ও চিকিৎসার পর একটি সুনির্দ্দিষ্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানে ইচ্ছুক যুবকদেরকে ৪৫ দিনের প্রশিক্ষণের জন্য বাছাই করে, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে ভর্তি করা হত। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে সাধারণতঃ তিন ধরণের প্রশিক্ষণ দেয়া হত। এই প্রশিক্ষণ কোর্সগুলো নিম্নরূপ ছিল ঃ

ক। পলিটিক্যাল মটিভেশন (Political Motivation)

এই ধরণের প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল, যুদ্ধে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক যুবকদেরকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলা এবং বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করা।

খ। উৎপাদন ও উন্নয়নমূলক কাজের প্রশিক্ষণ (Base work Training)

এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল, স্থানীয় সম্পদ, শক্তি ও সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থাপনা সহ উৎপাদন এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে দেশের যুবশক্তি কি ভূমিকা পালন করতে পারে, সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দান করা। তাছাড়া, এই স্বাধীনতা সংগ্রাম যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে যাতে বাঙ্গালী একটি জাতি হিসেবে টিকে থাকার জন্যে নিজস্ব সম্পদ, শক্তি, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, নেতৃত্ব, কর্ম প্রচেষ্টা ও কঠোর শ্রমের দ্বারা আপাততঃ শহরে অর্থনীতিকে বাদ দিয়ে (যেহেতু শহরগুলো শত্রুদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল) নিজেরাই নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বাবলম্বী হয়ে বেঁচে থাকার দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের উপযুক্ত করে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়, সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়াও এই ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

গ। হালকা অস্ত্রের প্রশিক্ষণ (Light Arms Training)

এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল, এই প্রশিক্ষণার্থী যুবকদেরকে পি, টি, করানো, 'গ্রেনেড' নিক্ষেপ, দেশের ভিতরে শত্রুদেব যাতায়াতে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে 'মাইন' পোঁতা, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী 'গেরিলা' সহ বিভিন্ন পর্যায়ের সংগ্রামী যুবক, সৈনিক, পুলিশ, আনসার ও অন্যান্য পর্যায়ের লোকদের সাথে গোপন এবং প্রয়োজনীয় যোগাযোগসহ তত্ত্ব এবং তথ্য সরবরাহের কাজে (রেকি এবং ওপি করা) সহযোগিতা করা ইত্যাদি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল একটা জনযুদ্ধ। সুতরাং এই জনযুদ্ধের প্রধান শক্তির উৎস ছিল, দেশের আপামর স্বাধীনতা সাধারণ মানুষ। যেহেতু আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা বিভিন্ন কারণে গেরিলা পদ্ধতির যুদ্ধকেই বেছে নিয়েছিলাম সুতরাং এই যুদ্ধে দেশের জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া জয়লাভ করা কোন অবস্থাতেই সম্ভপর ছিল না। কারণ, জনতা হলো 'পানি' এবং গেরিলারা হলো 'মাছ' সুতরাং পানি দূষিত হলে যেমন মাছ বেঁচে থাকতে পারে না, তেমনি জনতার সহযোগিতা না পেলেও 'গেরিলা' পদ্ধতির জনযুদ্ধ কোন অবস্থাতেই সাফল্যমণ্ডিত হয় না। আমাদের পরম সৌভাগ্য এই যে, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দেশের সাধারণ মানুষ, যে কোন মূল্যের বিনিময়ে নিজেদের গেরিলারূপী দামাল ছেলেদেরকে আশ্রয়, প্রশ্রয়, খাদ্য ও বিভিন্নমুখী সহযোগিতা প্রদান করতে কখনও কুণ্ঠাবোধ করেনি। সুতরাং দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সবচেয়ে বড় শক্তি ও সম্পদ ছিল, এই দেশের সাধারণ মানুষ।

ভিত্তি ফৌজ (V. F.) এবং যুব প্রশিক্ষণ

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়, দেশের ভিতর হতে লক্ষ লক্ষ ছাত্র যুবক ও কৃষকেরা যখন প্রয়োজনীয় অস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোতে উপস্থিত হচ্ছিল, তখন বিভিন্ন যুক্তি সঙ্গত কারণেই শিবিরে অবস্থানকারী সব শ্রেণীর লোকদেরকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভবপর ছিল না। তাছাড়া বিদেশে থেকে যেমন এক বিপুল সংখ্যক অস্ত্র প্রার্থীর জন্য তাদের ইচ্ছানুযায়ী প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ছিল, তেমনি Arms without command and control-অত্যন্ত বিপদজনক পরিস্থিতি এবং ঘটনার সৃষ্টি করতে পারে, এইসব ধারণায় ভাবান্বিত হয়ে সবাইকে 'অস্ত্র' প্রশিক্ষণ না দেবারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, যেহেতু আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রাথমিক পর্য্যায়ে গেরিলা পদ্ধতির ছিল সুতরাং কোন অবস্থাতেই Conventional Army-র সাথে সরাসরি মোকাবেলা করা যুদ্ধ-বিজ্ঞান সম্মত হত না। দ্বিতীয়ত, একটি যুবককে

হালকা (লাইট) এবং মাঝারি ধরণের অস্ত্র পরিচালনায় প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করতে হলেও কমপক্ষে ৬ মাস সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু তৎকালীন পরিবেশ এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী, সব যুবককে অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য এত সময় দেয়া আমাদের পক্ষে কোন অবস্থাতেই সম্ভবপর ছিল না। তাছাড়া এখানে উল্লেখিত এইসব সমস্যা ব্যতীত তৎকালে অন্যান্য বহুবিধ রাজনৈতিক, প্রশাসনিক প্রাতিষ্ঠানিক, ও আদর্শগত সমস্যা এবং কারণ ছিল, যার জন্যও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-গুলোতে অবস্থানকারী সব মানুষকে 'অস্ত্র' প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করা তৎকালীন নেতৃবৃন্দ এবং কর্মকর্তাগণ প্রয়োজন মনে করেননি। সুতরাং 'অভ্যর্থনা শিবির' হতে যে সমস্ত যুবককে ৪৫ দিনের প্রশিক্ষণের জন্য যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রিক্রুট করা হত, সে সব যুবকের মাঝ থেকে একমাত্র তাদেরকেই 'সামরিক' প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের বিভিন্ন সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রেরণ করা হতো যাদের শিক্ষাসহ শারীরিক, মানসিক ও প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক যোগ্যতা ছিল। এই পদ্ধতি ও ব্যবস্থার ফলে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর যে হাজার হাজার যুবকদের সরাসরি সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হতো না, সে সব যুবকদের ওপরে উল্লেখিত প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণ দিয়ে 'ভিত্তি ফৌজ' (সামরিক ও অর্থনৈতিক কর্মী) হিসেবে গড়ে তোলার চেস্টা করা হত। এখানে "ভিত্তি" বলতে মাটিকে এবং "ফৌজ" বলতে সামাজিক চেতনা সম্পন্ন এবং উৎপাদন, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সমাজের সার্বিক কল্যাণের কাজে নিবেদিত প্রাণ কর্মীদের বুঝানো হয়েছে। তৎকালে ভিত্তি ফৌজকে দেশের ভিতরে ও বাহিরে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করার জন্য যে আইডেন্টিটি কার্ড দেয়া হত, তার একটি নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

বিপদ আশংকায় নষ্ট কর

বাংলাদেশ ভিত্তি-ফৌজ বাহিনীর নির্দেশ পত্র

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নাম ... ... বয়স ... ... পিতা ... ... গ্রাম ... ... থানা ... ... জিলা ... ... কে বাংলাদেশ ভিত্তি-ফৌজ বাহিনীর ... ... নং স্বেচ্ছাসেবক কর্মী হিসেবে গ্রহণ করা হইল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের অপর নির্দেশ অনুসারে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে স্বাবলম্বী-কর্মশৃংখলার ভিত্তিতে এবং পঞ্চায়েতী শাসনের মাধ্যমে মুক্তিকামী জীবন যাপন (ও)সমাজ শৃংখলার দুর্গ গঠনের প্রশিক্ষণ নির্দেশ এই কর্মীকে দেওয়া হইল।

মোহর

বাংলাদেশ মুক্তি পরিষদের পক্ষ হইতে

স্বাক্ষর ... .

তারিখ ... ...

যুব অভ্যর্থনা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর নাম ও স্থান

	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর নাম	স্থান
১।	ইছামতী ওয়াই/টি	দুর্গা চৌধুরী পাড়া অঞ্চল
২।	একীনপুর ওয়াই/টি	ঐ
৩।	বিলুনিয়া ওয়াই/টি	বিলুনিয়া মহকুমা
৪।	সাররুম ওয়াই/টি	সাররুম
৫।	সোনার বাংলা ওয়াই/টি	হাঁপানিয়া
৬।	মড়াটিলা ওয়াই/টি	ঐ
৭।	মছিমা ওয়াই/টি	সোনামুড়া মহকুমা
৮।	বঙ্গবন্ধু ওয়াই/টি	হাঁপানিয়া
৯।	কাঁঠানিয়া ওয়াই/টি	সোনামুড়া মহকুমা
১০।	বঙ্গশার্দুল ওয়াই/টি	হাঁপানিয়া
১১।	কৈলাশহর ওয়াই/টি	কৈলাশপুর মহকুমা
১২।	রাজনগর ওয়াই/টি	উদয়পুর মহকুমা
১৩।	যমুনা ওয়াই/টি	হাঁপানিয়া
১৪।	বড়মুড় ওয়াই/টি	সোনামুড়া মহকুমা
১৫।	হাতীমাড়া ওয়াই/টি	ঐ
১৬।	গোমতী ওয়াই/টি	দুর্গা চৌধুরী পাড়া
১৭।	পালাটোনা ওয়াই/টি	উদয়পুর মহকুমা
১৮।	শ্রীনগর ওয়াই/টি	বেলুনিয়া মহকুমা
১৯।	শীলছড়া ওয়াই/টি	সাররুম মহকুমা
২০।	সেনক্রিরা ওয়াই/টি	করীমগঞ্জ মহকুমা
*২১।	হারিনা ওয়াই/টি	বেলুনিয়া মহকুমা
২২।	বক্সনগর ওয়াই/টি	সোনামুড়া মহকুমা
২৩।	তিতাস ওয়াই/টি	হাঁপানিয়া
*২৪।	বিজনা ওয়াই/টি	ঐ
২৫।	ব্রহ্মপুত্র ওয়াই/টি	ঐ
২৬।	গোমতী ওয়াই/টি	ঐ
*২৭।	চড়াই লাল ওয়াই/টি	উদয়পুর মহকুমা
*২৮।	গকুল নগর ওয়াই/টি	সদর মহকুমা
২৯।	১নং মিলিটারী হোল্ডিং ক্যাম্প	দুর্গা চৌধুরী পাড়া
৩০।	২নং মিলিটারী হোল্ডিং ক্যাম্প	ঐ
৩১।	৩নং মিলিটারী হোল্ডিং ক্যাম্প	ঐ

*তারকা চিহ্নিত ক্যাম্পগুলোকে দুইভাগে ভাগ করে, এক একটি ভাগের নামকরণ বিভিন্ন নদীর নামে করা হয়েছিল।

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সাথে সরাসরি জড়িত এম. পি ও এম, এন, এ-দের নামঃ

ক্রমিক	ক্যাম্পের নাম	স্থানের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত এম পি এ এবং এম এন এ-দের নাম
১।	গোমতী—২	দুর্গা চোধুরী পাড়া	জনাব তামীর হোসেন, এম পি এ
২।	বিজনা	ঐ	জনাব সৈয়দ এমদ দুল ব বী, এম পি এ
৩।	ইছামতী	ঐ	জন ব জ মাল উদ্দিন অ হমদ, এম পি এ
৪।	ব্রহ্মপুত্র	হাপানিয়া	জনাব আফতাব উদ্দিন ভুঁইয়া, এম এন এ
৫।	তিতাস	ঐ	জনাব কাজী আকবর উদ্দিন, এম পি এ
৬।	গোমতী—১	ঐ	জনাব অ লী আজম, এম এন এ
৭।	মনা	ঐ	জনাব সফীউদ্দিন, এম পি এ
৮।	সোনার বাংলা	ঐ	জনাব শামসুল হুদা, এম এন এ
৯।	বঙ্গ সারদুল	ঐ	জনাব দেওয়ান আবুল আব্বাস, এম এন এ
১০।	এম এ আজিজ*	হরিণা	জনাব মীজা আবুল মনসুর, এম পি এ
১১।	হরিনা ওয়াই সি	হরিণা	জনাব এম এ হান্নান, সাধারণ সম্পাদক চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ
১২।	পালাটোনা	উদয়পুর	ক্যাপ্টেন মুহম্মদ সুজাত আলী, এম এন এ
১৩।	রাজনগর	রাজনগর	অধ্যাপক এ হানিফ, এম এন এ
১৪।	বড়মুড়া	কাঁঠালিয়া	জনাব জ ন দিন আহমদ, এম পি এ
১৫।	চড়ইলাম —১	চড়ইলাম	জনাব সা ওয়াত উল্লাহ, এম পি এ
১৬।	চড়ইলাম ২	চড়ইলাম	জনাব ওয়াদি উল্লাহ নজে খান, এম এন এ
১৭।	পদ্মা	গকুল নগর	জনাব এস হক, এম পি এ
১৮।	কৈলাশহর	কৈলাশপুর	জনাব তৈবুর রহীম, এম পি এ
১৯।	আশারামবাড়ী	খোয়াই	জনাব মোস্তফা শহীদ, এম পি এ
২০।	ধর্মনগর	ধর্মনগর	জনাব তাইমুজ আলী, এম পি এ
২১।	এম এ আজিজ ওয়াই/সি-২	হরিণা	জনাব মোশাররফ হোসেন, এম পি এ
২২।	চোতাখোলা	বিলোনিয়া	জনাব এ বি এম তালেব আলী, এম পি এ

*মরহুম জনাব এম এ আজিজ চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের একজন জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। সুতরাং যুদ্ধের সময় তাঁর নাম অনুসারে দুটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নামকরণ করা হয়েছিল।

ক্রমিক	ক্যাম্পের নাম	স্থানের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত এম, পি, এ এবং এম, এন, এ-দের নাম
২৩।	মিলিটারী হোল্ডিং ক্যাম্প	ডি, সি, পাড়া	জনাব সিরাজুল ইসলাম, এম পি এ জনাব রফিক উল্লাহ, এম পি এ
২৪।	কাঁঠালিয়া	কাঁঠালিয়া	জনাব আলহাজ আলী আকবর, এম পি এ
২৫।	একীনপুর	একীনপুর	জনাব মোঃ আঃ সোবহান, এম পি এ
২৬।	পালাটোনা-২	উদয়পুর	জনাব আবদুল্লা আল হারুন, এম পি এ
২৭।	মনু	খোয়াই	জনাব মোঃ ইলিয়াস, এম পি এ
২৮।	বাগাফা	বিলোনিয়া	জনাব আবু নাসের চৌধুরী, এম পি এ

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে ব্যবহৃত 'ছদ্ম নামের' তালিকা ঃ

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে, বিশেষতঃ অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে, এই যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর মধ্যে কয়েকটির নাম, অবস্থান, কর্মতৎপরতা এবং আনুসঙ্গিক ঘটনাবলীর খবরাখবর কিছুটা শত্রুপক্ষের গোচরীভূত হয়ে পড়ে। ফলে কিছু সংখ্যক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে 'ছদ্ম নাম' ধারণ করতে হয়। নিম্নে যে সব যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে 'ছদ্ম নাম' ধারণ করতে হয়েছিল, সেগুলোর নাম উল্লেখ করা হল ঃ

ক্রমিক		পুরাতন নাম	নতুন নাম
১।	পদ্মা	চড়ইলাম	ক্রিকেট
২।	মেঘনা	,,	গলফ
৩।	গংগা	গকুল নগর	টেনিস
৪।	যমুনা	,,	হকি
৫।	মুহড়ী	হরিনা	ফুটবল
৬।	তিস্তা	বিজনা	পলো
৭।	কল্যাণপুর	খোয়াই	সুইমিং

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সাথে ভারতীয় সেনাবাহিনীর যে সব কর্মকর্তা সরাসরিভাবে জড়িত ছিলেন তাঁদের নাম ঃ

ব্রিগেডিয়ার মাস্টার—সাবিক তত্বাবধান এবং সহযোগিতা ; ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিং—সাবিক তত্ত্বাবধান এবং সহযোগিতা ; মেজর সুব্রামনিয়াম—সহকারী পরিচালক, সেন্ট্রাল রিলিফ ; ক্যাপ্টেন বিভুরঞ্জন চ্যাটার্জী— চড়ইলাম যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ; মেজর মিত্র--তত্ত্বাবধায়ক ; ক্যাপ্টেন ডি, পি, ধর--কল্যাণপুর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ;

বিশেষ প্রয়োজনে ক্যাম্পগুলোর 'ছদ্ম নাম' বাংলাদেশের বিভিন্ন নদ-নদীর নামানুসারে রাখা হয়েছিল।

ক্যাপ্টেন আর, পি, সিং--গকুল নগর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; ক্যাপ্টেন এস, কে, শর্মা--চড়ইলাম যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; ক্যাপ্টেন ডি, এস, মঙ্গনী---বাগাফা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; ক্যাপ্টেন জি, এস, রাওয়াত--গকুল নগর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; ক্যাপ্টেন নাগ--চোতাখোলা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে জড়িত ভারত সরকারের বে-সামরিক প্রতিনিধিদের নাম:

ডঃ শ্রী ত্রিগুনা সেন, শিক্ষা মন্ত্রী (ভারত); শ্রী সচীন্দ্রলাল সিং, মুখ্য মন্ত্রী (ত্রিপুরা রাজ্য); শ্রী কে, পি, দত্ত, পরিচালক, শিক্ষা দপ্তর, (ত্রিপুরা রাজ্য); শ্রী মনুভাই বিমানী, বাংলাদেশ এসিস্টেন্স কমিটি (ভারত)।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে একসাথে সাধারণতঃ পাঁচশত থেকে আড়াই হাজার পর্যন্ত যুবককে প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই সময়ে বিভিন্ন অসুবিধা থাকা সত্বেও সর্বমোট প্রায় এক লক্ষ যুবককে প্রাথমিক ভাবে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু এদের মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ হাজার যুবককে 'ভিত্তি ফৌজের' উপযোগী করে, বিশেষ ধরণের প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অবশিষ্ট যুবকদেরকে প্রয়োজনীয় সময়, অর্থ, সম্পদ ও উপকরণের অভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হয়নি।

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে জড়িত বাংলাদেশের সামরিক কর্মকর্তাদের নাম:

ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম--১ নং সেক্টর; ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম--১ নং সেক্টর; মেজর আবদুল মতিন--১ নং সেক্টর; মেজর খালেদ মোশাররফ ২ নং সেক্টর; মেজর সফিউল্লাহ--৩ নং সেক্টর; ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামান---৩ নং সেক্টর; মেজর সি. আর দত্ত--৪ নং সেক্টর।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সাথে জড়িত ছাত্র ও যুব নেতৃবৃন্দ:

জনাব আ. স, ম. আবদুর রব, প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়ন; জনাব শেখ ফজলুল হক মনি, তৎকালীন যুব নেতা; জনাব আবদুল কুদ্দুস মাখন, প্রাক্তন যুব ও ছাত্র নেতা; জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী, প্রাক্তন যুব ও ছাত্র নেতা, জনাব সৈয়দ রেজাউর রহমান, ছাত্রনেতা, কুমিল্লা; জনাব মাইনুল হুদা, ছাত্রনেতা, কুমিল্লা, শহীদ স্বপন কুমার চৌধুরী, যুব ও ছাত্র নেতা, জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, ছাত্র নেতা, নোয়াখালী।

---

* এখানে উল্লেখিত বাংলাদেশী সামরিক কর্মকর্তাগণ ব্যতীত, আরও যে সব সামরিক অফিসার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সাথে জড়িত ছিলেন, তাঁদের নামের তালিকা বিবরণ দাতার কাছে না থাকার দরুণ এখানে উল্লেখ করতে পারেননি বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত বাংলাদেশের ব্যক্তিবর্গের নামঃ

জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী, এম, এন, এ (চট্টগ্রাম), অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, এম, এন এ (চট্টগ্রাম); অধ্যাপক ইউসুফ আলী, এম, এন, এ (দিনাজপুর) যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর পরিচালক মণ্ডলীর সভাপতি; অধ্যাপক খোরশেদ আলম, এম, এন, এ (কুমিল্লা); অধ্যক্ষ আবুল কাসাম মজুমদার, এম, এন, এ (কুমিল্লা); জনাব আহমদ আলী, এম, এন, এ (নোয়াখালী); জনাব নূরুল হক, এম, এন এ (নোয়াখালী); জনাব খালেদ মোহাম্মদ আলী এম, এন, এ (নোয়াখালী); জনাব লুৎফুল হাই সাচ্চু, এম, পি-এ, (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), জনাব আলী আজম এম, এন, এ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া); জনাব মুহাম্মদ রাজা মিয়া, এম পি, এ (কুমিল্লা), জনাব মোঃ আবদুল আউয়াল এম, এন, এ (কুমিল্লা); জনাব হাজী আবুল হাসেম এম পি, এ (কুমিল্লা); জনাব আবদুর রউফ, রাজনৈতিক নেতা (কুমিল্লা), জনাব মুহাম্মদ আফজল খান, রাজনৈতিক নেতা (কুমিল্লা), জনাব কাজী জহিরুল কাইয়ুম, এম, এন, এ (কুমিল্লা), ফ্লাইট লেফটেনান্ট এ, বি সিদ্দিকী, এম পি, এ (কুমিল্লা). জনাব খাজা আহমদ, এম, এন এ (নোয়াখালী), জনাব আবদুল মালেক উকিল এম, এন, এ (নোয়াখালী); জনাব আবদুল করিম বেপারী, (মুন্সিগঞ্জ), এডভোকেট হাবিবুর রহমান, রাজনৈতিক নেতা, (ব্রাহ্মণবাড়িয়া); কর্ণেল আবদুর রব (পরে তিনি জেনারেল হয়েছেন), জনাব এইচ, টি, ইমাম, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি; জনাব রকিব উদ্দীন আহমদ, প্রাক্তন এস, ডি, ও (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) জনাব এম, আর, সিদ্দিকী, এম, এন, এ (চট্টগ্রাম); জনাব সাইদুর রহমান, সমাজকর্মী, (কুমিল্লা), জনাব আবু মিয়া, সামাজকর্মী, পেনোরমা (কুমিল্লা), শ্রী রাখাল ভট্টাচার্য, সরকারী কর্মচারী, বাংলাদেশ সরকার; ডাঃ আবদুছ ছাত্তার এম, পি-এ, জনাব জাবেদ আলী মোক্তার (চাঁদপুর), জনাব মকবুল আহমদ এডভোকেট (চাঁদপুর), জনাব মীর হোসেন চৌধুরী (কুমিল্লা); জনাব আমীর হোসেন, এম, পি, এ (কুমিল্লা); জনাব বিসমিল্লা মিঞা, এম, পি, এ (নোয়াখালী); জনাব শহীদ উদ্দীন ইস্কান্দার, এম, পি, এ (নোয়াখালী); জনাব জালাল আহামদ, এম, পি, এ (কুমিল্লা); অধ্যাপক মুহাম্মদ খালেদ, এম, পি, এ (চট্টগ্রাম); ক্যাপ্টেন আবুল কাসেম, এম, পি, এ (চট্টগ্রাম); জনাব মীর্জা আবুল মনসুর, এম, পি, এ (চট্টগ্রাম); জনাব আবদুর রশিদ ইঞ্জিনীয়ার এম, পি, এ; ডাঃ এ, কে, হাসান, আঞ্চলিক প্রশাসক, মুজিব নগর; জনাব মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, উপ-পরিচালক (একাউন্টস); জনাব গোলাম রফিক, (শিল্পী); জনাব শহীদ কাদরী, প্রোগ্রাম অফিসার, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; জনাব আনোয়ার হোসেন স্টাফ অফিসার, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; জনাব মুকতুল হোসেন, বিল্লন, যুব প্রশিক্ষণ

কেন্দ্র; জনাব শাহাব উদ্দিন, ড্রাইভার, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; জনাব অজিত কুমার নন্দি, হিসাব রক্ষক, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; জনাব সঞ্জীব কুমার রায়, স্টেনোগ্রাফার, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; জনাব গাজী গোলাম মোস্তফা, রাজনৈতিক নেতা; শ্রী সুখলাল সাহা (পলেটিকেল মটিভেটর); জনাব আজিজুল হক, সমাজ-কর্মী (কসবা); জনাব অহীদ মিঞা, ড্রাইভার; অধ্যক্ষ আবু আহমদ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া); জনাব কুতুবুর রহমান, ছাত্র নেতা।

আমাদের দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ বিভিন্ন কারণে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের মাটিতে থেকে আরম্ভ করা এবং সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহেরও অত্যন্ত অভাব ছিল। এতদ-সত্ত্বেও বীর বাংগালীরা এবং তাঁদের অকুতোভয় সন্তানেরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সামান্য কয়েকদিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশের আপামর জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ও প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় যেভাবে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেছে তা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য সাধারণ ঘটনা। সুতরাং বাংগালী জাতির এই ত্যাগ, তিতিক্ষা ও শ্রমের তাৎপর্যকে বেঁচে থাকা দেশের অবশিষ্ট মানুষগুলো গভীরভাবে উপলব্ধি করুক ইহাই বোধ হয় শহীদানদের আত্মার একমাত্র আকুতি।

দেবব্রত দত্ত গুপ্ত
অক্টোবর, ১৯৮২।

মণি সিং

নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত আমি কারাগারে বন্দী ছিলাম। দীর্ঘদিন আত্মগোপনে থেকে কাজ করার পর ১৯৬৭ সালে আমি গ্রেপ্তার হই এবং ১৯৬৯ সালের মহান গণ-অভ্যুত্থানের সময় জনগণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আমার এবং অন্যান্য রাজবন্দীদের মুক্তির দাবি দেশের আনাচে কানাচে ধ্বনিত করে তোলে, সেই পটভূমিতে ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা মুক্তি পাই। কিন্তু সামরিক শাসন জারি ও ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসার পর ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে আমাকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চের পর বন্দীরা রাজশাহী জেল ভেঙ্গে আমাকে বের করে নেয়ার আগে পর্যন্ত আমি আটক ছিলাম। কাজেই উল্লিখিত সময়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে পার্টি ও জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামে সরাসরি যোগ দিতে পারি নি। তবে আমাদের পার্টির তখনকার ভূমিকা আমার জানা আছে, সেটা সংক্ষেপে বলছি।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের বিশ্লেষণ ও পরিস্থিতির মূল্যায়ন আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে করা হয়। আমরা

নির্বাচনের ফলাফলকে পূর্ব বাংলার জনগণের ঐক্যবদ্ধ অভ্যুত্থান এবং একটি আকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশরূপে দেখি। আমাদের বিশ্লেষণে বলা হয়েছিল যে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ৬-দফার পক্ষে রায়ের মধ্য দিয়ে বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা আরও বিকাশ লাভ করেছে এবং বাঙালী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্খা প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের পার্টি নীতিগতভাবেই সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠাকে ন্যায্য মনে করে এবং প্রকৃতপক্ষে আমাদের পার্টিই প্রথম বাংলাদেশের জনগণের পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি ধ্বনিত করে।

নির্বাচনের ফলাফল মূল্যায়ন করে আমরা আরও দেখেছিলাম যে আওয়ামী লীগ কেবল "পূর্ব পাকিস্তানের" জনগণেরই সবাত্মক সমর্থন পায় নি, তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে গোটা পাকিস্তানের সরকার গঠনের অধিকারও লাভ করেছে। কিন্তু আমরা মূল্যায়নে বলেছিলাম যে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি এবং এই শাসকদের মদদকারী সাম্রাজ্যবাদ কিছুতেই নির্বাচনের এই ফলাফল মেনে নেবে না এবং তা বানচাল করার জন্য ষড়যন্ত্র করবে। বিশেষতঃ ৬-দফার সঙ্গে ছাত্র সমাজের ১১-দফাও তখন জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল এবং বিজয়ী দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১১-দফাকে সমর্থন দিয়েছিলেন। ১১-দফায় সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা হয়েছিল, ফলে তাঁরা ঐ নির্বাচনের দাবি কিছুতেই মানতে পারে না। এ-কারণে পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের সরকার গঠন ছিল অনিশ্চিত এবং এমতাবস্থায় বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকেই অগ্রসর হবে এবং সে সংগ্রামের জন্য জনগণকে প্রস্তুত করা দরকার।

১৯৭০ সালের নির্বাচন সম্পর্কে আমাদের পার্টির এই বিশ্লেষণ পরবর্তী ঘটনাবলীতে সঠিক বলেই প্রমাণিত হয়। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ নির্বাচনের ফলাফল বানচালের জন্য পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি এবং ভুট্টো প্রমুখের ষড়যন্ত্র পরিষ্কার হয়ে উঠে এবং জাতীয় সংসদের যে অধিবেশন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা অনুযায়ী ৩রা মার্চ হওয়ার কথা ছিল তা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ঐ সময় ২৫শে ফেব্রুয়ারি আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এক প্রস্তাবে রাজনৈতিক দাবি হিসেবে ঘোষণা মোতাবেক জাতীয় সংসদের অধিবেশন, সেখানে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতিসম্বলিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ঐ শাসনতন্ত্র অনুমোদন ও ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি উত্থাপন করে। সে সঙ্গে ঐ প্রস্তাবে বলা হয় যে নির্বাচনের রায়কে কার্যকরী করতে না দেয়া হলে বাংলাদেশের জনগণের আন্দোলন একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দিকে যেতে পারে। এ পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য হবে বাঙালীদের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি অনুসারে ঐ সংগ্রামে শরীক থাকা এবং ঐ নীতি

অনুসারে সমস্ত গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে এই সংগ্রামকে সঠিক পথে চালিত করতে চেষ্টা করা।

১লা মার্চ ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় সংসদের অধিবেশন হবে না—এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে আমরা শাসকগোষ্ঠির ষড়যন্ত্র কার্যকর হতে দেখলাম। ঐ দিন জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে স্বাধীনতার আওয়াজ তুলল। পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন ছিল যে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি বাঙালী জাতির এই অভ্যুত্থান দমন করার জন্য সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগ করবে এবং স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজন হবে। সে জন্য জনগণকে প্রস্তুত করা দরকার।

এ ছিল পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ। কিন্তু এটা করেই আমরা বসে থাকিনি। আমাদের পার্টি বেআইনী এবং আত্মগোপনে ছিল। ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি গণসংগঠনের মাধ্যমে এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে আমাদের যতটুকু যোগাযোগ এবং সম্পর্ক ছিল তা কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রচারকার্য চালিয়েছি। পার্টির নামোল্লেখ না করে আমরা 'একতা' নামে যে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের সুযোগ গ্রহণ করেছিলাম তার মাধ্যমেও আমরা দেশপ্রেমিক শক্তি ও জনগণকে প্রস্তুত করার জন্য প্রচার চালিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আমরা সম্ভাব্য স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সাধ্যমতো আমাদের পার্টি ও জনগণকে প্রস্তুত করে তুলছিলাম।

১লা মার্চের পর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু রেস কোর্সের জনসমাবেশ থেকে "এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম" বলে ঘোষণা দিয়ে যে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন, আমরা তার পুরোপুরি সমর্থক ছিলাম। ইয়াহিয়া খান যখন ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় বসেন, তখন আলোচনার বিরোধিতা করাকে আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করি নি. কিন্তু আমাদের পার্টির মূল্যায়ন ছিল যে ঐ আলোচনায় কোন অপোসরফা হবে না, কেননা জনগণ স্বাধীনতার আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছে এবং পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি ও সাম্রাজ্যবাদীরা এটা মেনে নিতে পারে না। আমাদের পার্টি তখন জনগণের সচেতনতা জাগরূক রাখার জন্য এবং আসন্ন যে-কোন ধরণের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য জনগণকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে ঢাকা সহ সম্ভবমতো দেশের সব জায়গায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন, তাদের কুচকাওয়াজ ও ট্রেনিং ইত্যাদির ব্যবস্থা করি। তখন ছাত্রসমাজের শক্তিশালী প্রগতিশীল সংগঠন "পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নে" আমাদের পার্টির প্রভাব থাকায় তাদের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'ইউ ও টি সি'-র সহায়তায় তরুণ-তরুণীদের রাইফেল ট্রেনিং ও কুচকাওয়াজের আয়োজন করা হয়েছিল। ডেমরা এলাকার কিছু সংখ্যক শ্রমিককেও আমরা স্বেচ্ছাসেবক করে এ-ধরণের ট্রেনিংএ যুক্ত করেছিলাম। এ-সব কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে দেখিয়ে

উদ্বুদ্ধ ও তাদের মনোবল বৃদ্ধি করা এবং সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে মানসিকভাবে সচেতন ও প্রস্তুত করে তোলা। এক কথায় ঐ সময়টাতে আমাদের পার্টির ভূমিকা ছিল অবশ্যম্ভাবি স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সাধ্যমতো সকল দেশপ্রেমিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ, জনগণকে সচেতন ও প্রস্তুত করে তোলা। আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ২৫শে মার্চের আগেই বুঝতে পেরেছিল যে অবস্থা ক্রমেই সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ করা যায় যে, ৯ই মার্চ ঢাকায় উপস্থিত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের এক বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সশস্ত্র সংগ্রামের যথাসম্ভব প্রস্তুতির জন্য একটি সার্কুলার প্রচার করা হয়েছিল। তবে তখনকার পরিস্থিতিতে কেন কোন জেলায় সার্কুলারটি বিলম্বে পৌঁছে এবং পার্টির তখনকার শক্তিসামর্থ সশস্ত্র সংগ্রামের ব্যাপক প্রস্তুতির উপযুক্তও ছিল না। সেই পরিস্থিতিতে ২৫শে মার্চ জনগণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ শুরু হয়।

সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ছিল এই যে জনগণ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছে এবং বিশেষতঃ সমগ্র পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন, পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোর দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন এবং বাঙালীদের জাতীয় অধিকারের দাবির সঙ্গে ১১-দফায় সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী আকাঙ্খা ব্যক্ত হওয়ায় পাকিস্তানে একটা সরকার গঠন এবং বাঙালীদের দ্বারা শাসিত হওয়ার অবস্থা পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি ও সাম্রাজ্যবাদ কিছুতেই মেনে নেবে না। কাজেই বাঙালীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম অনিবার্য এবং তা সশস্ত্র সংগ্রামের পথে যাবে। সে জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও প্রস্তুত করাই মুখ্য কাজ এবং তা খুব দ্রুত করতে হবে।

সামগ্রিক অবস্থা মূল্যায়নের আরও একটি দিক আমাদের পার্টির ছিল। তা হচ্ছে: আমরা সচেতন ছিলাম যে আমোদের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কতকগুলি দুর্বলতা থাকবে। মধ্যস্তরের জনগণের যে দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ঐ স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ও তার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চেতনার ঘাটতি ছিল। এবং শ্রমিক-কৃষক মেহনতী মানুষের সংগঠন শক্তি ছিল দুর্বল। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আওয়ামী লীগের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। আমরা অনিবার্য ঘটনা-ধারায় পিছনে পড়ে না থেকে সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংগ্রামের গতিধারায় অন্যান্য দেশপ্রেমিক শক্তি ও জনগণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের সচেতন হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় ঐ দুর্বলতাগুলো কাটানো প্রয়োজন বলেই তখন সিদ্ধান্ত করেছিলাম। তাছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভের জন্য জাতীয় ঐক্য এবং জাতীয় মুক্তির সমর্থক আন্তর্জাতিক শক্তি সমূহের সমর্থন সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তাও আমরা উপলব্ধি করেছিলাম।

উল্লেখ্য যে, ২৫শে মার্চের আগেই ঢাকায় উপস্থিত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিয়ে বিভিন্ন দেশে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে পত্র পাঠায়।

স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠিত করা ও প্রচার চালানোর মাধ্যমে প্রতিরোধের শক্তিগুলোকে প্রস্তুত করার চেষ্টার কথা আগেই বলেছি। ২৫শে মার্চ পাক-বাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ শুরু হলে আমাদের পার্টির ছাত্র-যুবক-শ্রমিক-স্বেচ্ছা-সেবকরা যেখানে যতটুকু সম্ভব হয়েছে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ প্রভৃতি দেশপ্রেমিক শক্তির সঙ্গে মিলিতভাবে প্রতিরোধরত বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআর বাহিনীর সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এপ্রিলের মাঝামাঝি নাগাদ এই প্রাথমিক প্রতিরোধ ভেঙে পড়লে প্রথমে শহর থেকে গ্রামে এবং পরে বাধ্য হয়ে আমাদের কর্মীরা ভারতে চলে যায়। তাঁরা আমাদের পার্টি ও গণসংগঠনের সমর্থক ও ইচ্ছুক তরুণদেরও সংগঠিত করে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং-এর জন্য ভারতে যেতে থাকেন। অনেক বিপন্ন পরিবারও ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

সীমান্ত অতিক্রম করার প্রাক্কালে আমি রাজশাহী জেলে বন্দী ছিলাম। বাইরে সমগ্র জাতি যে মুক্তির জন্য উদ্বেল হয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারতাম। বুঝতে পারতাম সামনে অপেক্ষা করছে এক নিদারুণ রক্তাক্ত সংগ্রাম। রাজশাহী শহরে ই পি আর-এর ক্যাম্প ছিল। পাক বাহিনীর ক্যাম্পও ছিল। ২৫শে মার্চ পাক বাহিনী ই পি আর ক্যাম্প আক্রমণ করে। ই পি আর প্রতিরোধ করে। আমি গোলাগুলির আওয়াজ শুনি এবং কিছু কিছু গোলাগুলি জেল খানার কাছে এসে পড়তে থাকে। ফলে বন্দীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। গোলাগুলির মাঝে পড়ে বন্দী অবস্থায় মৃত্যু ঘটতে পারে। অন্য সকলে আমাকে এসে বলে যে আপনি ডি আই জি-কে বলুন জেলের গেট খুলে সকলকে মুক্ত করে দিতে ডি আই জি-কে বললাম, কিন্তু তিনি রাজি হন না। তখন বন্দীরা সিদ্ধান্ত নেয় জেল ভেঙ্গে বের হবে। বাইরে জনতাও জেল ভাঙ্গা সমথন করে। বন্দী ও জনতা মিলে জেলের ময়লা ফেলার দরজা ভেঙ্গে ফেলে। আমরা বের হয়ে আসি। আমার সঙ্গে আরও কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন। জনতাই আমাদের পদ্মা নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে নৌকায় উঠিয়ে দেয় এবং বলে যে, শহরে থাকা আপনাদের জন্য নিরাপদ নয়, আপনারা নদীর ওপারে চলে যান। নৌকাযোগে নদী পার হয়ে বুঝতে পারি যে আমরা ভারতের মাটিতে পা দিয়েছি। কারণ পদ্মার ওপারেই ভারত।

এই সময়ে জেলের ভেতরের বিচিত্র কোন অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু মার্চ মাসের একটি অসাধারণ ঘটনা ছিল। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সে 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে ডাক দেয়ার পর ঐ ভাষণ ও ঘোষণার জন্য আমি বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দন ও সমর্থন জ নিয়ে রাজশাহী জেল থেকে একটি টেলিগ্রাম করতে চাই। জেল কর্তৃপক্ষ বলেন যে "আপনি তো টেলিগ্রাম করতে পারবেন না, কারণ আপনি ডেটিনিউ। আপনার টেলিগ্রাম পাঠাতে পুলিশের স্পেশাল

ব্রাঞ্চের অনুমোদন লাগবে।" আমি বললাম, "তবে অনুমোদন নিয়ে আসুন।" তাঁরা বললেন যে 'এখন অনুমোদন আনা যাবে না, কারণ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে কেউ কাজ করছে না, তারা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছে।" পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগও অসহযোগ আন্দোলনে শরীক হয়েছে এমন অভিজ্ঞতা আমার রাজনৈতিক জীবনে ইতিপর্বে আর ছিল না। তখন জেলের ভেতর থেকে আমি বুঝতে পারি যে সমগ্র জাতি স্বাধীনতার জন্য কতখানি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

প্রতিরোধ শুরু হওয়ার আগে থেকেই বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দলের সঙ্গে আমাদের আত্মগোপনরত পার্টির সম্পর্ক ছিল। বিশেষত: ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মোজাফ্ফর) আমাদের পার্টির ঐতিহ্যগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ন্যাপের অসাম্প্রদায়িক, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং সমাজতন্ত্রের সমর্থক ভূমিকার জন্য আমাদের পার্টির সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক ও নীতিগত মিল ছিল বেশী। অসহযোগ আন্দোলন প্রতিরোধ ও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে এই দুই পার্টি ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ন্যাপের (এবং ছাত্র ইউনিয়নের) সঙ্গে মিলিত ভাবে আমাদের পার্টি গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলে। অনেকস্থানে একত্রে ক্যাম্প করা হয়।

আওয়ামী লীগের সঙ্গে ১৯৬০-৬১ সাল অর্থাৎ আইউব-বিরোধী আন্দোলনের সূচনা থেকেই আমাদের পার্টির সহযোগিতামূলক সম্পর্ক ছিল। আমাদের পার্টি আত্মগোপনে থাকতে বাধ্য হলেও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব সময়টাতে আওয়ামী লীগের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয়ে আমাদের মত বিনিময় ও পরামর্শ হয়েছে। ১৯৭০-এর নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানী শাসকরা যে মেনে নেবে না এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম অনিবার্য এবং তা সশস্ত্র সংগ্রাম হতে পারে এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু এবং আমাদের পার্টি ঐকমত্যে পৌঁছেছিল। বঙ্গবন্ধু আমাদের বলেছিলেন যে সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থনের জন্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতা তাঁর জন্য মূল্যবান হবে, কেননা আওয়ামী লীগের এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও যোগাযোগের অভাব রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু আজ বেঁচে নেই। তিনি ঘাতকের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁর স্মৃতিকে স্মরণ করে আমি বলতে চাই যে কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে তিনি যে মূল্যায়ন ও প্রত্যাশা করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধে আমরা তা পূরণ করতে পেরেছি।

১৯৭১ সালের এপ্রিলে আওয়ামী লীগ প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ঘোষণা করার পরই দেশের ভেতরে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সম্পাদকমণ্ডলীর উপস্থিত সদস্যরা এক বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে স্বাগত জানায় এবং প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার কথা ঘোষণা করে। আমাদের পার্টির ঐ প্রথম প্রকাশ্য বিবৃতি

বিদেশে সংবাদপত্র ও বেতারে প্রচারিত হয়েছিল। এর ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামে পার্টির ভূমিকা দেশে-বিদেশে জনগণ জানতে পারে। আমাদের পার্টির বহু সদস্য-সমর্থক বাংলাদেশ সরকারের অধীনে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং গ্রহণ করে। তবে এক্ষেত্রে সরকার ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের পার্টির কিছু কিছু দ্বিমত ও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল।

অন্যান্য দলের মধ্যে কাজী জাফর আহমদ ও রাশেদ খান মেননদের দলের সঙ্গেও আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়। এরা মাওবাদী নীতি অনুসরণ করলেও ২৫ মার্চের পর সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে যায়। এরা স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন দিলেও অওয়ামী লীগের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী, স্বাধীনতার শক্তিগুলোর ঐক্য এবং স্বাধীনতার আন্তর্জাতিক শত্রু-মিত্র সম্পর্কে এঁদের নীতির সঙ্গে আমাদের প্রভূত পার্থক্য ছিল। মুক্তিযুদ্ধকালে এঁরা সহ কিছু মাওবাদী শক্তি আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে একটি 'বামপন্থী ফ্রন্ট' গঠনের যে প্রস্তাব দিয়েছিল তাকে আমারা বিভেদাত্মক ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে দুর্বল করার প্রয়াসী বলে ভ্রান্ত মনে করে প্রত্যাখ্যান করি এবং আওয়ামী লীগসহ জাতীয় ঐক্য গঠনের নীতি অনুসরণ করি। স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী দলগুলোকে আমরা শত্রু বলে চিহ্নিত করি।

২৫ মার্চের পরে জেল ভেঙ্গে মুক্ত হওয়ার পর কয়েকজন সহকর্মীসহ আমার নিরাপত্তা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজন উপলব্ধি করে জনতাই আমাদের ঠেলে নিয়ে পদ্মা পার করিয়ে দেয় একথা আগেই বলেছি। কাজেই দেশের ভিতরে আমাদের পার্টির সংগঠিত হওয়ার ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে জড়িত থাকতে পারিনি।

আমাদের পার্টির অন্য নেতারা ২৫ মার্চের পর সঙ্গে সঙ্গেই দেশত্যাগ করেন নি। তাঁরা পরিস্থিতি অনুযায়ী ভেতরে থেকে প্রতিরোধ সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন। অচিরেই ঢাকায় থাকা অসম্ভব এবং সকলের থাকা অপ্রয়োজনীয় মনে হলে দিলে আমাদের পার্টির নেতৃবৃন্দ তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবদুস সালাম, খোকা রায়, মোহাম্মদ ফরহাদ, জ্ঞান চক্রবর্তী সাইফউদ্দিন মানিক, মঞ্জুরুল আহসান প্রমুখ ঢাকা জেলার বেলাতো থানার রায়পুরায় ঘাঁটি করে অবস্থান করেন। কিছু কমরেডকে অধিকৃত রাজধানীতে রেখে যাওয়া হয়। রায়পুরা এলাকা পাকবাহিনীর পদানত হলে আমাদের নেতৃবৃন্দ ভৈরবের দিকে আশুগঞ্জে সরে গিয়ে অবস্থান নেন। নেতৃবৃন্দ দেশে থেকে পার্টির বিভিন্ন পর্যায়ে সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃস্থাপন এবং পুনর্গঠিত হয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধে ভূমিকা পালনের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। আশুগঞ্জে বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়লে এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে নেতৃবৃন্দের থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং প্রকৃতপক্ষে এলাকার জনগণ তাঁদেরকে ক্রমে সীমান্তের দিকে নিয়ে যায়। সীমান্ত অতিক্রম করার আগেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিভিন্ন জেলা সংগঠনের জন্য নির্দেশ দিয়ে ক্যাডার পাঠাতে সক্ষম হন।

পাক বাহিনীর আক্রমণ, নির্বিচার গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ প্রভৃতির মুখে সীমান্ত এলাকার জেলাগুলো থেকে হাজার হাজার মানুষ ভারতে চলে যায়। আমাদের পার্টির বহু কর্মী-সমর্থক সপরিবারে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়। অন্যান্য দলের রাজনৈতিক কর্মীরাও চলে যায়। আমাদের হিসেবে আমাদের পার্টির নেতা, সমর্থক ও কর্মীগণ এবং তাদের পরিবারবর্গ মিলিয়ে প্রায় ৬ হাজার নরনারী পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও মেঘালয় এই তিনটি ভারতীয় রাজ্যে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময় গোটা পার্টির সংগঠন সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন জেলায় দেশের মধ্যেও আমাদের কিছু কমরেড থেকে গিয়েছিলেন। প্রবাসে সকলের জন্য আশ্রয়, খাদ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করা এবং ভিতরে বাইরে সকল পর্যায়ের পার্টি সংগঠনের সাথে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপন করা এবং সংগঠন গুছিয়ে নেয়া এবং সর্বোপরি কালবিলম্ব না করে গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলা প্রভৃতি অত্যন্ত দুরূহ কাজ তখন পার্টির সামনে ছিল। আমাদের নেতা-কর্মীদের সব কিছু দৃঢ়তার সাথে হাসিমুখে সহ্য করা, অসম সাহসিক প্রয়াস এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিসহ অন্যান্য দেশপ্রেমিক শক্তির সাহায্যের ফলে অতি অল্প সময়ে আমরা কাজগুলো গুছিয়ে তুলি। এ-পর্যায়ে আমাদের সংগঠিত হওয়ার কাজের ধারাগুলো ছিল সংক্ষেপে নিম্নরূপ: (ক) কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ ক্যাম্প স্থাপন—ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক-দের সহায়তায়---সীমান্তবর্তী ভারতের তিনটি রাজ্যেই এবং তাদের আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থা। (খ) দু'ধরণের ক্যাম্প ছিল---পার্টির বয়স্ক সদস্যদের পরিবারবর্গ সহ আশ্রয়ের জন্য এবং তরুণদের জন্য যাদেরকে লড়াইয়ের উপযুক্ত মনে করা হবে ও ট্রেনিং দিয়ে পাঠানো হবে। (গ) ক্রমশঃ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সহায়তা গ্রহণ এবং আমাদের ক্যাম্পে সংগঠিত তরুণদের সরকারের মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিংএ প্রেরণ। (ঘ) আমাদের পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের মিলিত একটি নিজস্ব গেরিলা বাহিনী গঠন। এতে প্রথমে ট্রেনিং দানে প্রভৃত 'টেকনিক্যাল' অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। কিন্তু পরে ভারত সরকারের অনুমতি নিয়ে তা গঠন করা সম্ভব হয়। (ঙ) আগরতলায় এবং মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে কোলকাতায়ও কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যালয় গঠন করে কাজ করা। (চ) আমাদের নিজস্ব গেরিলা বাহি-নিকে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই দেশের ভেতরে যুদ্ধ করতে পাঠানো। (ছ) দেশের ভেতরের কমরেডদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং অনু-প্রবিষ্ট গেরিলাদের তাদের সহায়তা গ্রহণ। (জ) আমাদের ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধা তরুণদের রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা। (ঝ) কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক 'মুক্তিযুদ্ধ' নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করে তা সকল ক্যাম্পে, শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ও দেশের ভেতরেও প্রচারের ব্যবস্থা করা।

আমাদের পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের গেরিলা বাহিনীতে ৫ হাজার তরুনকে ট্রেনিং দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে পাঠানো হয়। এছাড়া আমাদের

প্রচেষ্টায় আমরা ১২ হাজার তরুণ সংগ্রহ ও সমাবেশ করে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিবাহিনীতে পাঠাই। অর্থাৎ আমরা মোট ১৭ হাজার তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে ট্রেনিং ও যুদ্ধের জন্য সংগঠিত করি। তবে যুদ্ধের পরে এই তরুণরা অনেকে লেখাপড়া, অনেকে চাকরি, কৃষিকাজ ও ব্যবসা প্রভৃতি নিজ নিজ পেশায় ফিরে যায় এবং রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত ছিলনা।

ভারতে যাওয়ার পরই ১৯৭১ সালের মে মাসে কেন্দ্রীয় কমিটি মিলিত হয়ে এর প্রথম বৈঠকে স্বাধীনতা সংগ্রামের মৌলিক চরিত্র, সংগ্রামের শক্তি এবং শত্রু-মিত্র প্রভৃতি সম্পর্কে মূল্যায়ন করে একটি দলিল গ্রহণ করেছিল। ঐ দলিলে পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক ধরণের শাসন-শোষণের স্বরূপ নির্দেশ করে আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামকে জাতীয় স্বাধীনতা এবং মুক্তির সংগ্রাম বলে মূল্যায়ন করা হয়েছিল। মূল্যায়নে বলা হয়েছিল যে স্বাধীনতার জন্য জনগণের দৃঢ় একতা এবং মুক্তিবাহিনীর বীরত্ব ও ত্যাগ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান শক্তি। এবং প্রতিবেশী ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক শিবির, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন ও দুনিয়ার শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও প্রগতিকামী শক্তি আমাদের স্বাধীনতার বন্ধু এবং অন্যদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, মাওবাদী চীন ও দুনিয়ার অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলরা পাকিস্তানের সমর্থক ও আমাদের স্বাধীনতার শত্রু বলে মূল্যায়ন করা হয়েছিল। এই মূল্যায়ন সঠিক বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

মে মাসের পরেও মাঝে মাঝে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা করা সম্ভব হয়েছে, যদিও আমাদের কমরেডরা ভারতের তিনটি রাজ্যে ও দেশের মধ্যেও ছড়িয়ে থাকায় তা খুব কষ্টসাধ্য ছিল।

ভারতের তিনটি রাজ্যেই (পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয়) সীমান্তবর্তী শহরে আমাদের পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ ক্যাম্প ছিল। দু' ধরণের ক্যাম্প ছিলঃ পার্টির বয়স্ক সদস্যদের পরিবারবর্গসহ এবং যুদ্ধে পাঠানোর জন্য তরুণদের 'ইয়ুথ ক্যাম্প'।

দেশ থেকে যাওয়ার সময় আমাদের কমরেডদের সঙ্গে যে যৎসামান্য অর্থ-সম্পদ ছিল তা-ই ছিল আমাদের প্রাথমিক সহায়। পরে ভারতীয় নাগরিকদের দ্বারা গঠিত সহায়ক সমিতি থেকে আমরা অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য পেয়েছিলাম। আমাদের প্রতিষ্ঠিত কিছু ক্যাম্প আমরা বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় মিলিয়ে দিয়েছিলাম। পরে অল্প সংখ্যক ক্যাম্পই আমাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

এ ছাড়া ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় প্রবাসী আমাদের পার্টির সমর্থকরা অর্থ-সাহায্য সংগ্রহ করে পাঠাতেন। বাংলাদেশে পাক বাহিনীর নৃশংসতা ও বাঙালীদের

সাহসিক যুদ্ধের খবর বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে ছাপা হওয়ার পর সারা দুনিয়ায় একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। এ পটভূমিতে মুক্তিযুদ্ধের শেষের মাসগুলোতে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে সাহায্য সংগ্রহের কাজটা লণ্ডনে আমাদের কমরেড ও সমর্থকরা সমন্বিত করে আমাদের কাছে অর্থ পাঠাতেন।

আমাদের ক্যাম্পে সংগঠিত তরুণদের অধিকাংশকেই যেহেতু সরকারী মুক্তিবাহিনীতে পাঠিয়ে দেয়া হত তাই খুব বেশী খরচের বোঝা আমাদের বহন করতে হয় নি। আর আমাদের নিজস্ব গেরিলা বাহিনীর ছেলেরা দেশের ভেতরে এসে জনগণের সহায়তায় আহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করতো।

আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা আগেই কিছু বলেছি। সবচেয়ে বড় ঐকমত্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে তা অর্জনের প্রশ্নে আমরা একমত ছিলাম।

আমরা আওয়ামী লীগ সহ স্বাধীনতার পক্ষের সকল শক্তির বৃহত্তম জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলাম। এই প্রচেষ্টা তেমন সফল হয় নি। শেষের দিকে বাংলাদেশ সরকারের "পরামর্শদাতা কমিটি" গঠিত হয় এবং তাতে আমাদের পার্টির প্রতিনিধিরূপে আমি ছিলাম। সশস্ত্র সংগ্রামের অগ্রগতির পর্যায়ে আমাদের উভয় দলের কিছু দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য ছিল। আমরা মুক্ত এলাকা গড়ে তুলে সেখানে প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক নীতি গ্রহণ ও কার্যকর করার মাধ্যমে ভবিষ্যত বাংলাদেশের মডেল জনগণের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতাম এবং ঐ রকম রণকৌশল গ্রহণের কথা বলতাম। আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামকে কেবল সাধারণ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোন থেকে দেখতাম না। মেহনতী মানুষ শোষণ ও নির্যাতনমুক্ত সুখী জীবন গড়ার আকাংখা থেকেই স্বাধীনতা চাইত। আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষের দৃঢ় ও শক্তিশালীরূপে সংগঠিত হয়ে ওঠার লক্ষ্য সামনে রেখেছিলাম। মুক্তাঞ্চল গড়ে তুলে প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ কিছু নিতে পারলে সারা দেশের মেহনতী জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে আরও উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা নিয়ে এগিয়ে আসতো। আমরা জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজস্ব শক্তির ওপর নির্ভর করার ওপর জোর দিতাম। এই সকল বিষয়ে আওয়ামী লীগের স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

আওয়ামী লীগের একাংশের তরুণদের দ্বারা 'মুজিব বাহিনী' নামে একটি পৃথক বাহিনী গঠিত হবার পর তাদের সঙ্গে এবং বিশেষ করে আমাদের সমর্থক গেরিলাদের দেশের ভেতরে প্রেরণের প্রশ্নে সরকারের সঙ্গে আমাদের কিছু অসুবিধা দেখা দিত। এ সব সমস্যা সমাধানের জন্য পরে একটি কোঅর্ডিনেশন কমিটি গঠিত হয়েছিল।

তবে সার্বিকভাবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক বজায় ছিল।

কমিউনিস্টরা সব সময় তাদের আন্তর্জাতিক কর্তব্য হিসেবেই যে কোন জাতির ন্যায্য সংগ্রাম--জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তির সংগ্রামকে সমর্থন করে। এই নীতি থেকে বস্তুতঃ আমাদের প্রচেষ্টা ছাড়াই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের জাতীয় সংগ্রামের সমর্থনে এগিয়ে আসে এবং বাংলাদেশের পক্ষে ভারতে জনমত গঠনে প্রভূত সহায়তা করে। এ-জন্য তাঁরা নিজেরাই প্রচার গড়ে তোলে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, বিশেষতঃ পাক বাহিনীর নিষ্ঠুর নির্যাতন ও গণহত্যা এবং প্রায় এক কোটি ছিন্নমূল নরনারী ও শিশুর ভারতে আশ্রয় গ্রহণ ইত্যাদি ভারতের জনগণের মধ্যে বাংলাদেশের জনগণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে গভীর আবেগ সৃষ্টি করেছিল। তারা, বিশেষতঃ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে বাংলাদেশের শরণার্থী ও উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিতে যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা হাসিমুখে সহ্য করেছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই জনমতকে আরও বিস্তৃত ও সংহত করার জন্য অবদান রেখেছে। ভারতের বিরোধী দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে কিছু কিছু বিভ্রান্তি ও বিরুদ্ধ মত ছিল। কোন কোন প্রশ্নে কংগ্রেসেরও দোদুল্যমানতা ছিল। এক্ষেত্রে ভারতের অভ্যন্তরে একটি রাজনৈতিক লড়াই ছিল। এই লড়াইয়ে বাংলাদেশের পক্ষে সি পি আই-র সুস্পষ্ট ভূমিকা দ্বারা আমাদের সংগ্রাম লাভবান হয়েছে।

আগেই বলেছি যে, ২৫শে মার্চের আগেই আমরা ভ্রাতৃপ্রতীম পার্টিগুলোর কাছে আমাদের সম্ভাব্য স্বাধীনতা সংগ্রামের সহায়তার জন্য পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে চিঠি পাঠাই। এরপর ভারতে যাওয়ার পর মে মাসে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সদস্য ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে এক বৈঠকে বসে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের কোচিনে অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পাটির কংগ্রেসে আমাদের পার্টির একটি প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়েছিল এবং সেখানে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে বিস্তৃত জানানোর সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আগে থেকেই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছিল।

সকলেই জানেন যে রণক্ষেত্র থেকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের টেবিল পর্যন্ত সর্বত্র প্রতিবেশী ভারত ব্যতীত সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবির এবং আন্তর্জাতিক প্রগতি ও শান্তির শক্তিসমূহের সক্রিয় সমর্থন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের একটি অন্যতম প্রধান উপাদান। আমাদের পার্টি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও শান্তির

শক্তিসমূহের সমর্থন ও সাহায্য সমাবেশ করার কাজে উদ্যোগ নিয়েছিল। আমাদের পার্টিই উদ্যোগী হয়ে এপ্রিল মাসে বিশ্ব শান্তি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রমেশ চন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর সহায়তায় তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল বিদেশে পাঠায়। এই দলের সদস্য ছিলেন আওয়ামী লীগের আবদুস সামাদ আজাদ, ন্যাপের দেওয়ান মাহবুব আলী (ফেরার পথে দিল্লীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন) এবং কমিউনিস্ট পার্টির ডাঃ সারোয়ার আলী। এই "শান্তি প্রতিনিধিদল" ইওরোপের বিভিন্ন রাজধানী সফর করে প্রগতিশীল শক্তিসমূহের কাছে বাংলাদেশে ইয়াহিয়া বাহিনীর ভয়াবহ গণহত্যা এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয় তুলে ধরেন। এটাই ছিল বিদেশে বাংলাদেশের প্রথম প্রতিনিধিদল। তখন পর্যন্ত কোলকাতা ছাড়া বিদেশে কোথাও বাংলাদেশ সরকারের মিশন সংগঠিত হয়নি।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরুতে বিদেশে, এমনকি প্রগতিশীল মহলেও আমাদের সংগ্রাম সম্পর্কে নানারূপ প্রশ্ন বিদ্যমান ছিল। বিদেশে পাকিস্তানীদের মিথ্যা প্রচার খণ্ডন করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ১৯৭০ এর নির্বাচনে জনগণের রায়ের প্রকৃত তাৎপর্য এবং আমাদের সংগ্রাম যে "বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা" নয় ও জনগণের ব্যাপক সমর্থনপুষ্ট জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের ন্যায্য সংগ্রাম, একথাও বিদেশে প্রচারের প্রয়োজন ছিল। অন্য দেশের মুসলমানদের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে "মুসলিম দেশ পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য অন্য দেশের ষড়যন্ত্র" বলেও একটা বিভ্রান্তি ছিল। আমরা চিঠিপত্র ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে বিদেশে এইসব ভ্রান্তি মোচনের চেষ্টা করেছি। সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হবার কিছুকাল আগে হতেই আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে, আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল শক্তিসমূহ, বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সমর্থন ও সাহায্য ব্যতীত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও চীনের মাওবাদী নেতৃত্বের সমর্থনপুষ্ট বর্বর ইয়াহিয়া চক্রকে পরাভূত করা ও স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভ করা সম্ভব হবে না। তাই পার্টি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমর্থন ও সাহায্যের আবেদন জানিয়ে দুনিয়ার ভ্রাতৃপ্রতীম কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর কাছে বিশদ চিঠি পাঠানোর এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে দুনিয়ার সমস্ত প্রগতিশীল জনমত সমবেত করার জন্য ও অন্য সকল সম্ভাব্য পন্থার জন্য চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত মতে প্রথমে পাক বাহিনীর গণহত্যা শুরু হওয়ার আগে ১৪ই মার্চ এবং সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হওয়ার পরে মে মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ হতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিসহ দুনিয়ার প্রায় সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টির কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। আমাদের পার্টির সে চিঠি হতেই বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন ও দুনিয়ার বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি এবং তাদের মাধ্যমে জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও মুক্তি সমর্থন-

কারী শান্তি ও প্রগতির শক্তিসমূহ এবং গণতান্ত্রিক জনগণ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেয়েছিল। এটি বিশ্ব জনমত গড়ে ওঠায় ও আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্বের গণমাধ্যমে প্রচারে সহায়ক হয়েছিল।

কোচিনে অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির যে কংগ্রেসের কথা আগে বলেছি সেখানে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধিদল ২২টি ভ্রাতৃপ্রতীম কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে বিস্তৃত আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। তাছাড়া শান্তি আন্দোলন ও অন্যান্য প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সমর্থন পাবার চেষ্টা আমাদের পার্টি করেছে। আমরা বলতে পারি যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে দুনিয়ার সমাজতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহকে সমবেত করার ক্ষেত্রে আমাদের পার্টি যথোচিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল এবং এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে যথাসাধ্য অবদান রেখেছে। বিশ্ব জনমত গঠনের ক্ষেত্রে এবং তার কার্যকর ভুমিকা সংহত করার ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির অবদানই সবচেয়ে বেশি।

স্বাধীনতাযুদ্ধে শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত ছিল সমগ্র জাতির একতা এবং আরও সুনির্দিষ্টভাবে স্বাধীনতার সকল শক্তি বিশেষতঃ আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যবদ্ধ কর্মতৎপরতার প্রয়োজন ছিল। আমাদের পার্টি স্পষ্টভাবে এইসব রাজনৈতিক দল সমবায়ে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের আওয়াজ তুলেছিল এবং সে ফ্রন্ট গঠনে অবিরাম প্রচেষ্টা নিয়েছিল। বিশ্ব জনমত এবং ভারতের জনমতও বাংলাদেশের নিকট এরূপ জাতীয় ঐক্যের বহিঃপ্রকাশ দেখতে চাচ্ছিল। আওয়ামী লীগ এ-ধরণের জাতীয় ঐক্য গঠনের গুরুত্ব বিলম্বে উপলব্ধি করে। পাশাপাশি কয়েকটি মাওবাদী উপদল আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে তথাকথিত "বামপন্থী ফ্রন্টের" নামে এক বিভেদাত্মক আওয়াজ তুলেছিল। এই দুই মনোভাবের বিরুদ্ধেই আমাদের পার্টির ঐক্যের নীতি তথা জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের নীতি স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম দিকে কার্যকর হয় নি। যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুকাল পরে আওয়ামী লীগ ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ কংগ্রেসের প্রতিনিধি এবং ব্যক্তিগতভাবে মওলানা ভাসানীকে নিয়ে তদানীন্তন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের একটি "পরামর্শদাতা কমিটি" গঠিত হয়েছিল। এই কমিটিতে আমাদের পার্টির প্রতিনিধি ছিলাম আমি।

এই পরামর্শদাতা কমিটি গঠনের গুরুত্ব ছিল এই যে স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং কমিউনিস্ট পার্টিসহ সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তি যে একতাবদ্ধ সেটা প্রত্যক্ষভাবে দুনিয়ার সামনে প্রকাশ করা গিয়েছিল। বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে ঐ কমিটি দেশের ভেতরে জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের মনে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। ঐ কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশপ্রেমিক

শক্তির আরও সমঝোতা ও ঐক্য গড়ার ভিত্তিও সৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের পার্টি "পরামর্শদাতা কমিটি" গঠনকে স্বাগত জানিয়েছিল। তবে ঐ কমিটি তেমন কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেনি এবং ঐ ঐক্যের উচ্চতর কোন বিকাশও ঘটেনি। এ বিষয়ে প্রধানতঃ গুরুত্ব উপলব্ধিতে আওয়ামী লীগের দুর্বলতা ও অনুৎসাহ ছিল।

কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের সম্মিলিত একটি পৃথক গেরিলা বাহিনী গড়ে উঠেছিল। এই বাহিনী গঠন, ব্যবস্থাপনা, ভারত সরকারের সঙ্গে এ-বিষয়ে যোগাযোগ প্রভৃতির সামগ্রিক দায়িত্বে তখন ছিলেন আমাদের পার্টির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ। আমাদের গেরিলা টীম সকল জেলায় পাঠানো হয়েছিল। ঢাকার খোদ রাজধানী, নরসিংদি, রায়পুরা, কুমিল্লায়, নোয়াখালিতে, চট্টগ্রামে; রংপুরসহ উত্তরবঙ্গের কয়েকস্থানে আমাদের টীমগুলো গেরিলা অ্যাকশন করেছে এবং রণক্ষেত্রে আমাদের কমরেডরা প্রাণ দিয়েছেন। যারা ভারতে যাননি, সেই কমরেডরা দেশের ভেতরে থেকে যুদ্ধের সংগঠন গড়ে তুলছিলেন এবং এঁরাই ভারত থেকে আগত আমাদের গেরিলাদের অ্যাকশনে সাহায্য করেছেন। এখন বয়সের কারণে কোন সময় কোথায় কোথায় আমাদের টীম কিরূপ অ্যাকশন বা লড়াই করেছিল তা স্মৃতি থেকে আমার পক্ষে বিশদ বলা সম্ভব নয়। আমরা নিজেরা, এবং বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতায় সাধ্যমতো সারা দেশে যুদ্ধরত ছিলাম। যুদ্ধ ছাড়া সংবাদ বহন, রেকি করা প্রভৃতি যুদ্ধের সহায়ক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ আমাদের কমরেডরা করেছেন। কেবল নিচু পর্যায়ে নয়, উঁচু পর্যায়েও যুদ্ধের সংগঠনে আমাদের ভূমিকা ছিল। যেমন অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম বিমান বাহিনী গঠনে আমাদের পার্টির অবদান ছিল। ছোটখাট গেরিলা অ্যাকশন ছাড়া আমাদের গেরিলারা চট্টগ্রাম বন্দরে পাকিস্তানী জাহাজ ডুবিয়েছিল। কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে বেতিয়ারা নামক স্থানে আমাদের কমরেড আজাদ, মুনির প্রমুখ আমাদের গেরিলা বাহিনীর ৯ জন সদস্য পাক বাহিনীর সঙ্গে এক লড়াইয়ে নভেম্বর মাসের ১১ তারিখে নিহত হন।

মুক্তিযুদ্ধকালে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শহীদুল্লাহ কায়সার ঢাকায় আলবদর বাহিনীর হাতে নিহত হন।

মণি সিংহ
(বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির
কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি)
মার্চ, ১৯৮৪।

মনসুর আলী

অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বেই আমরা খুলনাতে একটা আন্দোলন গড়ে তুলি এবং ৩রা মার্চ সভা শেষ করে একটি মিছিল বের করি। এ মিছিলে পাক-বাহিনী গুলি চালায় এবং গুলিতে আজিজুল হক, খালেদসহ আরো কয়েকজন নিহত হয়। গুলির প্রতিবাদে ৫ই মার্চ মিছিল বের করি। পাক বাহিনী এ মিছিলেও গুলি চালায়। দু'জন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়। ৭ই মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর আমরা অসহযোগ আন্দোলন শুরু করি। প্রত্যহ সকাল ১০টায় খুলনা পার্কে আমরা জমায়েত হতাম এবং বৃহত্তর আন্দোলনের জন্যে প্রস্তুতি নিতাম। ১৪ই মার্চ তেরখাদায় একটি সভা করি এবং এখানে একটি হাসপাতাল স্থাপন করি। তাছাড়া এখানে গেরিলা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করি। খুলনার অন্যান্য থানায়ও ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়। থানার পুলিশরা এ সময় ট্রেনিং প্রদান করতো এভাবে প্রায় ১০০০০ মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং দিয়ে প্রস্তুত করা হয়।

২৮শে মার্চ থেকে ট্রেনিং প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে রূপসাঘাট, সেনের বাজার যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নেই। এখানে পাক সৈন্যদের সংগে গুলি বিনিময় হয়। ১লা এপ্রিল আমি তেরখাদায় চলে আসি। এসময় আমরা খুলনার সংগে যশোহরের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেই এবং লঞ্চ যোগাযোগ বন্ধ করি। ৬ই এপ্রিল সমস্ত ট্রেনিং ক্যাম্পের দায়িত্ব থানার ও. সি, সাহেবের কাছে প্রদান করে আমি ভারতের উদ্দেশে রওয়ানা হই। ৭ই এপ্রিল কলকাতায় অবস্থান করি এবং সেখানে আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে দেখা করি। ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগদান করি। ২৪শে এপ্রিল বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশক্রমে নিজ এলাকায় ফিরে আসি। এসময় পাক বাহিনী আমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে। ১৩ই মে প্রথমে পাক সেনারা তেরখাদা আক্রমণ করে। ৪ঠা আগষ্ট তেরখাদায় রাজাকার, পাঞ্জাবী পুলিশ ও পাক সেনাদের সংগে মুক্তিফৌজের যুদ্ধ হয়। প্রায় ৫৭ জন লোককে পাক-বাহিনী হত্যা করে। তবে ছাগল'দা, ছাছিয়াদহ, চরকুরিয়া, চুনখোলা প্রভৃতি ইউনিয়ন সমূহ যুদ্ধের সময় সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল।

৯ই আগষ্ট আমি শেষবারের মতো ভারতে চলে যাই। টেট্যা যুব ক্যাম্পের ২০০ জন যুবককে গেরিলা ট্রেনিং এর জন্যে চাকুলিয়া প্রেরণ করি। এসময় তেরখাদা থানার ভিতরে পত্তমাতে একটি নতুন থানা স্থাপন এবং নিরঞ্জন সেন নামক একজনকে ও, সি, নিয়োগ করি। ৩০০ জন গেরিলা সংগ্রহ করে তাদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এই গেরিলাদের নিয়ে মঙ্গলা বন্দর অভিযান করি এবং একটি ষ্টীমার নিমজ্জিত করা হয়। ডাকবাংলোতে শান্তি কমিটির মিটিং চলাকালে গ্রেনেড চার্জ করা হয়। পাওয়ার হাউজেও আমরা একটি অভিযান চালাই এবং পাক-সেনাদের একটি লঞ্চ ডুবিয়ে দেই। এ সমস্ত যুদ্ধ ছাড়াও ৭টি বৃহৎ গেরিলা

যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এসব যুদ্ধে পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেন সেলিমসহ ৫৫ জন পাকসেনা এবং প্রায় একশত রাজাকার ও আলবদর মারা যায়। ইদ্রিস ও কালু নামে দু'জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয় এবং রতন, মোহাম্মদ ও খোকাসহ ৭জন আহত হয়।

পাক-বাহিনী আমার এলাকায় অনেক ক্ষতিসাধন করে। ছাচিয়াদহ বাজারে ১৩২টি, তেরখাদায় ২০০টি সহ সম্পূর্ণ এলাকায় প্রায় ৩০০০ বাড়ীঘর তারা লুঠ করে এবং পুড়িয়ে দেয়। প্রায় ১৩০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়। এদের মধ্যে তেরখাদা কলেজের ছাত্রলীগের সভাপতি [illegible]জের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করতেন। ১৪ই আগষ্ট পাক-বাহিনী তাকে ধরে নিয়ে যায়। শোনা যায়, প্রথমে তাকে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলতে বলে। এতে তিনি রাজী না হওয়ায় তার বাম হাতে গুলি করা হয়। এতেও তিনি 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলতে রাজী না হওয়ায় তার ডান হাতে গুলি করা হয়। সবশেষে তাকে একেবারে হত্যা করা হয়।

আমার এলাকার বোরহান উদ্দিন, [illegible] উদ্দিন, আবুল হোসেন, শামসুল হক, শেখ সেকান্দর আলী, নুরুল হক, আবু [illegible], [illegible] কুমার প্রমুখ নেতারা স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষভাবে কাজ করেন।

ডাঃ মনসুর আলী
(সাবেক এম, পি, এ খুলনা)
১৬ অক্টোবর, ১৯৭২।

মমতাজ বেগম

২৫শে মার্চের রাত্রে আমি ঢাকার দীননাথ সেন রোডে ছিলাম। এখান থেকে ১লা এপ্রিল কুমিল্লায় যাত্রা করি। কয়েকদিন আমি কসবায় অবস্থান করি। এখানে অবস্থানকালে জনসাধারণকে স্বাধীনতার পক্ষে উৎসাহিত করি এবং আনসার ও স্থানীয় ছাত্রলীগের কর্মীদের নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করি। ইতিমধ্যে মেজর বাহার কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট হতে পালিয়ে প্রাক্তন সৈনিক, ই পি আর ও আনসার বাহিনীর সদস্যদের একত্রিত করে বাংলাদেশের জন্য একটি সৈন্যদল গঠনের চেষ্টা করেন। এসময় আমাদের কিছু সদস্য ভারত সরকারের সাথে যোগাযোগ করে। বাংলাদেশকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করার জন্য একটি সরকার গঠন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১০ এপ্রিল যখন সরকার গঠন করা হয় তখন সেখানে মহিলা সদস্যদের মধ্যে শুধু আমিই উপস্থিত ছিলাম। পরে সেই সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে মুজিবনগরে (কুষ্টিয়ার আম-

কাননে) শপথ গ্রহণ করে। ১২ই এপ্রিল ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া আমার সাথে যোগাযোগ করেন। তাঁর নেতৃত্বে আমার ছোট ভাই আজিজ, ফজলু, কুদ্দুস, কসবা ছাত্রলীগের সভাপতি কাইউম, দোদুল ও আরো কিছু সংখ্যক ছেলে ইলিয়টগঞ্জ পুল ও কোম্পানীগঞ্জ পুল ধ্বংশ করার পরিকল্পনা নেয়। উক্ত দলটি ইলিয়টগঞ্জ পুল ধ্বংশ করতে সক্ষম হয় কিন্তু কোম্পানীগঞ্জ পুল ধ্বংশ করা যায়নি। ১৩ই এপ্রিল মেজর খালেদ মোশাররফ আমার সাথে যোগাযোগ করেন। পরের দিন অতর্কিতভাবে পাক বাহিনী কসবা এসে পড়ে। আমরা আগরতলার দেবীপুরে চলে যাই।

আগরতলায় পূর্বে সংগঠিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গঠন করার কাজে সহায়তা করি। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে দেবীপুরে (আগরতলা) অবস্থানরত ক্যাপ্টেন গাফফার ও তাঁর বাহিনীর সহযোগিতায় শালদানদীর খাদ্য গুদাম থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য কয়েক হাজার বস্তা গম ও চাল সংগ্রহের ব্যাপারেও সক্রিয় ছিলাম। মুক্তিবাহিনী ও মুজিব বাহিনীর যোদ্ধাদের সামরিক শিক্ষার জন্য এবং শিক্ষার্থী ... র দেশের অভ্যন্তরে করিয়ে খাদ্য ... ও চিকিৎসার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করে দিতেও সচেষ্ট ছিলাম। আমরা মহিলারাও মুক্তি সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার জন্য ... করি। তাই "মহিলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী" নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ... এই সংগঠনের সভানেত্রী ও ফরিদা মহিউদ্দিন সেক্রেটারী মনোনীত হন। এখানে মেয়েদের নার্সিং শেখার ব্যবস্থা করা হয়। আমরা বিভিন্ন ক্যাম্পে ত্রাণ কার্যাও পরিচালনা করি।

চৌদ্দগ্রাম থানা, কোতোয়ালীর বৃহৎ অংশ, বুড়িচং, মুরাদনগরের অংশ বিশেষ, কসবা, আখাউড়া, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট মুক্তিবাহিনীর লক্ষ্যস্থল ও পাক-বাহিনীর দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। সে সময় ঘরবাড়ী, মানুষ, রাস্তাঘাট ও যানবাহনের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। কসবা, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লালমাই ও লাকসামে বেশ কয়েকটি গণ কবর রচিত হয়। প্রতিরোধ যুদ্ধের মধ্যে কুমিল্লা পুলিশ লাইনের পুলিশ বাহিনীর কথা উল্লেখ করা যায়। রামমালার আনসার বাহিনীও প্রতিরোধ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে। লালমাই স্টেশনের সন্নিকটে কিছু সংখ্যক ই, পি, আর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছু লোক প্রায় ৫ দিন পর্যন্ত প্রতিরোধ যুদ্ধ করে। কসবা ও শালদা নদীতে ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী বেশ কিছুদিন প্রতিরোধ যুদ্ধ করে। লাকসাম, চৌদ্দগ্রাম, বুড়িচং, কসবা ও আখাউড়ায় সর্বাধিক নারী নির্যাতন হয়। আমার কসবাস্থ বাসস্থান বোমাবর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে পাক-সামরিক জান্তা বিনষ্ট করে।

যুদ্ধচলাকালীন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে বন্ধুরাষ্ট্র ভারতে যাওয়ার সময় কর্ণেল এম, এ, জি ওসমানী আমাদের কসবাস্থ বাসভবনে দুদিন অবস্থান করেন। প্রথম দিকে অবশ্য তাঁকে

আমরা চিনতে পারিনি। কেননা তিনি পরিচয় গোপন রেখেছিলেন এবং তাঁর সুপরিচিত গোঁফ ছিল না। পরে তাঁকে চিনতে পারি এবং ভারতে যাবার ব্যাপারে সহায়তা করি। পথে এক জায়গায় পাঞ্জাবী মনে করে তাঁকে কয়েকজন বাঙ্গালী মারতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু আমার এক আত্মীয়ের সনাক্তকরণের ফলে তাঁকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।

মমতাজ বেগম
গণপরিষদ সদস্যা
(সাবেক এম, এন, এ, মহিলা আসন—৬)
৩০ জুন, ১৯৭৩।

মোশাররফ হোসেন

অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতেই আমি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও এক্সপ্লোসিভ যোগাড় করতে থাকি। ২৪শে মার্চ কর্ণফুলি নদীতে অবস্থানরত ''সোয়াত', জাহাজ হতে সেল নিক্ষেপ করা হয়। ক্যান্টনমেন্ট হতে বাংগালী সৈন্যের একটি দল ক্যাপ্টেন রফিকের অধীনে কুমিরার দিকে যাত্রা করে। ২৫শে মার্চ রাত্রিতে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে গোলাগুলি বিনিময় হয়।

ইতিমধ্যে আমি ও আমার সংগীরা শুভপুর ব্রীজটির আংশিকভাবে ক্ষতি সাধন করি। অন্যদিকে চট্টগ্রামের দিকে আসার সময় লোকদিগকে রাস্তায় গাছপালা, ইটপাটকেল ইত্যাদি দিয়ে নানাভাবে প্রতিরোধ সৃষ্টির জন্য পরামর্শ দেই। ২৬ তারিখে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসরমান পাক সেনাদের সংগে কুমিরায় ক্যাপ্টেন রফিকের দলের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঐ যুদ্ধে একজন ক্যাপ্টেন সহ অনেক পাকিস্তানী সৈন্য মারা যায়। পরে মেজর জিয়াউর রহমানের অধীনে আর এক দল বাংগালী সৈন্য কালুরঘাটের দিকে যাত্রা করে।

এদিকে সমস্ত চট্টগ্রাম আমাদের অধীনে চলে আসে। হান্নান সাহেব সহ আমি অনতিবিলম্বে কালুরঘাটস্থ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে উপস্থিত হই এবং আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করি। হান্নান সাহেবই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম বক্তা এবং তিনি বেলা দেড় ঘটিকার সময় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

২৬ তারিখ রাত্রে 'সোয়াত' জাহাজ হতে সমগ্র চট্টগ্রাম শহরে অবিরাম গুলি বর্ষিত হয়। আমরা চট্টগ্রাম শহরে ক্যান্টনমেন্টের ঘেরাওকৃত বাঙ্গালী

সৈন্যদিগকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করার প্রচেস্টা চালাই। তখন সমস্ত যুদ্ধ ব্যবস্থা মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীনে চলতে থাকে। ২৯শে মার্চ তিনি শেখ মুজিবর রহমানকে "Head of the State" এবং নিজেকে "Supreme Commander of the Bengali Armed Forces" হিসেবে ঘোষণা করে যুদ্ধ পরিচালনা করতে লাগলেন। কিন্তু এপ্রিল মাসের তৃতীয় দিনের মধ্যে চট্টগ্রাম শহরের কিছু কিছু অংশ ব্যতীত সবটুকুই পাক সেনাদের অধীনে চলে যায়। আমরা তখন কালুর ঘাট ছেড়ে রামগড়ে চলে যাই। আমাদের অবস্থান আরও দৃঢ় করার জন্য এখানে একটি কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়। চট্টগ্রাম শহর দখল করেই পাক-সেনারা চট্টগ্রামের আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে। ৭ই এপ্রিল কালুরঘাটের পতন হয়।

ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডে তখন ক্যাপ্টেন শমসের মবিনের নেতৃত্বাধীনে যুদ্ধ চলছিল। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামেও বাঙ্গালী ও পাক-সেনাদের মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকে। সীতাকুণ্ডে পাক-বাহিনীর সংগে একটি যুদ্ধ হওয়ার পর ক্যাপ্টেন মবিনের সৈন্য-বাহিনী ঢাকি আস্তানায় চলে আসে। বাঙ্গালী সৈন্যবাহিনী এরপর মীরেশ্বরাই ব্রীজের ক্ষতি সাধনের জন্য এখানে সমবেত হয়। এপ্রিলের প্রথমদিকে আমাদের সৈন্যবাহিনী এক সপ্তাহ যাবৎ পাক হানাদারদের মোকাবেলা করেছিল। ১৭ তারিখে ব্রীজ হতে কিছু দূরে বাঙ্গালী ও পাক-বাহিনীর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। দুটি কনভয় সহ প্রায় ৪০০ জন পাক-সৈন্য ধ্বংশ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বাঙ্গালী সৈন্যরা বেলা দুটোর মধ্যে পিছু হটতে বাধ্য হয়। একজন বাঙ্গালী সুবেদার মৃত্যুবরণ করেন এবং দুজন সেপাই আহত হন।

ঐদিন রাত্রেই আমরা মীরেশ্বরাই থেকে সামান্য উত্তরে মোস্তান নগরে ওঁৎ পেতে থাকি। ১৮ তারিখে পাক-সেনাদের সাথে একটি খণ্ড যুদ্ধ হয়। এতে প্রায় ৩০/৪০ জনের মত পাক সৈন্য নিহত হয়। ১৮ তারিখ সন্ধ্যায় ঐ স্থান ছেড়ে বাঙ্গালী সৈন্যরা করের হাট চলে আসে এবং হিংগুলি ব্রীজটির ধ্বংশ সাধন করে। মোস্তান নগর যুদ্ধের পর পাক-সেনারা আর বেশী অগ্রসর হতে পারেনি। তারপর আমাদের সৈন্যরা রামগড় রাস্তার ওপর তুলাতলি ব্রীজটি উড়িয়ে দেয়। এদিকে শুভপুর, তুলাতলি, খাগড়াছড়ি ও ফটিকছড়ি প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধ চলছিল এবং ক্রমান্বয়ে পাক সেনারা রামগড় ঘিরে ফেলে। ৪ঠা মে রামগড়ের পতন হয়। আমরা সীমান্ত পেরিয়ে সাব্রুমে চলে যাই। পরে হরিনাতে গিয়ে একটি Army Camp ও পাশাপাশি 'youth Camp' গঠন করি। উক্ত ক্যাম্পে যুবকদের সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। প্রশিক্ষণ নেয়ার পর তারা বিভিন্ন গেরিলা দলে বিভক্ত হয়ে অপারেশনে চলে যায়। অন্যদিকে সেপ্টেম্বর মাসে বিহারের চাকুরিয়া ট্রেনিং সেন্টারেও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। অক্টোবরের ১৫ তারিখ হতে নভেম্বরের ২০ তারিখ পর্যন্ত মীরেশ্বরাই

সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম শহর পর্যন্ত স্পেশাল কমাণ্ডো গ্রুপ নিয়ে অপারেশনে লিপ্ত ছিলাম। বাকী সময়টুকু হরিনা সেক্টর নং ১, হেড কোয়ার্টারে ছিলাম।

মীরেশ্বরাই থানার করের হাট ও হিংগুলি ইউনিয়ন সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এখানে পাক সেনাদের হেড কোয়ার্টার ছিল। ঐ স্থানগুলি সীমান্তের কাছেই ছিল। প্রতিরোধ যুদ্ধের কেন্দ্র হিসেবে এখানে বহু হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংশযজ্ঞ সংঘটিত হয়। মীরেশ্বরাই থানার 'Wireless Station' এর পাশে সবচেয়ে বেশী হত্যা-কাণ্ড সংঘঠিত হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে ধৃত লোকদিগকে এখানে আনা হত এবং বিভিন্ন পৈশাচিক কায়দায় হত্যা করা হত। এখানে আজহারুস্ সোবহান নামে একব্যক্তি জবাই করত এবং প্রতি জবাইতে পাঁচটি করে সিকে পয়সা পেত। আনুমানিক ৫০০ জন লোকে হত্যা করা হয়েছিল। ওসমানপুর ইউনিয়নে একসাথে ৫ জন লোককে গুলি করে হত্যা করা হয়। হিংগুলি ইউনিয়নেও একসাথে ১০ জনকে হত্যা করা হয়।

মাতবরহাটে আমাদের প্রতিরক্ষা যুদ্ধের হেড কোয়াটার ছিল। ইছাখলি ইউনিয়ন, কাটাছোড়া, ওসমানপুর মিঠানালা ও বগাদিয়া প্রভৃতি ইউনিয়নে আমাদের অবস্থান দৃঢ় ছিল। এসমস্ত স্থান হতে আমরা গেরিলা যুদ্ধ চালাতাম।

মিয়াজান ঘাটের যুদ্ধ (জুন/জুলাই)

ওসমানপুর ইউনিয়নের মিয়াজান ঘাটে ১৮ ঘন্টা ধরে এক যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে পাকিস্তানের একজন মেজর ও তিনজন সেপাই প্রাণ হারায়। মাত্র ১৫০ জন সৈন্য নিয়ে শেষ অবধি তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

দারোগা বাজারের যুদ্ধ (এপ্রিল/মে)

কাঁটাছোড়া ইউনিয়নের দারোগা বাজার হতে কিছু দূরে মাইন ফুটিয়ে মুক্তি-বাহিনী পাক-বাহিনীর একটি গাড়ী উড়িয়ে দেয়। মাইন ফাটলে প্রায় ৬ জন পাক-বাহিনীর লোক মারা যায়। এর পর এখানে প্রায় ৬ ঘন্টা ধরে যুদ্ধ হয়। পরে ওরা পিছু হটতে শুরু করে এবং পালায়ন করার সময় কয়েক জন লোককে হত্যা করে। তাদের মধ্যে হাজী দুলাল মিস্ত্রী অন্যতম।

মিঠানালা কম্যুনিটি সেন্টার, দুর্গাপুর হাইস্কুল ও আবু তোরাব হাইস্কুলে অবস্থানরত রাজাকার ও পাক-বাহিনীর সৈন্যদিগকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ চালিয়ে উৎখাত করা হয়। এসমস্ত অভিযানে আমাদের কিছু মুক্তিবাহিনীর লোকও মারা যায়। দুর্গাপুর হাইস্কুল অভিযানে ফরিদ আহমেদ নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। পাক-সেনাদের একটি বাংকারে গ্রেনেড ছোঁড়ার সময় হঠাৎ প্রতিপক্ষের একটি বুলেট তাঁর বুকে বিদ্ধ হয়।

হাদি ফকির হাটের যুদ্ধ (নভেম্বর)

শাহ আলমের অধীনে এক প্লাটুন মুক্তিবাহিনী একটি রাজাকার দলকে আক্রমণ করলে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রচণ্ড আক্রমণে ৭ জন রাজাকার মারা যায়। পরে রাজাকারদের সাহায্যার্থে পাক-বাহিনী চলে আসে। পাক-সৈন্য আসলে ওদের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং মুক্তি-বাহিনীর দল ছত্রভংগ হয়ে পড়ে। শাহ্ আলম এক ধান ক্ষেতে আত্মগোপন করে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। কিন্তু পাক-বাহিনী শেষ অবধি তাকে ঘিরে ফেলে হত্যা করে। এ যুদ্ধে পাকিস্তানের কয়েকজন সৈন্য আহত হয়।

বাংলা বাজারের (পাকিস্তান বাজার) যুদ্ধ (মে/জুন)

জনাব মুস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা বাংলা বাজারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা পাক-বাহিনীর দলটিকে অতর্কিতে আক্রমণ করে এবং ১০ জনকে হত্যা করে। যুদ্ধ চলাকালে মুস্তাফিজুর রহমান বুলেট-বিদ্ধ হন।

তেতুইয়া, তেমোহনী ও আবুর হাটের যুদ্ধ (অক্টোবর)

পাক-বাহিনী উপরোক্ত মুক্তিবাহিনীর গেরিলা সেন্টার আক্রমণ করে। এ যুদ্ধ প্রায় দুদিন স্থায়ী হয়। মুক্তিবাহিনীর প্রধান যুদ্ধকেন্দ্র মাতার হাট পর্যন্ত আক্রান্ত হয়। প্রধান গেরিলা সেন্টার ছেড়ে মুক্তি যোদ্ধাদেরকে বঙ্গোপ-সাগর পর্যন্ত পিছু হটে যেতে হয়েছিল। পরে প্রবল আক্রমণের মুখে পাকিস্তান বাহিনী মাতার হাট ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। যুদ্ধে উভয়পক্ষের বেশ কিছু লোক আহত ও নিহত হয়।

আবুর হাটে একজন সাধারণ পানের দোকান দেশ স্বাধীন করার এক অদম্য ইচ্ছার নজির স্থাপন করেছেন। পাক-বাহিনী বাংলাদেশে হানা দেয়ার প্রথম-দিকে আবুর হাটের দিকে আসতে শুরু করলে লোকজন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে আরম্ভ করে। কিন্তু উক্ত দোকানদার তফাজ্জল হোসেন পাক-সেনাদের সম্মুখে গিয়ে কয়েকটি গ্রেনেড ছুঁড়ে মারে। গ্রেনেড লক্ষ্য বস্তুতে না পড়লেও কয়েকজন পাক-সৈন্য আহত হয়।

২৬শে মার্চ পাক-বাহিনী যখন চট্টগ্রামের দিকে আসছিল তখন তারা রাস্তার দু'পাশের বাড়ী ঘরে আগুন ধরিয়ে দে য়। বড় তাকিয়া বাজারে উপস্থিত হয়ে পাক-বাহিনী লুঠ ও অগ্নি সংযোগ করে। এ সময় এক সাহসী যুবক দা ও লাঠি নিয়ে একজন পাক-সেনাকে আক্রমণ করে। তার পর পাক-সেনারা তাকে ধরে ফেলে এবং হত্যা করে।

চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসরমান পাক-বাহিনী সীতাকুণ্ডে পৌঁছেই লোহাগাড়া গ্রামে ঢুকে পড়ে। ১০/১২ জন পাক সৈন্য একটা মেয়েকে ধরে আনে এবং একটা

পুকুর পাড়ে এনে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে। মেয়েটি কয়েকদিন মাত্র জীবিত ছিল, তারপর সে মারা যায়।

মোশাররফ হোসেন
গণপরিষদ সদস্য
(সাবেক এম, পি, এ, চট্টগ্রাম)
১২ জুন, ১৯৭৩।

মোহাম্মদ আজিজুর রহমান

২৪শে মার্চ আমি ঠাকুরগাঁ ও দিনাজপুরের ই, পি, আর বাহিনীর কয়েকজন সুবেদার ও হাবিলদারের সঙ্গে গোপনে আলাপ করি এবং তাদের উপদেশ দেই পাক অফিসাররা তাদের অস্ত্র জমা দিতে বললে তারা যেন তা না করেন। তাদের আরো উপদেশ দেই এরকম পরিস্থিতি দেখা দিলে তারা যেনো অস্ত্রাগার দখল করে নেন। তারা এতে রাজী হন। দিনাজপুর ই, পি, আর বাহিনীর একজন সুবেদার যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বেই অস্ত্রাগার লুন্ঠন এবং পাকসৈন্যদের হত্যার জন্যে আমার এবং জেলা আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী অধ্যাপক ইউসুফ আলীর কাছে অনুমতি চান। কিন্তু আমরা তাঁর এ প্রস্তাবে রাজী হইনি। ২৫শে মার্চ রাত প্রায় ১২টা পর্যন্ত স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গ এবং অবাঙ্গালী বিহারীদের মধ্যে মিটিং হয়। এই মিটিংএ বিহারীরা শান্তিরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং বিহারী-বাঙ্গালী ভাই ভাই প্রভৃতি শ্লোগান দেয়। ২৫শে মার্চের মধ্যরাতেই আমরা গুলির শব্দ শুনতে পাই। চারদিক থেকে 'জয়বাংলা'র শ্লোগানও কানে ভেসে আসে। ভোর পর্যন্ত এরকম ধ্বনি শুনতে পাই। ২৬শে মার্চ সকালে ফজরের নামাজান্তে আমার বাসার সামনে একটা হালকা কামান বসানো দেখতে পাই। পাঞ্জাবী সামরিক কর্মকর্তা আমাদের ডেকে নিয়ে যান এবং তাদের কথা মতো কাজ করতে চাপ দেন। তারা আমাদের স্পষ্ট জানিয়ে দেন তাদের কথা না শুনলে যে কোন দণ্ড তারা দিতে পারেন। এখান থেকে বাসায় না ফিরে আওয়ামী লীগের এক নেতার বাসায় চলে যাই। ইতিমধ্যে শহরে কারফিউ জারী হয়ে গেছে। ২৭শে মার্চ সকালে দু'ঘণ্টার জন্যে কারফিউ তুলে নেয়া হয়। এ সুযোগে আমি বেরিয়ে পড়ি এবং ই, পি, আর বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি। সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থির হয় দিনাজপুর ই, পি, আর ৮ম বাহিনীর বাঙ্গালীদের দায়িত্বে থাকবেন ক্যাপ্টেন নজরুল হক এবং ৯ম বাহিনীর দায়িত্বে থাকবেন সুবেদার মেজর আব্দুর রউফ। আর আমি বেসামরিক বিষয়ক উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করবো।

ঐ দিন পাক-বাহিনী আমাকে অনেক খোঁজাখুজি করে। আমি কাঞ্চন নদী পেরিয়ে গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় নেই। ২৮শে মার্চ আমি এখান থেকে ঠাকুরগাঁয়ের ই, পি, আর বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে রওয়ানা হই। ২৯শে মার্চ ঠাকুরগাঁ পৌছি। সেখানেও গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাই। এখানে সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দিন এবং ঠাকুরগাঁ আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে একত্রে কাজ চালিয়ে যাই। সুগার মিলের জীপ নিয়ে দিনাজপুর ৯নং ই, পি, আর বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে ২৯ তারিখেই রওয়ানা হই। ৩০শে মার্চ দিনাজপুরের কাঞ্চন নদীর ঘাটে আমাদের মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটিতে পৌছি। ঐদিনই দিনাজপুর ই, পি, আর ঘাঁটির সব অস্ত্র আমরা লাভ করি। এসব অস্ত্রপাতি আমরা স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্র এবং মুজাহিদদের সহায়তায় কাঞ্চন নদীর পশ্চিমে এক গ্রামে রেখে দিই। এখানে রফিক সাহেব, ফয়েজ সাহেব, নাজিম ভূঁইয়া, জজ, আব্দুল হান্নান চৌধুরী এবং ক্যাপ্টেন নজরুল হকের সঙ্গে দেখা হয়। ভারতীয় বন্ধুগণ এখানে আমাদের রসদ সরবরাহ করতো।

৩:শে মার্চ ঠাকুরগাঁ ঘাঁটি আমাদের দখলে আসে। রাত দশটায় আমরা অস্ত্রাগারের অস্ত্র নিজেদের অধিকারে আনি। ঠাকুরগাঁ আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আবুবকর খানও এই সময় আমাদের সঙ্গে ছিলেন। যুদ্ধের শেষের দিকে তিনি শহীদ হন। ঐ রাতেই ঠাকুরগাঁ থেকে একটু দূরে আমাদের ঘাঁটি ও ট্রেঞ্চ বসাই। এসময় স্থানীয় গ্রামবাসী আমাদের সর্বাত্মক সহায়তা করে। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কাজ করে। এসময় ভারতীয় সীমান্ত থেকে কিছু অস্ত্র এবং অয়ারলেস সংগ্রহ করি। আমি ঠাকুরগাঁ ও পঞ্চগড় এলাকার দায়িত্ব পালন করি। রেল লাইন অচল করে দেই এবং প্রাক্তন উইং কমাণ্ডার জনাব মির্জার সঙ্গে পরামর্শ করে শিবগঞ্জ বিমান ঘাঁটি নষ্ট করে দেই। ক্যাপ্টেন নজরুলের দেয়া অস্ত্রসহ আমরা এলাকাব্যাপী মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ ও সংগঠনে তৎপর হই।

২রা এপ্রিল সীমান্ত পার হয়ে অস্ত্রের জন্য ভারতে যাই। সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য সুবেদার কাজিম উদ্দিনকে পাঠিয়ে আমি ঐ তারিখে গভীর রাতে আবার দেশে ফিরে আসি। ৩রা মার্চ দিনাজপুরে আমাদের যুদ্ধঘাঁটি পরিদর্শন করি। ঐদিনই দিনাজপুরের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন আশরাফকে ঠাকুরগাঁয়ে ডেকে পাঠাই এবং মিটিং করে সৈয়দপুর ঘাঁটি আক্রমণের পরিকল্পনা নেই। ৫ই এপ্রিল আমি সেতাবগঞ্জ ও পীরগঞ্জ ঘাঁটি অভিমুখে রওয়ানা হই। ৬ই এপ্রিল রাতে ভারতে যাই এবং কংগ্রেস নেতা বাবু আর, দত্ত এম, এন, এ এর সঙ্গে আলাপ করি। অধ্যাপক ইউসুফ আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামারুজ্জামান, মিজানুর রহমান, মনসুর আলী প্রমুখ নেতৃবর্গের সঙ্গেও সেখানে সাক্ষাৎ হয়।

১৮ই এপ্রিল দিনাজপুরের রায়গঞ্জে ফিরি এবং দিনাজপুর শহর উপকণ্ঠে প্রবেশের চেষ্টা করি। কিন্তু সে সময় পাক বাহিনী দিনাজপুরে প্রবেশ করে প্রবল গুলিবর্ষণ করে। রাত্রে ক্যাপ্টেন নজরুল হক, সুবেদার মেজর রউফ, ওসমান গণী সাহেবের সঙ্গে ভারত সীমান্তে সাক্ষাৎ হয়। এসময় রাধিকাপুর স্টেশনে ভারতগামী হাজার হাজার শরণার্থী দেখতে পাই। এখান থেকে বি এস এফ ক্যাম্পে চলে যাই এবং সেখানে অবস্থান করি। ১৯শে এপ্রিল মুক্তিবাহিনীসহ পাক-বাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণ করি। যুদ্ধে আমরা জয়ী হই এবং প্রচুর খাদ্যদ্রব্য উদ্ধার করি। শরণার্থী ক্যাম্পের যুবকদের নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করি। আমার সঙ্গে এসময় দিনাজপুরের জজ, ডাঃ নইম উদ্দিন, ছাত্র নেতা আজিজুল ইসলামও ছিলেন। মুজিবনগর সরকার এবং ভারতীয় বাহিনী আমাদের এব্যাপারে সহায়তা করেন। এসময় বাংলাদেশ সীমান্তে এম, এন, এ, এম পি এ-দের এক সম্মেলন হয়। আমাকে মুক্তিবাহিনীর ৬নং সেক্টরের বেসামরিক উপদেষ্টার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। অক্টোবর মাস পর্যন্ত আমি এ দায়িত্ব পালন করি। জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ যুব শিবির, ইসলামপুর, গংগারামপুর, হামজাপুর, বালুঘাট প্রভৃতি যুবশিবির পরিদর্শন করে যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রাণিত করি এবং উৎসাহ দেই। ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করি। যুবশিবিরে যুবকদের গেরিলা ট্রেনিং দিয়ে তাদের বাছাই করে যুদ্ধের জন্যে বাংলাদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করি। শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করে তাদের অবস্থা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করি। পশ্চিম বাংলার প্রধানমন্ত্রী বাবু সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করি।

৫ই ডিসেম্বর আমি ভারত থেকে মিত্রবাহিনীর সঙ্গে ঠাকুরগাঁও-এ প্রবেশ করি। এখানে বেশ কয়েকদিন ব্যস্ততার মধ্যে কাটে। ইতিমধ্যে ১৬ই ডিসেম্বর আমরা দিনাজপুরে স্বাধীনতা উৎসব পালন করি।

১৯৭১ সালের যুদ্ধের নয় মাস আমাদের দিনাজপুর জেলায় পাক-বাহিনী অসংখ্য নারী নির্যাতন, ধ্বংসযজ্ঞ, ও গণহত্যা চালায়। ১৩ই এপ্রিল পাক-বাহিনী দিনাজপুর শহর পুনর্দখলকালে অমানুষিক অত্যাচার চালায়। দিনাজপুর শহরের টেলিফোন ভবনে অনেক লোককে পাক-সেনারা হত্যা করে। পীরগঞ্জে, সেতাবগঞ্জ সুগার মিলে হাজার হাজার লোককে হত্যা করা হয়। পীরগঞ্জের ডাঃ সুজাউদ্দিন, আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান ও একজন অধ্যাপককে পাক-সেনারা নির্মমভাবে হত্যা করে। সেতাবগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা ডাঃ তমিজউদ্দিন চৌধুরী, মুনিরউদ্দিন, দিনাজপুর ডিগ্রি কলেজের অধ্যাপক শাহ সুলেমান তৈয়ব পাকসেনাদের গুলিতে শহীদ হন। ঠাকুরগাঁও খানকা শরিফের পীরসাহেবের কনিষ্ঠ পুত্রকেও তারা হত্যা করে। ঠাকুরগাঁও সুগার মিলে আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আবু বকর খানকে দালালদের সহায়তায় নির্মমভাবে হত্যা করা

হয়। পাক-সেনারা পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া ও বালিয়াডাংগীতেও অকথ্য অত্যাচার এবং হত্যাকাণ্ড চালায়।

মোহাম্মদ আজিজুর রহমান
গণপরিষদ সদস্য (সাবেক এম, এন, এ)
দিনাজপুর
২৭ অক্টোবর, ১৯৭২।

মোহাম্মদ আজিজুর রহমান

স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব থেকেই আমরা সিলেটে গণ আন্দোলন গড়ে তুলি। মূলতঃ ১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে আমরা বহুমুখী কর্মসূচী ও আন্দোলনের মাধ্যমে পাক স্বৈরাচার সরকারের বিরোধিতা করি এবং বৃহৎ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকি। ২রা মার্চ পথসভা ও মশাল মিছিল, ৩রা মার্চ হরতাল, ৪ঠা মার্চ মশাল মিছিল, ৫ই ও ৬ই মার্চ হরতাল, ১০ই মার্চ গণসমাবেশ ও জঙ্গী মিছিল বের করি। ১১ই মার্চ আমাকে আহবায়ক করে মৌলভী বাজার মহকুমাতে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। ১২ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত আন্দোলন, জনসভা, মিছিল ও কর্মীসভা আরো প্রবলভাবে চলতে থাকে। ২৫শে মার্চ বিকেল ৩ টায় শ্রীমঙ্গল থানার ভৈরববাজার স্কুল মাঠে শ্রমিক সমাবেশে আমি ভাষণ দেই এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার জন্য শ্রমিকদের আহ্বান জানাই। প্রায় দু' হাজার শ্রমিক লাঠি, তীর, ধনুক সহ উক্ত জনসভায় উপস্থিত ছিল এবং তারা সবাই লাঠি উঁচু করে শত্রুদের প্রতিরোধের শপথ নেয়। সভাশেষে শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সংগে দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয় এবং যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর পর রাত ১১টায় আমি মৌলভীবাজার নিজ বাড়ীতে চলে যাই।

২৬শে মার্চ ভোর ৪টায় তৎকালীন অবাঙ্গালী এস, ডি, ও এবং এস, ডি, পি, ও আমার বাড়ীতে আসেন এবং থানায় নিয়ে যান। থানা থেকে আমাকে ব্যোমকেশ ঘোষ বাবুর বাড়ীতে নিয়ে যায় এবং তাকে সংগে করে আমাদের টুরিষ্ট রেষ্ট হাউজে বন্দী করে রাখে। এখানে অবাঙ্গালী ও খানসেনারা আমাদের ওপর বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার চালায়। ২৭শে মার্চ আমাকে ছেড়ে দিলে আমি আমার বাসায় চলে আসি। ঐ দিন বিকেলে কার্ফু ভঙ্গ করে হাজার হাজার জনতা মৌলভীবাজারের দিকে আসতে থাকি। পাক বাহিনী জনতাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। কার্ফু ভঙ্গের মিছিলে রোদন মিয়া, ছাওমনা ঠাকুর, তারা মিয়া ও অজ্ঞাতনামা ৫জন শ্রমিক শহীদ হন এবং বহু লোককে গ্রেফতার

করা হয়। ২৭ তারিখ রাতেই জনৈক পাক ক্যাপ্টেন আবার আমাকে গ্রেফতার করে রেস্ট হাউজে নিয়ে যায় এবং লাঠি ও রাইফেলের বাট দিয়ে বেদম প্রহার করে। বহু নিরীহ বাঙ্গালীকে কার্ফুভঙ্গের দায়ে গ্রেফতার করে খান সেনারা অমানুষিক নির্যাতন করে। রাতে পাক বাহিনীর অত্যাচারের শিকার বাঙ্গালীদের চিৎকার শুনতে পেয়েছি। সৈনারা রাত এগারটায় ব্যোমকেশ বাবু, গিয়াসনগর চা বাগানের ম্যানেজার এবং আমাকে সিলেট সার্কিট হাউজে বন্দী করে রাখে।

২৮শে মার্চ সকালে কর্ণেল সরফরাজ আমাকে ইণ্টারগেশন করেন। আওয়ামী লীগের কর্মীদের কে কোথায় আছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে আমার সমর্থন আছে কিনা এসব প্রশ্ন করে। আমি কর্নেলের প্রশ্নের কোন উত্তর না দেয়ায় আমাকে ভিতরের এক কক্ষে নিয়ে গিয়ে ৩ জন খান সেনা একযোগে ভীষণ প্রহার করে। তাদের প্রহারে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। জ্ঞান ফিরে আসলে আমাকে পুনরায় কর্নেলের সম্মুখে হাজির করা হয় এবং স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়ার জন্য চাপ দেয়। আমি তার প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় আমাকে থানায় পাঠিয়ে দেয়। ২৯শে মার্চ বেলা ১টায় আমাকে সিলেট সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়। ৫ই এপ্রিল জেলের ভিতর থেকেই সিলেট শহরের চার-দিকে গুলির শব্দ শুনতে পাই এবং দুপুরের পর কম করে হলেও তিনবার সিলেট শহরের ওপর বিমান হামলা চলে। ব্রাশের সেলের একটা টুকরা আমাদের কক্ষে এসে পড়ে। ৬ই এপ্রিল জেলের পূর্ব-উত্তর দিক থেকে মুক্তিযোদ্ধা এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে পাক বাহিনীর মধ্যে তুমুল লড়াই চলে। ঐ দিন প্রায় ৮ বার পাক-বিমান মুক্তি ফৌজের ওপর হামলা করে। ঐ দিন জেলের সাধারণ কর্মীরা বিমান হামলার ভয়ে বাইরে রাখার দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠে। কর্তৃ-পক্ষের সাথে কথাকাটাকাটি হলে গুলি ছোঁড়া হয়। আমাদের জেলের দিকে প্রায় ৫০ রাউণ্ড গুলি নিক্ষেপ করা হয়। সারা রাত ধরে গোলাগুলি চলতে থাকে। আমরা সৌভাগ্যক্রমে সেদিন রক্ষা পাই।

৭ই এপ্রিল সকালে খবর পাই মুক্তিবাহিনী শহরের বেশ কিছু অংশ মুক্ত করে নিয়েছে। ২ টার সময় দু'জন মুক্তিযোদ্ধা আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং ৫টায় সিলেটের সিরাজ সাহেব আমাদের মুক্ত করে নিয়ে আসেন। সন্ধা ৬-টায় মানিক চৌধুরী, এম এন এ, কর্ণেল রেজা ও মেজর দত্তের সংগে চাঁদনি ঘাটে মুক্তি বাহিনীর ক্যাম্প পরিদর্শন করি। ৮ থেকে ১০ই এপ্রিল ডাক্তারের পরামর্শে বিশ্রামে থাকার পর আমি মৌলভীবাজার আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হই। ১২ই এপ্রিল নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে সিলেট জেলা প্রশাসনিক কাউন্সিল গঠন করা হয়।

(১) দেওয়ান ফরিদ গাজী, এম, এন, এ, জেলা প্রশাসক।

(২) মোঃ ইলিয়াস, এম, এন, এ, মৌলভীবাজার মহকুমা প্রশাসক।

(৩) মোস্তফা আলী, এম, এন, এ, হবিগঞ্জ মহকুমা প্রশাসক।

(৪) মাসুদ চৌধুরী, এম, পি, এ, সিলেট সদর মহকুমা প্রশাসক।
(৫) জনাব আব্দুল হক, এম, এন, এ, সুনামগঞ্জ মহকুমা প্রসাশক।

উল্লেখ্য যে, মুজিবনগরে অস্থায়ী সরকার গঠনে প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে সিলেট থেকে কর্ণেল রব ও মানিক চৌধুরীকে ভারতে প্রেরণ করা হয়।

১২ই এপ্রিল থেকে ২৬শে এপ্রিল পর্যন্ত সিলেট জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধ চলতে থাকে। এইসব যুদ্ধে পাক বিমান হামলার জন্যে মুক্তিফৌজ কিছুটা পিছু হটতে বাধ্য হয়। এসময় তেলিয়াপাড়া পাহাড়ে আমাদের মুক্তিবাহিনীর প্রধান ঘাঁটি স্থাপিত হয়। এই ঘাঁটির দায়িত্বে ছিলেন কর্ণেল রব, কর্ণেল রেজা ও মেজর সি, আর, দত্ত। সিলেট জেলার সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করতে তারা এ ঘাঁটি থেকে সেনা পরিচালনা করতেন। শেরপুর মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটির দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন আজিজ। ২৫শে এপ্রিল রাতে ক্যাপ্টেন আজিজ শেরপুর যুদ্ধে আহত হলে তাঁকে কালীঘাট হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ঐদিনই শেরপুর সেক্টরের পতন ঘটে। ২৬শে এপ্রিল রাতে প্রধান সেনাপতি আতাউল গণি ওসমানী শ্রীমঙ্গল এবং ইলিয়াস সাহেবের ওপর মৌলভীবাজার সোনালী ব্যাংকের সমস্ত টাকা নিয়ে যাবার দায়িত্ব দেন। ভারতীয় ডেমোলিশন পার্টির এক্সপ্লোসিভ দিয়ে ব্যাংকের স্ট্রং রুমের দরজা খুলতে গেলে সমস্ত রুম বিধ্বস্ত হয়। ব্যাংক থেকে মোট ২ কোটি ৫ লাখ ৩ হাজার টাকা পাওয়া যায়। এখান থেকে প্রায় ২ কোটি টাকা আগরতলা ৯১ নং বি, এস, এফ হেড কোয়ার্টারে বাংলাদেশের প্রতিনিধি এম, আর, সিদ্দিকী ও কর্ণেল রবের মাধ্যমে মুজিবনগর সরকারের কাছে জমা দেয়া হয়। এ অভিযানে ইলিয়াস সাহেব ছাড়াও মানিক চৌধুরী ও মেজর জামান অংশ-গ্রহণ করেন।

২৮শে এপ্রিল মৌলভীবাজার শহর পাকবাহিনীর কবলে চলে যায়। ২৯শে এপ্রিল আমরা শ্রীমঙ্গল হতে কয়েক হাজার ব্যারেল পেট্রল ৩০ লাখ সিগারেট, কয়েক হাজার মণ চাউল, ২৫০টি ট্রাক্টর, ৩০০টি ট্রাক, ২০০ জীপ ও মটরকার বন্ধুরাষ্ট্র ভারতে নিয়ে যেতে সক্ষম হই।

আমি ভারতের কৈলাশ্বরে অবস্থান কালে শরণার্থীদের ক্যাম্পে পৌঁছিয়ে দেয়া এবং মুক্তিফৌজে ভর্তি করার ব্যবস্থা করি। মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ যোগা-নোর জন্যে কৈলাশ্বর মুক্তিফৌজ ক্যাম্প হতে ৩৫ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আমি, মোজাফফর সাহেব ও সুবেদার চৌধুরী মাঝে মাঝে পাক-বাহিনীর সীমান্তের ক্যাম্পগুলো আক্রমণ করতাম। কৈলাশ্বরে ভগবাননগরের যুব-ক্যাম্প আমি স্থাপন করি এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করি।

সেপ্টেম্বর মাসে চাতলাপুর হতে মুক্তিফৌজের ক্যাম্প টিলা বাজারে স্থাপিত হয়। তখন আমাদের ৪নং সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন কর্ণেল সি, আর, দত্ত

এবং উক্ত সেক্টরের রাজনৈতিক লিয়াঁজো ছিলেন দেওয়ান ফরিদ গাজী। আমাকে কৈলাশহর ও ধরমনগরের রাজনৈতিক লিয়াঁজো অফিসার নিয়োগ করা হয়। ইতিমধ্যে চীফ অব স্টাফ কর্ণেল রবকে চেয়ারম্যান এবং ডাক্তার হাসানকে প্রশাসনিক অফিসার নিয়োগ করে হবিগঞ্জ জোনাল কাউন্সিল গঠন করা হয়। সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ বিহারের চাকুলিয়া ট্রেনিং ক্যাম্পে ২২ জন যুবককে আমার নেতৃত্বে ট্রেনিং-এর জন্য প্রেরণ করা হয়। তাদের ট্রেনিং শেষে কলকাতা হয়ে কৈলাশহরে পাঠিয়ে দেই। এসময় আমি, মোজাফফর আহমদ, মেজর জেনারেল কে, বি, কেশব রাও এর সাথে বিভিন্ন যুদ্ধ পরিকল্পনা নিয়ে বেশ কয়েকবার আলোচনা করি। আমি প্রত্যক্ষভাবে মেরলীচড়া পাক ক্যাম্প, আলীনগর পাক ক্যাম্প, চাতলাপুর বি, ও, পি ইত্যাদি ক্যাম্পে বিভিন্ন সময় আক্রমণ করি।

২রা ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী যৌথভাবে সমশেরনগর (কমলগঞ্জ থানা) আক্রমণ করে। ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং এ যুদ্ধে মেজর গুরুম সহ বেশ কয়েকজন মিত্রসৈন্য ও মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। ৩রা ডিসেম্বর সকালে তুয়াবুর রহীম, এম, পি সহ আমি চাতলাপুর বি, ও, পি ও সমশেরনগর স্কুলে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করি। এসময় ভারতের মুক্তিছড়া থেকে মেজর আনোয়ারুজ্জামানের নেতৃত্বে ৩টি বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানী কমলগঞ্জ থানা হেড কোয়ার্টারে পাঠানো হয়। তাঁদের আমি ২০ জন গাইড সংগ্রহ করে দেই। ৪ঠা ডিসেম্বর বিকেলে সি, এন, সি স্পেশাল ব্যাচ ও মুক্তিযোদ্ধাসহ আমরা কড়াইয়াহাড়ি মুক্তিযোদ্ধার প্রধান ক্যাম্পে এসে যোগ দেই। ৫ই ডিসেম্বর মিত্রবাহিনীর সঙ্গে সৈয়দ মহসীন আলীর নেতৃত্বাধীন এক কোম্পানী মুক্তিবাহিনী যোগ দেয় এবং মুন্সিবাজার (কমলগঞ্জ থানা) পাক-বাহিনীর অবস্থানের ওপর হানা দেয়। যুদ্ধে পাক-বাহিনীর পতন ঘটে এবং পাক-বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। ৬ই ডিসেম্বর রাজনগরের তেরক পাশা স্কুলে এক সমাবেশে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করি। ৭টি মুক্তিফৌজের কোম্পানীকে রাজনগর থানার বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়। ৯ই ডিসেম্বর মৌলভীবাজার আসি। ঐদিন মৌলভীবাজারে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা উঠানো হয়। তুয়াবুর রহীমকে মৌলভীবাজারের প্রশাসনিক দায়িত্ব দেয়া হয়। ২০শে ডিসেম্বর মৌলভীবাজার সরকারী বিদ্যালয়ে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। একটি মাইন বিস্ফোরণের ফলে ক্যাম্পের কমাণ্ডার সোলায়মান সহ ২৩ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। আমি সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যাই।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কুলাউড়া থানার শরীফপুর ইউনিয়নের দশ হাজার লোকের বসতিপূর্ণ অঞ্চল মুক্ত ছিল এবং এ অঞ্চলে বাংলাদেশের নিজস্ব প্রশাসন চালানো হয়েছিল। প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিলেন তুয়াবুর রহীম এম, পি

সাহেব। মুক্তিবাহিনী সবসময় এ অঞ্চলে অবস্থান করতো এবং কোন সময় এ অঞ্চল পাক-বাহিনী অধিকার করতে পারেনি।

বর্বর পাক-বাহিনী যুদ্ধকালে সিলেটে অনেক নির্যাতন ও ক্ষতি সাধন করে। শুধুমাত্র মৌলভীবাজারে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে ৪০০ নিরীহ মানুষকে পাক-বাহিনী হত্যা করে। ৪/৫ হাজার বাড়ী ঘর জ্বালিয়ে দেয়। যুদ্ধে আমরা হারিয়েছি মুকিত, সহীদ, রানু, সুদর্শন নরেশ, অরুণ, মনির মিয়া, খোকা, কাজলসহ নাম না জানা আরো অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধাকে।

মোহাম্মদ আজিজুর রহমান
গণপরিষদ সদস্য, (সাবেক এম, পি, এ) সিলেট
২২ অক্টোবর, ১৯৭৩।

আব্দুর রব, মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত

স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে আমি এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি। ১০ই এপ্রিল ভারতে যাই এবং আগরতলায় অবস্থান করি। ইস্টার্ন জোনের এক থেকে চারটা সেক্টরের দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়। এখানে মুক্তিবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করি। তারপর জেনারেল মানেক শা', জেনারেল অরোরা, জেনারেল গিল, জেনারেল সরকার, জেনারেল কালকাট প্রমুখ অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করি। ৭ই মে তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। প্রধানমন্ত্রী আমাদের সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। আমি মুক্তি-বাহিনী, ই, পি, আর দের নিয়ে সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে অপারেশন চালাই। হবিগঞ্জ থেকে শুরু করে শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার, শমসেরনগর, শেরপুর, সিলেট প্রভৃতি স্থানে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলি। পাক-বাহিনীর সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে আমাদের দু'জন সৈন্য শহীদ হয়। অন্য দিকে পাক-বাহিনীর ১৫/২০ জন সৈন্য মারা যায়।

পাক বর্বর বাহিনী মাখালকান্দি, জিলুয়া, কাটাখালী, আনিয়ামুগুর, বদর-পুর, রাজেন্দ্রপুর কুমিয়া প্রভৃতি গ্রাম আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। তারা মাখালকান্দি গ্রামটি প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। পাক-বাহিনী আমার এলাকার প্রায় ৫০০ জন লোককে হত্যা করে। শুধু মাত্র মাখালকান্দিতেই ৩০০ জনকে হত্যা করা হয়। প্রায় ১০/১৫ জন নারীকে পাক বর্বররা ধর্ষণ করে। তাছাড়া পাক-বাহিনী ক্যাম্পে নিয়েও অনেক লোকের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালায়।

আব্দুর রব, মেজর জেনারেল, অবঃ
গণপরিষদ সদস্য (সাবেক এম, এন, এ) সিলেট
৩১ অক্টোবর, ১৯৭২।

অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী

১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর। বঙ্গবন্ধু এভেনিউ (তদানীন্তন জিন্নাহ্ এভেনিউ)-এর আলফা ইনসিওরেন্স অফিসের দোতালায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের খাস কামরায় বসে আছি। আরো আছেন রাজশাহীর জনাব কামারুজ্জামান এম, এন. এ সাহেব এবং বেশ কয়েকজন আওয়ামী লীগ কর্মী। মধ্যমণি বঙ্গবন্ধু নিজে। আলোচ্য বিষয় দলীয় রাজনীতি থেকে শুরু করে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা। হালকা পরিবেশ। বেলা তখন প্রায় ১০টা। টেলিফোন বেজে উঠলে শেখ সাহেব ধরলেন। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে আলাপ করছেন। প্রায় ২/৩ মিনিট পরে ফোন ছেড়ে দিয়ে বললেন এ, পি, পি থেকে ফোন এসেছিল। ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করেছে। ভারতীয় সেনা লাহোর শহরের উপকণ্ঠে শালিমার বাগান পর্যন্ত এসেছে এবং এর সঙ্গে অন্যান্য ফ্রন্টেরও কিছু কিছু প্রাথমিক খবর। তিনি বললেন, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সব রকমের যোগাযোগ বন্ধ। কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন তারপরেই বলে উঠলেন 'দেশটাকে বাঁচানো যায়'। একটা বড় সুযোগ এসে গেছে। 'আমরা যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেই' বলে তিনি কিছুক্ষণ থামলেন। যাহোক, তিনি খুবই উত্তেজিত অথচ পরিবেশটা এই ধরণের আলোচনার উপযুক্ত নয়। হেনা ভাই (কামারুজ্জামান) আমার চোখের দিকে তাকালেন। ইতিমধ্যে শেখ সাহেব বাথরুমে গেছেন। তিনি বললেন যে নেতা খুবই উত্তেজিত, কথাবার্তাও অসংলগ্ন হচ্ছে। তাঁকে এখান থেকে সরাতে হবে। শেখ সাহেব ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে হেনা ভাই এবং আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রায় এক-রকম জোর করে নীচে নিয়ে এলাম। টিপ-টিপ বৃষ্টি পড়ছে। তাঁর জীপে ৩২ নং রোডের বাড়ীতে এসেই তাজউদ্দীন সাহেবকে ফোনে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলেন। আমরা মোট চারজন। তাঁকে আমরা তিনজনই বুঝাতে চেষ্টা করলাম—আপনার কথা আমরা বুঝতে পারছি কিন্তু এরকম একটা কাজ করতে যাওয়ার আগে অনেকগুলো দিক খুবই গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করতে হবে--তবে মনে হয় এখন তার উপযুক্ত সময় নয়। দেশবাসী এটার জন্য প্রস্তুত নয়। এটাই বঙ্গবন্ধুর নিকট প্রকাশ্য স্বাধীনতার কথা আমি প্রথম শুনতে পাই।

১৯৬৬ সাল। পাক-ভারত যুদ্ধের পরবর্তী অবস্থা। ভারতের ওপর দিয়ে পাকিস্তানের দুই অংশের চলাচল বন্ধ। শ্রীলংকা ঘুরে বিমান ঢাকা-করাচী সংযোগ রক্ষা করছে। ২রা ফেব্রুয়ারী। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আমরা মোট ৬ জন যাচ্ছি লাহোরে একটি জাতীয় সম্মেলনে যোগদান করতে। তাসখন্দ ঘোষণার পর পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধী দলীয় নেতারা ডেকেছেন এই সম্মেলন। আলোচ্য বিষয় তাসখন্দ ঘোষণা জাতীয় স্বার্থকে মারাত্মকভাবে জলাঞ্জলি দিয়েছে।

আমাদের জোয়ানরা যুদ্ধক্ষেত্রে যে জয়লাভ করেছিল আইউব খাঁ আলোচনার টেবিলে তা লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে দিয়ে দিয়েছেন। যাহোক আমরা শ্রীলংকা ঘুরে সকালের দিকে গিয়ে পৌঁছলাম করাচীতে। বিমান বন্দরে হাজার হাজার বাঙ্গালী বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর দলকে অভ্যর্থনা জানালো। দলের মধ্যে (১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, (২) তাজউদ্দীন আহমদ (৩) আব্দুল মালেক উকিল (৪) আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম চৌধুরী, (৫) এ,বি,এম, নুরুল ইসলাম এম, এন, এ, এবং (৬) আমি নিজে। সব বাঙ্গালীর একটাই প্রশ্ন 'মুজিব ভাই, আমাদের বাঙ্গালীদের কি হবে'। তিনি সবাইকে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করে বললেন, "দেখ, বাঙ্গালী জাতির দাবী তো ন্যায্য দাবী। আমরা পথ খুঁজে পাবই"। আমরা গিয়ে উঠলাম মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কন্যা আখতার সোলায়মান বেবীর বাসা বিখ্যাত "লাখাম হাউসে"। সেখানেও সারাদিন বহু লোকের আনা-গোনা—বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী নির্বিশেষে। সবারই একই প্রশ্ন এই সংকট উত্তরণের পথ কি? এর মধ্যে দুপুরের আহারের পর শেখ সাহেব আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে বসলেন এবং বললেন আমাদের নিজেদের মধ্যে কিছু জরুরী আলোচনা আছে। তারপর তিনি সঙ্গে নিয়ে আসা '৬ দফার' কাগজপত্র ব্যাগ থেকে বের করলেন। আমরা পড়লাম। তিনি আমাদের বিশদ বুঝানোর চেষ্টা করলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর আমি বললাম, "আপনি আমাদের নেতা, বহুদিক বিবেচনা করার পর আপনি এই ৬ দফা প্রণয়ন করেছেন এবং দেশ-বাসীর সামনে তা দিতে যাচ্ছেন। মনে হয়, পশ্চিম পাকিস্তান, বিশেষ করে পাঞ্জাব এটা মানবেনা"। আমি এর কারণ বিশ্লেষণ করে বলবার চেষ্টা করলাম, "এই ৬ দফা যদি অনমনীয় হয় তা হলে এটা সরাসরি ১ দফার দিকেই এগিয়ে যাবে, আমরা কি সে জন্য তৈরী হয়েছি?" প্রায় সবাই একই মত প্রকাশ করলাম। তাজউদ্দীন ভাই মুচকি মুচকি হাসছেন। জানিনা নেতার সঙ্গে তাঁর পূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে কিনা। বঙ্গবন্ধু অনেক দিক দিয়ে বিষয়টির উপর আলোকপাত করে বললেন—"আজ হোক কাল হোক পূর্ব পাকি-স্তানকে একদিন আলাদা হতেই হবে। এরকম কৃত্রিম ভৌগলিক অবস্থান, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্ন অবস্থা নিয়ে দুটা অংশ কতকাল দাঁড়িয়ে থাকবে! এটা সত্য কথা যে আমরা দেশবাসীকে এখনও তৈরী করার কাজে হাত দেই-নি। তবে বাঙ্গালীরা অত্যন্ত রাজনীতি সচেতন। সংগঠনের মাধ্যমে এটা করা যাবে।" এরপর লাহোরের সম্মেলন সম্পর্কে আলোচনা হল এবং আমরা কোন্ লাইন গ্রহণ করবো তাও তিনি জানিয়ে দিলেন। এর পরের কথা—পরদিন আমরা লাহোরে গেলাম সরাসরি সম্মেলনস্থানে। চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাসভবনের সামনের বিরাট লনে এই সম্মেলনের আয়োজন। নেতাকে আন্তরিকতার সঙ্গেই অভ্যর্থনা করা হল। আমরা বসলাম। সম্মেলন তখনো শুরু হয়নি। সময় সকাল

৯-৩০ মিঃ। সাবজেক্ট কমিটির সভা শুরু হবে। বঙ্গবন্ধু মানেক ভাইকে পাঠালেন সাবজেক্ট কমিটির সভায়। তিনি সেখানে বক্তব্য রাখলেন—এটা যেহেতু জাতীয় সম্মেলন, সেহেতু জাতীয় সমস্যাগুলি আলোচনার মাধ্যমেই এখানে প্রতি-ফলিত হবে। তাসখন্দ ঘোষণা ছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, বন্যা, অর্থনৈতিক শোষণ, চাকুরীর ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য, মারাত্মক বেকার সমস্যা এগুলিও আমাদের জাতীয় সমস্যা এবং এগুলিও এই সম্মেলনে আলোচিত হবে। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, সিন্ধু এবং সীমান্ত প্রদেশেরও অনেক সমস্যা আছে—সেগুলিই বা কেন এখানে আলোচনা করা যাবেনা। কিন্তু চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর যুক্তি হল এতগুলো সমস্যা আলোচনা করতে গেলে মূল আলোচ্য বিষয় (তাসখন্দ ঘোষণা) গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের কোন সমস্যারই আলোচনা হবে না এই কথার পর আওয়ামী লীগের অনমনীয় মনোভাবের ফলে সাবজেক্ট কমিটিতে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। এমতাবস্থায় আওয়ামী লীগের পক্ষে ওয়াক-আউট করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সম্মেলন ত্যাগের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু ৬ দফার কাগজপত্র আমাদের হাতে দিলেন বিলি করার জন্য। বিখ্যাত ৬ দফা এই ভাবেই লাহোরে প্রথম জনগণের হাতে গিয়ে পৌঁছুল। সম্মেলনস্থানের অনতিদূরে মালিক গোলাম জীলানী সাহেবের বাসায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমরা সম্মেলন থেকে বেরিয়ে আসার পর প্রায় ৩/৪ শত পশ্চিম পাকিস্তানী, অবশ্য অধিকাংশই আওয়ামী লীগ কর্মী, আমাদের ধাওয়া করে। আমরা দ্রুত হেটে জিলানী সাহেবের বাসায় পৌঁছলাম। মালিক জিলানী এবং আজম খান এই দুই জন শেখ সাহেবের দুই পার্শ্বে দেহরক্ষীর কাজ করেছিলেন। জিলানী সাহেবের বাসায় পৌঁছার পর আর এক দৃশ্য। আসলে আমরা সকাল থেকে কেউই চা নাস্তা করিনি। অনেক সকালে উঠে করাচী বিমান বন্দরে ছুটতে হয়েছিল লাহোরগামী বিমান ধরার জন্য। আমরা পাশের ঘরে চা খাচ্ছি তখন ভীষণ গোলমালের শব্দ কানে আসে। ব্যাপার কী? জিলানী সাহেব এসে বললেন ৩/৪ শত লোক এসেছে বঙ্গবন্ধুর কাছে। তাদের প্রশ্ন আপনি এতবড় একটা সম্মেলন কেন বানচাল করে দিলেন এবং এর দ্বারা আপনি বিরোধী দলগুলির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সম্মেলন নষ্ট করে পরোক্ষ-ভাবে আইউব খানকেই সাহায্য করলেন। তারা খুবই উত্তেজিত, বিক্ষুব্ধ এবং বিশৃঙ্খল। পরে অবশ্য তিনি সবারই বক্তব্য শোনার পর তাঁর বক্তব্য দিলেন। ১ ঘন্টা ব্যাপী এই বক্তব্যে পূর্ব পাকিস্তানের এবং তার পর সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং সীমান্ত প্রদেশের নিপীড়িত বঞ্চিত দরিদ্র জনগণের যে করুণ এবং মর্মান্তিক কাহিনী ব্যক্ত করলেন তা শুনে অনেকেই কেঁদে ফেললেন। বিশেষ করে বেলুচিস্তান এবং সীমান্তের কিছু নেতা বঙ্গবন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। তুমি শুধু পূর্ব পাকিস্তানের নেতা নও—আমাদেরও নেতা। আমাদের কথা কেউ তো সাহসের সাথে এমন করে কোনদিন বলে নি। তারপরও

তিনি ৬ দফার ওপর সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন। অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তানের কাগজগুলিতে ৬ দফা নিয়ে ঝড় উঠতে শুরু করল।

১৯৬৬ সালের জাতীয় পরিষদের শীত কালীন অধিবেশন বসেছে ঢাকায়। আমার একটা প্রস্তাব (Resolution) গৃহীত হল আলোচনার জন্য। বিষয়বস্তু ছিল 'পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক আমদানী নীতি' (Separate Import policy for East Pakistan)। আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের ওপর তুলনামূলক আলোচনা করে দেখানোর চেষ্টা করলাম যে, দুই অঞ্চলের অবস্থা, বিশেষ করে শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা এবং সমস্যা পৃথক বলেই একই নীতিতে দুই অঞ্চলের সমস্যার সমাধান হবেনা। বললাম, দুই পৃথক রোগীর জন্য একই প্রেসক্রিপশন চলতে পারে না। এর ওপর আলোচনার ঝড় উঠলো। আর তার চেয়েও বেশী ঝড় সৃষ্টি হল পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদ পত্র গুলিতে। Pakistan Times তো সম্পাদকীয়তে বলেই ফেললো, অধ্যাপক ইউসুফ আলী আওয়ামী লীগের লোক —আওয়ামী লীগ ৬ দফার মাধ্যমে দেশকে দ্বিখণ্ডিত করতে চায় এবং এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমি এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছি। প্রস্তা-বটি ভোটে হেরে গেলেও আমরা পূর্ব পাকিস্তানের করুণ অবস্থা তুলে ধরবার চেষ্টায় মোটামুটি সফল হয়েছি। এমন কি পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা গাউস বক্স বেজেঞ্জো, খায়ের বক্স মারী, আতাউল্লাহ খান মেঙ্গল সহ বেশ কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী এম, এন, এ একথা স্পষ্ট করে আমার কাছে বলেছেন যে ইনসাফ কায়েম করতে না পারলে চিরদিনের জন্য একটা জাতিকে এভাবে রাখা সম্ভব নয়।

এরপর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসেবে শেখ মুজিব যখন ঢাকা সেনানিবাসে আটক আমরা কয়েকজন প্রত্যেকদিন তাঁর সাথে দেখা করতে যেতাম। অফিসারস্ মেসে দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হত। কর্ণেল এ, বি, নাসেরের ওপরে দায়িত্ব ছিল আমাদের মেহমানদারীর। সেখানে প্রায় দিনই নাসেরও আলো-চনায় অংশ গ্রহণ করত। শেখ সাহেব বলতেন, নাসের, দেখো, মামলায় আমার কি হবে আমি জানিনা কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলছি। দেশের দুই অংশের সম্পর্কটাকে তোমরা এত বেশী নাজুক করে তুলেছো যে যত বেশী টানবে তত শীঘ্র ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর ১৯৭১ সালের গোড়ার দিকে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির নির্বাচনে আমি পার্টির চীফ হুইপ নির্বাচিত হই। অন্য দুইজন হুইপ ছিলেন জনাব আব্দুল মান্নান এবং ব্যারিস্টার আমিনুল ইসলাম। ৩রা মার্চ থেকে পরিষদের অধিবেশন শুরু হবে। স্বভাবতই চীফ হুইপ হিসেবে পরিষদ ভবনে সদস্যগণের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে আমি খুবই ব্যস্ত। ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কিছু সংসদ সদস্য ঢাকায় পৌঁছে গেছেন। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে নেতা আমাকে তাঁর ৩২নং

রোডের বাসায় ডেকে পাঠালেন। ঐ বাসায় সব সময় লোকজনের অসম্ভব ভীড়, আমি এলেই গাজী গোলাম মোস্তফা আমাকে বঙ্গবন্ধুর লাইব্রেরী রুমে পৌঁছে দিলেন। সেখানে দরজা বন্ধ রেখে বঙ্গবন্ধু আরেকজনের সাথে নীচুস্বরে আলাপ করছিলেন। আমি ঢুকতেই তিনি গাজী সাহেবকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে যেতে বললেন। তাঁর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি হলেন আলী সাহেব, কোলকতায় আমাদের ডেপুটি হাই কমিশনার। তাঁদের মধ্যে যা আলোচনা হবার তা পূর্বেই হয়ে গিয়েছিল। তিনি শুধু বললেন, আপনি সব সময় প্রস্তুত হয়ে থাকবেন, যে কোন সময়ে আপনাকে ডেকে পাঠাতে পারি। তিনি সালাম জানিয়ে চলে গেলে নেতা আমাকে বললেন, বিভিন্ন মহলের সাথে আলাপ আলোচনা করে মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মনে হয় ওরা সবকিছু সহজভাবে এগিয়ে যেতে দিবেনা। হয়তো একটা চরম পরিণতির দিকেই আমরা অনিবার্যভাবে এগিয়ে যাচ্ছি। সেই জন্যেই আমি হোসেন আলী সাহেবকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। যদি সে রকম একটা অবস্থার উদ্ভব হয়, তার চিন্তাভাবনা এবং ব্যবস্থা তো আগে থেকে কিছু করে রাখতে হবে। তারপর তিনি আমাকে অন্যান্য প্রস্তুতি কতদূর কি হলো জানতে চাইলে আমি তাঁকে গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করলাম।

২৪শে মার্চ সকাল ৬টা। বাসার টেলিফোন বেজে উঠলো। দিনাজপুর সদর এস, ডি, ও আব্দুল লতিফ সাহেব অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে জানালেন সৈয়দপুরে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। বাঙ্গালীদের মেরে শেষ করে দিচ্ছে।

এর কয়েকদিন আগে থেকেই গোটা দেশে একটা থমথমে ভাব। একদিকে আইন অমান্য আন্দোলন, অন্যদিকে আলোচনা চলছিল বঙ্গবন্ধু এবং ইয়াহিয়া খাঁর মধ্যে। উত্তেজনায় ফেটে পড়েছে সারাদেশ। এর মধ্যে হঠাৎ সৈয়দপুরে বাঙ্গালী-বিহারীদের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হলে তা আমাদের ঈপ্সিত লক্ষ্যকে আরো দূরে ঠেলে দেবে। আমি ফোন করলাম জিলা আনসার কমাণ্ডার শরীফুল ইসলাম সাহেবকে। তাঁকে বললাম রাইফেল ক্লাবে কি কি অস্ত্র এবং গুলি আছে খুব তাড়াতাড়ি বের করে আনুন। বেশ কয়েকটি রাইফেল এবং কয়েক কার্টুন গুলি নিয়ে এস, ডি, ও সাহেবর জিপে এগিয়ে চললাম সৈয়দপুরের দিকে। সৈয়দপুরের কাছাকাছি যাওয়ার পর স্থানীয় জনগণ আমাদের জানালো যে আসলে বাঙ্গালী-বিহারী দাঙ্গা নয়—সেনা নিবাসের মিলিটারীরা সাদা পোষাকে বাঙ্গালীদের নির্বিচারে হত্যা করছে এবং ইতিমধ্যে তারা আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহতাব বেগ, তার পুত্র এবং আরো অনেক লোককে গুলি করে হত্যা করেছে। বুঝলাম উচ্চতর মহলে যতই আলোচনা চলুক আসলে মিলিটারীরা দেশে একটি বিশৃঙ্খল ও জঙ্গী পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় যা দেশকে আমি এ্যাকশান-এর দিকে ঠেলে দিতে পারে।

দিনাজপুরে ফিরেই টেলিফোনে শেখ সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তাঁকে ব্যাপারটা জানাতে তিনি বললেন ওরা ইচ্ছাকৃতভাবে এসব করছে আলোচনা পণ্ড করার জন্যে। যাহোক তোমরা চেষ্টা করো যাতে সৈয়দপুরের অবস্থা দিনাজপুরে সংক্রমিত না হয়। আমি প্রতিদিনই ঢাকায় তাঁর সাথে যোগাযোগ করে জানবার চেষ্টা করতাম আলোচনার অগ্রগতি এবং ঢাকার অবস্থা। সেদিন জানতে চাইলে তাঁর মনের হতাশা কিছুতেই চাপা থাকলনা।

২৪ এবং ২৫শে মার্চ সারাদিন আমরা কয়েকজনে মিলে দিনাজপুর শহরের বিহারী এলাকাগুলো ঘুরে ঘুরে তাদের বুঝাতে চেষ্টা করলাম যেন বাঙ্গালী-বিহারী সম্প্রীতি কিছুতেই ক্ষুণ্ণ না হয়। ২৫শে মার্চ বিকেলে ই, পি, আর সেক্টর কমাণ্ডার তারেক রসুল কোরেশীর সাথে ফোনে আলাপ করলাম। তিনি বললেন—আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি অবস্থা শান্ত এবং নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য।

২৫শে মার্চ সন্ধ্যার পর আমি বাসা থেকে বেরুচ্ছি আওয়ামী লীগ অফিসে যাওয়ার জন্য। হঠাৎ বাইরের ঘরে ফোন বেজে উঠল। ফোন ধরতেই বঙ্গবন্ধুর সেই ভারী গলা—তিনি দিনাজপুরের অবস্থা জানতে চাইলে সংক্ষেপে জানিয়ে বললাম ঢাকার অবস্থা কি। তিনি বললেন, মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করো। আরেকবার ঢাকার কথা জানতে চাইলে তিনি আবার বললেন "সতর্কতার সাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে যাবে" বলেই ফোন ছেড়ে দিলেন। অন্যান্য দিন অন্ততঃ দুএক কথায় ঢাকার অবস্থা তিনি জানাতেন কিন্তু আজ কেন কিছুই বললেন না ভেবে মনটা অজানা আশঙ্কায় দুলে উঠলো। এরপর আওয়ামী লীগ অফিসে কয়েকজন বসে আছি। অনিশ্চিত ও থমথমে অবস্থা। একটু আগেই নিউ টাউন থেকে ফিরেছি। সেখানকার অবাঙ্গালী নেতাদের খুব উদ্ধত মনে হলো অথচ ইতিপূর্বে কতইনা বিনয়ের সাথে আমার সঙ্গে বরাবর ভাল ব্যবহার করেছে। যা হোক রাত তখন ঠিক ১২টা ৩ মিনিট। হঠাৎ গুলির শব্দ। কখনও মনে হয় নিউ টাউনের দিকে কখনও মনে হয় জিলা স্কুলের দিকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গুলির শব্দ আরো প্রবল হল। আওয়ামী লীগ অফিসে থাকাটা আমরা নিরাপদ মনে করলাম না। সবাই আপনাপন বাড়ীর দিকে দ্রুত রওয়ানা হলাম। বাসায় এসে মোটর সাইকেলটা রেখে টেলিফোনের কাছে এলাম। ভাবলাম এস, পি-র কাছ থেকে জানবার চেষ্টা করি প্রকৃত ব্যাপারটা কি, ফোন তুলেই দেখি লাইন কেটে দেয়া হয়েছে। হতভম্ব হয়ে গেলাম। আস্তে আস্তে থানার দিকে পায়ে হেটে এগিয়ে গেলাম। অতিরিক্ত এস, পিকে পেলাম তিনিও বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না। শুধু এটুকু বললেন মিলিটারীরা ট্রাকে করে বেরিয়ে এলোপাথারি গুলি করে বেড়াচ্ছে। এমনকি জিলা স্কুলের কাছে রাত্রিকালীন পাহারারত পুলিশের গাড়ীর দিকেও লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছে। পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি? আরো ধাঁধায় পড়ে গেলাম।

বড় অস্বস্তির মধ্যে ঘুমহীন রাত কেটে গেলো। ভোর রাতে আজানের পর পরই মাইকে প্রচার শুনলাম বেলা ১১টা থেকে কারফিউ। দিনটি ছিল শুক্রবার।

সকাল সাড়ে সাতটার সময় বারান্দায় বসে আছি। এমন সময় ডি সি-র একজন পিয়ন সালাম জানিয়ে আমার হাতে একটা স্লিপ দিল। তাতে ডি,সি (ফয়েজউদ্দিন সাহেব) লিখেছেন আমার বাসায় আমার সংগে চা খেলে আমি খুব খুশী হব। আমি ৮টার দিকে বাসা থেকে বেরিয়ে গেলাম। ইতিপূর্বে ভোর বেলায় আমার মা বলেন যে, তিনি রাতে খুবই খারাপ স্বপ্ন দেখেছেন। রাস্তায় রাস্তায় কুকুর মানুষের লাশ ছিঁড়ে খাচ্ছে সুতরাং সবাইকে নিয়ে তখুনি গ্রামের বাড়ী চলে যেতে চান। কিন্তু এই অবস্থায় আমি কি করে যাই। তাই আমি, আমার স্ত্রী ও কনিষ্ঠা মেয়েটি বাদে বাসার সকলেই গ্রামের বাড়ীতে চলে গেল।

বাসা থেকে বেরিয়ে থানার কাছে গিয়ে ও, সি, কে বললাম ডি, সি-র বাংলোয় যেতে হবে কিন্তু যানবাহন তো নেই। এমনিতেই শুক্রবার দোকান-পাট বন্দের দিন, তার ওপর কারফিউ ঘোষণা। এমন সময় অতিরিক্ত এস, পি গাড়ী নিয়ে থানায় ঢুকলেন। তিনি বললেন, আমার মনটা কিন্তু সায় দিচ্ছেনা যে আপনি ডি, সি-র বাংলোয় যান। কারণ, পাশেই সার্কিট হাউস। মিলিটারীদের অস্থায়ী হেড অফিস। দেখাই যাক না কি হয় এই মনে করে তাঁর গাড়ীতে আমাকে পৌঁছে দেয়া হলো। ডি, সি-র বাংলোর গেট বন্ধ, পাশের সার্কিট হাউসের গেট খোলা। গাড়ী থেকে নামার সংগে সংগেই গেটের পাহারাদার সৈনিক এমন অভদ্র এবং কর্কশ ভাবে আমাকে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেল যাতে আমার মনটাই খারাপ হয়ে গেল। গাড়ী বারান্দায় বেশ কয়েক-জন মিলিটারী অফিসার। এক পাশে ডি,সি। তিনি এগিয়ে এসে আমার সাথে হাত মেলাতেই শান্ত স্বরে বললেন আপনি কেন এলেন? বলেই মুখ ফিরিয়ে আরেকদিকে চলে গেলেন। আশ্চর্য্য ব্যাপার। (পরে ডি,সি আমাকে বলেছিলেন যে অস্ত্রের মুখে তিনি সেই স্লিপটা লিখে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন)। একটু পরে আরো ২/১ জন আওয়ামী লীগ নেতা এলে লেঃ কঃ তারেক রসুল কোরেশী আমাদের নিয়ে বসলেন। তাঁকে সাহায্য করলেন মেজর তারিক আমিন। কোরেশী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ঢাকায় আপনাদের শেখ সাহেব প্রেসিডেন্টের সংগে আলাপে রয়েছেন। আলাপের ফলাফল যাই হোক কিন্তু ইতিমধ্যে দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই সামরিক আইন জারী করা হয়েছে। আমি আপনাকে বলছি, আপনার লোকজনকে জানিয়ে দিন, তারা যেন আমাদের সাথে সহযোগিতা করেন। বলেই তিনি অন্যান্যদের চলে যেতে বললেন কিন্তু আমাকে থাকতে বললেন। মিলিটারী অফিসাররা সবাই উঠে চলে গেলে আমি একাই চুপ-চাপ বসে আছি। পরিস্থিতিটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনা। আমাকে থাকতে বললেন কি আরো কিছু আলাপ করার জন্য, না কি চা খাওয়ানোর জন্য। এই

মেজর আর কর্ণেল যে কতদিন আমার বাসায় চা খেয়েছে, কত সহজ ব্যবহার করেছে কিন্তু আজকের ব্যবহারের সঙ্গে তার কত প্রভেদ! আজকে মনে হচ্ছে তারা যেন চেনেই না।

যাক, তখন প্রায় ১০॥টা বাজে। ১১টা থেকে কারফিউ। কারো পাত্তা নেই উঠে চলেই যাব কি না ভাবছি। একবার উঠেই দাঁড়ালাম অমনি দরজায় স্টেনগান হাতে দাঁড়িয়ে থাকা সৈনিকটি ভাঙ্গা গলায় হুকুম করলো "বয়ঠো"। আর কি মুশকিল। তার মিনিট পাঁচেক পরে কোরেশী এসে বললো "আপনি বাসায় চলে যান। বাসাতেই থাকবেন।" তাঁকে বললাম, ১১টা বাজতে মাত্র কয়েক মিনিট, রিকশা পাবার কোন আশা নেই। দয়া করে তোমার গাড়ী করে আমাকে বাসায় পৌঁছে দিলে বলতেই "সরি" বলে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। আমার তো ব্যবহার দেখে অবাক হবার পালা। আমি দ্রুত বেরিয়ে হেটে বাসার দিকে রওয়ানা হলাম। পরে ক্যাপ্টেন নজরুলের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা শুনেছি। নজরুল বাঙ্গালী। তিনি পাশের ঘরেই অসুস্থ বলে মুখে কাপড় ঢেকে শুয়ে ছিলেন। ঘটনাটি ছিল আমাকে নিয়ে কি করা হবে। ৪/৫ জন মিলিটারী অফিসার কিছুতেই একমত হতে পারছিল না। মেজর জিলানী নামে একজনের মত ছিল ঝামেলা করে লাভ নেই, এখন রেখে দিয়ে রাতে শেষ করে দেয়া হোক। কর্ণেল তারেক রসুল কোরেশীর মত ছিল সৈয়দপুর সেনানিবাসে পাঠিয়ে দেয়া হোক—যা করার সেখানেই আজকে রাতের মধ্যে করা যাবে (ইনিই আমার বাসায় চা খেয়েছিলেন সব চেয়ে বেশী)। শুধু মেজর তারিক আমিনের মত হল আমরা তাঁর সম্পর্কে যখন কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশ পাইনি তাই এখন অন্য কিছু না করে বাসায় অন্তরীণ করে রাখা হোক (অথচ কয়েকদিন আগে ছাত্রদের একটা মিছিলের ব্যাপারে তার সঙ্গে আমার প্রচণ্ড বাদানুবাদ হয়েছিল)। লেঃ দুররানী নামে একজন অফিসার তাঁকে সমর্থন করে এবং এই দুররানীকেই দায়িত্ব দেয়া হয় আমাকে পাহারা দেয়ার জন্য।

বাসায় আছি। কারফিউ। টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন। সামনে দিয়ে কয়েক মিনিট পর পর মিলিটারী টহল। একটা অসহ্য অবস্থা। এর মধ্যেও যতটুকু সম্ভব আওয়ামীলীগ সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগের প্রচেষ্টা চালাতে লাগলাম। আমি বিশেষ করে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করলাম ই, পি, আর-এর সুবেদার মেজর রউফের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কারণ বেশ কয়েকমাস, বিশেষ করে নির্বাচনের পর থেকেই, তাঁর সঙ্গে আমার বহু গোপন বৈঠক হয়েছে। ই, পি, আর-এ যদিও কিছু বাঙ্গালী অফিসার ছিল কিন্তু কেন যেন আমি তাদেরকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি। সেই কারণে সুবেদার মেজর রউফ এবং তাঁর মাধ্যমে দিনাজপুর ও রংপুর জিলার বাঙ্গালী ই, পি, আর-দের সাথে এই বিষয়ে আমার পক্ষে গোপন যোগাযোগ সম্ভব হয়েছিল। তখন দিনাজপুর ও রংপুর একই সেক্টরের অধীনে ছিল এবং দিনাজপুর ছিল সেক্টর হেড কোয়ার্টার। এই অবস্থাতেই বাসার

পেছনের দিক থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে মাড়োয়ারী পট্টিতে এক বাসায় তাঁর সাথে আমার সংক্ষিপ্ত আলাপ হল। আমি শুধু জানতে চাইলাম আমাদের পূর্ব পরিকল্পনা ঠিক আছে কিনা এবং সেই মোতাবেক কাজ করতে কোনো বিশেষ অসুবিধা আছে কিনা। তিনি জানালেন সব ঠিক আছে। তখন সময় ২৬শে মার্চ রাত ৯টা। সিদ্ধান্ত হলো ২৮শে মার্চ দুপুর ১২॥ টার দিকে আমরা আমাদের কাজ শুরু করব। ইতিমধ্যে আমার করণীয় সম্পর্কেও তিনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। আমার কাজ ছিল দিনাজপুর জেলার পশ্চিম সীমান্তের ই, পি, আর ফাঁড়ি থেকে বাঙ্গালী ই, পি, আর-দের উপরোক্ত সময়ের পূর্বেই এক জায়গায় জমায়েত করা। বাসায় ফিরেই আমার স্ত্রীকে বললাম আমাদের দু'জনের একসঙ্গে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় অথচ আমাকে যথাশীঘ্র সম্ভব বাইরে চলে যেতে হবে।

সকাল হল। বাইরের রাস্তায় মিলিটারী টহল। আমি বেলা ৯টার দিকে আমার স্ত্রী এবং ছোট বাচ্চাকে আল্লাহর হাতে সঁপে দিয়ে বাসার পেছন দিয়ে প্রাচীর টপকে রাস্তায় একটা রিক্সা নিলাম। রিক্সা দ্রুত চালাতে বললাম। প্রথমে যেতে বললাম মুন্সিপাড়া। এই চরম দুদিনে জুগলু এবং আব্দুর রহীম সাহেবের খোঁজ নেয়া প্রয়োজন। হঠাৎ রিক্সাওয়ালা আমাকে উর্দুতে বলল প্রফেসার সাহেব, আপনি যত শীঘ্র পারেন টাউন ছেড়ে চলে যান। আমি জানি আপনার খুবই বিপদ। এতক্ষণ এদিকে খেয়ালই ছিলনা যে রিক্সাওয়ালা অবাঙ্গালী অথচ সেই আমাকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য সরে যেতে বলে। যাহোক, জুগলু এবং রহীম সাহেব নেই, তাঁরা শহর ছেড়ে চলে যেতে পেরেছেন। তারপর শাহ মাহতাবের বাসায় যাই। তাঁকে আর এক বাসা থেকে খুঁজে নিয়ে রিক্সাওয়ালা:কে বললাম কাঞ্চন ঘাটের দিকে যেতে। সে বলল কাঞ্চন কলোনী এবং কাঞ্চন ঘাটে মিলিটারী পাহারা দিচ্ছে। সে .ক বাঁধের কাছে আমাদের ছেড়ে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে অতিক্রম করে নদী পার হতে বললো। আমি আবার রিক্সাওয়ালার দিকে তাকালাম। সে বলল আল্লাহ আপনার হেফাজত করুন।

বাঁধ পার হতেই দেখি নদীর পশ্চিম পাড়ে ২/৩ হাজার লোক লাঠিসোটা বল্লম ইত্যাদি নিয়ে জড় হয়েছে। ওরা আমার গ্রামের এবং আশপাশের লোক। ওরা শুনেছে আমাকে গৃহবন্দী করে রেখেছে। আমাকে মুক্ত করে নিয়ে যাবার জন্যই ওরা সমবেত হচ্ছে। তাও আবার লাঠি-বল্লম নিয়ে মিলিটারীর মোকাবিলা—মনে মনে হাসলাম। আমাকে দেখেই ওরা অনন্দে উত্তেজনায় যেন পাগল হয়ে গেল। কিন্তু এই আনন্দ বেশীক্ষণ সইলনা। হঠাৎ কয়েক রাউণ্ড গুলির শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে ৫/৬ জন মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তিনজন সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল। আর ২জন গুরুতর আহত। বেশ দূরে একখানা জীপ থেকে নেমে আমাকে লক্ষ্য করেই গুলি। আমি প্রাণে বেঁচে গেলাম কিন্তু আমার জন্যই কয়েকটা অমূল্য প্রাণ চলে গেল।

এদিকে আমি চলে যাওয়ার আধ ঘন্টার মধ্যেই মিলিটারীরা টের পেয়ে যায় যে আমি যেভাবেই হোক বাসার বাইরে চলে গেছি। তখনই তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আমার খোঁজে। বিশেষ করে আমার গ্রামের বাড়ী যাবার রাস্তায় কাঞ্চন ঘাটের কাছে যখন তারা আমার সন্ধান পেল তখন আমি কয়েক হাজার লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত। ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে জীপ থেকে নেমে কয়েক রাউণ্ড গুলি করেই তারা চলে যায়। নদী পার হতে সব কাপড় ভিজে গিয়েছিল। ভেজা কাপড়েই কয়েক মাইল হেটে গ্রামের বাড়ীতে পৌছি। পৌছেই প্রথম কাজ হলো কয়েকজন লোককে মোটর সাইকেলে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করা। সেতাবগঞ্জের রউফ চৌধুরীকে লিখলাম তুমি সেতাবগঞ্জ সুগার মিলের সব ক'খানা ট্রাক বিভিন্ন ই, পি, আর শিবিরে পাঠিয়ে দাও। তাদেরকে নিয়ে রাতের মধ্যে আমার গ্রামের কাছে সমবেত হও। রা'ত ২/৩ টার মধ্যেই ২/৩ খানা ট্রাক ভর্তি ই, পি, আর দেওয়ানদিঘী হাটখোলায় হাজির। তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হল। তারা সকালের পূর্বেই কাঞ্চন ব্রীজের পশ্চিম পার্শ্বে গ্রামের আড়ালে পজেশন নিল।

২৮শে মার্চ রবিবার। সেই বিশেষ মুহূর্তটি উপস্থিত হল যার জন্য কয়েক মাস কত গোপন আলোচনা, শলা পরামর্শ ও উত্তেজনা। বেলা তিনটা বাজার পূর্বে প্রথমেই ৬ পাউণ্ডার এর গুলির শব্দে আকাশ কাঁপিয়ে ঝড় সৃষ্টি হল যেন। আসলে অপারেশন শুরু হয়েছে বেলা ২টা থেকেই। কুঠিবাড়ী সেক্টর হেড কোয়ার্টারে যত অবাঙালী ই, পি, আর, জওয়ান এবং অফিসার ছিল তাদেরকে বেয়নেট দিয়ে শেষ করতে হয়েছে। কারণ গুলির শব্দ হলেই কয়েক শত গজ দূরে অবস্থান গ্রহণকারী মিলিটারীদের কাছে খবর পৌছে যেত। ই, পি, আর-দের টারগেট ছিল সা'কিট হাউসের পাশের ময়দান এবং বড় ময়দানের মাঝখানে অবস্থিত অফিসারস ক্লাব। এগুলিতেই মিলিটারীরা অবস্থান নিয়েছিল। কিন্তু বিপদ হল, সেখান থেকে গুলি কুঠিবাড়ীতে আসছিল আরো দুটি স্থান থেকে। উপরোক্ত স্থান ছাড়াও রাজবাড়ীর কাঁটাপাড়া এবং সুইহারী ডিগ্রী কলেজের ছাদের ওপরেও যে মিলিটারীরা পজেশন নিয়েছিল সেটা ই, পি, আররা জানতে পারে নি। তিন দিকের গুলির আক্রমণে তারা অনেকটা হতভম্ব হয়ে গেল। তখন তারা একটা নতুন কৌশল গ্রহণ করল। কুঠিবাড়ীর পশ্চিম পাশের প্রাচীর ভেঙ্গে তারা নদীর বালুর ওপর অবস্থান নিয়ে সেখান থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করল। এটা মিলিটারীরা টের পেল না। এ সময়ে কাঞ্চন ঘাট, বাইশাপাড়া, কাঞ্চন রেলওয়ে ব্রীজের পশ্চিম পার্শ্বে উঁচু লাইনের দু'পার্শ্বের নীচু জায়গায় হাজার হাজার উল্লসিত মানুষের ঢল। তাদের মাথার ওপর দিয়ে গোলাগুলি ছুটছে অথচ তার মধ্যেই নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ করে নদী পার হয়ে ছুটে যাচ্ছে কুঠিবাড়ীর ভেতর। সেখান থেকে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাগুলির ভারী বাক্সগুলি কয়েকজনে মিলে অনায়াসে নদী পার করে পশ্চিম পাড়ে এনে জমা করছে।

সেখানে গোলাগুলিতে বেশ কজন লোক নিহত হয়। এ যেন জীবনকে বাজী রেখে মহোল্লাসে মেতে ওঠার তীব্র প্রতিযোগিতা। সেখান থেকে রাতের মধ্যে খোশালডাঙ্গা হাটে সব অস্ত্রশস্ত্র ও মালপত্র এনে জড়ো করা হলো।

এর মধ্যেও শহরের কয়েকটি লক্ষ্যে বিশেষ করে উপশহরে (নিউ টাউনে) গোলা নিক্ষেপ চলতেই থাকে। কারণ, মিলিটারী ও অবাঙ্গালী ই, পি, আর-রা পিছিয়ে এখানেই আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। সারারাত ব্যাপী গোলাগুলি চলে।

পরের দিনই দুটো ঘটনা ঘটল। দিনাজপুর শহরের অমিয় কুটিরে সিকিউ- রিটি সহ মেজর রাজা থাকতো সপরিবারে। তার স্ত্রী কুষ্টিয়ার রাজনৈতিক নেতা জনাব সাদ আহমদ সাহেবের বোন। মেজর রাজা যখন অয়ারলেস সেটের সামনে বসে করাচী এবং অন্যান্য স্থানে খবর পাঠানোর চেষ্টা কর- ছিল ঠিক সেই সময়ে ই, পি, আর-রা তাকে ধরে নিয়ে আসে এবং দিনাজপুর হেমায়েত আলী হলের সামনে গুলি করে হত্যা করে।

মেজর তারিক আমিন সকাল বেলা ডি,সি-র বাংলোয় এসে তাঁর কাছে দেখা করে প্রাণ ভিক্ষা এবং আশ্রয় চায়। অবশ্য ডি, সি-র পক্ষে সেই পরিস্থিতিতে তা করা সম্ভব ছিল না। তার একদিন পরেই শহরের উপকণ্ঠে কসবা এলাকায় নদীর তীরে তাকেও সপরিবারে প্রাণ দিতে হয়। লেঃ কর্ণেল তারেক রসুল কোরেশী জনৈক স্থানীয় চেয়ারম্যান (পরবর্তীকালে রাজাকার হিসেবে তাকে কারাগারে দীর্ঘ দিন থাকতে হয়েছিল)-এর সহায়তায় মোহনপুর ব্রীজ পার হয়ে আমবাড়ী দিয়ে রাতের অন্ধকারে পার্বতীপুর পৌঁছে প্রাণ বাঁচাতে সমর্থ হয়েছিল। তারপর কয়েকদিনের জন্য কাঞ্চন ঘাট থেকে ২ মাইল পশ্চিমে ভবানীপুরে আফতাবউদ্দীন সরকার সাহেবের বাড়ীতে সাময়িকভাবে জেলা সদর দফতর স্থানান্তরিত হয় এবং জেলা কর্মকর্তাগণ সেখান থেকেই সেই অস্বাভাবিক অবস্থায় যতটা সম্ভব সরকারী কাজকর্ম, নির্দেশনামা জারী করতে থাকেন।

৩১ তারিখে দিনাজপুর ইনস্টিটিউট প্রাংগণে সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (ক) অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী, (খ) গোলাম রহমান (গ) এ.এম, আই, জেড ইউসুফ এবং (ঘ) গুরুদাস তালুকদার এই কজনের নামে একটি প্রচারপত্র ছাপিয়ে বিলি করতে হবে। প্রচার পত্রে অবিলম্বে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠনের দাবী করা হবে এবং জনগণকে সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য আহবান জানানো হবে। এই প্রচার পত্র ১লা এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত হয় এবং এই সপ্তাহেই কোলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'কালান্তর' পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়।

এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে আমাকে অবিলম্বে কয়েকটি কাজ করতে হবে। সেগুলি হচ্ছে ভারতে গিয়ে ভারত সরকার এবং আন্ত- র্জাতিক বিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে বাংলাদেশের অবস্থাকে তুলে ধরা,

বাংলাদেশের অন্যান্য নেতার সংগে সম্ভব হলে যোগাযোগ স্থাপন করা, এবং আমাদের ইপিআর, পুলিশ, আনসারসহ যুদ্ধরত জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করা। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আমি ২রা এপ্রিল সীমান্ত অতিক্রম করি। এর পূর্বে দিনাজপুরের ডেপুটি কমিশনার আমার কাছে কিছু নির্দেশ চাইলে আমি তাঁকে নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী দেইঃ কোন অবস্থাতেই কোন ব্যাংকের ষ্ট্রং রুম থেকে যাতে নগদ অর্থ এবং সোনা রূপা গয়না লুঠতরাজ না হয়; প্রয়োজন না হলে কোন ব্যক্তিকে হত্যা না করা; দেশের ভেতরে সীমান্তের কাছাকাছি খাদ্যশষ্য মওজুদ করা যাতে যুদ্ধরত লোকদের খোরাকীর কোন অসুবিধা না হয়। অতঃপর ভারতের উদ্দেশে আমি রওয়ানা হই।

সীমান্তের ওপারেই অবস্থিত রাধিকাপুর ষ্টেশনে আমাকে অভ্যর্থনা জানান পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ মহকুমার পুলিশ অফিসার। সেখান থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল জেলাসদর বালুর ঘাটে। সেখানে এস,পি-র অফিসে দীর্ঘক্ষণ সাবিক পরিস্থিতি, মুক্তিযুদ্ধ ও জনগণের সংগে পাক সৈন্যদের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের কৌশলগত দিক এবং বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলে। অতঃপর এস, পি মিঃ হ্যারিস জেমস পশ্চিম বংগেব মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অজয় মুখার্জী মহাশয়ের একটি বার্তা আমাকে দেন। ঐ বার্তায় মুখ্য মন্ত্রী আমাকে অবিলম্বে কোলকাতায় গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করার জন্য অনুরোধ করেছেন। আমি পবদিন স্থানীয় কংগ্রেস এম,এল এ-এর সংগে কোলকাতায় পৌছে সরাসরি কংগ্রেস অফিসে যাই। সেখানে আমাকে অভ্যর্থনা জানান শ্রী অরুণ মৈত্র (পরবর্তীতে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট)। অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সাথে পরিচয় এবং কিছু আলাপ আলোচনার পর আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় ৩৪ হাওয়ান মিরর ষ্ট্রীটে "বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতির" অফিস কক্ষে। সেখানে মুখ্য মন্ত্রী শ্রী অজয় মুখার্জী পূর্ব থেকেই উপস্থিত ছিলেন। উষ্ণ আন্তরিকতা নিয়ে তিনি আমার সংগে আলাপ করলেন। তাঁরা তাঁদের প্রধান সমস্যার কথা বললেন—বাংলাদেশের কোন সংবাদই তাঁরা ভালভাবে পাচ্ছেন না। বিক্ষিপ্তভাবে প্রাপ্ত কিছু সংবাদের ওপর ভিত্তি করে তাঁরা পূর্ণাংগ কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারছেন না। সেই অবস্থায় এই অসুবিধা খুবই স্বাভাবিক। কারণ আমাদের পক্ষেও পুরোপুরি বলা সম্ভব ছিলনা বাংলাদেশের কোথায় কী ঘটছে। সবরকমের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। বিশেষ করে সেই দিনগুলোতে আমি ছিলাম দেশের দূরতম এক সীমান্ত-জেলা, দিনাজপুরে। আকাশবাণী, বি,বি,সি, ভয়েস অব আমেরিকার দেয়া সংবাদের ওপর নির্ভর করা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই আমাদের জানাবার ছিলনা। তবু এর মধ্যে এই সহায়ক সমিতি একটি অফিস করেছেন এবং কিছু কিছু চাঁদা আদায় করে বালুরঘাট বেনাপোল সীমান্ত বরাবর উদ্বাস্তু এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে সাহায্য পৌছাচ্ছেন। এই সহায়ক সমিতি সর্বদলীয় ভাবে গঠিত হয়েছিল। অর্থাৎ প্রায় সব রাজনৈতিক

দলের সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়েছিল এবং ১৯৭১ এর শেষ পর্যন্ত এই সমিতি আমাদের প্রচুর সাহায্য সহযোগিতা দান করেছিল। প্রথম দিনই অর্থাৎ ৪ঠা এপ্রিল তারিখে মুখ্যমন্ত্রী আমার কাছে তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এই বলে যে, দু তিনদিন আগে বাংলাদেশের দুইজন নেতা তাঁর সংগে দেখা করে দিল্লী চলে গেছেন। তাঁরা তাঁদের আসল পরিচয় না দিয়ে দুটি ছদ্মনাম—মাহমুদ আলী ও রহমত আলী বলে চলে গেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর ধারণা উপরোক্ত দুজন নেতা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রকৃত সংবাদ গোপন করেছেন। পরে জানতে পারি তাঁরা ছিলেন জনাব তাজউদ্দিন আহমদ এবং ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম। শ্রী অজয় বাবু ছাড়াও এই সমিতিতে ছিলেন প্রাদেশিক মন্ত্রী সন্তোষ রায়, ডাঃ জয়নাল আবেদীন, শ্রী কাশীকান্ত মৈত্র, কংগ্রেসের অরুণ মৈত্র, গোপালপুর কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন গুহ, এবং শ্রী বিজয় সিং নাহার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

আমার থাকবার জায়গা তাঁরা করে দিলেন কীড স্ট্রীটের এম এল এ ভবনে। তারপর চেস্টা চলল নেতৃবৃন্দের সাথে সংযোগ স্থাপনের। প্রথমে দেখা হল জনাব কামারুজ্জামান সাহেবের সাথে বালিগঞ্জ এলাকার রাজেন্দ্র রোডের নর্দার্ন পার্কের একটি বাড়ীতে। পরবর্তীকালে জানা গেল বাংলাদেশ থেকে আগত উচ্চ পর্য্যায়ের নেতৃবৃন্দের জন্যে এই বাসাটি সংরক্ষিত ছিল। বাসাটির তিন তলায় উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বেতার যন্ত্র ছাড়া যোগাযোগ স্থাপনের অন্যান্য উপকরণ দ্বারাও এটি সজ্জিত ছিল। এর পরে তাজউদ্দিন সাহেব ফিরে এলেন দিল্লী থেকে। পরপরই এলেন ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং খোন্দকার মোস্তাক আহমদ সাহেব। প্রথম দিকে নেতৃবৃন্দের জন্য বাসস্থান নির্দিষ্ট ছিল ১০, লর্ড সিন্‌হা রোডে। ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের অনেক নেতা, এম,এন, এ, এম, পি এ কোলকাতায় পৌঁছে গেছেন। ১০ই এপ্রিল তারিখে এই ১০ নং লর্ড সিন্‌হা রোডেই নেতৃবৃন্দ এবং অনেক এম,এন,এ, এম,পি,এ দের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনার পর সরকার ও মন্ত্রিসভার কাঠামো এবং সদস্যগণের নাম ঠিক করা হয়। পরবর্তী ১৭ই এপ্রিল তারিখে এই সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকতার রূপ গ্রহণ করে। সেখানেই স্বাধীনতার সনদ ঘোষণার পর আমি মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে শপথ পাঠ করাই। শতাধিক দেশী বিদেশী সংবাদ সংস্থার বেতার-টেলিভিশন সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে একটি স্বাধীন জাতি ও রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের প্রথম আইনানুগ আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং এই সরকারের মাধ্যমেই সারা বিশ্বের জনগণের নিকট আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্য সহানুভূতি ও সক্রিয় সমর্থন কামনা করা হয়।

এরপরে নেতৃবৃন্দের জন্য বাসস্থান নির্দিষ্ট হয় ৫৭/৮ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে। যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁরা সপরিবারে থাকেন সি, আই, টি রোডে আশু বাবুর বাড়ীতে। অবশ্য মন্ত্রী সাহেবেরা বরাবর থিয়েটার রোডের অফিসে

বসতেন। কোলকাতা মিশন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণার পর সেখানে খন্দকার মোশ্তাক সাহেবের পররাষ্ট্র বিষয়ক অফিস বসে। আর বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের হিসাব সংরক্ষণের জন্য প্রতিদিন ২ ঘন্টা করে আমাকে সেখানে বসতে হত। বিদেশী চাঁদা ও সাহায্যের সমন্বয় করতেন মিশন প্রধান জনাব হোসেন আলী। হোসেন আলী সাহেব, তাঁর স্ত্রী এই মিশনে থেকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

কোলকাতায় ফিরে একটি নতুন দুশ্চিন্তা আমার মনকে আচ্ছন্ন করল। চিন্তা করলাম মুজিবনগরে স্বাধীনতার ইস্তেহার পাঠের সংবাদ শুধু বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে নয়, সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। সংবাদটি পাক-সেনারা কিভাবে গ্রহণ করবে? আমি জানিনা এই মুহূর্তে আমার পরিবারের লোকজন কে কোথায়! গ্রামের বাড়ী থেকে আসার সময় শুধু মা এবং স্ত্রীকে বলে এসেছিলাম 'যাচ্ছি'। কোথায় যাচ্ছি, কখন ফিরব, আদৌ ফিরব কিনা সে মুহূর্তে সেই চিন্তার একেবারেই অবকাশ ছিলনা। শরীরের কোন স্থানে কেটে যাবার সংগে সংগে বেদনা বোধ হয়না—হয় পরে, ঠিক তেমনি সেই সময় এই চিন্তা আমাকে ভীত ও আতঙ্কিত করে তুলল। কামারুজ্জামান সাহেবের সংগে আলোচনা করলাম। তাঁরও একই অবস্থা। আনন্দ বাজার পত্রিকার মালিক অশোক বাবু তাঁর গাড়ী এবং কিছু পথ খরচ আমার হাতে দিলেন। আমি এবং হেনা ভাই (কামারুজ্জামান সাহেব) রওয়ানা হলাম আপনাপন পরিবারের সন্ধানে ২০শে এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে। রাতে এসে পৌঁছলাম কৃষ্ণনগর ডাক বাংলোয়। সেখানে শুরু হল ঝড়-বৃষ্টি। মনে ভীতি, অনিশ্চয়তা ও উত্তেজনা বাইরে এই দুর্যোগের রাত। সেখানেই মধ্যরাতে আমাদের কাছে এসে পরিচয় দিয়ে দেখা করলেন চুয়াডাংগার আওয়ামী লীগ নেতা এবং একজন দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ আসহাবুল হক। তাঁর সাথে প্রায় সারারাতব্যাপী আলোচনা হল পশ্চিম সেক্টরে যুদ্ধের কথা। বিভিন্ন কলা কৌশল সম্পর্কে তাঁকে নির্দেশ দিয়ে আমরা পরদিন সকালে রওয়ানা হলাম। মুর্শিদাবাদ জেলার 'ভাবতা' নামক স্থানে হেনা ভাই-এর পরিবারের সবারই খোঁজ পাওয়া গেল। তিনি অনেকটা নিশ্চিত হন কিন্তু আমার অবস্থা। পরদিন বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবির আমরা পরিদর্শন করলাম। পরিদর্শন মানে উদ্বাস্তুদের দুঃখ এবং সর্বনাশের করুণ কাহিনী শোনা। পরদিন পশ্চিম দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে এসে আমরা রাধিকাপুর-ডালিমগাঁও উদ্বাস্তু শিবিরে যাই। দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনার অনেক নেতার সাথে দেখা হল সেখানে। স্থির হল ১লা মে তারিখে বেলা ১০টায় রাধিকাপুর প্লাটফর্মে আমরা সকলে মিলে সভা করে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। ইতিমধ্যে খোঁজ পেয়ে গেলাম আমার পরিবারের। রায়গঞ্জ শহরে এক বাসার বারান্দায় পেলাম আমার স্ত্রী এবং মেয়েদের। ছেলে দু'জন সেখানে ছিলনা। তারা সীমান্ত এলাকায় মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে অন্যান্যদের সংগে যোগ দিয়েছিল। এরা কি করে বাড়ী

থেকে বেরিয়ে কয়দিনে কি দুঃখ দুর্গতির মধ্য দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করেছে তার কাহিনী আমি শুনলাম। তবে অনেক পরিবারের বুকফাটা কাহিনীর তুলনায় এ আর কতটুকু।

পরদিন ১লা তারিখে গেলাম রাধিকাপুরে সভা করতে। গিয়েই শুনলাম এক শিবিরে এক বৃদ্ধ মরণাপন্ন, মৃত্যুর পূর্বে আমাকে একটু দেখতে চায়। এদিকে সভার সময় হয়ে গেছে। তবু গেলাম মৃত্যু পথযাত্রীকে শেষবারের মত দেখতে। ঠিক বেলা ১০টা যে সময় সভা অনুষ্ঠানের কথা ছিল তখন আমি শিবিরে। ১০টা বেজে ১৫ মিনিটের সময় সীমান্ত থেকে পাক সৈন্যরা শেলিং শুরু করল। টার্গেট আমাদের সভাস্থল। তারা বোধ হয় পূর্বাহ্নেই খবর পেয়ে গিয়েছিল। রাধিকাপুর স্টেশন ঘরের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হল এবং কয়েকজন লোকও মারা গেল। সেখানে ঐ সভার নেতৃবৃন্দ পরিস্থিতি নিয়ে, উদ্বাস্তুদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের বিষয়টিই বিশেষ গুরুত্বলাভ করল। অনেক সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁদের জন্য ক্যাম্পের ব্যবস্থা, খাওয়া-দাওয়া-অস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

দুই তিন দিন পর ফিরে গেলাম কোলকাতায়। সেখানে একটা যোগাযোগের অফিসের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল। মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতির প্রচেষ্টায় ৩/১ ক্যামাক স্ট্রীটে অফিস ঘর পাওয়া গেল। আমি সেই অফিসের দায়িত্ব নিলাম। আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করলেন ব্যরিষ্টার বাদল রশীদ। মুজিবনগর সরকারের পক্ষে এটাই সর্বপ্রথম সংযোগ রক্ষাকারী অফিস। ক্যামাক স্ট্রীটে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ৪৫ প্রিন্সেপ স্ট্রীটে অফিস স্থানান্তরিত করা হয়। আমাকে তখন দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। মুজিবনগর সরকারের ত্রাণ এবং পুনর্বাসন মন্ত্রী ছিলেন জনাব কামারুজ্জামান সাহেব—আমি অনারারী মহা-সচিব। আমাদের সাহায্য করার জন্য এই অফিসেই বসতেন সর্ব জনাব আব্দুল মালেক উকিল, মোঃ সোহরাব হোসেন, আব্দুর রব সেরনিয়াবত, ব্যারিষ্টার বাদল রশীদ, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে "যুব অভ্যর্থনা শিবির" স্থাপন করা হল। এগুলির কাজ ছিল সীমান্ত অতিক্রম করে আসা যুবকদের জন্য আহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, ক্লাশ নেয়া, শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য পি, টি সহ অন্যান্য শারীরিক কসরত ও হালকা অস্ত্র পরিচালনা শিক্ষা করা। ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রীকে এই দায়িত্ব পালনের জন্য মটিভেটর নিয়োগ, তাঁবু-বিছানা-বালিশ, কাপড়-চোপড়, রান্নার যাবতীয় সরঞ্জাম ও নিয়মিত রেশন সরবরাহ করতে হয়েছে। শিবির পরিচালকও আমরা নিয়োগ করতাম। মহাসচিব হিসেবে আমাকে এই শিবির-গুলিতে অর্থ সহ যাবতীয় সরবরাহ প্রথমে সরাসরি এবং পরে জোনাল কাউন্সিলের মাধ্যমে করতে হত।

এছাড়াও আমাদের দায়িত্ব ছিল সীমান্ত বরাবর উদ্বাস্তু শিবিরগুলির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ভারত সরকার সহ বিভিন্ন বিদেশী রাষ্ট্র এবং সাহায্যদাতা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা। উদ্বাস্তুদের কার্ড, ও অন্যান্য বস্তু সরবরাহের দায়িত্ব আমাদেরই পালন করতে হত। মূল কথা, যেহেতু এই সময় শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সরকারী কর্মচারী সহ বিভিন্ন স্তরের উদ্বাস্তুদের রিলিফের প্রয়োজন ছিল সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এই অফিসকে সবদিকেই দৃষ্টি রাখতে হত।

যুব অভ্যর্থনা শিবির ছাড়াও তৎকালীন সশস্ত্র বাহিনী, ই,পি,আর, আনসার মুজাহিদ যাঁরা প্রথম থেকে সরাসরি যুদ্ধে জড়িত ছিলেন (কারণ তাঁরা ছিলেন শিক্ষাপ্রাপ্ত, এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল না) তাঁদের শিবিরগুলির দায়িত্বও আমাদের মন্ত্রিকে নিতে হয়েছে; তাঁদের কাপড় চোপড়, খাওয়া দাওয়া সহ যাবতীয় সরবরাহ আমাদেরকেই করতে হয়েছে। এরপর এসেছে 'যুব শিবির' প্রকল্পটির ধারণা। এর মূল উদ্ভাবক ভারতের তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডঃ ত্রিগুনা চরণ সেন। স্থির হল যুব অভ্যর্থনা শিবির থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের বাছাই করে এই যুব শিবিরে আনতে হবে। সেখানে উচ্চতর মোটিভেশন সহ মাঝারী ধরণের অস্ত্র পরিচালনা প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সেখান থেকে সরাসরি তাদেরকে অস্ত্রদিয়ে গেরিলা হিসেবে দেশের ভেতরে প্রেরণ করা হবে কিংবা কেউ যদি আরো উচ্চতর ভারী অস্ত্রের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে চায়, তাঁদের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে 'প্রশিক্ষণ শিবির' নামে আরো কয়েকটি শিবির স্থাপন করা হয়। এসব যুব শিবির সরাসরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এগুলোতে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ও মেজর পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ। এগুলির পরিচালনা ও নিয়োগ-এর জন্য গঠন করা হয় "Board of Control Youth Camps"। আমাকে এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। সদস্য ছিলেন (১) ডঃ মফিজ চৌধুরী, (২) ক্যাপ্টেন করীম, (৩) শ্রী গৌর চন্দ্র বালা। সচিব ছিলেন তৎকালীন সি, এস, পি, জনাব নূরুল কাদের খান। ডি, জি ছিলেন উইং কমাণ্ডার এস, আর, মির্জা, ডাইরেক্টর ছিলেন আহামদ রেজা। এর অফিস ছিল ৮নং থিয়েটার রোড, মুজিবনগর কেন্দ্রীয় অফিস ভবনে।

কামারুজ্জমান সাহেব এবং আমি প্রায় এই 'যুব অভ্যর্থনা শিবির' এবং 'যুব শিবিরগুলি' পরিদর্শন করতাম। আমাদের জন্য সার্বক্ষণিকভাবে একটি হেলিকপ্টার নির্দিষ্ট করা ছিল। চব্বিশ পরগণা জেলার হাসনাবাদ টাকী থেকে শুরু করে পূর্বাঞ্চলের আগরতলা সাবরুম পর্যন্ত সীমান্ত বরাবর দীর্ঘ এলাকাব্যাপী এই সমস্ত শিবির স্থাপিত ছিল। সুতরাং এগুলির পরিদর্শন কাজ খুব সহজসাধ্য ছিলনা। 'যুব অভ্যর্থনা শিবির' 'যুব শিবির' কিংবা ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হত মুজিবনগর সরকারের বাজেট থেকে। এই হিসাব সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় স্টাফ ছিল সময় সময় এই হিসাব অডিট করা হত। যুদ্ধ পরবর্তী কালে এই অডিটের হিসাব বাংলাদেশ সরকারের নিকট

দাখিল করা হয় এবং ব্যাংকে রক্ষিত টাকা বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রত্যর্পণ করা হয়।

৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১। স্মৃতিতে বড় উজ্জল হয়ে আছে দিনটি। ৩রা ডিসেম্বর ভারত-পাকিস্তান সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। নয় মাসের স্বাধীনতার যুদ্ধ শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। প্রিন্সেপ স্ট্রীটের অফিসে বসে আছি হঠাৎ খবর এলো ভারত সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। চারিদিকেই আনন্দ-উৎসব শুরু হয়ে গেল। অতি আনন্দে সবারই চোখ অশ্রু-সজল। দীর্ঘ নয় মাসের কত মৃত্যু, কত রক্ত, কত বেদনা ও অশ্রুঘন কাহিনীর সকরুণ স্মৃতি। এই স্বীকৃতি আমাদের জন্য একটা পরিচয়—জাতি হিসেবে গৌরবময় পরিচয় এনে দিয়েছে। একটা নতুন রাষ্ট্র, একটা নতুন জাতির জন্ম পৃথিবীর বুকে স্বীকৃত হল।

খুব সম্ভব এদিনেই ফোন পেলাম। রিসিভারে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবের কণ্ঠস্বর। আমার প্রতি নির্দেশ—শরণার্থী প্রত্যাবর্তন বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার এবং ভারত সরকারের মধ্যে এক্ষণে উচ্চ পর্য্যায়ের দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হবে। আমাকে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে বালিগঞ্জ বি, এস, এফ হেড কোয়ার্টারে পৌঁছলাম। আমার গাড়ী পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই বি, এস, এফ-এর এক কর্ণেল এসে গাড়ীর দরজা খুলে ধরলে আমি নামার সঙ্গে সঙ্গেই সেলুট করলো। আশে পাশে দাঁড়ানো আরো কয়েকজন অফিসার একই ভাবে সেলুট দিল। সভাঘরের দরজায় আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন লেঃ জেঃ জগজিৎ সিং অরোরা এবং কেন্দ্রীয় জয়েন্ট সেক্রেটারী শ্রী এ, কে, রায়। কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হল—এর আগেও অনেকবার এই অফিসে এসেছি, এদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আগের তুলনায় আজকের ব্যবহারে বিশেষ পার্থক্য স্পষ্ট চোখে পড়ে। এর কারণ, আজ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পক্ষে সরকারী এবং আনুষ্ঠানিকভাবে এই অফিসে আমার আগমন। আলোচনার টেবিলে বসলাম। দুপার্শ্বে দুই সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ। আমার সামনে বাংলাদেশের পতাকা টেবিলের স্ট্যাণ্ডে দাঁড় করানো। বিপরীতে ভারতের পতাকা। আলোচনার বিষয় ভারতে আগত বাংলাদেশের শরণার্থীদের দেশে প্রত্যাবর্তন। প্রথমে আমি ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য এবং এই সভার আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। ভারত পক্ষে আলোচনার সূত্রপাত করেন শ্রী এ, কে, রায়। তিনি বললেন, বাংলাদেশে শরণার্থীরা কিভাবে ফিরে যাবেন, তার একটা ফরমুলা উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। আলোচনা অগ্রসর হবার পূর্বেই আমি বললাম, এটাতো সম্পূর্ণ আপনাদের ব্যাপার। কারণ, প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছেন মর্যাদার সংগেই আমি বাংলাদেশের শরণার্থীদের দেশে ফেরৎ পাঠাবো। সুতরাং

ফরমুলা উদ্ভাবন করে নতুন সিদ্ধান্তের প্রয়োজন নেই। আমার এই কথায় হঠাৎ ভারত পক্ষ নীরব হয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রীর সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করে তাঁর নির্দেশ লাভের জন্য শ্রী রায় কিছুক্ষণের জন্য সভার কাজ বন্ধ রাখলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি সভায় এসে বললেন প্রধানমন্ত্রী শরণার্থী প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর আনুসংগিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা হল। বিভিন্ন স্থান থেকে সুবিধামত শরণার্থীরা বাস, ট্রেন এবং অন্যান্য যানবাহনে দেশে ফিরবেন। ফেরার সময় হাঁড়ি, পাতিল, চাল ইত্যাদি এবং কিছু নগদ টাকা প্রত্যেককে দেয়ার সিদ্ধান্তও গৃহীত হল। এক কোটি বাংলাদেশের শরণার্থীকে সসম্মানে দেশে ফেরত পাঠানোর প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য বহু টাকা ব্যয় এবং এতবড় আয়োজনের ব্যবস্থা—এটা একটা সহজ কাজ ছিলনা। মিসেস গান্ধীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এল। আর একবার সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অফিসে ফিরে এলাম।

১৬ ডিসেম্বরের বিজয়ের আনন্দ এবং বহু আকাঙ্খিত স্বাধীন বাংলাদেশের মাটির অভূতপূর্ব অনুভূতি তখনো সদ্য সজীব। এ অবস্থায় একটা প্রলয়ঙ্করী ও মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে যা দিনাজপুরবাসী কোন দিন বিস্মৃত হবেনা। দিনাজপুরের মহারাজাদের তৈরী স্কুল। নাম মহারাজা গিরিজানাথ হাই স্কুল। বিস্তীর্ণ এলাকা। সামনে বিরাট খেলার মাঠ। বিরাট স্কুল গৃহ, মজবুত এবং দেখবার মত। ১৯৪২ সালে অবিভক্ত ভারতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে কোলকাতা রিপণ কলেজের একটি শাখা দিনাজপুরে খোলা হয় এবং এই মহারাজা স্কুলেই সকালের শিফটে সেই কলেজ চলতো। পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর ৭ নং সেক্টরের সব মুক্তিযোদ্ধা দিনাজপুর শহরে প্রবেশ করলে তাদের জন্য কয়েকটি শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়। এর মধ্যে দিনাজপুর ষ্টেডিয়াম ও মহারাজা স্কুল গৃহ—এই দুটিই ছিল বড় শিবির। মহারাজা স্কুলের সামনের মাঠে আণ্ডার গ্রাউণ্ড ঘর তৈরী করে উদ্ধারকৃত সমস্ত অস্ত্র রাখার ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় প্রতিদিন ট্রাকে করে বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্র উদ্ধার করে নিয়ে এসে এখানেই জমা করা হত। সেদিন ৬ই জানুয়ারী। হিলি সীমান্ত থেকে দুই ট্রাক অস্ত্র শস্ত্র (বিভিন্ন প্রকারের তাজা বোমা সহ) নিয়ে এলে সেগুলো ট্রাক থেকে নামিয়ে মাটির নীচের ঘরে রাখার কাজ শুরু হয়। সময় সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ। হয়ত অন্যমনস্কতার কারণে তাজা বোমা কারো হাত থেকে পড়ে গিয়ে বিস্ফোরিত হয়ে যায়। এই বিস্ফোরণ এত প্রচণ্ড এবং ভয়াবহ হয় যে সম্পূর্ণ স্কুল গৃহ ধ্বংস হয়ে যায়। স্কুল গৃহের সামনের মাঠটি একটি বিরাট পুকুরে পরিণত হয়। শুধু দিনাজপুর নয় এই শহর থেকে ১৯ মাইল দূরে পার্বতীপুর শহরেরও কিছু বাড়ী ঘরের জানালার কাচ ভেংগে যায়। ৪৫০ জনের মত মুক্তিযোদ্ধা সেখানে থাকতেন। দুর্ঘটনার পর আহতদের আর্তনাদে এক করুণ এবং মর্মান্তিক দৃশ্যের

অবতারণা ঘটে। আহতদের বিভিন্ন হাসপাতাল ও ডাক্তারদের কাছে পাঠানো ও নিহতদের লাশ উদ্ধার কার্যে শহরের হাজার হাজার মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে। তবে পুরো মৃতদেহ পাওয়া যায়নি বলা চলে। প্রায় সকলেরই দেহ ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পাওয়া যায়। লাশের অংগ প্রত্যংগ এক জায়গায় জমা করে মোটামুটি হিসেবে ১৬০ জনের মত নিহত মুক্তিযোদ্ধার লাশ সংগ্রহ করে শহরের তিন মাইল উত্তরে সুবিখ্যাত চেহেল গাজী মাজারের একপাশে দাফন করা হয়। ঘটনার ৬/৭ মাস পরে ধ্বংসস্তুপ পরিষ্কার করার সময় আরো প্রায় ৪০টি মাথার খুলি পাওয়া যায়। নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে যারা বীরের মত জয়-লাভ করে স্বাধীনতার রক্ত সূর্যকে ছিনিয়ে আনলো তাদেরকে সামান্য একটা দুর্ঘটনার শিকার হয়ে এরূপ মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করতে হল। বীরদের এই সকরুণ মৃত্যুবরণ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক সকরুণ মর্মন্তুদ অধ্যায় সৃষ্টি করে রাখবে।

মোহাম্মদ ইউসুফ আলী
নভেম্বর, ১৯৮৪।

মোহাম্মদ বয়তুল্লাহ

নওগাঁ ৭ উইং ই, পি, আর হেড কোয়ার্টারে ২৫শে মার্চের পূর্ব হতে ক্যাপ্টেন ও মেজর পর্যায়ের পাঞ্জাবী অফিসারবৃন্দের উপস্থিতির কারণে সংগ্রামের শুরুতে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু মার্চের শেষ ভাগে মেজর নাজমুল হক, ও ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিন বদলী হয়ে নওগাঁ আসেন এবং তাঁরা উভয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁরা প্রথমেই উপ-রোক্ত পাঞ্জাবী মেজর, ক্যাপ্টেন ও তৎকালীন নওগাঁর পাঞ্জাবী এস, ডি, ও-কে গ্রেফতার করেন। এসময় আমি নওগাঁ সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ছিলাম। আমার সক্রিয় সহযোগিতায় কয়েকদিনের মধ্যেই নওগাঁর বিভিন্ন ই, পি, আর ক্যাম্পের পাঞ্জাবী ও পাঠান সিপাহীদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়। এবং এর ফলে সমস্ত নওগাঁ শত্রুমুক্ত হয়। আমার নেতৃত্বে এবং মেজর নাজমুল হক ও ক্যাপ্টেন গিয়াস উদ্দিনের পূর্ণ সহযোগিতায় বহু সংখ্যক যুবকদের সামরিক শিক্ষা দানের জন্য নওগাঁ কে, ডি স্কুল ও ডিগ্রীকলেজে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ঐ সময় বগুড়ার পাক-বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রসম্ভার (Arms Ammunition dump) ছিল। রংপুর দিনাজপুর থেকে পাক-বাহিনী উক্ত অস্ত্র-শস্ত্র দখল করার জন্য বগুড়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকলে ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিনের নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক ই, পি, আর ও কিছু সংখ্যক নতুন শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবককে নিয়ে বগুড়ার উত্তর ধারে

খান সেনাদের অগ্রগতি রোধ করা হয়। তাদের কিছু সংখ্যক সৈন্য মারা গেলে তারা পশ্চাদপসরণ করে। এই যুদ্ধে নওগাঁর ১৪ বছর বয়স্ক বাবলু নামক এক তরুণ যোদ্ধা প্রথম শহীদ হন। ক্যাপ্টেন গিয়াসের নেতৃত্বে ঐ সময় বগুড়া থেকে বেশ কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। ইতিমধ্যে ট্রেনিং প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এইসব তরুণ মুক্তিযোদ্ধা ও ই, পি, আর জোয়ানদের নিয়ে ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিনের নেতৃত্বে পাঞ্জাবী-দের তৎকালীন শক্ত কেন্দ্র (Strong hold) রাজাশাহী সেক্টর আক্রমণ করা হয় এবং বহু পাঞ্জাবী সৈন্য খতম করা হয়। রাজশাহীর যুদ্ধ পরিচালনায় অস্ত্র-রসদ সরবরাহ এবং সামগ্রিক যুদ্ধ পরিকল্পনা শহীদ মেজর নাজমুল হক এর নেতৃত্বে নওগাঁ হতে পরিচালিত হয়। এই পর্যায়ে সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি হিসেবে আমি সামগ্রিক সহযোগিতা প্রদান করি।

এই সময়ে আর্টিলারীর অভাবে সংগ্রাম ব্যাহত হতে থাকলে এবং পাক-বাহিনী আরিচা-নগরবাড়ী হয়ে রাজশাহীর দিকে অগ্রসর হতে পারে এই আশংকায় উন্নত ধরণের অস্ত্র প্রাপ্তির আশায় আমি প্রথমে একাকী মালদহ শহরে ভারতীয় সামরিক ও বেসামরিক অফিসারদের সাক্ষাৎ এর জন্য যাই। সেখানে নবাব-গঞ্জের এম, সি, এ ডাক্তার মঈনদ্দিন ওরফে মন্টু ডাক্তার সাহেবের সাথে দেখা হয়। সামরিক ও বেসামরিক অফিসারদের সাথে আলোচনার পর ঠিক হয় যে সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট অস্ত্র সরবরাহ করতে তাদের আপত্তি নেই। কিন্তু তৎপূর্বে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে তাদের আলোচনা প্রয়োজন। এমতাবস্থায় আমি নওগাঁ ফিরি এবং মেজর নাজমুল হককে সাথে নিয়ে পুনরায় মালদহ যাই। এসময়ে ভারতীয় অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যে ক্যাপ্টেন গিয়াস রাজশাহী সেনানিবাস দখলের প্রায় কাছাকাছি অবস্থায় পৌঁছেছিলেন। অস্ত্র সাহায্য প্রাপ্তির আশ্বাস নিয়ে আমি ও নাজমুল হক নওগাঁ ফিরে আসি। কিন্তু ২/১ দিনের মধ্যে পাক সৈন্য ভারী কামান ও অন্যান্য অত্যাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত হয়ে নগরবাড়ী অতিক্রম করে পাবনা দখল করার পর ট্রেনযোগে নওগাঁ অভি-মুখে এবং সড়কযোগে রাজশাহী অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকলে আমরা আত্ম-রক্ষার্থে ১৭ই এপ্রিল তারিখে মেজর নাজমুল হকের সাথে পরামর্শ করে বালুর ঘাট হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করি।

উল্লেখ্য যে, এই এলাকার সমস্ত সংগ্রামের অধিনায়ক মেজর নাজমুল হক শিলিগুড়ি থেকে তরঙ্গপুর ফেরার পথে আকস্মিকভাবে স্বহস্তচালিত জীপ দুর্ঘটনায় শহীদ হন।

এরপর আমি পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জের মুক্তিফৌজের সামরিক শিক্ষা শিবিরে, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়ার শিক্ষানবিশ যুবকদেরকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য দীর্ঘদিন অবস্থান করি এবং ট্রেনিং

ক্যাম্প হতে সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রথম এবং দ্বিতীয় ব্যাচের মুক্তি সেনাদের নিয়ে 'শোবরা অপারেশন' শিবিরে অবস্থান করি। এবং তাদের সঙ্গে থেকে তাদেরকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে থাকি। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন এলাকা সেক্টরে বিভক্ত করলে আমি তরঙ্গপুর 'শোবরা অপারেশন' ক্যাম্পের জন্য সিভিল লিয়াজোঁ অফিসার নিযুক্ত হয়ে কাজ চালিয়ে যেতে থাকি।

যে সমস্ত এলাকায় খান সেনাদের গেরিলা যুদ্ধে ঘায়েল করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাঙ্গাইখড়া। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের দিকে এখানে ৫টি বিরাট নৌকা ভর্তি প্রায় ৭০/৮০ জন খান সেনাকে তাদের অফিসার সহ ব্রাস ফায়ারে খতম করা হয়। সাহাগোলা ব্রীজ ধ্বংস করে দেয়া হয়। এবং সৈন্য বোঝাই একটি রেলগাড়ী বিধ্বস্ত করে দেয়া হয়। এখানে প্রায় শতাধিক খান সেনা নিহত হয়। নওগাঁ-মহাদেবপুর হাই রোডের মধ্যে হাপানিয়া গ্রামে মাইন বিস্ফোরণের দ্বারা একটি সৈন্য বোঝাই ট্রাক বিধ্বস্ত করা হয়। এতে ৮/৯ জন পাক-সেনা মারা যায়। হাপানিয়ার দক্ষিণে আরেকটি বিস্ফোরণে দু'জন অফিসার সহ ৫/৬ জন পাক-সৈন্য নিহত হয়।

মোহাম্মদ বয়তুল্লাহ
গণপরিষদ সদস্য
(সাবেক এম, এন, এ) রাজশাহী
২২ অক্টোবর, ১৯৭২।

মোহাম্মদ শামসুল হক চৌধুরী

২৩শে মার্চ ভুরুঙ্গামারী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে কুড়িগ্রাম মহকুমা ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ, আওয়ামী লীগ সেচ্ছাসেবক বাহিনী, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ, সাবেক ই,পি,আর, আওয়ামী লীগ কর্মী, নেতা এবং সর্বস্তরের জনগণের এক বিরাট সমাবেশে আমি সভাপতিত্ব করি। এই সমাবেশে ইয়াহিয়ার ঘৃণ্য চক্রান্ত নস্যাৎ করে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তানী সৈন্যদের কবল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য শপথ গ্রহণ করা হয়। ঐ সমাবেশেই স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ভুরুঙ্গামারীর ইতিহাসে এটিই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন।

২৫শে মার্চের কালো রাত্রিতে বাংলাদেশে ব্যাপক গণহত্যা শুরু হলে ২৬শে মার্চ আমরা জরুরী ভিত্তিতে স্থানীয় নেতাদের নিয়ে এক গোপন বৈঠকে থানা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করি এবং সমস্ত ইউনিয়নে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার জন্য জরুরী নির্দেশ প্রদান করি। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ মোতাবেক সর্বস্তরের জনগণকে সংঘবদ্ধ করার জন্যও আমরা কর্মসূচী গ্রহণ করি।

ইতিমধ্যে ভুরুঙ্গামারী থানার সীমান্তবর্তী ফাঁড়িগুলোর সাবেক অবাঙ্গালী ই,পি আর-রা সাবেক বাঙ্গালী ই পি আরদের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। ই পি আর আনিস মোল্লা এবং রওশনুল বারীর নেতৃত্বে ই,পি,আরের সদস্যবৃন্দ আমাদের সহযোগিতা কামনা করলে স্থানীয় কর্মী ও নেতৃবৃন্দসহ আমার ভুরুঙ্গামারীস্থ বাসস্থানে এক জরুরী বৈঠকে অবাঙ্গালী ই,পি,আরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে বাঙ্গালী ইপিআরদের সক্রিয় সাহায্যের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

২৮শে মার্চ অবাঙ্গালী ই,পি,আরদের বিরুদ্ধে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরদিন ২৯শে মার্চ বাঙ্গালী ই,পি,আর এবং সম্মিলিত ছাত্র জনতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে জয়মনির হাট ক্যাম্পের একজন অবাঙ্গালী সুবেদার, একজন ড্রাইভার এবং একজন অয়ারলেস অপারেটর নিহত হয়। উক্ত জয়মনির হাট ক্যাম্পে অবাঙ্গালী ই,পি,আরদের সঙ্গে সহযোগিতাকারী জয়মনিরহাটের একজন অবাঙ্গালী চক্ষু চিকিৎসক জনগণের হাতে নিহত হয়।

অত্র থানার অন্যান্য সীমান্ত ফাঁড়ি যেমন কেদার, সোনাহাট, ধলভাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালী ইপিআরদের সঙ্গে সংঘর্ষে কয়েকজন অবাঙ্গালী ইপিআর নিহত হয়। অবাঙ্গালী ইপিআরদের কবল থেকে জয়মনির হাট ক্যাম্প উদ্ধার করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অস্ত্রাদি আওয়ামী লীগের তত্বাবধানে রাখা হয় এবং নাগেশ্বরী ও ভুরুঙ্গামারী থানার সমস্ত বাঙ্গালী ইপিআরগণকে তাদের অস্ত্র সমেত উক্ত ক্যাম্পে জরুরী ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ করা হয়।

অতঃপর সাবেক বাঙ্গালী ইপিআরগণের সঙ্গে আনসার, মুজাহিদ, এবং আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী জয়মনিরহাটে যোগ দেয়। ছাত্র ও যুবসম্প্রদায়ও এখানে যোগ দেয়। এদের সকলকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিয়ে আমরা হানাদার বাহিনী প্রতিরোধের ব্যবস্থা করি।

জয়মনিরহাটে সংঘবদ্ধ এই দলকে বিভিন্ন ক্যাম্প এবং পুলিশ ফাঁড়ি থেকে প্রাপ্ত সামান্য অস্ত্র দিয়েই রংপুর সামরিক গ্যারিসন থেকে হানাদার বাহিনী যাতে অত্র অঞ্চলে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য তিস্তাপুল প্রতিরোধ কেন্দ্রে পাঠানো হয়। এই সংঘবদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়া সহ যাবতীয় আর্থিক দায়িত্ব আমি স্থানীয় কর্মী ও নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় পালন করেছি। অতঃপর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র যোগান দেয়াই ছিল বড় সমস্যা। ২৯শে মার্চ আমি ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের আসাম ও পশ্চিম বঙ্গ সীমান্তে সোনাহাট এবং সাহেবগঞ্জ সীমান্ত ঘাঁটির সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করি। আমাদের অনুরোধে উক্ত সেনাধ্যক্ষ প্রাথমিক বেসরকারী সাহায্য হিসেবে ১লা এপ্রিল মধ্যরাতে ২টি হাল্কা মেশিনগান, কিছু সংখ্যক রাইফেল এবং প্রচুর হাত বোমা প্রদান করেন। এসব অস্ত্র ও গোলাবারুদ তিস্তা প্রতিরোধ কেন্দ্রে সারাসরি পাঠানো হয়। পরবর্তীকালে আমি সোনাহাট এবং সাহেবগঞ্জের ভারতীয়

সীমান্ত ঘাঁটি থেকে সামরিক সাহায্য নিয়ে মুক্তি যোদ্ধাদের কাছে পাঠিয়েছি।

৫ই এপ্রিল ভুরুঙ্গামারী কলেজে আমরা প্রথম মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলি। যুবক এবং ছাত্ররা এখানে প্রশিক্ষণ নিতে থাকে। শীঘ্রই বাংলাদেশের অধিকৃত অঞ্চল থেকে বহু ছাত্র-যুবক এখানে আসতে থাকলে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি সম্প্রসারণ করা হয়। সমগ্র রংপুর জেলার বিভিন্ন সীমান্ত ফাঁড়ি থেকে বাঙ্গালী, ই, পি, আরবৃন্দকে আমরা ভুরুঙ্গামারী থানায় সংঘবদ্ধ করতে সমর্থ হই। বিভিন্ন সীমান্ত ফাঁড়ি থেকে আগত ই, পি, আরদের দুই কোম্পানী ই, পি, আরকে তিস্তা প্রতিরোধ কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেই। এক কোম্পানী ই, পি, আরকে ভুরুঙ্গামারীতে সংরক্ষিত রাখা হয়। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম ও প্রধান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিসেবে ভুরুঙ্গামারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হানাদার কবলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অসংখ্য গেরিলা যোদ্ধা তৈরী করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাথমিক ট্রেনিং দিয়েই গেরিলাদেরকে সারাসরি প্রতিরোধ ঘাঁটিতে পাঠানো হয়েছে। পরবর্তীকালে এখান থেকে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে পাঠানো হয়েছে। সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে অত্র থানার বিভিন্ন ইউনিয়নের জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আর্থিক সাহায্য করেছেন। এছাড়া ভারতীয় জনগণ ভুরুঙ্গামারী থানার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে চাল, গম, আলু, কেরোসিন, পেট্রোল, সিগারেট, বিস্কুট, কাপড়, ঔষধপত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করেছেন।

৮ই এপ্রিল ভারতে আশ্রিত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের এক জরুরী গোপন নির্দেশ আমি পাই। উক্ত নির্দেশে উত্তরাঞ্চলের সাবেক গণপরিষদ সদস্যবৃন্দকে অবিলম্বে ভারতের এক অজ্ঞাত স্থানে সম্মিলিত হয়ে স্থানীয় ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়। সে মোতাবেক ৯ই এপ্রিল আমি অত্র অঞ্চলের অপরাপর গণপরিষদ সদস্যদের নিয়ে ভারতের আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া জেলার সোনাহাট সীমান্ত ঘাঁটিতে উপস্থিত হই। অতঃপর সামরিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে আমাদেরকে আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া জেলার রূপসা বিমান বন্দরে নিয়ে আসা হয়। এখানেই আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রধান নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম সহ বহু নেতার সাথে আমরা প্রথম মিলিত হই। কিছুক্ষণের মধ্যে তাজউদ্দিন আহমদ, কুষ্টিয়ার ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম, শেখ ফজলুল হক মণি, ভারতের ইস্টার্ন কমাণ্ডের প্রধান জগজিৎ সিং অরোরা, আসাম ৮২তম সীমান্তরক্ষী ব্যাটালিয়নের সেনাধ্যক্ষ, কর্ণেল আর, দাস, রূপসা বিমান বন্দরে অবতরণ করেন এবং আমাদের সঙ্গে জরুরী বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে উত্তরাঞ্চলের ভারতীয় সামরিক সাহায্য, মুক্তিবাহিনীর তত্ত্বাবধান ও তাদের সার্বিক দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করা হয়। এই সময় জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, জনাব মতিউর রহমান সহ সাবেক বাংলাদেশ বাহিনী প্রধান কর্ণেল ওসমানী

মুক্তাঞ্চল সফর করে আমাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। এভাবে উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ, ও স্থানীয় জনগণের সাহায্য সহযোগিতা, এবং ভারতীয় জনগণ ও সামরিক কর্তৃপক্ষের সাহায্যে আমরা ২৬শে মে পর্যন্ত কুড়িগ্রাম শহরের উত্তরে ধরলা নদীর উত্তর তীরের প্রতিরোধ ব্যাবস্থা অটল রাখতে সক্ষম হই। ২৬শে মে রাতে পাক-বাহিনীর ভারী অস্ত্রের মুখে আমাদের পাটেশ্বরী প্রতিরোধ ঘাঁটি ভেঙে গেলে আমরা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করি।

ভারতে প্রবেশের পর পরই মুক্তিযোদ্ধাদের সংঘবদ্ধ করা হয়। ভারতের পশ্চিম বাংলা সীমান্তের সাহেবগঞ্জ ও আসামের সোনাহাটে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর অনুমোদনে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখান থেকেই মুক্তিযোদ্ধারা অধিকৃত ভুরুঙ্গামারী এবং নাগেশ্বরী থানার বিভিন্ন স্থানে হানাদারদের প্রতি আঘাত হানতে থাকে। বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মোতাবেক অধিকৃত অঞ্চল থেকে মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ করার জন্য পশ্চিম বাংলা সীমান্তে যুবশিবির খোলার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় এই যুবশিবিরগুলো স্থানীয় ভারতীয় জনগণের আর্থিক সাহায্যপুষ্ট ছিল। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকার যুবশিবিরগুলোর আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করে। যুবশিবিরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাথমিক ট্রেনিং এর পর তাদের উচ্চতর ট্রেনিং এর জন্য ভারতের অভ্যন্তরে পাঠানো হতো।

দুধকুমার নদীর পূর্বতীরস্থ নাগেশ্বরী এবং ভুরুঙ্গামারী থানার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল হানাদার কবল মুক্তছিল। এই সমস্ত অঞ্চলের জনগণের সাবিক সাহায্যের জন্য আমরা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়েছি। মুক্তাঞ্চলের জনগণের নিরাপত্তার জন্য নাগেশ্বরী থানার সুবলপাড় বন্দরে এবং মাদারগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধাদের ছোট ছোট ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছিল। পশ্চিম বাংলার কুচবিহার জেলা শহরে উত্তরাঞ্চলের সাবেক গণপরিষদ সদস্যবৃন্দের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ সরকারের Northern Zone অফিস হবার পর পরই মুক্তাঞ্চলে চিকিৎসা ও ঔষধপত্রের তীব্র অভাব জরুরী ভিত্তিতে মিটানো হয়। মুক্তাঞ্চলের সোনাহাটে প্রধান মেডিক্যাল কেন্দ্র স্থাপন করে সেখান থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে উক্ত মেডিক্যাল কেন্দ্র খোলা হয়। বাংলাদেশ সরকারের কুচবিহারস্থ Northern Zone Medical Centre থেকে মুক্তাঞ্চলে ঔষধপত্র সরবরাহ করার ব্যবস্থা আমরা করেছি। আসাম প্রদেশে ৮২তম ব্যাটেলিয়ান হেড কোয়ার্টারে যোগাযোগ করে সেখান থেকে ঔষধপত্র লাভ করেছি এবং উক্ত অঞ্চলের জনগণকে বিনামূল্যে বিতরণ করেছি। মুক্তাঞ্চলে খাদ্য সংকট দেখা দিলে আমি তা অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে অবহিত করি এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে Northern Zone এর সাবেক চেয়ারম্যান, সাবেক গণপরিষদ সদস্য জনাব মতিয়র রহমানকে মুক্তাঞ্চল পরিদর্শন করতে আহবান জানাই। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে

তিনি ৭১ সালের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সোনাহাটে এক বিরাট গণসমাবেশে ১০ হাজার টাকা প্রদান করেন। স্থানীয় কর্মীদের সহায়তায় উক্ত টাকা বিতরণ করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশ সরকারের Northern Zone এর প্রচার বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করা হয়েছিল। মুক্তাঞ্চলের জাতীয় ঐক্য অক্ষুন্ন রাখার সর্বাত্বক প্রচেস্টা আমরা সাধ্যমত চালিয়েছিলাম।

বাংলাদেশের সাবেক ই, পি, আর বাহিনীর ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ এর অধীনস্থ সাহেবগঞ্জ ঘাটির গেরিলা যোদ্ধা এবং ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর আসাম সীমান্তের সোনাহাট ঘাটির গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সৈনদের এক যৌথ অভিযানের পর ১৭ই নভেম্বর ভুরুঙ্গামারী মুক্ত হয়। এর পরপরই অত্র থানার আন্ধারীঝাড় বাজার থেকে পাক বাহিনী তাদের গোলন্দাজ বাহিনী সরিয়ে পিছু হটে গেলে ভুরুঙ্গামারী থানা শত্রুমুক্ত হয়। এই এলাকা মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে আশ্রিত জনগণ বিধ্বস্ত ভুরুঙ্গামারীতে দলে দলে প্রবেশ করতে থাকে। মাতৃভূমিতে পা দিয়েই জনগণের আনন্দ উল্লাস আমাদেরকে অভিভূত করে। ডিসেম্বরে সারা বাংলাদেশের মুক্তির সাথে সাথে জনগণ এক অভূতপূর্ব আনন্দে উল্লসিত হয়েছে। দীর্ঘ পঁচিশ বছরের স্বাধীকার আন্দোলন থেকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে জনগণ বাঙালী জাতির এক ঐতিহাসিক বিজয় বলে মনে করেছে।

শামসুল হক চৌধুরী
গণপরিষদ সদস্য, (সাবেক এম,পি,এ)
রংপুর-১২
১৭ মে, ১৯৭৩।

অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল হক

স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভ হবার প্রাক্কালে আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলাম। সত্তরের নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে পাক-সামরিক জান্তার ক্রিয়াকলাপ অনেকের মত আমার মনেও গভীর সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনের তারিখ পরিবর্তন এবং ঢাকার বৈঠকে যোগদানের ব্যাপারে ভুট্টোর অনীহা প্রকাশের ফলে বৈঠক অনিশ্চিত হয়ে পড়লে সারা দেশ ক্ষোভে উত্তেজনায় ফেটে পড়ে। এই পটভূমিতে ১৬ মার্চ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া-ভুট্টো ও সংখ্যাগরিষ্ঠ

আসন লাভকারী আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে যে আলোচনা চলে স্বভাবতই তীক্ষ্ন দৃষ্টি নিয়ে তা আমরা অনুসরণ করছিলাম। আমার ধারণা ছিল এই চরম সংকট ও অচলাবস্থার নিরসনে তাঁরা হয়ত একটা সমঝোতায় উপনীত হবেন।

অন্যদিকে সারাদেশে প্রতিদিনই জেনারেল ইয়াহিয়ার সামরিক তৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা হচ্ছিল। ২৩ মার্চ বিকেলে চট্টগ্রাম শহরে ছাত্র-শিক্ষক জনতার একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয় ও প্যারেড গ্রাউণ্ডে গিয়ে মিলিত হয়। এই জনসভায় আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র-শিক্ষক অনেকে গিয়েছিলাম। সভা চলাকালে খবর পেলাম, চট্টগ্রাম বন্দরে বাঙালী শ্রমিকরা জাহাজ থেকে অস্ত্র নামাতে অস্বীকার করায় পাক-বাহিনীর জোয়ানরা গোলাবর্ষণ করেছে। এর পর সভা মুলতবী হয়ে যায়। চট্টগ্রাম শহর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফিরে আসার সময় এক অভূতপূর্ব স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ প্রত্যক্ষ করি। তরুণ ও যুবকরা স্বেচ্ছাসেবকের প্রতীক নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছে। দেখে মনে হলো তারা পাক-সামরিক অভিযান বাধা দিতে অকুতোভয় প্রহরীর মত সদা সতর্ক। তারা জানাল, এ পথে যাওয়া সম্ভব হবেনা। আমরা আর সে পথে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের দিকে এগুতে পারিনি। গ্রামের ভেতর দিয়ে পায়ে হাঁটা পথ খুঁজে নিয়ে আমাদের ক্যাম্পাসে পৌঁছুতে অনেক রাত হয়েছিল।

দেশের এই ক্রান্তিকালে যেকোন মুহূর্তে নতুন কোন ঐতিহাসিক অধ্যায়ের উম্মোচন হতে পারে এরূপ একটা অবস্থায় গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে প্রতিদিন বেতারে খবর শুনতাম। ২৬ মার্চ সকালে রেডিও খুলতেই হঠাৎ অস্বাভাবিক অবস্থা মনে হলো। ভারী কন্ঠ, যা কোন বাঙালীর বলে মনে হয়নি, ঘোষণা শুনতে পেলাম, ঢাকাতে কার্ফিউ জারি হয়েছে, পরবর্তী ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করুন। সেই মুহূর্তে ঢাকায় কি ঘটেছে তা জানা যায়নি তবে সাংঘাতিক কিছু একটা হয়েছে তা আঁচ করা যাচ্ছিল।

দ্বিপ্রহরের পর থেকে আকাশবাণীর খবরে ঢাকার কিছু কিছু সংবাদ পেলাম-ই পি আর ও পুলিশ ক্যাম্প পাক সেনারা আক্রমণ করেছে, নিরীহ জনসাধারণের ওপরও তারা ভারী অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে চড়াও হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অনেক পরিচিতজনের নিহত হবার কথাও শুনলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে চট্টগ্রামে আমরা কি করব তা স্থির করতে পারিনি।

২৬ মার্চ রাত বারটার দিকে উপাচার্য ডঃ এ, আর, মল্লিক আমাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন আরো যাকে পান সংগে নিয়ে আসবেন। গিয়ে দেখি অনেক ই পি আর (তদানীন্তন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)-এর লোকজন রামগড় ও সন্নিহিত সীমান্ত এলাকায় তাদের স্থান ছেড়ে ক্যাম্পাসে এসে জড় হয়েছে। এদের খাওয়ার ব্যবস্থা করাই ছিল সেই মুহূর্তের সবচে জরুরী কাজ। আমাকে সেই দায়িত্ব দেয়া হলো। অন্যান্য কর্মীদের সংগে নিয়ে গ্রামে গেলাম। চাল, ডাল

তরকারী ইত্যাদি সংগ্রহ করে তাদের খাওয়ার আয়োজন করা হল। এ অবস্থায় তারা কি করবে এই নিয়ে আমাদের সংগে আলোচনা হয়। চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করা যায় কিনা এবং কি উপায়ে তা করা যাবে এ ব্যাপারে অনেক কথাবার্তা হল। উল্লেখ্য যে, এদের মধ্যে অফিসারের সংখ্যা ছিল কম। অস্ত্রশস্ত্রও তেমন ছিলনা।

ডঃ মল্লিক বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। অবস্থা মোকাবেলার জন্য তাঁর গোপন নিদেশে আমরা মলোটভ ককটেল জাতীয় কিছু বোমা তৈরী করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। এ ব্যাপারে তিনি আমাকে সাহায্য করার জন্য সি,এস,আই,আর-এর ডঃ আব্দুল হক-এর সংগে যোগাযোগ করতে বলেন। রসায়ন বিভাগের ডঃ মেসবাহউদ্দীন ও পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ডঃ এখলাসউদ্দীনের সহায়তায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরীতে আমরা এ ধরণের কিছু হাতবোমা তাৎক্ষণিকভাবে বানাতে সক্ষম হই এবং সেগুলোর পরীক্ষামূলক ব্যবহার করি।

২৭ তারিখ কালুরঘাট স্বাধীনবাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র হতে মেজর জিয়া কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা শোনা যায়। ঐ ঘোষণায় প্রথমে তিনি নিজেকে প্রেসিডেন্ট বলে উল্লেখ করেছিলেন পরে তিনি তা সংশোধন করে শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা সম্প্রচার করেন। তাঁর নেতৃত্বে ইস্ট বেংগল রেজিমেন্টের জোয়ানরা কালুরঘাটে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে বলেও আমরা খবর পাই। ডঃ মল্লিক কালুরঘাট স্টেশনের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করেন।

এই বেতার ঘোষণার পর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থান করা আমাদের কারো পক্ষে আর নিরাপদ ছিলনা। মল্লিক সাহেব ক্যাম্পাসে অবস্থানরত মহিলা ও শিশুদের আগে সরাবার ব্যবস্থা করেন। ৩০ মার্চ সকালের দিকে অন্যান্যদের সংগে আমার পরিবার কুণ্ডেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয় হোস্টেলে আশ্রয় নেয়। অপরাহ্নে আমরাও মিলিত হই তাদের সংগে। নিরাপত্তার আশংকা আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলছিল সর্বত্র। ফজলুল কাদের চৌধুরীর লোকেরা সেখানে আমাদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে শুরু করে। আমরা সত্বর সে স্থান ত্যাগ করে নাজিরহাটে চলে যাই। এখানে মল্লিক সাহেব ডঃ আনিসুজ্জামান, সৈয়দ আলী আহসান এবং আরো অনেক শিক্ষক অবস্থান করছিলেন। ডঃ মল্লিক চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা হান্নান সাহেব ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতার সংগে যোগাযোগ রক্ষা করছিলেন। তাঁরা সীমান্ত অতিক্রম করার জন্য নির্দেশ দেন। সকলে চলে যাবার পর আমরা প্রায় আরো এক সপ্তাহ সেখানে কাটাই। এ সময় মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। বিভিন্ন স্থানে সেতু উড়িয়ে তারা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে থাকে। এ অবস্থায় আমরা কয়েকটি পরিবার নৌকায়

করে রামগড় টি এ্যাস্টেটে চলে যাই। সেখানে একরাত কাটাবার পরই হানাদার বাহিনীর অভিযানের সংবাদ ও গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাই। অতি সত্বর আমরা নদী পার হয়ে ভারতের সাবরুমে একটি প্রাইমারী স্কুলে এসে পৌঁছি। এখানে সপ্তাহ খানেক অবস্থান করি। স্কুলের একেকটি কামরায় প্রায় ১০টি করে পরিবারকে এই ক'দিন কোনমতে থাকতে হয়েছিল। এরপর আগরতলায় এসে ডঃ মল্লিক ও বাংলাদেশ থেকে আগত অনেকের সংগে দেখা হয়। এখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করি। একটি টেকনিক্যাল স্কুলের পরিত্যক্ত হোস্টেলে স্বপরিবারে আশ্রিত হই। মে মাসের প্রথম দিকে ডঃ মল্লিক কলকাতায় যান। সৈয়দ আলী আহসানও তাঁর পর পরই চলে যান।

আগরতলায় শরণার্থীদের জন্য ক্যাম্প খোলা হয়েছিল। এসব ক্যাম্পে বাংলাদেশ থেকে আগত যুবক ও ছেলেদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমি এসব ক্যাম্পে যাতায়াত করেছি এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এখানে মেজর জিয়া, ক্যাপ্টেন আকবর হোসেন, মেজর মীর শওকত আলী প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সামরিক ব্যক্তিবর্গের সংগেও মাঝে মাঝে আমার দেখা সাক্ষাৎ হত। মেজর নুরুজ্জামান আমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করেছিলেন।

ইতিপূর্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করা এবং শরণার্থী শিক্ষকদেরকে নানাভাবে সহায়তা করার উদ্দেশ্য নিয়ে "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি" নামে একটি প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ থেকে আগত শিক্ষকদের ঠিকানা ও বিবরণ চেয়ে পাঠানো হয়েছিল যাতে তাঁরা ভারতে কোথাও কোনভাবে আশ্রয় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করতে পারেন। তাঁদের এই আহবান অনুযায়ী আমি আমার বায়োডাটা পাঠিয়েছিলাম। কিছুদিন পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর আগরতলা এসে আমাদের সংগে দেখা করেন। তিনি ছিলেন অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ। আমাকে বললেন, তুমি তো বোঝই আমাদের এখানে চাকরীর অনেক অসুবিধা। তবে তোমার জন্য বোধহয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে' আমি কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ছিলাম এবং সেসময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর পদে উন্নীত হয়েছিলাম। তাই তিনি বোধহয় আমাকে এই আশ্বাস দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে কলকাতা যেতে আহবান জানান এবং বিমানের টিকেট পাঠিয়ে দেন।

কলকাতায় গিয়ে আমি মুজিব নগর সরকারের অফিসে দেখা করি। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সংগে আমার পূর্ব পরিচয় ছিল। তিনিও আমাকে আশ্বাস দিলেন। ইতিমধ্যে সৈয়দ আলী আহসান সাহেবও শরণার্থী শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীগণের জন্য বিদেশের একটি সাহায্য সংস্থা হতে কিছু অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলেন।

বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি আমার যায়ো-ভাটা পাঠিয়েছিল পাতিয়ালা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাতে আমার ঠিকানা ছিল আগরতলার। জুনের শেষের দিকে আমি কলকাতায় আগরতলা থেকে পুনঃপ্রেরীত পাতিয়ালা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি চিঠি পাই। বিভাগীয় প্রধান ঐ চিঠিতে আমাকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে যোগ দেবার আহবান জানান। তিনি আরো জানান যে, এজন্য তাঁরা আমাকে এক হাজার রুপী মাসিক বেতন দিতে পারবেন। এই প্রস্তাব আমি সানন্দে গ্রহণ করি এবং জুলাই মাসের ১ তারিখে পাতিয়ালা রওয়ানা হই। এরপর থেকে আমি বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার দিন পর্যন্ত সেখানেই ছিলাম।

পাতিয়ালায় অবস্থান কালে আমি রেডিও মারফত মুক্তিযুদ্ধের খবর ও পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত থেকেছি। সেখানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করেছি। দেশ স্বাধীন হলে বর্তমান নেতৃত্ব সরকার পরিচালনায় সমর্থ হবেন কিনা, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্রিক এরূপ নানা সংশয় বিদ্যমান ছিল স্থানীয় লোকদের মধ্যে। পাক হানাদার বাহিনীর গণহত্যা একটা ব্যাপক প্রোপাগাণ্ডা হিসেবে অনেকে মনে করতো। শরণার্থীদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ধারণা ছিল। আমি তাঁদের যথাসাধ্য বোঝাতে চেষ্টা করেছি। আমি এইভাবে তাদের ধারণা পরিবর্তনের প্রয়াস পেয়েছি যে, আমরা শিক্ষকরা রাজনীতির সঙ্গে কখনো সরাসরি জড়িত ছিলামনা, তব কেন আমাদেরকে এভাবে খালি হাতে দেশত্যাগ করতে হলো?

পাতিয়ালায় থাকাকালে ভারতের দূরবর্তী এলাকাসমূহে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে জনমত গঠনের আরো কয়েকটি প্রক্রিয়া আমি প্রত্যক্ষ করি। যেমন, সিনেমা হলগুলোতে বাংলাদেশে পাক হানাদার বাহিনীর গণহত্যা, শরণার্থীদের অন্তহীন দুর্ভোগ ও দুর্দশা সম্বলিত সংবাদ-চিত্র প্রদর্শনী, বাংলাদেশ সম্পর্কে নেয়া বিভিন্ন জনের সাক্ষাৎকারের ছবি ও ক্যাপশন প্রদর্শনী ইত্যাদি। এমনকি ইতিপূর্বে আগরতলা প্রবাসকালে ভারতীয় সংবাদপত্র আমার যেসব বিবৃতি ও সাক্ষাৎকার নিয়েছিল তার কিছু কিছু পাতিয়ালাতেও প্রদর্শিত হয় বলে আমি জানতে পারি।

১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হবার পর আমি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করি এবং ২৫ ডিসেম্বর তারিখে চট্টগ্রামে এসে পৌঁছি।

মোহাম্মদ শামসুল হক
(উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
জুন, ১৯৮৪।

মোহাম্মদ হুমায়ুন খালিদ

মেঘালয়ের তুরাতে এফ, জে, সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং সেন্টারে দীর্ঘ আট মাস মোটিভেশনের দায়িত্বে ছিলাম। এই কয়মাসে প্রায় ১৬ হাজার মুক্তিবাহিনীর সদস্য আমার হাত দিয়ে শপথ নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে ঢোকে। আমি নিজেও দীর্ঘ চারমাস গেরিলা ট্রেনিং গ্রহণ করি। টাঙ্গাইলের গেরিলা নেতা কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে সর্ব প্রথম আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়। মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের ট্রেনিং গ্রহণ করার পর টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহের ভাল ভাল ছেলেদের সরাসরি কাদের সিদ্দিকীর নিকট পাঠিয়ে দেই।

কাদের সিদ্দিকীর জন্য কিছু (উচ্চমানের) অস্ত্র-শস্ত্র পাঠানোর ব্যাপারে আমি ভারতীয় উক্ত সেক্টরের ব্রিগ্রেডিয়ার সান্ধু সিংহের সঙ্গে দেন দরবার করি। এই খবর পাক-বাহিনী পায়। ফলে আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার কে বন্দি করে তাদেরকে কঠোর ইন্টারগেশন করে। অবশ্য অন্য কোন অত্যাচার নাকরে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। আমি এই খবর ভারতে থেকে পাই। আরো জানতে পারি যে, পাক-সেনারা আমার পালক পুত্র (কলেজের ছাত্র) সোহরাব হোসেনকে বন্দী করে টাঙ্গাইল জেলে রেখেছে।

মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ ৮মাসে মাইনকার চর, মহেন্দ্রগঞ্জ, ও ডালুতে ঘুরে ঘুরে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই, পি, আর ও মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের সামনে বক্তৃতা করে উদ্বুদ্ধ করতাম। তারা বজ্র শপথে মাতৃভূমি উদ্ধারকল্পে বাংলাদেশে ঢুকতো। নাটিয়াপাড়া, বাঐখোলা, পাটখাগুড়ি, বাসাইল, হাতিবান্ধা ও মিরিকপুরে ১২ জন নিহত হয়। এদের সবাইকে গুলি করে হত্যা করা হয়। গণহত্যার স্থান ছিল মিরিকপুর, বাসাইল। আমার পালিত পুত্রের বাবা খন্দকার শামসুর রহমানকে শুধু আমারই পালক পুত্রের বাবা হওয়ার অপরাধে ধরে এনে টাঙ্গাইল সার্কিট হাউসের সামনে নৃশংসভাবে জবাই করে হত্যা করা হয়।

৩রা এপ্রিল (যে দিন পাক-বাহিনী টাঙ্গাইলে প্রথম ঢোকে) নাটিয়াপাড়াতে পাক-বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে তুমুল যুদ্ধ হয়। নাটিয়াপাড়া বাজার ও আশে পাশের বাড়ীঘর পাক-বাহিনী পুড়িয়ে দেয়। আমার স্ত্রী বেগম রিজিয়া খালিদ পাক-বাহিনীর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পর লজ্জায় অপমানে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে চিকিৎসার জন্য তিনি ছদ্ম নামে ঢাকা হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ভর্তি হন। আমার প্রাক্তন ছাত্র (ডাঃ আব্দুর রহমান) উক্ত হাসপাতালের ডাক্তার আমার স্ত্রীকে বাঁচানোর জন্যে অনেক চেষ্টা করেও রক্ষা করতে পারেননি। ৩রা ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল শুক্রবার সকাল ন'টায় তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। মারা যাওয়ার প্রাক্কালে প্রকাশ পেয়ে যায় যে তিনি আমারই স্ত্রী এবং যখন তার

লাশ টাঙ্গাইলে নেয়ার জন্য অনুমতি চাওয়া হয়, পাক-বাহিনীর কাছে তা অগ্রাহ্য হয়। ফলে একদিন পর ৪ঠা ডিসেম্বর আজিমপুর গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। সে সময় ঢাকায় ভীষণভাবে বোমা বর্ষিত হচ্ছিল। আমার স্ত্রীর এই অকাল মৃত্যুর খবর আমি ঘটাইলে পাই ১৩ই ডিসেম্বরে, সর্ব প্রথম যখন আমি ভারত থেকে টাঙ্গাইলের দিকে আসছিলাম। কাদের সিদ্দিকীর উপস্থিতিতে ১৮ই ডিসেম্বর ঢাকার পল্টন ময়দানে সর্ব প্রথম যে জনসভা হয় সেই সভায় আমি কোরান তেলাওয়াত করি এবং মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দিই। এটি ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে প্রথম জনসভা। এই সভায় বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য আমি মোনাজাত পরিচালনা করি তাতে সমস্ত জনসভা যেন কান্নার রোলে ফেটে পড়ে।

অধ্যক্ষ হুমায়ুন খালিদ
এম, সি, এ (সাবেক এম, এন, এ) টাঙ্গাইল।

মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত নওগাঁতেও স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার পুরোমাত্রায় এসেছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় শাখাসমূহ তাদের নিজ নিজ কেন্দ্রীয় সংগঠনের। নির্দেশ অনুযায়ী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সংগ্রাম ছিল সত্যিকার অর্থেই জনতার সংগ্রাম। অন্যান্য এলাকার মত নওগাঁ-বাসীদের অবদানও এতে কোন অংশেই কম ছিলনা। ২৬শে মার্চের আগেই নওগাঁর বুকেও স্বাধীনতার প্রতীক বাংলাদেশের পতাকা নওগাঁবাসীরা উড়িয়েছিল।

একাত্তরের ২৫শে মার্চের রাতের নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ ঘটনাবলীর খবর ঘটনার দু'একদিনের মধ্যেই টুকরো টুকরো ভাবে বিভিন্নসূত্রে নওগাঁতেও এসে পৌঁছেছিল। অনেকের মত আমারও কোন সন্দেহ ছিল না যে ঐ ঘটনা আমাদেরকে এক রক্ত-ক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে ঠেলে দিয়েছে।

ঢাকা শত্রুকবলিত হওয়ায় ঢাকার সংবাদপত্রগুলো আর "আমাদের" ছিলনা; ওগুলো দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর প্রচারপত্রে পরিণত হয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপক্ষে প্রচারণা চালাবার জন্য আমাদেরও পত্র পত্রিকার প্রয়োজন রয়েছে মনে করেই বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশেও রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমা শহরের হোটেল পট্টির পাশে কাজীপাড়ার ছোট একটি হস্ত চালিত প্রেস থেকে ১৯৭১ এর ৩০শে মার্চ তারিখে ক্ষুদ্রাকৃতি এক পাতার "দৈনিক জয় বাংলা" বের করি। বাংলার আবালবৃদ্ধবণিতার কণ্ঠে ধ্বনিত "জয় বাংলা" কথাটি আমাদের জাতীয় শ্লোগানে পরিণত হয়েছিল বলে আমার পত্রিকার নামটিও "জয় বাংলা" রাখি। মুক্তিযুদ্ধের একটি মুখপত্রের জন্য এর চেয়ে কোন যোগ্য নাম আমার মনে আসেনি।

মুক্তি সংগ্রামের স্বপক্ষে এবং একে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে "জয় বাংলা"য় লেখা হত। নানা রকম পরিস্থিতিতে জনগণের কি করণীয় সে সম্পর্কেও মতামত ব্যক্ত করা হত। নিজেদের দোষ ত্রুটি এবং সকল প্রকার অনাচারের প্রতিও জোরালোভাবে পাঠক পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ কার্যাবলীর রিপোর্ট সংগ্রহ ও প্রকাশের মাধ্যমে তাদের উৎসাহিত করা হয়েছে। এটি আমার একক প্রচেষ্টা ছিল। লেখা, রিপোর্ট সংগ্রহ প্রুফ দেখা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় বিতরণের ব্যবস্থাও আমিই করতাম। সম্পাদকীয় মন্তব্য ও বিভিন্ন রিপোর্ট আমি সাধারণতঃ রাতে এবং খুব ভোরে লিখতাম। তারপর প্রায় সারাদিন ধরে প্রেসে বসে হাত-কম্পোজ শেষে প্রুফ দেখে ছাপা হবার পর বিকেলে পত্রিকার বাণ্ডিল নিয়ে প্রেস থেকে বের হতাম। মুসলিম লীগের সাবেক এম, পি. এ, জনাব কাজী শাহ মাহমুদের মালিকানাধীন প্রেসের জন্য কোন বিপদ না আসে সে কারণে কাজী সাহেবের অনুরোধে পত্রিকায় প্রেসের নাম ছাপা হতনা। প্রেসের ম্যানেজার ও কম্পোজিটর যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে কাজ করতেন।

২৬শে মার্চ থেকেই আমরা নিজেদেরকে স্বাধীন হিসেবে গণ্য করছিলাম। তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের কোন সরকার গঠিত না হলেও এক 'গোপন সরকারের' অস্তিত্ব স্বীকার করে সংগ্রাম পরিষদগুলোকে স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করার জন্য "জয় বাংলা"র প্রথম সংখ্যাতেই মত প্রকাশ করা হয়।

যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত অপর কোন দৈনিক পত্রিকার অস্তিত্বের কথা আমাদের জানা ছিলনা (পরে প্রমাণিত হয়েছে ঐ সময়ে সত্যি সত্যি আর কোন 'দৈনিক' পত্রিকা ছিল না) বলে "জয় বাংলা"র নামের উপরে 'স্বাধীন বাংলার একমাত্র মুখপত্র" কথা কয়টি ছাপা হত।

"জয় বাংলা" প্রথম থেকেই নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করে চলেছে। কোন কোন স্বার্থান্বেষী মহলের হুমকী এমনকি সম্পাদকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রতি হুমকীরও তোয়াক্কা না করে স্বাধীন এবং নিরপেক্ষভাবে নানা প্রকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করা এবং সকল প্রকার অনাচারের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে প্রতিবাদ জানান হয়েছে।

৫ই এপ্রিল রাতে [illegible] রাইফেলস বাহিনীর গোলা বারুদের জীপে চড়ে বগুড়া যাই। বগুড়া এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও মুক্তাঞ্চল সফর শেষে ৭ই এপ্রিল সন্ধ্যায় নওগাঁ ফিরে আসি। এ কারণে ৬ই ও ৭ই এপ্রিল দু'দিন 'জয় বাংলা' প্রকাশিত হয়নি। ৮ই এপ্রিল বগুড়ার মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতার এবং বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের ওপর ভিত্তি করে ৮ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়।

এ সফরকালে আমি বগুড়ার তৎকালীন ডি, সি, এবং এস, ডিও সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদেরকে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বগুড়ায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানাই।

এ বিশেষ সংখ্যায় হানাদার বাহিনীর হাত থেকে বগুড়া শহর রক্ষা এবং মুক্তিবাহিনী কর্তৃক আড়িয়ার বাজারে অবস্থিত পাক সেনাবাহিনীর গোলা বারুদের ডিপো দখলের বিস্তারিত বিবরণ ছাপা হয়। এ ছাড়া মুক্তাঞ্চলের টেলিফোন এক্‌চেঞ্জগুলোর কর্মীদের সহায়তায় যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব প্রদানের কথাও লেখা হয়।

'জয় বাংলার' ১১শ এবং শেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১১ই এপ্রিল, ১৯৭১। এ সংখ্যায় যুদ্ধের খবরাখবর সংগ্রহের জন্য "জবাসস" (জয় বাংলা সংবাদ সংস্থা) গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। বিভিন্ন সূত্রে যে সব খবর পাচ্ছিলাম সেগুলো একটি সংগঠনের মাধ্যমে প্রচার করার উদ্দেশ্যেই এটি আমি গঠন করি। আমাদের কোন নিজস্ব সংবাদ সংস্থা ছিল না এবং কেউ সে রকম কোন উদ্যোগ না নেয়ায় সীমিত সামর্থ নিয়েই "জবাসস" গঠন করি। মুক্তাঞ্চলের কিছু টেলিফোন এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে খবরাখবর সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়। একাজে আমাকে সহায়তা করেন নওগাঁ এক্সচেঞ্জের অপারেটর জনাব বজলুর রহমান, জনাব সলিম মণ্ডল, পাঁচবিবি এক্সচেঞ্জের শ্রী উপেন্দ্রনাথ ঘোষ ও আরও অনেকে বগুড়া সার্কিট হাউজস্থিত মুক্তিযোদ্ধা কন্ট্রোল রুমের রিটায়ার্ড সুবেদার দবিরউদ্দীন (ওস্তাদজী) ও হাবিলদার এমদাদুল হক ওরফে তোতাও এ ব্যাপারে সহায়তা করেন। এ ছাড়া রাইফেল বাহিনীর স্থানীয় কামাণ্ডার মেজর নজমুল হকও এ বিষয়ে সহযোগিতা করেন।

দেশের অন্যান্য সীমান্তের মত নওগাঁ সীমান্তও তখন উন্মুক্ত ছিল। কলকাতার বিভিন্ন পত্র পত্রিকারও দু'এক কপি সীমান্ত পথে আমাদের হাতে আসতে শুরু করেছিল। 'জয় বাংলা'র ১১শ সংখ্যায় "জবাসস" সংগৃহীত এবং এসব পত্র পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করে কিছু সংবাদ ছাপান হয়। অমৃত বাজার পত্রিকার ৯ই এপ্রিল তারিখের সংবাদে জানতে পারি যে, ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকার "দৈনিক ইত্তেফাক", "সংবাদ" ও "দি পিপল" এর কার্যালয়গুলো ধ্বংস করা হয়েছে এবং বেশ কিছু সাংবাদিক ও কর্মচারীদের হত্যা করা হয়েছে। আরও জানি 'দি পাকিস্তান অবজার্ভার', 'দি মর্নিং নিউজ', 'দৈনিক পাকিস্তান', 'আজাদ' ও 'পূর্বদেশ' পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে ছাপা হচ্ছে। 'জয় বাংলা'র এখবর উদ্ধৃত করে মন্তব্য করা হয়—"পশ্চিমা বর্বরেরা বিশ্বকে ধোঁকা দিবার জন্য উক্ত বিখ্যাত পত্রিকাগুলির নাম বা Goodwill ব্যবহার করিতেছে।" এই সংখ্যায় জনপ্রিয় সংবাদপত্রগুলোর অফিস ধ্বংস ও সাংবাদিক হত্যার নিন্দা করা হয়।

হানাদারদের আক্রমণের ভয়ে নওগাঁ শহর তখন প্রায় ফাঁকা। কাজী-পাড়ার যে ছোট প্রেস থেকে 'জয় বাংলা' ছাপা হচ্ছিল তার কর্মচারিদের অনেক বলে কয়েও নওগাঁ থাকতে রাজী করান যাচ্ছিল না। সকলের মনেই ভীতি, —এই বুঝি হানাদাররা এসে পড়ে। অন্যান্য প্রেসও বন্ধ। এ পরিস্থিতিতে 'জয় বাংলা' আর ছাপান সম্ভব হয়নি।

১৬ই ডিসেম্বরের বিজয় দিবসের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের ভেতর কিংবা বাইরে থেকে 'স্বাধীন বাংলার' আর কোন দৈনিক পত্রিকা ছাপা হয়নি। দেশের বাইরে থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের নাম দিয়ে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় একাধিক সাপ্তাহিক/পাক্ষিক ইত্যাদি পত্রিকা প্রাকাশিত হয়েছিল—কিন্তু 'দৈনিক' একটিও বের হয়নি।

নিজস্ব সীমিত পুঁজির ওপর নির্ভর করেই 'জয় বাংলা' প্রকাশের কাজে হাত দিয়েছিলাম। কারও কাছ থেকে কোন আর্থিক সাহায্য নেবার প্রয়োজন হয়নি। প্রেস কর্তৃপক্ষও কোন লাভ নিতেন না, শুধু কাগজ ও মুদ্রণ এর খরচ নিতেন। 'জয় বাংলা'র প্রথম সংখ্যার মূল্য ১০ পয়সা ধার্য হয়েছিল। এক ঘণ্টায় ২০০ কপি বিক্রিও হয়েছিল। কিন্তু এ সামান্য দাম আদায়ে ঝামেলার কারণে প্রথম সংখ্যার অবশিষ্ট কপি ও দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে শেষ সংখ্যার সকল কপিই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছিল।

'জয় বাংলা'র প্রথম সংখ্যাটি ছাপা হয়েছিল ১০০০ কপি। পরবর্তী সংখ্যা-গুলোর কোনটা ২,৫০০ কোনটা ৩,০০০ কপি ছাপা হয়। সর্বমোট কপি সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০,০০০। খুলনা নিউজ প্রিন্টের হাফ ডিমাই সাইজের কাগজে 'জয় বাংলা' ছাপান হত। প্রথম কয়েক সংখ্যা এক পাতার এক পাশে এবং অব-শিষ্টগুলো এক পাতার দু'পাশে ছাপা হত। ঐ পরিস্থিতিতে ছোট হাতে চালানো প্রেস থেকে এর চেয়ে বড় আকারে পত্রিকা বের করা কোন মতেই সম্ভব ছিলনা।

'জয় বাংলার' প্রথম সংখ্যাটি আমি নিজে আমার স্কুল জীবনের সহপাঠি জাহিদ হোসেনকে সাথে নিয়ে নওগাঁ শহরে বিলি করেছিলাম—৩০শে মার্চ, ১৯৭১ তারিখে। এ পত্রিকা প্রকাশ কালে নওগাঁর তৎকালীন এম, এন, এ, জনাব বায়তুল্লাহ (পরবর্তীকালে জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার), নওগাঁ, রাজশাহী, ও বগুড়া মুক্তাঞ্চলের তৎকালীন কমাণ্ডার রাইফেল (ই পি আর) বাহিনীর মেজর নজমুল হক, বিভিন্ন এলাকার মুক্তিযোদ্ধাসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের আরও অনেকেই উৎসাহ দিয়েছেন এবং সহযোগিতা করেছেন। মেজর হকের অনুমতি-ক্রমেই তাঁর বাহিনীর যানবাহনে নওগাঁর বাইরে "জয় বাংলা"র বাণ্ডিল পাঠান সম্ভব হয়েছে।

এপ্রিলের মাঝামাঝি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের মুক্তাঞ্চলগুলো একে একে আমাদের হাত ছাড়া হতে থাকে। পাবনা, রাজশাহী, বগুড়া ও অন্যান্য

শহরগুলোতে হানাদার বাহিনী ধীরে ধীরে তাদের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। আমাদের অসংগঠিত, বিশৃঙ্খল, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণবিহীন এবং উপযুক্ত অস্ত্র-বিহীন বাহিনী প্রথম পাল্টা আক্রমণেই পশ্চাদপসরণ করতে এবং নিরুপায় হয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ব্যাপক জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও আপৎকালীন জরুরী ব্যবস্থার কোন পরিকল্পনা না থাকায় কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বও সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে, বলা চলে সাময়িকভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়, এবং এরই ফলে এবং হানাদারদের হামলার মুখে সারদেশ জুড়ে শুরু হয় মাঠ-ঘাট, বন-বাদাড়, নদী-নালা টিলা-পাহাড় পেরিয়ে পরিকল্পনহীনভাবে সকলের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য প্রাণান্তকর ছুটাছুটি। সীমান্ত-নিকটবর্তী শহর নওগাঁতেও এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি।

১৪ই এপ্রিল সকালে রাইফেল বাহিনীর গোলাবারুদ সহ রাজশাহীগামী দু'টি জীপের কনভয় এ রাজশাহী যাত্রা করি। অধিকাংশ রাস্তাই কাঁচা। দুপুরের আগেই আত্রাই নদীর তীরে কালিকাপুর পৌছি। নদীর ওপারে মান্দা। নৌকায় জীপ পারাপারের ব্যবস্থা ছিল। সেখানেই রাজশাহী এলাকা থেকে জীপ যোগে ফিরে আসা নওগাঁ এলাকার সেক্টর কমান্ডার মেজর নজমুল হকের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি রাজশাহী শহর হাতছাড়া হবার খবর দেন এবং কনভয়ের কয়েক-জন সৈন্যকে একটি জীপ নিয়ে ঐ এলাকায় অবস্থানরত ক্যাপ্টেন গিয়াসের সঙ্গে যোগ দেবার নির্দেশ দিয়ে অপরটিকে তাঁর সঙ্গে নওগাঁ ফিরতে বলেন। রাজ-শাহী যাওয়া সম্ভব নয় বলে আমাকেও তাঁর জীপে তুলে নেন। দুপুর ২টার দিকে আমরা নওগাঁর বলিহার হাউসে ইপি আর সেক্টর হেড কোয়ার্টারে ফিরে আসি। জীপে বসে মেজর হককে আমি নওগাঁ ঘাঁটি রক্ষার্থে সম্ভাব্য হানাদার রাস্তাসমূহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাঁর অধীনস্থ সৈন্য এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় প্রতিরক্ষা ব্যূহের ব্যবস্থা করার অনুরোধ করি। তিনি নিরাসক্তভাবে আমার বক্তব্য শোনেন। রাজশাহী হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় তিনি অনেকটা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন এবং শীগগীরই নওগাঁ আক্রমণের আশংকা করছিলেন। হাতি-য়ারের জন্যও তিনি চিন্তিত ছিলেন। যে কয়েকটা মেশিনগান তাঁর বাহিনীর হাতে ছিল সেগুলোরও ফায়ারিং পিনের অভাব দেখা দিয়েছিল। হানাদারদের অস্ত্র বলের ধারণা তাঁর ছিল কেননা মূলতঃ তিনি আর্টিলারী কোরের সদস্য ছিলেন কিন্তু রাইফেল বাহিনীর সঙ্গে ডেপুটেশনে যুক্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ এসব কারণেই আমার মত যুদ্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রস্তাবে তাঁর কোন ভাবান্তর হয়নি। এরপরে সংগ্রাম পরিষদের কয়েকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সকলের মনেই নানারকম আশংকা। প্রায় ফাঁকা নওগাঁ শহর বিকেলের মধ্যেই আরও ফাঁকা হয়ে যায়।

বিকেলে মেজর হকের সঙ্গে আবার দেখা করি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করি আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে কোন অস্ত্র সাহায্য পাচ্ছেন কিনা। তিনি বলেন

এখনো ত তেমন কিছুই পাচ্ছিনা। আমি তখন তাঁকে সীমান্তের ওপারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ করব কিনা জিজ্ঞাসা করি। তিনি বললেন চেষ্টা করে দেখতে পারেন। তাঁর সাথে আলোচনায় এবং হেড কোয়ার্টারের তোড়জোর দেখে আমার বুঝতে বাকী রইলনা যেকোন মুহূর্তে তিনি ঘাঁটি ত্যাগ করবেন। সন্ধ্যার পরে সংগ্রাম পরিষদের অফিসেও আর কাউকে পাওয়া গেলনা। সব যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। "মুক্তি" সিনেমার রাস্তার মাথার টেলিফোন এক্সচেঞ্জটিতে তখনও একজন অপারেটর ছিলেন। সেখান থেকে রাতে বলিহার হাউজের রাইফেল বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে ফোন করে কোন সাড়া পাওয়া গেলনা। এ পরিস্থিতিতে আমি অপারেটরের সহায়তায় পাঁচবিবি, আত্রাই, জয়পুরহাট, ও পত্নীতলা পিসিও ও বগুড়া সার্কিট হাউজে অবস্থিত বগুড়া কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং রাজশাহীর সর্বশেষ পরিস্থিতির খবর দিয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেই। নওগাঁর পরিস্থিতিরও ইংগিত দেই। পরদিন ১৫ই এপ্রিল সকালে হেড কোয়ার্টার শূন্য থাকার খবর পাওয়া গেল। আগের রাতেই রাইফেল বাহিনীর হেড.কোয়ার্টার অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছে। শহরও প্রায় শূন্য। প্রেসও বন্ধ। এ পরিস্থিতিতে আমার শহরে থাকা মানে হানাদারদের হাতে পড়ে খামোখা জান দেয়া বিধায় একটি ব্যাগে কাগজপত্র ও একসেট বাড়তি কাপড় নিয়ে আমার বাসা-কাম-'জয় বাংলার' দপ্তরে তালা ঝুলিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। সীমান্ত এলাকায় তখন সুযোগমত লুঠপাটের প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। দু'এক-জায়গায় সন্দেহজনক লোকদের তথাকথিত "চেক পোস্টে" আমার পরিচয় দিয়ে দলসহ ১৫ই এপ্রিল রাত প্রায় ১১টার দিকে প্রহরাবিহীন নওগাঁ-পশ্চিম দিনাজপুর সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করি। ভারতে এটাই ছিল আমার প্রথম প্রবেশ।

ভারতে প্রবেশের কিছুদিন পরে কোলকাতা প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারী সহ কয়েকজন সদস্য আমাকে কোলকাতা থেকে 'জয় বাংলা' পুণঃপ্রকাশের পরামর্শ দেন। মুক্ত বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'জয় বাংলা' সম্ভব হলে পুনরায় মুক্ত বাংলাদেশ থেকেই প্রকাশিত হবে তাঁদেরকে আমার এ সিদ্ধান্তের কথা জানাই।

ভারত থেকে পরবর্তীকালে অন্যান্য বাংলাদেশী সাংবাদিকেরা বেশ কয়েকটি সাপ্তাহিক/পাক্ষিক পত্রিকা বের করেছিলেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগও ১১ই মে, ১৯৭১ তারিখে তাদের দলীয় মুখপত্র "সাপ্তাহিক জয় বাংলা" প্রকাশ করেন। প্রকাশ স্থলের নাম দেয়া হয় "মুজিবনগর"। কোলকাতার পার্ক সার্কাস এলাকার ২১/এ বালুহাক্কাক লেনে এ পত্রিকার দফতর ছিল। কোলকাতা সহ ভারতের পত্র পত্রিকায় আমার ক্ষুদে 'দৈনিক জয় বাংলা'র ব্যাপক প্রচার হওয়া সত্বেও আওয়ামী লীগ কর্তৃপক্ষ তাদের পত্রিকার নামও "জয় বাংলা" রাখেন। এই দলীয় মুখপত্রটির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না। "জয় বাংলা সংবাদ সংস্থা (জবাসস)" নামটি অবশ্য আর কেউ ব্যবহার করেননি।

একাত্তরের ১৫ই এপ্রিল মধ্যরাতে আমি ভারতের বালুরঘাট শহরে পৌঁছি। এটি পশ্চিম বাংলা রাজ্যের পশ্চিম দিনাজপুর জেলার জেলাসদর। পরদিন ১৬ই এপ্রিল নওগাঁয় মেজর হকের সঙ্গে ১৪ই এপ্রিলের আলোচনা মোতাবেক স্থানীয় এম, এল, এ শ্রী বীরেশ্বর রায় এবং পশ্চিম দিনাজপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর সঙ্গে সাক্ষাত করি এবং সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার কথা জানাই। উভয়েই জানালেন বিষয়টি উচ্চতর কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। আমাদেরকে সক্রিয়ভাবে কোন সাহায্য দানের ব্যাপারে তাঁরা কিছুই অবগত নন। এরপরে ঐ দিনই খবরের কাগজ কিনে বাংলা দৈনিক 'আনন্দবাজার' ও ইংরেজী দৈনিক 'অমৃত বাজার' পত্রিকার টেলিগ্রাফিক ঠিকানা সংগ্রহ করে বালুরঘাট থেকে 'জবাসস' নাম দিয়ে একটি রিপোর্ট পাঠাই। আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই কোলকাতা পৌঁছে গেছেন শুনে পরদিন ভোরে এক্সপ্রেস বাসে বালুরঘাট থেকে কোলকাতা রওয়ানা হই। কোলকাতায় পৌঁছে পত্র পত্রিকায় মুজিবনগর সরকার গঠনের খবর দেখলাম।

কোলকাতা আগে কখনও যাইনি। কাউকে চিনিওনা। স্টেশন থেকে ট্যাক্সী নিয়ে সোজা যুগান্তর পত্রিকার অফিসে গেলাম। সম্পাদক শহরে ছিলেন না। বার্তাসম্পাদক কবি শ্রী দক্ষিণারঞ্জন বসুর ঠিকানা নিয়ে তাঁর বাসায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং তাঁকে 'জয় বাংলা'র কপিগুলো দেই। প্রবীণ সাংবাদিক শ্রী বসু সস্নেহে আমাকে গ্রহণ করে সব খবরাখবর নিলেন। তাঁর বাসায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ঠিকানা সংগ্রহ করে কোলকাতা বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির সঙ্গে যুক্ত প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী. তারাশংকরের সঙ্গে সাক্ষাত করি এবং 'জয় বাংলা'র কপি উপহার দেই। তিনি সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বলেন। এরপরে চৌরংগীর কিড স্ট্রীটের স্টেট গেস্ট হাউজে যাই এবং ইনচার্জকে অনুরোধ করে রাতের জন্য একটি রুম পাই।

পরদিন ১৯শে এপ্রিল সকালেই বাংলাদেশ মিশনে গিয়ে জনাব হোসেন আলীর সংগে সাক্ষাত করি এবং নওগাঁ এলাকার বিস্তারিত খবর জানাই। তাঁকে বলি এখনও চেষ্টা করলে নওগাঁ এলাকাটি আমাদের দখলে রাখা সম্ভব। তাঁকে আরও জানাই সক্রিয় সাহায্য পেলে আমাদের বাহিনী বাংলাদেশের সমগ্র উত্তরাঞ্চল দখলে রাখতে পারে এবং আমাদের সরকারও দেশের অভ্যন্তর থেকেই কাজ চালাতে পারে। তিনি আমাকে সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করার জন্য একটি লিখিত রিপোর্ট দিতে বলেন। আমি তখন মিশনের টাইপিস্ট দিয়ে দেশে থাকাকালীন মুদ্রিত 'জবাসস' এর প্যাডে একটি রিপোর্ট টাইপ করিয়ে দুই কপি জনাব হোসেন আলীকে দেই। জনাব হোসেন আলী এ রিপোর্টটি আমাদের কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেবেন বলে আমাকে বলেন। আমার কাছে কোন বৈধ ট্রাভেল ডকুমেন্ট নেই বিধায় আমাকে মিশন থেকে একটি পরিচয়পত্র দেয়া হয়। একই দিনে মিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারী জনাব আর, আই, চৌধুরী, প্রেস এ্যাটাশে জনাব

মকসুদ আলীর সংগেও পরিচয় হয়। এর ৩/৪ দিন পরে পুনরায় জনাব হোসেন আলীর সংগে মিশনে সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে জানান ১৯ তারিখের 'জবাসসে'র রিপোর্টটি তিনি আমাদের প্রধান সেনাপতি কর্ণেল ওসমানীকে পৌঁছে দিয়েছেন।

১৮ ও ১৯ তারিখ দু'দিন ষ্টেট গেষ্ট হাউজে থাকার পর সেখানে অবস্থানরত গণপরিষদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা জনাব অধ্যাপক ইউসুফ আলীর সুপারিশে আমাকে আরও ৭ দিনের জন্য গেষ্ট হাউজে থাকতে দেয়া হয়।

১৯শে এপ্রিল কোলকাতার দৈনিক যুগান্তরে 'জবাসস' সম্পর্কিত এবং মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত দেশের বাইরে 'জবাসস' প্রচারিত প্রথম সংবাদটি ছাপা হয়। এতে উত্তরাঞ্চলের সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং অবিলম্বে সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। ঐ দিনই ভারতের সর্ববৃহৎ সংবাদ সংস্থা পি, টি, আই এর কোলকাতা ব্যুরোর ম্যানেজার শ্রী সুধীর চক্রবর্তীর সংগে দেখা করি এবং বাংলাদেশের একজন সাংবাদিক হিসেবে বিশ্বের লেখক এবং সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে এবং গণহত্যার বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত জোরদার করার আহবান জানিয়ে বিবৃতি দেই। পি টি আই তাদের নেট ওয়ার্কের মাধ্যমে সারা বিশ্বে এটি প্রচার করে। পরদিন ২০শে এপ্রিল প্রায় সবগুলো দৈনিকের প্রথম পাতায় এ বিবৃতিটি ছাপা হয়েছে দেখতে পাই। ২১শে এপ্রিল পি টি আই এর মাধ্যমে প্রচারিত আরেকটি বিবৃতিতে বাংলাদেশের গণহত্যা বন্ধের জন্য জাতিসংঘ সহ বিশ্ব বিবেকের প্রতি আহবান জানাই। এতে বাঙালী মুসলমান নিধন যজ্ঞে পাকিস্তানী বর্বরদেরে সাহায্য না করার জন্য আর,সি,ডি জোটভুক্ত ইরান ও তুরস্কের মুসলমান ভাইদের প্রতিও আহবান জানাই। এতে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দানের জন্যও আবেদন জানান হয়। এটিও ২২শে এপ্রিল দৈনিক পত্রিকাগুলোতে গুরুত্বের সংগে ছাপা হয়। এরপরে ভারতের অপর সংবাদ সংস্থা ইউ এন আই এর কোলকাতা ব্যুরোর ম্যানেজার শ্রী ইউ আর কালকুর এর সংগে সাক্ষাত করি। বগুড়ার মুক্তি যোদ্ধাদের বীরত্ব সম্পর্কিত আমার 'জয় বাংলা'র বিশেষ সংখ্যার রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে ২৫শে এপ্রিল ইউ,এন,আই দুটি রিপোর্ট প্রচার করে। ২৬ এপ্রিল এ রিপোর্ট বিভিন্ন দৈনিকের প্রথম পাতায় ছাপা হয়। যুগান্তরের হেডিং ছিল "বীরের এ রক্ত স্রোত", Statesman-এর "Student Forced Pak Army Column to Retreat", দিল্লীর Times of India-এর "Many a Heroic Saga from Bangladesh" ইত্যাদি।

এর আগে ১৯শে এপ্রিল আকাশবাণী, কোলকাতার সংগে যোগাযোগ হয়। ২১শে এপ্রিলের সংবাদ পরিক্রমায় 'জয় বাংলা' সম্পর্কে এবং আমার প্রদত্ত বিবৃতিগুলোর উল্লেখ করা হয়।

এ সময়ের মধ্যেই কোলকাতার সব প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা যথা—আনন্দবাজার পত্রিকা, Hindustan Standard, যুগান্তর, Amrita Bazar Patrika, States-

man, সাপ্তাহিক দেশ ও অমৃত ইত্যাদির সাংবাদিক সহ কোলকাতা প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারী ও সদস্যদের সঙ্গেও আলাপ পরিচয় হয়। এভাবেই ভারতীয় তথা বিশ্ব প্রচার মাধ্যমের সংগে কোন প্রকার সরকারী সাহায্য বা আনুকুল্য ছাড়াই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও অরাজনৈতিক প্রচেষ্টায় ভারতে প্রবেশের এক সপ্তাহের মধ্যেই একটা কার্যকর যোগসূত্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হই।

কোলকাতায় অবস্থানকালে সাংবাদিক ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন স্তরের লোক-জনের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। কোলকাতা সফররত সর্বোদয় নেতা শ্রী জয় প্রকাশ নারায়ণের সংগেও ২৮শে এপ্রিল সাক্ষাৎ করি এবং আমাদের মুক্তি সংগ্রামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করি। শ্রী নারায়ণ তাঁর এই সফরকালে বাংলাদেশী নেতৃবৃন্দের সংগেও সাক্ষাৎ করেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসংগিক হবে না যে শ্রী নারায়ণ এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন সর্বোদয় ও গান্ধী আদর্শবাদী আন্দোলনের ভারতব্যাপী শত শত প্রতিষ্ঠানের শাখা উপশাখাগুলো বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে এবং শরণার্থী শিবিরগুলোতে বেসরকারী পর্যায়ে ব্যাপক ত্রাণ তৎপরতা চালিয়েছে। শ্রী নারায়ণ ভারতে এবং ভারতের বাইরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন এবং ব্যাপক সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন। এসময়ে প্রায় প্রত্যেকদিনই প্রবীণ সংবাদিক শ্রী দক্ষিণারঞ্জন বসুর সঙ্গে সাক্ষাত করতাম। তিনি আমাকে বাংলাদেশের একজন সাংবাদিক হিসেবে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। একদিন তাঁর অফিসে তাঁর টেবিলের উপর রক্ষিত রাশি রাশি কাগজপত্র দেখিয়ে আমাকে বললেন, "দেখ রহমত, এসবই যুগান্তর এবং অমৃতের পাঠকদের কাছ থেকে পাওয়া তোমাদের বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা কবিতা, গান ইত্যাদি। এবং প্রতিদিনই আরও আসছে।" দু'চারটি পড়ে দেখলাম, সবই আবেগপূর্ণ ভাষায় লেখা। একথা সত্য যে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সকল বাংলা ভাষাভাষি বাঙ্গালীর মনকেই আবেগাপ্লুত করেছিল।

এপ্রিলের শেষে এক সন্ধ্যায় আবার আমাদের মিশন প্রধান জনাব হোসেন আলীর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। অনেক বিষয়ে আলাপ হল। তাঁকে বললাম ভারতের অন্যান্য অঞ্চল, বিশেষ করে রাজধানী দিল্লীতে, এবং ভারতের অন্যান্য অবাঙ্গালী অধ্যুষিত এলাকায় আমাদের নিজস্ব লোকজন নেই বললেই চলে। আর এসব এলাকাতে আমাদের বিপক্ষ পাকিস্তানীদের প্রচার চলছে। আমি দিল্লী থেকে এসব প্রচারণার পাল্টা জবাব এবং সর্ব ভারত এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বেসরকারীভাবে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে প্রচার চালাতে চাই। তিনি আমার সঙ্গে একমত হন এবং আমাকে কোলকাতা ও দিল্লী মিশনের সঙ্গে সংযোগ রাখতে বলেন।

দেশ ছাড়ার সময় আমার সঙ্গে যে স্বল্প টাকা ছিল তা বদলিয়ে ভারতীয় ২৫০ টাকার মত পেয়েছিলাম। কোলকাতায় ১৯শে থেকে ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত

স্টেট গেস্ট হাউজে থাকার সুযোগ হয়েছিল বলে থাকা বাবদ কোন ব্যয় হয়নি। তবে খাওয়া, যাতায়াত ব্যয়ে পুঁজি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। পশ্চিম বাংলার বিধান সভার অধিবেশনের সময় এগিয়ে আসছিল বলে স্টেট গেস্ট হাউজ খালি করার সরকারী নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এ ভবনটি এম, এল, এ হোস্টেল হিসেবেও ব্যবহৃত হত। এ পরিস্থিতিতে যুগান্তর এর সাংবাদিক শ্রী পরেশ সাহা প্রাক্তন ঢাকা জেলাবাসী পূর্ব রেলওয়েতে কর্মরত শ্রী তরুণ গুহের গোবড়া অঞ্চলের বাসায় আমার থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিলেন। শ্রী গুহ আমার দিল্লী যাবার টিকেটের বন্দোবস্ত করে দিলেন এবং তাঁর মহল্লার তরুণদের সমিতি 'আদর্শ সংঘের' সদস্যরা চাঁদা তুলে আমাকে ১০০ টাকা দেন। সাহিত্যিক শ্রী শংকর-এর সুপারিশে উল্টোরথে মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত একটি লেখা দিয়ে আরও ৫০ টাকা পাই। এভাবেই ৪ঠা মে ট্রেনযোগে দিল্লী রওয়ানা হয়ে পরদিন ৫ই মে দুপুরে দিল্লী পৌঁছি। দিল্লী স্টেশন থেকে শ্রী গুহের দেয়া ঠিকানায় তাঁর ভাগ্নের বাসায় যাই। সেখান থেকে যুগান্তরের দিল্লী অফিসে এবং তাঁদের পরামর্শে পশ্চিম বঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর নেতৃত্বাধীন দিল্লীর মহিলাদের 'বাংলাদেশ এসিসট্যান্স কমিটির' অফিসে যাই। কমিটির সহায়তায় দিল্লীর জয়সিংহ রোডের ওয়াই, এম, সি, এ ট্যুরিস্ট হোস্টেলে এক সপ্তাহের জন্য আমার থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত হয়।

এখানে এসেই দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক ও অন্যান্য সাময়িকী কিনে পত্রিকার পরিধি প্রকৃতি আঁচ করে নেই। IENS ভবনে অবস্থিত কোলকাতার যুগান্তর, Amrita Bazar Patrika, আনন্দবাজার পত্রিকা, ও Hindustan Standard এর [illegible] সঙ্গে আলাপ করে বুঝতে পারি রাজধানীর পত্র পত্রিকাগুলো [illegible] অনুভূতিশীল তবে প্রভাবশালী Hindustan Times-এ [illegible] -এ বাংলাদেশ ও শেখ মুজিব বিরোধী বিতর্ক [illegible] আমার সে ধারণাই হয়েছিল। যেমন ৭ তারিখে [illegible] মুসলমান উদ্দেশ্যে লেখেন :

" the majority of [illegible] must not be expected to encourage those who [illegible] tendencie in Pakisan ."

শেখ মুজিবের কার্যকলাপ [illegible] হয়। ".. the responsibility of the carnage and [illegible] Bengal lies entirely on him" এ ছাড়া আরও অনেক যুক্তি [illegible] করা হয়।

৯ই মের সংখ্যায় 'Bangladesh and the Indian Press" শিরোনামে প্রকাশিত ৬টি চিঠিতে লেখকেরা ভারতীয় পত্র মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং গণহত্যার ফলাও প্রচারের জন্য ভারতীয় পত্রিকার নিন্দা করেন। তাঁরা এ প্রচারকে অতিরঞ্জিত, নীতি বহির্ভূত বাড়াবাড়ি, [illegible] খোদ ভারতীয় অখন্ডতারও প্রতিকূল বিধায় ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী বলে আখ্যায়িত করেন। এসব চিঠিপত্র এ পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যের সমর্থনে লেখা হয়।

এসব বক্তব্যের বিপক্ষে এবং আমাদের স্বপক্ষে কোন লেখা ছাপা হচ্ছেনা দেখে এ প্রচারণার একটি যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দেবার সিদ্ধান্ত নেই এবং "In Defence of Mujib" শীর্ষক একটি দীর্ঘ পত্র লিখে এ পত্রিকার জাঁদরেল সম্পাদক মিঃ বি, জি, ভার্গিজের সঙ্গে সাক্ষাত করি। স্বাধীনচেতা এ সাংবাদিক সরকারী মতামতেরও খুব একটা তোয়াক্কা করতেন না। আমি তাঁকে বলি আপনার পত্রিকায় আমাদের বেশ সমালোচনা করা হচ্ছে কিন্তু আমাদের স্বপক্ষে কিছুই দেখছিনা। এই বলে ব্রীফ কেস খুলে আমার টাইপকরা চিঠিটি তাঁর হাতে দেই। তিনি মনোযোগ দিয়ে চিঠিটি পড়েন। আমি চিঠিটি শেষ করেছিলাম 'Joy Bangabandhu। Joy Bangla ।।' দিয়ে। তিনি বলেন 'এ দু'টো বাদ দিতে হবে, এগুলো শ্লোগান'। আমি বলি প্রথমটি বাদ দিতে পারেন তবে দ্বিতীয়টি রাখতে হবে, কারণ 'Joy Bangla' আমাদের জাতীয় শ্লোগান। তিনি আমাকে প্রথম শ্লোগানটি বাদে বাকী চিঠিটা হুবহু ছেপে দেবেন বলে জানান।

মিঃ ভার্গিজের কাছে যুক্তি সহকারে আমাদের সংগ্রামের কারণগুলোও ব্যাখ্যা করি। এর পরে তাঁর পত্রিকার কলামে বাংলাদেশ বিরোধী বিতর্ক বন্ধ হয়ে যায়। ১০ মে তারিখে আমার চিঠিটি ছাপা হয়, ১৩ মে আমাদেরকে সমর্থন এবং পাকিস্তান পন্থীদের নিন্দা করে একসাথে ৫টি চিঠি ছাপা হয় এবং ১৫মে লক্ষ্ণৌর অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল হাবিবুল্লাহ এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের প্রফেসর কে, এ, ফারুকীর পাকিস্তানীদের নিন্দা এবং আমাদের আন্দোলন ও নেতাকে সমর্থন করে লিখিত ২টি চিঠি প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রভাবশালী Hindustan Times এর পাতায় পাকিস্তানপন্থীদের বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণার প্রচেষ্টার শোচনীয় পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রফেসর ফারুকী পাকিস্তানী বাহিনীকে তৈমুর, চেংগীজ ও হালাকু খানের মত বর্বর বলে আখ্যায়িত করেন।

একই সময়ে দিল্লীর প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের সম্পাদক ও অন্যান্য সাংবাদিক এবং সংবাদ সংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করি। ১০ই মে ইউ এন আই দিল্লী থেকে আমার রাজধানীতে অবস্থান এবং কাজকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে তিন প্যারার একটি সংবাদ প্রচার করে। এ ছাড়া আকাশবাণীর (অল ইণ্ডিয়া রেডিও) কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গেও সাক্ষাত করি। আকাশবাণীর মহাপরিচালক শ্রী এ, কে, সেনের পরামর্শ অনুযায়ী আকাশবাণীর বহির্বিশ্ব কার্যক্রম, বিশেষ করে উর্দু সার্ভিসের জন্য আমাদের মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে কতগুলো কথিকা রচনা করি। একটি সিরিজ হিসেবে প্রচারের জন্য তিন ভাগে এগুলো লিখি। মূল শিরোনাম ছিল "Recent events in Bangladesh"। উপ-শিরোনাম ছিল—Historical Background (১৯৪৭ সালের আযাদী থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত ঘটনার ভাবাবেগবর্জিত সংক্ষিপ্ত তথ্যমূলক বিশ্লেষণ), Election in Pakistan and Aftermath (নির্বাচনের ফলাফল, অসহযোগ আন্দোলন ও স্বাধীনতা ঘোষণার

প্রেক্ষাপট); এবং শেষেরটি Genocide in Bangladesh (২৫শে মার্চের পরের গণহত্যার বিবরণ এবং পাকিস্তানী মিথ্যা প্রচারণার জবাব)। ইংরেজীতে লেখা এ কথিকাগুলো উর্দুতে অনুবাদ করে আকাশবাণী দিল্লী কেন্দ্রের বহির্বিশ্ব উর্দু সার্ভিসের বিশেষ অনুষ্ঠানে ১৯৭১ এর ২, ৪, এবং ৮ই জুন প্রথম প্রচারিত হয় এবং পরে পুণঃ প্রচারিত হয়। প্রতিটি কথিকার জন্য ১০ মিনিট বেতার সময় বরাদ্দ ছিল। এছাড়া আকাশবাণী দিল্লীর "হামারে মেহমান" অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের ওপর আমার ১০ মিনিটের বেতার সাক্ষাতকার প্রচারিত হয় ১৪ মে তারিখে। এটি উর্দুতে গৃহীত হয় এবং ভাংগা ভাংগা উর্দুতে আমার বক্তব্য পেশ করি। একই দিন দিল্লী টেলিভিশন তাদের 'আজ কাল' অনুষ্ঠানে আমার একটি ১০ মিনিটের টিভি সাক্ষাতকার প্রচার করে। মুক্তিযুদ্ধের ওপর এ সাক্ষাতকারে একই সাথে দিল্লী সফররত আওয়ামী লীগের ধর্মীয় ফ্রন্ট আওয়ামী ওলামা-লীগের সভাপতি জনাব খায়রুল ইসলাম যশোরীর সাক্ষাতকারও প্রচারিত হয়। শ্রোতাদের সুবিধার্থে এটি হিন্দিতে গৃহীত হয় এবং আমরা ভাংগা ভাংগা হিন্দিতে যেটুকু বোধগম্য ভাবে আমাদের বক্তব্য পেশ করি। মওলানা যশোরী তখন মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে ভারতীয় ওলামাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। এছাড়া তরুণদের জন্য সর্বভারতীয় অনুষ্ঠান যুব বাণীতেও আমার আরেকটি সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। আকাশবাণীতে প্রচারিত কথিকাগুলোর উর্দু অনুবাদ সাংবাদিক জনাব নজমুল হাসান কয়েকটি উর্দু পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। মে এবং জুন এই দু'মাসে দিল্লীস্থ প্রচার মাধ্যমগুলোর সহায়তায় ব্যাপক প্রচার চালাই। আকাশবাণীতে প্রচারিত কথিকাগুলোর মূল ইংরেজী স্ক্রীপ্ট সাইক্লোস্টাইল করে "জবাসস" এর External Bureau নাম দিয়ে দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও অন্যান্য এলাকা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন ধরণের পত্র পত্রিকার ঠিকানায় ডাক যোগে পাঠাই। দিল্লীর অনেক প্রবীণ সাংবাদিক বন্ধু আমাকে হেসে জিজ্ঞেস করতেন "রহমত, আপনার 'জবাসস'-এর External Bureauটা কোথায়?" আমিও হেসে জবাব দিতাম, "আমাদের সব কিছুই এখন চলমান, আজ এখানে কাল ওখানে। আমার হাতের ব্রীফকেসটাই আপাততঃ 'জবাসস'-এর চলমান ব্যুরো"।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গেও আমার যোগাযোগ হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণদের একটি মুখপত্র AFON-এর সম্পাদক তাদের বাংলাদেশ সংখ্যার জন্য আমার একটি লেখা নেন। এসময়েই একদিন দিল্লীতে যাত্রা-বিরতিকালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গেষ্ট হাউজে অবস্থানরত ডঃ এ, আর মল্লিক এর সঙ্গে সাক্ষাত করি।

দিল্লী যাবার পূর্বে কোলকাতা থেকে একজন উত্তর কোরীয় সাংবাদিককে সাথে নিয়ে বনগাঁও এলাকার শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করে ক্যাম্প কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছিলাম। কয়েকটি ছবিও নিয়েছিলাম। এর ওপরে

ভিত্তিকরে "UN must rush to the rescue of victims" নামে একটি সচিত্র রিপোর্ট তৈরী করি। বোম্বাই থেকে প্রকাশিত ইংরেজী উর্দু, হিন্দি, মলয়ালম ইত্যাদি ভাষায় মুদ্রিত BLITZ-এ ১৫ই মে এটি প্রকাশিত হয়।

জবাসস-এর External Bureau-র নামে কিছু বাংলা দেশাত্মবোধক কবিতার ইংরেজী অনুবাদ সাইক্লোস্টাইল করেও প্রচার করা হয়েছিল। এ সম্পর্কিত কিছু রিপোর্ট কোলকাতার অমৃত ও দেশ পত্রিকায়ও ছাপা হয়েছিল। দেশ পত্রিকার নিয়মিত ফিচার 'ঘরোয়া'র লেখক "শ্রীমতী" (শ্রীমতী সুজয়া সেন)-এর সংগেও আমার দিল্লীতে পরিচয় হয়েছিল। মাতৃসমা এ মহিলার স্নেহ আমার অনেকদিন মনে থাকবে। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম দরদ ছিল। জওয়াহরলাল নেহরু প্রতিষ্ঠিত দৈনিক National Herald-এর সম্পাদকীয় পাতায় জবাসস' প্রচারিত "Bengalees are not Cowards" নামক একটি কবিতাও ছাপা হয় ১৩মে তারিখে।

এছাড়া বাংগালোর ও হুবলী থেকে একযোগে প্রকাশিত ঐ এলাকার কানাড়া ভাষার Samyukta Karnataka Group of Papers মে'র শেষে আমার সাক্ষাতকার গ্রহণ করে। দিল্লীর কয়েকজন মুসলমান সাংবাদিক বন্ধু কিছু উর্দু পত্র-পত্রিকাতেও আমার লেখার অনুবাদ পড়েছেন বলে আমাকে জানান। মোট কথা আমার সীমিত প্রচেষ্টায় এই অল্প সময়ের মধ্যেই যতটা সম্ভব প্রচার কার্য চালিয়েছিলাম এবং দিল্লীর সাংবাদিক মহলে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলাম। এ সময়ে শ্রী ফণী মজুমদারের নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি সংসদীয় দল দিল্লী সফরে আসেন। বেগম নুরজাহান মুর্শেদও এ দলে ছিলেন। দিল্লী প্রেস ক্লাব তাঁদের একটি সম্বর্ধনার আয়োজন করে। শ্রী মজুমদার ও বেগম মুর্শেদ এ সভায় বক্তৃতা দেন। আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

জয়সিংহ রোডের টুরিস্ট হোস্টেল থেকে সাংবাদিক বন্ধু শ্রী যতীন্দ্র ভাটনগরের বাসায় কিছুদিন থাকি। এর পরে বাকী সময় দিল্লীস্থ গান্ধী শান্তি পরিষদের আন্তর্জাতিক হোস্টেলে তাদের মেহমান হিসেবে থাকি। কথিকা ও সাক্ষাতকারের জন্য আকাশবাণী ও টেলিভিশন থেকে এবং অন্যান্য পত্রিকা থেকে দু'একটি লেখার জন্য প্রাপ্ত সম্মানীর টাকায় আমার খরচ চলে যায়। থাকার জন্য কোন খরচ হয়নি। খাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে কিছু খরচ হয়েছে। যাতায়াত, পত্র পত্রিকা কেনা এবং ডাক খরচ সম্মানীর টাকা থেকে চালান সম্ভব হয়েছিল।

গান্ধী শান্তি পরিষদের হোস্টেলে অবস্থানকালে বেনারসের গান্ধীয়ান ইনস্টিটিউট অব স্টাডিজ-এর যুগ্ম পরিচালক অধ্যাপক শ্রী সুগত দাশ গুপ্তের সংগে পরিচয় হয়। সর্বোদয় নেতা শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ এ প্রতিষ্ঠানের অবৈতনিক পরিচালক ছিলেন। অধ্যাপক দাশ গুপ্ত আমাকে তাঁদের ইনস্টিটিউট-এর বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত কার্যক্রমে অংশ নেবার আমন্ত্রণ জানান। আমি সময়মত

যোগাযোগ করবার প্রতিশ্রুতি দেই। এ হোস্টেলে অবস্থানকালে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপকের সংগেও আমার পরিচয় হয়। তাঁদেরকেও মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত কাগজপত্র দেই। এ ছাড়া অল ইণ্ডিয়া পঞ্চায়েত পরিষদ-এর সেক্রেটারী শ্রী জি,এল,পুরীর সংগে আমার পরিচয় হয়। তাঁর পরিষদও আমাদের সংগ্রাম সমর্থন করেছিল।

দিল্লীতে অবস্থানকালে আমাদের কূটনৈতিক প্রতিনিধি পাকিস্তান হাই কমিশনের দলত্যাগী সাবেক দ্বিতীয় সচিব জনাব কে,এম,শাহাবুদ্দীন এর সংগেও আমি যোগাযোগ রক্ষা করেছি। জুন মাসের মাঝামাঝি খবর প্রচারিত হয়, যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে নতুন সমরাস্ত্রের চালান পাঠাচ্ছে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধের স্বার্থবিরোধী এ কার্যক্রমের প্রতিবাদ করা হয়। দিল্লীতে ঐ সময়ে মাত্র কয়েকজন খাস বাংলাদেশী ছিলাম। সে কারণে অন্যান্য বাংগালী ও অবাংগালী সমর্থকদের সহায়তায় ২৫শে জুন, ১৯৭১ মার্কিন দূতাবাসের সম্মুখে এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। দিল্লীর সাংবাদিক বন্ধুদের সহায়তায় দেশী বিদেশী সংবাদ সংস্থা এবং টেলিভিশন প্রতিনিধিদের দ্বারা এ মিছিলের খবর বিশ্বব্যাপী প্রচারের ব্যবস্থা হয়। দূতাবাসের গেটে রাষ্ট্রদূতের প্রতিনিধির কাছে জনাব শাহাবুদ্দীন প্রতিবাদ লিপি অর্পণ করেন। ভারতের সকল প্রধান প্রধান দৈনিকে এ বিক্ষোভের সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল।

দিল্লীতে আমার কাজ-কমের বিস্তারিত রিপোর্ট কোলকাতা মিশনে জনাব হোসেন আলীর কাছে পাঠাতাম। জুনের শেষে দিল্লী থেকে কোলকাতা ফিরে এসে জনাব হোসেন আলী, প্রেস অ্যাটাশে জনাব মকসুদ আলী ও অন্যান্যদের সংগে সাক্ষাত করি। কোলকাতা ফেরার পর আকাশবাণীর কোলকাতা কেন্দ্র থেকে ৩রা জুলাই "জানেন ওদের মতলবটা কি" শীর্ষক আমার একটি ১০ মিনিটের কথিকা পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয় এবং পরে পুনঃপ্রচারিত হয়। এতে আমি বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত বাংগালীদেরকে জাতিগতভাবে পংগু করার পাকিস্তানী চক্রান্ত সম্পর্কে শ্রোতাদের অবহিত করে হুশিয়ার থাকবার অনুরোধ জানাই। এর পরে আমি যশোর সীমান্ত এলাকায় যাই এবং নানা প্রকার খবরাখবর সংগ্রহ করি। এ ছাড়া নওগাঁ এলাকার লোকজনদের সংগে সাক্ষাতের জন্য বালুরঘাটে যাই। সেখানে নওগাঁর এম,এন,এ জনাব বায়তুল্লাহ ও অন্যান্যরা ছিলেন। এ এলাকায় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের অন্যতম সংগঠক নওগাঁর জনাব এম,এ জলিলের সংগে সীমান্ত এলাকায় স্থাপিত কয়েকটি ক্যাম্প ঘুরে দেখি এবং খবরাখবর সংগ্রহ করি।

কোলকাতায় এ যাত্রা অবস্থানকালে আমি গান্ধী শান্তি পরিষদের কোলকাতা কেন্দ্রের আতিথ্য লাভ করি। এ প্রতিষ্ঠানও সীমান্ত এলাকার শরণার্থী শিবিরগুলোতে 'অক্সফাম'-এর সহযোগিতায় নানা রকম ত্রাণকার্য চালাচ্ছিল। এসময়ে

ভারতের কেন্দ্রীয় পুণর্বাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এবং সরকারী ত্রাণ তৎপরতার সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত কর্ণেল পি,এন, লুথরার সংগেও তাঁর কোলকাতার দপ্তরে পরিচয় হয়। ত্রাণ তৎপরতার ব্যাপকতা সম্পর্কে তাঁর কাছে থেকেই একটি ভাল ধারণা পাই।

জুলাইর শেষে উত্তর ভারতের বেনারস শহরের শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বাধীন Gandhian Institute of Studies এ বাংলাদেশ বিষয়ক কাজকর্মে যোগ দেবার জন্য দিল্লীতে থাকাকালীন যুগ্ম পরিচালক অধ্যাপক দাশগুপ্তের আমন্ত্রণ অনুযায়ী বেনারস যাই। কনসালট্যান্ট অন বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স হিসেবে প্রাথমিকভাবে তিন মাসের জন্য ইনষ্টিটিউটের সংগে যুক্ত থাকি। আমাকে ৫০০ টাকা সম্মানী (Honorarium) দেয়া হয়। এ ফেলোশীপটি তিন মাস পর আবার এক বৎসরের জন্য বাড়ানো হয়েছিল তবে বাড়তি সময়ের মধ্যে মাত্র দু'মাস কাটাবার পরেই দেশে ফিরে আসি। ইনষ্টিটিউট-এর অবৈতনিক পরিচালক ও সর্বোদয় নেতা শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণের উদ্যোগে ১৮ থেকে ২০শে সেপ্টেম্বর তিন দিন ব্যাপী "International Conference on Bangladesh" দিল্লীতে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। এতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাংলাদেশ সমর্থক প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরা যোগ দেন। এ কনফারেন্সে ব্যবহারের জন্য নানা রকম ওয়ার্কিং পেপার ইনষ্টিটিউট থেকে তৈরী করা হয়। আমি বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্ব পত্র-পত্রিকার রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে Genocide in Bangladesh" "Bangladesh in world Press" শিরোনামে দুটি পুস্তিকা প্রস্তুত করি এবং অন্যান্য ওয়ার্কিং পেপার তৈরীতেও অন্যদের সাহায্য করি। এ পুস্তিকা দু'টি এবং ওয়ার্কিং পেপারগুলো ঐ কনফারেন্সে বিতরণ করা হয়।

আগষ্ট মাসে খবর বের হয় যে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবের বিচার করবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিবেকবান ব্যক্তিরা এর প্রতিবাদ করেন। ভারতের বিভিন্ন জায়গাতেও প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। উত্তর ভারতের বেনারসেও ইনষ্টিটিউট-এর যুগ্ম পরিচালক শ্রী সুগত দাস গুপ্তের নেতৃত্বে বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্যদের প্রায় এক মাইল দীর্ঘ এক প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। আমিও এতে যোগ দেই। বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিরও অনেকে এতে অংশ নেন।

সেপ্টেম্বরের ২২ তারিখে বেনারসে শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণের সংগে আমার দ্বিতীয়বার সাক্ষাত হয়। এই সাক্ষাতকালে শ্রী নারায়ণ আমাকে বলেন ভারতের অবাংগালী অধ্যুষিত অনেক এলাকাতেই পাকিস্তানপন্থীরা আপনাদের বিরুদ্ধে ২৫শে মার্চের আগেই বাংলাদেশে ব্যাপকহারে বিহারী নিধনের অভিযোগ করে প্রচার চালাচ্ছে। বিভিন্ন সভাসমিতিতে আপনাদের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখবার সময় আমাকেও মাঝে মাঝে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। এ অভিযোগ কতটা সত্যি? আমি

তাঁকে জানাই ২৫শে মার্চের আগে বংগোলীরা এ ধরণের কাজ ব্যাপকহারে করেছে এ অভিযোগ সত্য নয়। দু'একজায়গায় এ ধরণের ছোট খাট ঘটনা অবশ্য ঘটেছে তাতে উভয় পক্ষেই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তবে এটাকে ব্যাপক বিহারী হত্যা কোন মতেই বলা চলে না। কোন কোন এলাকায় বাংগালীরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তবে ২৫শে মার্চে পাকিস্তানী গণহত্যা শুরুর পরে আমাদের দখলাধীন কোন কোন জায়গায় কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে সেটা সত্য। তবে তার জন্য দায়ী হানাদারেরা এবং তাদের সহযোগী বিহারীরা। এর উত্তরে তিনি বলেন "২৫শে মার্চ পর্যন্ত ঘটনা সম্পর্কে আমি আপনার কাছ থেকে নিশ্চিত হলাম। ২৫শের পরের ঘটনার দায়-দায়িত্ব ত পাকিস্তানীদের। যদিও পাকিস্তান সরকার তাদের 'শ্বেতপত্রে' আপনাদের ঘাড়েই আবার দোষ চাপিয়েছে।" এর পরে তিনি আমাকে ১ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত ঢাকা, পশ্চিম পাকিস্তান এবং কিছু নামকরা বিদেশী পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের ভিত্তিতে এ অভিযোগ খণ্ডন করে ব্যাপক প্রচারের জন্য একটি রিপোর্ট তৈরী করার চেষ্টা করতে বলেন। তিনি বলেন এ রিপোর্ট ভাবাবেগবর্জিত, এবং নিরপেক্ষ হতে হবে। এ আলোচনার পরদিন ২৪শে সেপ্টেম্বর বিদেশী পত্রিকার ঐ সময়ের কপি খুঁজবার জন্য দ্বিতীয়বার দিল্লী যাই। আমার রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য আমি দিল্লীর ইণ্টারন্যাশনাল ষ্টাডিজ লাইব্রেরী, বৃটিশ হ.ই কমিশন লাইব্রেরী এবং ইউ,এস,আই,এস লাইব্রেরীতে ঢাকা পিণ্ডি, প্যারিস, লণ্ডন ও নিউ ইয়র্কের প্রধান প্রধান পত্রিকাসমূহ অনুসন্ধান করি।

এসব পত্রিকার রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে "Pakistani Propaganda—Is it based on Facts?" নামে একটি তথ্যমূলক পুস্তিকা রচনা করি। এতে পাকিস্তান সরকারের "শ্বেত পত্রে" বিহারী নিধনের অভিযোগও খণ্ডন করা হয়। আমাদের কোলকাতা মিশনও আমার এ কাজে আগ্রহ দেখান এবং এ রিপোর্টের কপি পাঠাবার অনুরোধ জানান। আমি যথাসময়ে তা পাঠাই। ইনষ্টিটিউট থেকে মুদ্রিত করে এ রিপোর্টটি ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। আমিও ডাকে আমার বিভিন্ন সাংবাদিক বন্ধুর কাছে এটি পাঠাই।

নভেম্বর মাসে পুনরায় কোলকাতা আসি। এসময়ে জানতে পারি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী কোলকাতায় অবস্থান করছেন। আমি মিশন থেকে ঠিকানা নিয়ে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র ষ্ট্রীটের হোটেল পূর্বরাগে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করি। অনেক আলোচনা হয়। তিনি তখন বাংলাদেশের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রের রূপরেখা প্রণয়নে ব্যস্ত ছিলেন।

ইতিমধ্যেই ভারত সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধের তৎপরতা অনেক বৃদ্ধি পায়। এবারে কোলকাতা থেকে শিলিগুড়ি হয়ে মেঘালয় সীমান্ত পথে দেশের

অভ্যন্তরে ঢোকার প্রস্তুতি নিয়ে শিলিগুড়ি পর্যন্ত যাই। ততদিনে সীমান্ত এলাকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফলে শিলিগুড়ি থেকে ফের কোলকাতা ফিরে এলাম। সীমান্তে জোরে শোরে লড়াই চলছে শুনে নভেম্বরের শেষে কোলকাতা ছেড়ে নওগাঁ সীমান্ত নিকটবর্তী ভারতীয় শহর বালুরঘাট রওয়ানা হই। কিন্তু বালুরঘাটে তখন পাকিস্তানী শেলিং এর কারণে শহর প্রায় ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল বলে মালদা থেকে পুনরায় কোলকাতা ফিরে আসি। খবর পাই ভারতীয় নিয়মিত বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে এক যোগে লড়াই চালাচ্ছে এবং বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর পরে ঘটনার দ্রুত পট পরিবর্তন হতে থাকে। ৪ঠা ডিসেম্বর ভারত-পাকিস্তান প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হয়। এ পরিস্থিতিতে গান্ধীয়ান ইনস্টিটিউট অব স্টাডিজের সবার কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বেনারসে যাই। সেখানে থেকে শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য পাটনা যাই ১১ই ডিসেম্বর। শ্রী নারায়ণ-এর সঙ্গে সাক্ষাতের পরে ১৩ ডিসেম্বর কোলকাতা পৌঁছি। ইতিমধ্যে যশোর সহ অনেক শহর মুক্ত হয় এবং যে কোন সময়েই ঢাকা শত্রুমুক্ত হওয়ার আশা করা হচ্ছিল। কোলকাতায় সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ১৬ই ডিসেম্বর ভোর পাঁচটায় এক্সপ্রেস বাসযোগে নওগাঁ সীমান্তের নিকটবর্তী বালুরঘাট রওয়ানা হই। বিকেলে বাসে বসেই রেডিওতে ঢাকায় পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণের খবর শুনি। ১৬ থেকে ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বালুরঘাট শহরে থাকি। বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার রাস্তাঘাটে পাকিস্তানী মাইন পোঁতা ছিল এবং ভারতীয় বাহিনী মাইন অপসারণের কাজ চালাচ্ছিল। ২২শে ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর জীপে বালুরঘাট ছেড়ে নওগাঁ শহরে ফিরে আসি।

মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ
সম্পাদক, 'দৈনিক জয়বাংলা' নওগাঁ
জুন, ১৯৮৪।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান

My direct involvement with the Liberation struggle dates from after the election to the Pakistan National Assembly in December 1970. However prior to that, along with other economists from Bangladesh I had been drawn into the Bangladesh nationalist struggle as far back as a decade ago. The Bengali economists had been in the forefront in identifying the extent of the economic deprivation o

Bangladesh as a result of the domination of the Pakistani state by a ruling elite based in West Pakistan. Throughout the 1960's I had occasion to articulate my views in various public forums and in professional and popular publications on the subject of regional disparity and the need to view Pakistan in terms of two economies. These views received widespread publicity and earned the writer, along with other of his colleagues, considerable notoriety in the eyes of the Pakistani ruling class.

The views of the Bengali economists were vigorously and directly communicated to policymakers in Pakistan through our involvement in various seminars and committees. The seminar on the Second Five Years Plan in Rawalpindi in 1660 in which I participated along with Prof. Nurul Islam, the East Pakistan panel of Economists on the Second Plan in the same year, where Professors Akhlaqur Rahman, Mosharaf Hossain and myself were associated ; the First Finance Commission in 1961, where Prof. Nurul Islam was a member and I was an adviser to the East Pakistan members ; the panel of Economists on the Third Plan in 1965 where Mosharaf Hossain and myself were members ; the Fourth Five Year Plan in 1970 where Professors Mazharul Haq, Nurul Islam Akhlaqur Rahman, Anisur Rahman and myself were members ; these were all occasions where sharp contradictions on economic policy were evident and bitter exchanges took place. Between East wing economists and the planners and policymakers of Pakistan. In 1969-70 in my capacity as Executive Editor of the weekly Forum I had occasion to publicise my views to the public on the subject of the deprivation of Bangladesh and to also engage in a number of publicised confrontations with the CMLA of that time, General Yahya Khan, and with his principal economic advisor Mr. M.M. Ahmed.

The research and public position on the rights of Bangladesh taken up by the Bengali economists inevitably drew them into more active association with the political struggle for Bengali nationalism. Some of us were frequently consulted by the political leadership of the nationalist movement on economic issues. The 6 point programme of the Awami League was influenced, by our writings, though as far as I am aware no economists actually participated in its preparation. At the time of the Round Table Conference in Pindi in early 1969. Bangabandhu Shaikh Mujibar Rahman, drew upon the services of Prof. Nurul Islam, Prof. Anisur Rahman and Prof. Wahidul Haq to advise

him in the preparation of the memorandum he presented to the conference. In the summer of 1970, Prof. Nurul Islam, prof. Anisur Rahman Dr. A. R. Khan, Dr. Swadesh Bose, Dr. Hasan Imam and myself met in Karachi with Dr. Kamal Hossain to draw up the Awami League election manifesto. Its radical orientation and analytical content owes in some measure to the efforts of this group.

Upto December 1970, however, our contribution was still spasmodic. However immediately after the massive electoral victory of the Awami League in December, 1970, Bangabandhu decided to move ahead with the task of framing a viable constitution which fully incorporated the provisions of the 6 point programme in which the Awami League had fought its election campign. He wanted to discuss in detail the implications of putting such a constitution into operation so that the 6 point programme could be taken beyond the level of election rhetoric and be presented at the negotiating table and to the National Assembly as a seriously thought out and wrokable constitutional programme for the ecountry.

In the months after the election a series of meetings were convened by Bangabandhu to discuss the constitution. These meetings were attended by the high command of the Awami League made up of the Tajuddin Ahmed, Nazrul Islam, Capt. Monsoor Ali, Qamruzzaman and Khondkar Mushtaq Ahmed and by Dr Kamal Hossain, Prof. Nurul Islam, Prof. Muzaffar Ahmed Chowdhury, Prof Sarwar Murshed, Prof. Anisur Rahman and myself In these days long and intensive discussions, usually held in a house on the banks of the Buriganga, the academic participants, including Dr. Kamal Hossain played the most active role. However Tajuddin Ahmed was quite as fertile in his contribution as any of the academics demonstrating deep political insight dialectical skill and an extraordinary capacity to absorb and break down complicated technical issues to their basic essentials. Bangabandhu was himself an active participant giving us the benefit of his political experience and shrewd commonsense. By the time the group had finished their excercise, the Awami League had a constitutional draft and a fully worked out negotiating position for any future political dialogue which may have ensued.

In order to ascertain if any of the leading political parties in West Pakistan had given any serious thought to the constitution or had decided to take the 6 points seriously I was requested by Bangaban-

dhu and Tajuddin Ahmed to pay an informal visit to West Pakistan in January 1971. During this visit in Lahore I met separately with Dr. Mubasher Hasan and with Mian Mahmud Ali Qasuri of the PPP who were meant to be the leading brains of the party. Neither gave me the impression that they had given any serious thought to the task of constitution making and had little to offer but rhetorical posterings on the subject of national unity. I was interested to learn after liberation that some of my remarks made in conversation with Qasuri were subsequently passed on by him to Pakistan Military Intelligence who used them in their subsequent interrogation of Dr. Kamal Hossain when he was held in custody by them during the liberation war.

When I moved from Lahore to Karachi I had extensive discussions with Barrister Rafi Raza who was then functioning as the constitution adviser to Mr. Bhutto. From my talks with Raja I learnt that he had been entrusted by Bhutto with formulating the constitutional position of the PPP for the forthcoming assembly session. In practice he had done little work on this largely because Bhutto was himself disinclined to go into the fine points of constitution making. Discussions with one of Bhutto's principal lieutenants, Abdul Hafeez Peerzada, confirmed this point. On my return to Dhaka I could this report to Bangabandhu that the PPP was far from prepared for serious constitutional discussions.

This point was fully confirmed when the Bhutto accompanied by PPP entourage visited Dhaka at the end of January 1971. From what I learnt of these talks from Tajuddin Ahmed,the PPP were more interested in there share of power rather then to discuss the implications of implementation a constitution based on 6 Points During the PPP visit to Dhaka I had discussions with Rafi Raza and Mubasher Hasan and also with some of the PPP radicals such as Mehraj Mohammed Khan. Discussions tended to revolve around Quasi philosophical issues rather then specifics. Others are better equipped than me to give the details of the PPP-Awami League talks though some of the principal protagonists have now been eternally silenced. My own impressions were that neither the PPP nor Yahya Khan had made any effort prior to March 1, 1971 to define a serious negotiating position on the subject of 6 Points. As far as I Know, no discussion ever took place between the Awami League and any of the political leadershid of west Pakistan on the concrete problems involved in implementing 6 Points, when detailed discussions did get un-

derway at 5 Minutes to midnight, in March of 1971, the constitutional issue had moved beyond 6 Points and the Generals had already decided to settle the issue by blood and fire.

In the tense period prior to March 1, I put some of the concerns indicated above into print in my writings for Forum. In this I tried to spell out in more explicit terms the implications implementing 6 Points and the issues at stake for the political leadership in West Pakistan. The universal theme of my writings in the columns of Forum was that the 6 Points were the last chance for a political resolution to the Pakistani crisis. Beyond this lay the path of mass struggle and independence for Bangladesh. Few Bengalis at that time retained any sentimental attachment to the Pakistan concept. The only question appeared to be whether the parting of the ways would emerge through a process of constitutional evolution or through armed confrontation.

The decision by President Yahya Khan on March 1st, 1971 to postpone the meeting of the constituent Assembly in my mind marked the watershed which constitutes the political independence of Bangladesh. The non co-operation movement which was initiated on that day throughout Bangladesh, at the call of Bangabandhu Shaikh Mujibar Rahman, repudiated the political authority of the Pakistan government within the territory of Bangladesh This political authority was never again restored. All subsequent attempts by the Pakistan government after March 26, 1971 to restore their authority were seen by the masses of Bangladesh as acts of userpation by foreign military occupation power.

The totality of the success realised by the call for non-cooperation immediately created a crisis for maintaining essential civic and economic services within Bangladesh. Once the entire labour force, administration and law enforcing authorities had answered Bangabandhu's call for non-cooperation the writ of the Pakistan government in Bangladesh quite literally ceased to run outside the military cantonments. This vacuum had to be filled if social life in the country was not to break down completely. Bangabandhu had therefore assumed both political and administrative authority throughout the country once Yahya had ordered the Pakistan army to withdraw into the cantonments on 6 March 1971. From this day on Bangladesh assumed self rule for the first time since the Battle of Plassey in 1757.

During this period some of the economists of Bangladesh were thrust into the peculiar position of looking into the problems of keeping

the economy viable. Such questions as the enforcement of exchange controls on remittances to West Pakistan, the limits on the stocks of Pakistani currency arising out of the cutoff of supplies of money from the mint in Pakistan, policies towards export consignments and modes of payment, import of essentials and raw materials had to be worked out.

The residence of Prof. Nurul Islam in Dhanmondi become a sort of economic secretariat for the government of Shaikh Mujibar Rahman centred in Road No. 32 Dhanmandi. Dr. Kamal Hossain's residence in Circuit House Row was the third centre of administration. Some of us met daily at Prof. Islam's residence with some of the Bengali civil servants and bankers to review specific problems. Those were then incorporated into decrees or instructions which were passed on to the civil servants, bankers and for press circulation every evening by Tajuddin Ahmed and Kamal Hossain either at Road 32 or at Kamal Hossain's residence.

Apart from reviewing the state of the local economy, our other task was to brief the international press. Every day the elite of the foreign press crop came to these sessions. These included Tilmagn and Peggy Durdin of the New York Times, Sydney Schanberg of the New York Times whose coverage of the liberation war, had him expelled from Dhaka by the Pakistan military authorities and almost won him a Pulitzer Prize, Peter Preston, now Editor and Martin Adeney of the Guardian, Peter Hazelharst of the Times, Seling Harrison for the Washington Post, Henry Bradsher of the Washington Star. All these experienced journalists were filling regular copy from Dhaka to their news papers so that their readers were kept abreast of the unfolding drama in Bangladesh.

It was Peter Hazelharst who told me that he had recently interviewed Bhutto in Larkana and had been told by him that this agitation in Bangladesh was a storm in a tea cup led by a few urban based politicians. A massive use of force by the army which killed and terrorised the demonstrators in Dhaka and jailed many of the leaders would lower the tempo of the agitation and create a climate for more reasonable negotiations. This piece of intelligence seemed to have a prophetic quality which Bhutto may have shared with Yahya Khan since it was this false assumption which appears to have drawn the army into military adventure on 25 March, 1971.

During this period Col. Yasin of the Pakistan Army and Mr. S. Huda then in the T & T department both brothers in law to Prof. Nurul Islam were regular visitors to his house. Col. Yasin was in ch-

arge of supplies to the Pakistan forces in Dhaka. He was therefore in a position to supply a list of the food suppliers to the Pak army in Dhaka. This list was passed on to the party volunteers who then visited these suppliers and pursuaded some of them to cut off supplies to the cantonment. There was a more sinister aftermath to these exchanges After the Army assult on 25 March, both Col. Yasin and Huda were picked up by the army. Huda was kept in custody in Dhaka where he was interrogated under torture and asked to confess to conspiring with Prof. Islam and myself and acting on behalf of the Awami League to set up a telecommunications link with India. This totally fabricated charge found its way into the charge sheet for treason drawn up against Bangabandhu for which he was put on trial for his life during 1971.

Col. Yasin faced a worse fate. He was taken into custody. But in his case he was transferred to Lahore where he was interrogated under torture with a view to forcing him to bear false witness against Bangabandhu in his trial. Both these Victims owed their fate to their chance encounters with Prof. Islam and myself in those days in March.

From the time that negotiations were begun between Yahya and Mujib, some of us were drawn in to back up the Awami League team which consisted of Nazrul Islam, Tajuddin Ahmad and Kamal Hossain. The team was supposed to be negotiating an interim constittutional arrangement with Yahya's teams of experts which was made up by Major General Peerzada, Justice Cornelius and M. M. Ahmed. We would sit with the AL team after each session to take note of suggestions made by Yahya's team and to put forward our responses or our own substantive contribution. This involved long sessions including some with Bangabandhu. There was one climatic session which went on in the chamber of Dr. Kamal Hossain in Motijheel, where the AL high command and its advisers worked all night to formulate the final negotiating position for the talks the next day. Our last contribution was to sit over the handwritten amendments of M.M. Ahmed to the proposal prepared the night before. The final position taken by the Yahya team indicated that at least on economic issues an agreement could be reached. The expectation was that on the 24th March, General Peerzada would convene the final session of the negotiations, following which an announcement would be made to the press. The next 2 days were spent waiting for the convening of this session. It was only on 25th that we learnt that M.M. Ahmed had already left for West Pakistan the night before. Apparently he too had been waiting for the meeting

but was abruptly told by Peerzada that his work had been concluded that along with Justice Cornelius he could leave Dhaka. The substance of the negotiations is not discussed here as I have given my own indication of what went on in my article, 'Negotiating for Bangladesh' wihch I wrote for South Asian Review later that year to put my knowledge, whilst still fresh, on the record. Dr. Kamal Hossain has separately given his own more authoritative version on the negotiations.

The negotiations were themselves going on against a progressively mounting environment of tension, created by the daily reinforcement of the Pakistani garrisons in Bangladesh and the growing political consciousness and militancy of the Bengali masses. Around the third week of March, a friend of ours, Muyeedul Hasan, told me he had an urgent message to deliver to Bangabandhu from sources within the Cantonment. He did not reveal this at the time but later told me that the source was Air vice Marshall Khondkar who was then a Group Captain in the Pakistan airforce. I took Muyeed to Bangabandhu's residence at around 10 p. m. one night where he passed on the message that the Pakistan army was preparing to strike and was going into a state of combat readiness. Bangabandhu took note of this but said that he was already informed of these preparations.

During the period of the negotiations, I had occasion to meet with some of the National Awami Party (NAP) leaders from West Pakistan. If I recollect Abdul Wali khan of NWFP and Ghous Bux Bizenjo of Baluchistan were staying with Ahmedul Kabir, the proprietor of Daily Sangbad. Both Wali Khan and Bizenjo conveyed their apprehensions to me that the talks between Yahya, Mujib and Bhutto were likely to override the interests of the smaller provinces of West Pakistan. The Pathan and Baluchi apprehension arose from the fact that Bhutto was in these discussions demanding a free hand in West Pakistan on the strength of his electoral majorities in Panjab and Sind. As a counterpoint to autonomy demanded by Mujib for the east wing, Bhutto wanted to be chief executive for all of West Pakistan rather than just Panjab or Sind. Since the Peoples Party had been defeated at the polls in both NWFP and Baluchistan, Bhutto feared that the Awami League majority in the parliament would side with the Pathans and Baluch to completely exclude the Peoples Party from power in the Centre and would push through autonomy for the provinces of West Pakistan which could emancipate them from Panjabi hegemony. The NAP leaders feared that in order to get a free hand in the East wing Mujib would be pursu-

aded to cede a free hand to Bhutto, at the expense of autonomy for the smaller regions of West Pakistan. As it turned out however, their apprehensions about the role of Mujib turnes out to be academic. But the fear of losing out their autonomy to a Panjabi dominated West Pakistan, first under Bhutto and now the Pakistan Army, appear to have been fully justified by the passage of events.

I had some insight into the duplicity of the Pakistani Generals who, it appears, were conducting the negotiations to buy time to reinforce their garrisons in Bangladesh. On 24th March the NAP leaders and other political figures from the smaller West Pakistani parties left Dhaka. They indicated that they had been advised to do so by Yahya and that army action was imminent.

On the eveneng of 25th March, around 5—6 p.m, I took Mazhar Ali Khan, the father of Tariq Ali and a distinguished journalist in his right, who used to write a column for Forum, to meet Bangabandhu at Road 32. At that time the house was beseiged by journalists who had presumably sensed that the denouement with the Pak army was close,

Mazhar Ali Khan wanted to meed Bangabandhu so I took him in expecting to find a big crowd as there always was. Bangabandhu had known Mazhar from the days when he was the Editor of Pakistan Times in the days when it was owned by Mian Iftikharuddin. He greeted him warmly and emptied the room so that there were just two of us with him. Bangabandhu told us that the army had decided to go for a crackdown. He went on to say, I quote from memory, "Yahya thinks that he can crush the movement by killing me. But he is mistaken. An independent Bangladesh will be built on my grave". Bangabandhu appeared to have a rather fatalistic attitude to what he seemed to accept as his imminent death. He suggested that a new generation would carry on the Liberation struggle. After this meeting Mazhar Ali Khan wanted to find out what some of the PPP leaders had to say about the impending bloodbath. From Road 32 we went to the Hotel Intercontinental where we met Mahmud Ali Qasuri. In his usual rather blustering tone Qasuri immediately greeted me with the charge that, "It appears the Awami League do not wants a settlement". Since to my knowledge a draft agreement was already there waiting to be announced to the press, I asked him where he had received this confirmation. He told me that General Peerzada had told him this. Since again it was General Peerzada who had been a key figure in the negotiation, it was evident that they were feeding a diffe-

rent story to the West Pakistani political leaders and preparing the ground for a crackdown. Qasuri went on to say that the unity of the country was at stake and that if necessary blood would have to be shed in the same way as Lincoln had fought a Civil War to preserve the integrity of the United States. I left Qasuri with the observation that he was a well known jurist who had served on the Bertrand Russel War Crimes Tribunal to expose U.S genocide in Viet-Nam. Since the Pakistan army was about to launch a genocide on the Bengali people I hoped that he would raise his voice in the same way that he did for the Viet Namese.

Following this confirmation of the duplicity of the Pakistani generals I went on to the house of Kamal Hossain in Circuit House Rowd to pass on the message that Peerzada had obviously fed a concocted version of the talks to the PPP and that the ground was now set for action From there I went home to Gulshan. There were reports of army action which were given substance by the spectacle of some Awami League volunteers putting up make shift barricades on some of the roads. Sometime around 9—10 p. m. we heard the first soundi of artiliery fire which signalled that action by the Pakistan army against the EPR and Police barracks had begun. I phoned up a diret number I had to Road 32 to enquire after the welfare of Bangabandhu. I do not know who answered the phone but the voice at the phone indicated that he was there. Later calls went unanswered. After that all lines went dead.

For the next 36 hours we heard the sound of artillery and automatic weapons fire, could see the glow in the distance from fires started by the army action and listened on the 26th to Yahya's announcement. it was clear to all of as that the Liberation war had began. It was less apparent when it would end.

For the next 36 hours, confined to our house in Gulshan and cut off from telephonic contact we could only hear the sounds of genocide. On the morning of 27th March the curfew was lifted. For some reason the first thing I did that same morning was to walk across to the Ford Foundation guest house in Gulshan where Daniel Thorner, who was a visiting scholar from Sorbonne at the Pakistan Institute of Dovelopment Economics was staying. I asked him to immediately drive over to Dhanmondi to ascertain if the Nurul Islam were alright. When I returned home I found my friend Muyeedul Hasan and Mr. A Alam of Pakistan Tobacco waiting for me. Muyeed

wanted me to leave the house immediately. According to him the army had already begun killing people on a large scale. He had contacted Kamal Hossain's house and had heard that the army had been there to pick him up, but that Kamal had not been in the house.

I had not myself appreciated that I would be a target for the army since till that time one had assumed that the army would go for those who were political activists. Muyeed however advised against taking chances on this and suggested I should move out of my house. I was reluctant to do this, feeling that this would leave no family exposed to danger but my wife fell that, if anything, my presence could be a danger to them and that she would in my case be freer to get out of the house and Dhaka to leave me free to contribute to the liberation war.

With much reluctance I therefore left my family and moved that morning to another house within Gulshan. Muyeed reported to me in the afternoon that he had been to the University quarters where there was evidence of a massacre. The block of flats occupied by Prof. Abdur Razzaque and Prof. Anisur Rahman, opposite Jagannath Hall, had a pool of blood on the floor and staircase and was deserted. There were reports that Prof. Razzaque had been killed by the army. This knowledge deeply disturbed me not only because he was one of our closest friends but that this indicated that the army had widened its target to include people who were not directly involved in current events.

I spent the night of 27th in my new refuge. The next morning Muyeed visited me and reported that the previous evening, just after curfew, the army had come to my house to pick me up. As I heard later from my wife two truck loads of Pakistani army troops, led by Col. Sayeeduddin, had come to our house. This colonel claimed the distinction of having led the assault party which took Bangabandhu into custody from his house on Road 32, Dhanmondi, on the night of 25th March.

My oldest son Taimur, who was then just 8 years old, was in our house when it was invaded by the troops of the Pakistan army. He was asked by Col. Sayeeduddin about my whereabouts and appears to have handled himself quite cooly in the face of these gun toting soldiers marauding around our house. My wife Salma, on hearing of the arrival of the troops and fearing for Taimur, had tried to rush back to the house but was prevented at gun point from entering it. Col. Sayeeduddin ques-

tioned our neighbours about my whereabouts. When he heard that I had only left the house this morning he wanted to take my wife and sons hostage to the cantonment in the hope that, 'this would flush me out'. Our neighbours however pursuaded him to leave them behind.

The knowledge that the Pakistan army had paid me the compliment of wanting to pick me up within the first 48 hours of their operation indicated that I was now a designated target. Muyeed advised me that I should get out of Dhaka as there would be house to house search which would put into at risk anyone who gave me shelter. There was at that stage no foreknowledge of what course the war would take or our role in it. I sent a note to my wife asking her to get away from Dhaka and preferably abroad so that I could be more freely active in the cause of the Liberation struggle

Preparatory to my getting out of Dhaka, Muyeed took me over to the residence of Moklesur Rahman (Shidu Mian) in Gulshan. From there I move across the river from Gulshan to the village of Baraid, to the house of Shidu Mian's father-in law, Mr. Matin. Walking across the fields frow Gulshan to the village of Baraid I merged with the vast exodus of the population of Dhaka fleeing the city and heading for the Village. In this exodus I ran into Anisur Rahman, from whom I heard of the horrors he had lived through on the night of 25/26 March. He narrated how the army had invaded their block of flats and shot dead Prof. Jotyrmoy Guha Thakurta of the English Department of Dhaka University who lived on the ground floor and Prof. Maniruzzaman of statistics who lived on the top floor of the building. Prof. Razzaque was spared only by providence. Some Pakistani soldiers had banged at the door to his flat on the first floor of the flat. He took some time to come to open it. They took this to mean that his flat was empty and moved on before he could open it. Anis who lived opposite prof. Razzaque, was spared by the fact that he had put a lock on one of the doors leading into his flat which again suggested from the outside that it was empty. Anis had spent two nights and a day on the floor of his flat with his wife and two daughters, with the army going up and downs the stairs carrying out the bodies of their victims.

At the village home of Mr. Matin in Baraid we came aross a number of other friends such as Jamil Chowdhury and his family, Mokammel Haq who was son-in-law to Mr. Matin and his family and Mostafa Monwar of Dhaka Television. At Baraid it was decided that

since I was a direct target of the army and so might Anis be, we should get across the border into India and then launch a campaigm to seek international support for the cause of Bangladesh.

In the early morning of 29th March, Anisur Rahman, Mostafa Monwar and myself, guided by a relation of Mr. Matin, Mr, Rahmatullah and Mr. Rasheed, who was a school teacher in the area, set out for Agartala across the border. We were seen off at the river's edge by Shidu Mian and Muyeed.

From there we crossed the Sitalakhya by 'nauka' and headed for Narsingdi. All the way we came across people fleeing from Dhaka. At Narsinghdi we were to take a launch across the river to Brahmanbaria. Upto this point we had only seen a demoralised population fleeing army terror in Dhaka. We had heard rumours of resisistance in Chittagong but nothing more to indicate that a full scale war of resistance had begun. The first driect signs of this appeared to us when we sighted the Bangladesh flag flown by the launch which came across the river Meghna to pick up passengers at Narsingdi.

After a while we found the launch pulling into the river bank across the river but a long way from Brhamanbaria. Here some students approached us and asked us to accompany them off the launch Since at that stage both Anis and myself were not anxious to reveal our identities lest Pakistani intelligence operatives had been moving in these crowds, we were hesitant to so expose ourselves but eventually went ashore. Here we found ourselves in an unanticipated situation because some of the people there seemed to be uncertain about our identity. Apprehending that this situation might get out of hand, Mustafa Monwar, with some presence of mind asked if there were any students of Dhaka University in the vicinity and if there were that they should be sent for immediately as they would be sure to establish the identity of their teachers.

Anis and myself asked that we be taken before the local leader of the Sangram Parishad so that we could reveal our identity in confidence rather than in the middle of a big mob. At that stage a peon at Oxford University Press, Dhaka who had recognised me from my visits there spoke up so that the crowd was willing to give us a hearing We were then taken into the local school by the head of the Sangram Parishad who was an Awami Leaguer and some others. There we sought to reveal our identity but still had no way of confirming that we were whom we claimed to be. Some of the people recognised my name

but it took longer discourse for them finally to be convinced that we were the people we claimed to be. At that stage it was decided that we should go out and address the crowd now that our credentials had been established. As we went out we came across Muqtada, who had seen the direct student of Anis and myself in the Economics Department at Dhaka University and his cousin Mofakkher, a student of the History Department. They lived in the next village and when Mostafa Monwar's message to search out some Dhaka University students had finally reached them they ran all of several miles to get to us in order to proclaim our identity.

Once our bonafides had been established we became instant celebrities in the area. We moved to the house of the local Awami league leader. At that stage a rumour began to circulate in the village that large numbers of people from the area begin descending on the place where we were staying. This rumour was eventually dispelled but any hope of retaining our anonymity had vanished and it was felt that we should move on.

We were told by the local leaders that the village masses had been in a state of alert to apprehend Pakistani saboteurs and paratroopers. The local population had armed themselves with whatever weapons came to hand and were in a state of high vigilance. This again, albeit at our own expense, was reassuring first hand evidence that the village masses of Bangladesh had in these last four weeks been sufficiently mobilised to willingly participate in the aimed struggle against the Pakistan army. Under local leadership they had mobilised themselves all over the country.

From this area Muqtada and Mofakkher took us to their village to the home of Mofakkher's brother Prof. Noman, now principal of Dhaka College, There it was decided that we should head for Brahmanbaria and should travel late at night by river as there was some apprehension the Pakistan army may be patrolling the rivers. We set out for Brahmanbaria by 'nauka' in the early hours of 30th March accompanied by Muqtada, Mofakkher and his older brother Mohaddes who was in Radio Pakistan. We bid farewell there to Rashid and Rahmatullah and asked them to take messages back to our families.

We landed in Brahmanbaria early in the morning of 30 March. One of the first things we noticed patrolling the streets of the twon was an army jeep flying the Bangladesh flag. At that time Brahmanbaria was

part of liberated Bangladesh. It appeared that the town was in control of freedom fighters. We were given the opportunity to meet some of them. That same afternoon we were taken to the rest house of Titas Gas Company in Brahmanbaria. There for the first time I met Major Khaled Mosharaf of the Bengal Regiment. He told us how his units had arrested their Pakistani commanding officer and liberated Brahmanbaria which they were now planning to defend against attack by the Pakistani army.

Major Mosharaf took us on an inspection of the defenses of Brahmnbaria and then as night approachd, took all three of us to his command post at the nearby Teliapara Tea Estate which he had taken over. The whole area was in darkness as a precaution against air attack by the Pakistan air force. In the garden manager's bunglow all lights were blacked out. There Major Mosharaf narrated the odyssey of his battalion and informed us of the massacre of those of his Bengali Colleagues who had been in Comilla Cantonment where he had originally been based. He was not in close contact with other areas of the Resistance and appeared to have only some knowledge from his signals and the radio of the battle in Chittagong.

That night at the tea estate we heard together over the radio that overseas Bengalis were trying to collect money to buy arms for the Liberation struggle. Mosharaf suggested that we should go across the border and carry their request for the supply of more weaponry to the Indian authorities and should also help in the procurement of arms overseas from funds raised by the Probashi Bengalis. Mosharaf felt that whilst their resistance was strong the freedom fighters would be outgunned by the Pakistan army if they did not very soon get access to more arms and ammunition He further told me that as of now he and his officers were in a state of insurgency. They wanted direction from civilian authority. He suggested to me that in the name of the sovereign government of Bangladesh all officers and men of the Bengal Regiment should be recommissioned into the army of an independent Bangladesh. Khaled was in as much ignorance as I was over who could constitute such an authority but suggesed that if I met with any of the elected political leaders I should communicate his message to them. We were all at that stage deeply impressed by the commitment of these soldiers who had pledged their lives and risked the safety of their families left behind in the cantonments to fight for the Liberation of Bangladesh.

Early next morning, on 31st March, Major Mosharaf provided us with a jeep to take us across the border to Agartala in Tripura State. It seemed that by then the border had become quite pourus and people were moving across it with impunity.

At Agartala we learnt that a large contingent of Bangladeshis were located at the sports stadium. There we met M.R. Siddiqui, Taheruddin Thakur and a number of other Awami league M. P s, student and workers from the districts of Chittagong, Noakhali and Comilla. It appeared that M.R. Siddiqui and Thakur were flying that evening to Delhi with the Chief Minister of Tripura to put the facts of the genocide before the Indian government and to request help so that the resistance could be sustained. I learnt from Siddiqui that he had no knowledge whether other AL leaders were alive or their whereabouts. He himself had been involved in organising resistance at Chittagong and had only just come over to Tripura to seek Military assistance to enable the defense of Chittagong to survive.

At the meeting with Siddiqui and Thakur, it appeared that they themselves knew few people of consequence in Delhi. They felt that the contacts which Anis and myself had with some eminent Indian economists might help in securing an effective hearing for the Bangladesh cause. We were therefore pursuaded to join M. R. Siddiqui on the flight to Delhi that same evening. To do so we had to be fitted out in borrowed Panjabi and Pyjamas which were the only assets we carried with us on the flight from Agartala to Delhi.

On landing in Delhi on the night of 31 March 1971, Anis and I phoned Amartiya Sen who was at that time Professor at the Delhi School of Economics He and his wife came over immediately and took us to their house in the Delhi University campus. The next morning Prof. Sen took us to the residence of Dr. Ashok Mitra now Finance Minister in the CPM government in West Bengal, but who was then Economic Adviser in the Ministry of Finance, Government of India. Dr. Mitra immediately invited Prof. P N Dhar, another well known econcmists to come over. Prof. Dhar was then Secretary to the Prime Minister of India. To Prof. Dhar, Anis and myself provided a full narrative, as best known to us, of the background to the genocide, the accounts of the massacres in Dhaka and state of the resistance by the people of Bangladesh Prof. Dhar took us to Mr. P. N. Hakser, then Principal Secretary to the Prime Minister, to whom we repeated our narrative.

We are not sure if this was the first full account of the background to the liberation war which had been communicated to the upper reaches of the Government of India. It appears that round about the time that we reached Delhi, Tajuddin Ahmad, accompanied by barrister Ameerul Islam had also reached Delhi and established a more authoritative basis for communication with the Government of India. I was put in touch with Mr. Tajuddin Ahmad shortly after my arrival. He told me that he himself had no knowledge about which of his colleagues was alive. He told me how Ameerul Islam, Dr. Kamal Hossain and himself had gone to the residence of Bangabandhu on the night of 25th March, after the reports of imminent army movement had come in and had tried to pursuade him to accompany them to a more secure place. But Bangabandhu had refused to accompany them and advised them to go underground. Tajuddin and Islam had then parted company with Kamal Hossain, who had gone to a hide away in Dhanmondi, after which they had lost contact. Tajuddin and Islam had susbequently made their way across the border via Kushtia.

Whilst we were together in Delhi we were deeply disturbed to hear over the radio that Dr. Kamal Hossain had just been captured up by the Pakistan army. However by then we were getting news that one by one members of the Awami League high command had been getting across the border. Tajuddin Ahmed was anxious to fly immediately to the border to meet with his colleagues and with them constitute the government of an independent Bangladesh to give leadership to the liberation war.

In order to proclaim such a government we felt that a formal proclamation of independence should be drafted. The declaration of independence authorised by Bangabandhu which had been transmitted over the Radio at Chittagong, first by Abdul Hannan of the Awami League and then by Major Ziaur Rahman, now had to be incorporated into a formal proclamation of independence.

I was entrusted by Tajuddin Ahmed with the task of drafting the independence proclamation along with a separate statement setting out the background to the proclamation and the genocide launched by the Pakistani army on the people of Bangladesh. This task I undertook with some trepidation as these were likely to be historic documents. The proclamation of independence drafted by me incorporated the theme of the original declaration as well as Khaled Mosharaf's request that the Bengalis who had originally been with the armed services of Pakistan and had

now decided to fight for Bangladesh after March 25, 1971 should be recommissioned into the newly formed army of the Peoples Republic of Bangladesh.

As I learnt later my original draft of the proclamation was amended to make it more in conformity with the juridical parlance of such documents but some elements of my original draft constituted the core of the proclamation. However my draft on the background to the events was kept intact and presented to the world by Tajuddin Ahmad as prime Minister of independent Bangladesh on 14 April, after the government of Bangladesh officially came into being at the swearing ceremony in a grove in Kushtia which is now known as Mujeebnagar. One of the phrases which has since been frequently quoted, 'Pakistan lies dead and buried under a mountain of corpses, reflected concisely my sentiments at that time and constituted the basis of all my subsequent actions.

Whilst I was with Tajuddin and Islam we heard over the BBC that M. M. Ahmed, Economic Adviser to Yahya Khan, was flying to Washington on an emergency mission to seek renewed aid from the consortium of aid donors to Pakistan. Tajuddin felt that any attempt to finance Pakistan's war machine through aid must be resisted with all the political resources at our disposal. I was commissioned by Tajuddin to proceed to London and Washington as fast as I could to initiate a campaign on behalf of the Bangladesh government to seek the stoppage of aid to Pakistan by its principal donors. My second brief was to Pursuade all Bengali officers serving in the diplomatic missions of Pakistan to defect and proclaim allegiance to the government of Bangladesh. My particular target was the mission in the United States, where some of the most able of the Bengali service holders were located. Their defection would be of tremendous propaganda value as well as service to the Bangladesh cause.

I managed to get to London by mid-April. When I got to London I learnt that my wife and three sons had managed to get out of Pakistan and that they were now in Jordan with her sister. This knowledge gave me a feeling of complete freedom to speak out openly on behalf of the liberation struggle. When in London I made contact with Justice Abu Sayed Chowdhury who was also Vice Chancellor, Dhaka University at the time. He had been in London at the time and was one of the first to proclaim his allegiance to the liberation struggle and to speak out against the genocide.

In London through my contacts with Brian Lapping, a journalist, I was put in touch with the Biritish Labour Party and addressed a group of Labour M. P.,s in the House of Common's where I stressed the importance of putting pressure on the Conservative government to withhold further aid to Pakistan. I had a very sympathic hearing and met subsequently with Denis Healy who was then Shadow spokesman for Foreign Affairs for the Labour Party in the House of Commons.

I sought to make contact with the Tory government though Sir Douglas Dodds Parker a senior Tory M. P. who was well known to my wife's family and who could put me in touch with Sir Alec Douglas Home, the them Tory Foreign Secretary, who was also well known to my wife's family. Dodds Parker said he would pass on the message of events in Bangladesh to the foreign secretary, which he did. But I could never quite get a direct hearing from the Foreign Secretary, who was reluctant to take the political risk of meeting with a spokesman for a 'rebel' government. I tried later on, again without success, through his private secretary, Nicholas Barrington, who was also well known to me. Barrington however remained a most helpful conduct for all information on the Bangladesh case, to be passed on to the Foreign Secretary.

The real action was however building up in Washington, around M. M. Ahmed's visit We had learnt that the external resources of the Pakistani Government were low and needed urgent replenishment from the donors. With the interruption of jute exports form Bangladesh and also of public revenues, new doses of aid were seen as essential to sustain the Pakistani war effort.

I arrived in the United States towards the end of April, where by chance, in New York, I ran into Prof. Nurul Islam and Prof. Anisur Rahman, both of whom had made their way there independently of me. Prof. Islam had himself had a dramatic journey out of Dhaka. He had met up with me Delhi before leaving for the United States.

I proceeded from New York to Washington with Harun-ur-Rashid, a CSP officer who was than working with the World Bank. In Washington I was received at the airport by A.M.A. Muhith who was then Economic Minister at the Pakistan Embassy. That same evening I met with the full component of the Bengalis in the Washington Embassy. They were an elite group led by the late Enayet Karim, Shamsul Kibria, who later became foreign secretary, Prof. Abu Rushd Matinuddin who was Educational Attache there, Moazzem Ali who was I think Third Secretary, a number of non-PFS officers such as Rustam Ali, Ra-

zzaque Khan and Shariful Alam. At that stage none of these officers had defected. They all proclaimed their complete sympathy with the liberation struggle and had clandestinely been in touch with members of the U. S. Congress and even people in the State Department, to speak on behalf of the Bangladesh cause. I passed on to them Tajuddin Ahmad's message to defect. They all appeared to be willing to do so but needed to be convinced of the commitment of the people of Bangladesh to the goals of full independence and assurances about the practical problems arising out of their defection. Till then they were willing to go on speaking for Bangladesh but not openly.

During this period Razzaque Khan and Shariful Alam, along with a Bangladeshi student, Mohsin Siddiqui, came foreward quite publicly to work with me in lining up contacts with the press and TV and with Congress so that I could get my message across to them to stop aid to Pakistan. I was given a number of prime time TV appearances which gave valuable publicity to the Bangladesh cause. Warren Una, a well known journalist and TV commentator, was particularly helpful in this respect. Razzaque and Alam functioned as a sort of secretariat for me notwithstanding the fact that they were still on the Pakistan Embassy staff.

On the press front I met Henry Bradshar of the Washington Star, Lewis Simons of the Washington Post, Adam Clymer of the Baltimore Post, Ben Wells of the New York Times and Gilbert Harrison, editor of the prestigious weekly, New Republic. These were the main papers read in Washington and these columnists and their leader writers excercised considerable influence on shaping Congressional opinion. It was therefere a major coup for the Bangladesh cause when, more or less simultaneously, all four papers came out with editorials, to coincide with the arrival of M. M. Ahmed in Washington, requesting the U.S. government to suspend their aid commitment to Pakistan as long as the genocide continued in Bangladesh.

I had also been active in the Congress. Here I had been put in touch with two of the most effective supporters of the Bangladesh cause during that period, Senator Edward Kennedy and Senator Frank Church, who was a ranking membe of the Senate Foreign Relations Committee. Tom Dine, aide to Senator Church, along with Gerry Tinker and Dale Diehan, aides to Senator Kennedy, became close friends and active spokesman for the Bangladesh cause. Through them I met a number of other senators. At that time, led by Kennedy and Church, and Gallagher in the House of Representatives Congressman and Senators had begun

to speak out on the floor of the house to denounce the genocide and to demand that U.S. aid to Pakistan be reviewed. Many of these statements, along with documents and letters sent by American's who had come out from Bangladesh, after 26 March, were entered into the Congressional Record.

At that stage I was informed that some old time friends of Pakistan, led by Senator Symington, were hosting a tea for M. M. Ahmed to put his views on the events in Pakistan to the Senators. He got a small turm out but it was felt by our friends on the Hill that we should match This. Since Church and Kennedy were leading figures of the Democratic Party it was felt that a less partisan figure in the Senate might be mobilised to host a lunch for me which could attract both Republicans and Democrats. Senator Saxby of Ohio agreed to host such a lunch. This turned out a bigger and more distinguished collection of Senators than had turned up to hear M. M. Ahmed. I had as my audience, amongst others, Senators Church, Fulbright, the Chairman of the Senate Foreign Relations Committee and Senator Socott who was the Senate minority leader of the Republican Party. These distinguished figures of the American political establishment gave a patient hearing to the full facts behind the Pakistani genocide and the complicity of the U. S. government in this act as long as they remained the principal aid donors to Pakistan. Out of these early initiatives in the Senate emerged the Saxby-Church amendment to the U. S. Foreign Aid bill, which aimd to stop. U. S. aid to Pakistan as long as the genocide in Bangladesh continued. But this is a later part of the story and required a much larger mobilisation.

Following our success in the Senate we heard that M. M. Ahmed was scheduled to address a press conference at the National Press Club. We decided to beat him to it and managed, through the efforts of Razzaque Khan and his associates, to organise our own conference. This was well attended by the press, radio and TV media. Voice of America carried excerpts from my speech which were heard round the world. Nasim Ahmed correspondent of Dawn, who later became Information Secretary, under Bhutto, had been sent by Pakistan, along with another journalist, Qutubuddin Aziz, to counter my campaign. Nasim Ahmed was at my press conference but appeared more interested in monitoring who was there than in putting any serious questions to me. The success of the conference and the favourable publicity that Bangladesh was attracting in the media sufficiently discouraged M. M. Ahmed who subsequently cancelled his own press conference.

Whilst the U. S. Congress and media had given us a favourable hearing it was much more difficult to get through to the upper echelons of the Nixon administration. We had set our sight on making contact with Henry Kissinger who had taught a number of Bengalis in his International Seminar at Hurvard and was thus thought likely to be more familiar with the background to the liberation struggle. We soon found that the U. S. administration was a closed door to Bangladeshis. I was advised to fly to Cambridge to meet with Kissinger's former colleagues to see if they could get me an audience with him. Apart from some of the ranking economists such as Prof. Dorfman, I met with a colleague of Kissingers in the Dept. of government, Prof. Samuel Huntington and with Prof. Lodge at the Harvard Business School, supposedly another close friend of Kissinger. None of these contacts proved particularly useful.

At the official level in Washington the best I could do was to meet at the home of Enayet Karim, Craig Baxter, who was then the Bangladesh desk officer at the State Department. I also met through the good offices of Tom Hexner, a consultant to the World Bank, with Maurice Williams, who was then Deputy Director, U. S. Aid. I remember this meeting for the message communicated by Williams, that if Bangladesh expected its cause to be taken more seriously in Washington, it must demonstrate its military capability.

My other target in Washington was the World Bank who had till then been the leader of the Pakistan consortium and were indeed its principal spokesman in the international community.

My first contact in the Bank was with the Englishman, I. P. Cargill who was then a Vice President and the person who chaired the Pakistan Consortium. He was a close friend of M. M. Ahmed from their I. C. S. days and the most knowledgeable about affairs in Pakistan. In a recently concluded meeting of the Consortium in Paris, the members, under advise from Cargill had suspended further consideration of aid to Pakistan, till the Bank-Fund mission to Pakistan had reported on its findings on the situation in the East Wing. Cargill gave me a long hearing and gave me the impression that new aid commitments were unlikely to be forthcoming until military activities in Bangladesh were stopped.

Beyond Cargil lay the Olympian figure of Robert Macnamara, President of the World Bank. I was told that after much effort by friends within the Bank, Macnamara had agreed to meet me. I was told

that his computer oriented mind only absorbed facts which were to be presented as concisely as possible. To prepare for this, aided by other Bangladeshis in Washington, I put together a paper, arguing for the stoppage of aid to Pakistan. This paper was subsequently printed and widely circulated. I think paper was titled 'Aid to Pakistan: Background and Options'. As it transpired, in our short meeting Macnamara appeared to be more moved by the human dimensions of the problem and at least gave me the impression of having genuine concern for the nature of the crisis. It will be difficult to isolate the impact of Macnamara's response to the Bangladesh situation on the Banks role in the Pakistan aid consortium. All that can be observed is that the Bank did send out a mission to Pakistan and that this mission submitted a devastating report on the attrocities of the Pakistan army in Banglades and the complete breakdown of the development process in that area. The report of the mission, which was leaked by Harun-ur-Rashid to and publishsd in the New York Times, was an important aide to lobbystsh within the United States for the Saxby-Church amendment and in dissuading members of the Pakistan aid consortium from making fresh aid pledges in their meeting in Paris in June 1971.

Outside of my meetings with Congress, the World Bank and the media I was also in contact with some of the groups which had sprung up amongst the large Bangladeshi community resident in the United States. The main group amongst the Bangalis, chaired by the late F.R. Khan, was involved in mobilising public opinion within the United States in favour of the Bangladesh cause and in fund raising for supporting the liberation war.

One of the important tasks I had to face was to pursuade the groups to make funds available to support the Bengalis in the Pakistan mission in Washington as well as the mission to the U. N. in New YorK once they had defected. There was some misunderstanding between the Bengali community and the mission members which I tried to mediate. My final taska in Wshington was to work out with all the members of the mission an estimate of the financial requirements to support them and an establishment to enable them to function as representatives for Bangladesh. A date was also agreed to, I think it was 1st July, when They would together publicly renounce their allegiance to Pakistan and proclaim their commitment to the cause of Bangladesh. From Washington I went on to New York where I met with representatives of the Bengail community and also spoke to F. R. Khan in Chicago to secure a pledge from them to fund the Bangladesh Mission in the US.

Apart from these major involvements I used whatever residual time I had meeting with individuals or groups who might in anyway be mobilised in support of the Bangladesh cause. In New York I met with Jim Brown of the New York Times who subsequently wrote some important pieces critical of the Pakistani actions in Bangladesh. I also made some further TV appearances. I had a very valuable visit to Philadelphia at the invitation of Sultana Alam. Krippendorf where I addressed a group which she had formed to support Bangladesh. Other such groups either of Bengalis or American's who had been mobilised by Bengalis were a ready audience.

At the end of my stay in the U.S. I flew into Ottawa for a day at the request of a Bengali action group there who felt that my presence as a spokesman for the Bangladesh government may be of some value. On arrival in Ottawa I addressed a well attended Press conference. Following this I had lunch with some members of Parliament in Ottawa, chaired by the shadow foreign minister from the opposition bench. In the afternoon I was taken off to a private club for a clandestine rendezvous with a member of the Cabinet. As a Minister he was reluctant to meet me openly but gave me a sympathetic hearing. In the evening I met with the Bengali community in Ottawa. My one day visit to Ottawa was one of the most productive days I had spent on this campaign.

I returned to London at the end of May. During my short stay in London I found the climate of public opinion moving much more strongly in favour of Bangladesh. I met with Judith Hart in her home in kew Gardens. She was the Labour Front bench spokesman on foreign aid and subsequently became Minister for Overseas Development in the next Labour government. Following our meeting she made a powerful speech on the floor of the House of Commons when she demanded, on behalf of the Labour opposition, that aid to Pakistan from the U. K. be suspended and that U. K. should pledge no further aid to Pakistan till the genocide in Bangladesh was stopped and a dialogue opened with the elected leaders of Bangladesh.

I also had occasion to communicate my views to a number of Tory and Labour M. P.'s and to again use my aquaintance with Nicholas Barrington to get our views across to Sir Alec Douglas Home. I also spoke to some of the officials from the Ministry of Overseas Development in the U. K. delegation to the Consortium meeting in Paris and gave them our memorandum.

This same proposition to cut off aid to Pakistan which had been argued in our presentation to Macnamara in Washington and with the U. S. Congress, had become the main campaign theme amongst the Bengali community in U. K. The U. K. Bengalis were the most numerous of the 'Probashi' Bengali communities and were active in raising funds and mobilising public opinion in the U. K. against aid to Pakistan. Justice Abu Sayed Chowdhury had by then been officially designated as the chief spokesman for the cause and had set up offices for the movement near Liverpool Street station in East London.

During this and subsequent visits to London, Tasadduq Ahmad, proprietor of the Ganges Restaurant and his wife Rosemary, were very helpful in setting up meetings for me and letting me use their store room above their restaurant in Gerrad Street as a sort of London office. I had a number of interesting encounters there. One of these was with Phizo, the leader in exile of the Naga separatist movement. A meeting with him was set up for me on the assumption that he had some line to the Chinese regime in Beijing and might use his good offices to get the Chinese to be more receptive to the voice of the Bangladesh movement than they had been so far. Phizo came with his daughter to the meeting with me at the Ganges. He seemed more anxious to convert me to the cause of the Nagas than to contribute his services to speak to the Chinese. The meeting was thus interesting but rather unproductive.

I took the opportunity of my stay in the U. K. to do some writing on the Bangladesh issue. I renewed my old contacts with the left wing weekly, the New Statesman and offered them an article on the genocide in Bangladesh and the role of foreign aid in sustaining the Yahya regime. The Editor of the New Statesman ultimately decided to use the material from my article as the substance for a front page editorial in his weekly which demanded suspension of all U. K. aid to Pakistan. At the request of the editor John White, I also wrote a piece for South Asian Review which for the first time put on record a full account of the negotiations leading to the army crack down. I also wrote a piece for the Guardian.

During my visit I participated in a large Teach-In at the Oxford University Union organised by two sympathetic Pakistanis, Akbar Noman and Tariq Abdullah. It was largely attended and addressed by Prof. Daniel Thorner who had been witness to the Pak army genocide whilst with PIDE in Dhaka and had on his return to the Sorbonne in Paris become

a leading spokesman there for the Bagladesh cause. Apart from Daniel, another Pakistani, Tariq Ali was also bitterly critical of the Pakistani army action and spoke in support of an independent Bangladesh. He however saw this as a prelude to a revolutionary upsurge where the two Bengals may unite to form a socialist state. During his rather harsh remarks about the Pakistan army he was heckled from the gallery by someone who appeared to be a Pakistani military intelligence officer. The meeting was also addressed by a representative of Bhutto's Peoples Party. As may be expected the Pakistani cause did not get a very sympathetic hearing. I was the last speaker and received a fairly enthusiastic response from the audience This was our general experience at all such public gatherings.

From London I moved on to paris for the crucial meeting of the Pakistan Aid Consortium, scheduled if I remember, for 7 June . The Pakistanis were banking on this meeting to get a large new pledge of commodity aid, as their current import capacity had been seriously constrained by the war.

In paris I stayed with Daniel and Alice Thorner. Also staying with the Thorners was Dr. Hasan Imam who had been with PIDE and had recently come over to Paris via India. Daniel, Hasan Imam and myself prepared a memorandum for the consortium based on my original memo presented to Macnamara. This was then distributed by us on the night before the meeting to the leader of every delegation to the Consortium. We also attempted to meet with the respective delegations. Some gave us a hearing. Others were inaccessible. I met with the Deputy head of the World Bank delegation, an American by the name of Votaw the night before the meeting. He told me that it was unlikely the consortium would pledge any new aid. I spoke over the phone to Peter Cargil the Vice President of the World Bank. He had Just returned from Pakistan. He confirmed the view of his deputy but asked me to see him after the meeting was over.

Apart from our three man effort to lobby the consortium, a group of Bengalis had come over to Paris and led a procession in front of the building where the meeting was held armed with placards demanding that aid to Pakistan be cut off.

On the morning after the Consortium concluded I met with Peter Cargil over breakfast at his 5 Star Hotel, the Royal Monceau. He told me the good news that the consortium hed declined to make any new pledges until normalcy was restored in Bangladesh. They were influenced

by Cargil's report of his visit to Dhaka and Islamabad. In the meeting he confirmed the highly unstable nature of the current situation in Pakistan. Some other members made stronger observations at the meeting. But most, reacting to mounting domestic public pressure at home against the attrocities of the Pak army, were happy to use the excuse of the prevailing inhospitable climate for development in Pakistan to withold new aid pledges. The U. S. delegate made a moderating plea for some support to Pakistan but did not argue the case very strongly and went along with the decision of the Consortium.

The Consortium meeting was a serious set back for Pakistan and a modest triumph for the international mobilisation which had taken place around the world in support of Bangladesh's liberation struggle.

Apart from our work with the Consortium, Daniel used my presence in Paris to present the Bangladesh cause to influential French intellectuals. I had some useful meetings with Journalists and some leading figures of the French intellectual establishment such as Raymond Arom, Louis Dumont the Social Anthropologist and the Arabist, Maxim Robinson. I also gave a seminar at the Sorbonne. We had learnt that the French Government had been an important source of arms supplies to Pakistan. Our target was to mobilise some influential opinion in France to get these sales suspended. As it turned out the more decisive influence on the French Government was the attempt of Pakistan to renew on their payment for the arms by seeking a rescheduling of their debt. This eventually led to a cut off in arms deleveries' from France.

From Paris I moved in to Rome. During a short stay there I delivered a memo to the World Food Programme suggesting that Food aid to Pakistan, ostensibly meant for Bangladesh, should be diverted to the Bangladesh, government who would supply it across the border to inhabitants in that area. Apart from this objective I also met with officials in the three major Italian political parties, the Christian Democrats Communist and Socialists to seek their support in securing a cut off in Italian aid to Pakistan. This was meant more as a gesture, since the Italian's had never been particularly large aid donors to Pakistan or any other developing country.

From Rome I returned to base to report in the results of my campaign to the Mujibnagan government. Whilst I was there during the month of July 1971 I found that a number of my friends and academic colleagues had surfaced. We felt it appropriate that some thought be given to the future direction of an independant Bangladesh. With this in view I submitted a proposal to the Bangladesh cabinet for the

creation of a Bangladesh Planning Board. This was envisaged to have as members, Prof. Mosharaf Hossain, Prof. Sarwar Murshed, Dr. Anisuzzaman, Dr. Swadesh Bose and myself. The idea was eventually accepted but it took sometime for the proposal to take off. When I returned to Europe after a month at base, the brunt of the work was left to Prof. Hossain. When Prof. Muzaffar Ahmed Chowdhury finally surfaced, he was designated as Chairman of the Board. The board finally secured some office space and research assistance and towards the end of the war had begun work on some policy papers for the Cabinet.

Whilst at base I had occasion to meet up again with Major Khaled Mosharraf who had by now been commissioned into the army of Bangladesh and was a Sector Commander. He gave me his account of the Battle of Belonia; for this he had as witness, a British Television journalist, Vanya Kewley who had been advised by me earlier in London to meet Khaled if she wanted to see some action. During this visit I met for the first time with Major Ziaur Rahman, who was another of the Sector Commanders. Zia was then a much more withdrawn personality than Khaled. From Zia I heard his account of the battle for Chittagong and his analysis of the present war. I also met with General Osmany the C-in-C of the Mukti Bahini and with Group Captain Khondkar, who was Deputy Chief of Staff.

All those whom I met with from the Mukti Bahini spoke of the impressive mobilisation of youths who were streaming in to join the Resistance. The Majors told me of the way in which the guerilla war was being organised. They were all unanimous in their complaints that inadequacy in the quantity and sophistication of arms was the only constraint in the build up of the resistance, from what I learnt later it was only in August that the policy decision was taken by the Indian government to step up the flow of weapons to the Mukti Bahini and to improve their fire power.

Having made my reports to the Bangladesh cabinet and presented my proposal for a Planning Board to them I returned to the task of mobilising opinion in Europe and the U.S. for stopping aid to Pakistan. This time, when I set out I was equipped with official credentials by the cabinet who designated me as 'Envoie Extraordinaire in Charge of Economic Affairs'.

I returned to London in August to find that the campaign by the local Bengalis was in high tide. A mamoth rally had been organised by them in Trafalgar Square. Press support was strong, spokesman from

all parties were vocal in Parliament against aid to Pakistan and the Tory government was compelled to confirm their refusal to pledge new aid.

I had been invited to address a meeting convened by the Royal Institute of International Affairs at Chatham House in London. This provided a rather prestigious audience. I could not return in time to meet this commitment so that my wife Salma, who had by now reached U.K. with my sons, spoke in my place along with the Labour M.P. Arthur Bottomley who had just returned from a visit to Pakistan as head of British Parliamentary delegation sent out to report on the situation. Salma gave a moving account of the situation and along with Bottomley's first hand report, the occasion proved a most effective forum for the Bangladesh cause. I subsequently was invited by Chatham House to address them in October.

From U. K. I moved back to Washington. Around September the entire Bengali contingent in the embassies at Washington and to the UN finally declared their allegiance to the Bangladesh government. It was a great diplomatic coup. Since they were a big group and had within their ranks some of the most able officers of the Pakistan foreign and civil service. S.A. Karim, who was Deputy Permanent Representative at Pakistan's mission to the U.N. and the senior most amongst them came in from New York and joined the group in a well attended press conference held to announce their decision. A conspicuous absentee from the press conference was Enayet Karim who a few days before had been hospitalised by a severe coronary attack. He had however, from his sick bed, declared his solidarity with the other Bengalis.

Earlier in June we have noted that the report of the World Bank-IMF fact mission to Pakistan had been leaked to the New York Times by some officials of the World Bank. The report had a significant impact not Just on the Consortium but on the U.S. public, Congress and donors outside the United States.

By this time the Bangladesh movement in the United State had become more organised in their lobbying efforts. Support amongst the U.S. public had crystallised in the form of a number of effective Volunteer organisations made up of committed and idealistic Americans who were willing to volunteer their time and energies to work for the Bangladesh cause. One of the most effective of these groups was the Bangladesh Information Center which was based in Washington. This group took on the task of coordinating the lobbying effort for the Sexby-Church amendment.

The availability of this sizeable body of Bengali diplomats and the more widespread support for the Bangladesh cause amongst the people and Congress in the United States pursuaded the Bangladesh government to establish a permanent mission in washington. This was located in offices at Connecticut Avenue in downtown Washington. M R. Siddiqui was sent out to head the mission which was manned by a distinguished collection of defected diplomats. S.A. Karim was entrusted with the tasks in the U N. and the New York area.

The newly formed mission in Washington and the Bangladesh Information Center became the focal point for the lobby effort in Washington for the Saxby-Church amendment The amendment sought to attach a ryder on the U.S. Foreign Aid bill that all fresh commitments of U.S. aid to Pakistan be cut off till they stopped their genocide in Bangladesh and resumed a dialogue with the elected representatives of Bangladesh. This bi-partisan group in the U S. Senate, led by a ranking Republican and a Democrat, had already attracted a large number of aherents within the Senate.

The political objective of the moment was to secure a majority vote for the amendment on the floor of the Senate. Whilst the amendment had attracted very strong support its supporters had to contend with strong counter-pressures from the U.S. administration. They had moved to justify their support for the Yahya regime on the plea that they wished to retain coverage on the Yahya government and that any move to cut aid would prejudice their efforts to influence the Pakistanis. On this ground they had continued shipments of arms and spare parts to Pakistan, an exercise which had been exposed by Senator Kennedy on the floor of the Senate. An imaginative effort by a group of American supporters to organise a boat picket of the ship docked in an East Coast port for carrying the arms shipments to Pakistan, attracted much public attention.

My own efforts on my return to Washington were thus concentrated on working on the Hill to secure support for the Saxby-Church amendment. In this task I worked closely both with the Bangladesh Mission and the Bangladesh Information Center. The BIC had taken on the staf work for the lobbying. This consisted of a well researched file index on each Congressman, which spelt out their reputed political position and phobias. An explicit lobbying instructions was prepared Bengalis and sympathetic Americans both in Washington and the country at large were pursuaded to come into Washington to contribute som

time to the lobbying exercise. This mobilisation attracted quite extensive support. People took leave from their work to come into Washington and spent a few days in the task of lobbying. Americans were sent off to their respective state senators whilst Bengalis were each assigned specific members of the senate to approach.

Being closely involved in this lobbying exercise I came to aquire some insight into the intricacies of U.S. politics and the ways in which political opinion is mobilised in the United States. The dedication with which some of the American friends in the group and our now widening circle of friends amongst the staff on the Hill, worked for the cause of Bangladesh will remain an abiding memory. From the Bangladesh group I will particularly remember the work of Joan Dine, wife of Tom Dine one of our staunchest supporters on the Hill, Dave Weisbro a young graduate student who became the full time secretary of the BIC. They were aided by a young Bengali, Kaiser Haq who did good work in the office. On the Hill, Tom Dine, Gerry Tinker and Dale Diehan who were friends from the early days, were joined by Mike Gertner, aide to Senator Saxby. Ever since the lunch he hosted for me in May, Senator Saxby had become one of the staunchest supporters of the Bangladesh cause, as was evident from his willingness to co-sponsor an amendment to his own administration's Foreign Aid bill. In staying loyal to his commitment he faced up to a lot of pressure from the white House. During this phase his aide Mike Gestner was an indefatigable source of advise and support.

The lobbying effort behind the Saxby-Church amendment reached its denouncement at a...debate on the floor of the Senate. Here a peculiar coalition emerged which bought together such liberal senators as Frank Church and the Southern conservatives. The liberals spoke of the misuse of U.S. Aid in supporting the genocide by Yahya Khan's hoardes in Bangladesh. Virtually all liberal supporters of the amendment spoke in this vein. They were however now joined by the conservatives who had been outraged by the public enthusiasm on the floor of the General Assembly by some Third World countries over the admission of People's for China to the United Nations. 1971 was indeed the year when Communist China displaced Taiwan from its seat in the United Nations some 22 years after the victory of the Revolution. The whole episode in the U.N. rankled deeply amongst conservative Congressman who saw this as a display of political ingratitude by many U.S. aid dependant Third World countries. They were the mood to strike at them though a cut off in aid.

As it transpired then, the objective of securing passage for the Saxby-Church amendment ended in the defeat of the whole Aid bill on the floor of the Senate. This of course had more far reaching implications for the rest of the world. But it served as a victory of sorts for the Bangladesh lobbying effort since it effectively cut off all fresh commitments of U.S. aid to Pakistan, amongst other U,S. aid recipients.

This victory was however not enough to restrain the U.S. administration from finding other loopholes to get their aid through to Pakistan. By then the Nixon administration had amongst its NATO allies become the sole bulwark of support for the Yahya administration. The need to sustain our lobbying effort in Congress and amongst the U.S. public was thus an essential component of the strategy to at least contain the excesses of the U.S. administration on their commitment to the Pak junta.

Whilst the lobbying in Washington continued, the donors aid consortium to Pakistan still remained an important arena of influence. The annual World Bank IMF meeting held in October, 1971 in the Sheraton Hotel in Washington became another target for our efforts. Although aid to Pakistan was not an item on the agenda of the meeting, we had been advised by friends that Pakistan would use the occasion to meet with the consortium to seek a rescheduling of its debts servicing obligations and seek once again to line up fresh commitments A M.A Muhith and myself put together a fresh document spelling out Pakistan's circumstances and the case for refraining from any fresh relief to Pakistan just when the liberation war was reaching a critical stage.

Mubith and myself took on the task of tackling the different deligations from the Consortium countries who were attending the meeting, to place our literature to them and to talk with them. Our efforts inside were on one day assisted by Prof. Nurul Islam who flew in from Yale where he was based. Outside the hotel BIC group had organised small demonstration. Amongst others Joan Dine, accompanied by her baby Amy, still in her pram, participated. On one occasion Mubith found himself linked with the demonstration outside the hotel and was evicted by the security guards from the premises of the Sheraton. Fortunately I was at a distance from these proceedings and managed to rescue the bundle of literature with Muhith to resume our lobbying efforts within the hotel.

It was again a peculiar experience for us, trying to buttonhole delegates in the rooms and lobbys of the hotel in order to press our

case. Some gave as a hearing, others avoided us. We had some strange encounters. On one such occasion I ran into an old classmate from Cambridge after all of 18 years, Shahpour Shirazi who was then Governor of the Bank Markazi in Iran. I used the occasion to question him on the subject of the Shah of Iran's Military aid to Pakistan. Shahpour claimed that the Shah had interceded with Yahya to prevent the execution of Bangabandhu. I have no way of verifying the truth of this statement.

On another occasion we met through another friend from Cambridge, Lal Jaywardene, who was then Secretary, Economic Affairs in the Govt. of Sri Lanka. Lal arranged a meeting for Prof. Islam and myself with the Trotskyite, Finance Minister of Sri Lanka, N.M. Perera. We took him to task for Sri Lanka's provision of landing rights to PIA and the Pakistan Air Force to facilitate their carriage of arms and troops to Bangladesh. He denied this and promised to see that landing rights were not thus abused. Again I cannot vouch for his success in making good his promise.

The other main exercise with which I came to be associated at that time was the campaign at the United Nations. The Bangladesh government had nominated a delegation to the United Nations General Assembly session beginning in October 1971. The delegation was to be headed by Justice Abu Sayeed Chowdhury. I was nominated as a member of delegation along with Ambassador K.K. Panni who had defected from Manila, Ambassador A. Fateh who had defected from Iraq, and a number of other delegates such as Dr. A.R. Mallik who had come over to join the delegation. The lobbying exercise at the U.N. was more frustrating, since it aimed to generate support for a resolution in the General Assembly to stop the genocide in Bangladesh. This issue may have given occasion for some speeches in our favour on the floor of the Assembly and in some of the Committees, but not much more came of it largely because most U.N. members were reluctant to raise their voice against anything which appeared to interfere with the sovereignty of a member nation. Since at that stage none of the veto power states had sought to lend their public support to the cause of Bangladesh the lobbying effort in the initial phase of the session tended to yield insubstantial results.

During this period I involved myself in a number of speaking engagements on behalf of Bangladesh. These included a well attended meeting at the University of Philadelphia another at the University of Syracuse, another at MIT in company with Justice Abu Sayeed Chowdhury, and Dr.

Mohiuddin Alamgir, one at Williams College organised for me by Prof. Anisur Rahman who was based there and one at Yale organised by Prof. Nurul Islam. In most of these functions the occasional group of Pakistanis would turn up perhaps to heckle but at the end to put a few plaintive questions more in sorrow than in anger.

I also continued to make some appearances and to write occasionally for periodicals. Two of my most interesting appearances on TV took place towards the end of my stay. The first of these was an appearance on Public Television in Boston. This programme is organised around a court case based on some highly topical public issue where two lawyers act as counsel for the prosecution and the defense. Each is permitted to bring three witnesses to speak in their cause. If I recollect correctly, on this occasion the issue was to discuss the case for the United States government extending support to the Bangladesh cause. I fail to remember the advocate for our cause. But the opposition was led by William Rusher the proprietor of the National Review one of the foremost conservative Weeklies in the United States, edited by the well known right wing figure William F. Buckley Jr. Rusher was well to the right of Buckly and possibly to the right of Gengis Khan as well. His view of the subcontinent was frozen around the time of John Foster Dulles. He appeared to have difficulty in distinguishing the India of Indira Gandhi from that of her father in the 1950's and still seemed to think that Krishan Menon was Foreign Minister of India.

The program did not have that a large TV audience but was interesting because it brought to the surface the various arguments for and against Bangladesh. Rusher had for his case sent out a television crew to Pakistan to interview Bhutto. This rather tendentious testimony was produced before us in the studio on a video screen. Rusher also lined up Congressman Frevlinghausen from New Jersery and a former U. S. Ambassador to the U. S. who was the Pepsi-Cola magnate and had been sent out there in compensation for his financial contribution to Nixon's election campaign. On the Bangladesh side our advocate had lined by John Stonehouse, the Labour M. P. who had in England been one of the most eloquent campaigners for Bangladesh, who was specially flown in from London for the programme. There was in addition, Ambassador M. K. Rasgotra who was then number two to L. K. Jha in the Indian embassy in Washington and who is now Foreign Secretary in the government of India. Finally there was myself as the only Bangladeshi on the programme. There was a full studio audience and I am told an enthusiastic audience of TV viewers.

My second TV appearance was at a more historic moment. Prior to this all of us at the UN delegation had become more active as the Bangladesh issue finally came before the Security Council and General Assembly following the outbreak of open hostilities between India and Pakistan. The escalation in the liberation war and the growing tension on the Bangladesh border had culminated in the aggression by the Pakistan Airforce, through bombing attacks on targets in Northern India. Pakistan which had hitherto been fully committed to keep the Bangladesh issue off the UN agenda, now became active in internationalising it as part of an Indo-Pakistan threat to peace rather than as a liberation struggle. The successful advance of the Indian army into Bangladesh and the disintegration of the Pakistan army compelled Pakistan to seek international support for a cease fire and a withdrawal of the Indian army back across the border. In this task they were strongly supported by the United States and China. The latter's advocacy of the Pakiastni case was their first public action in the United Nations. The move to secure passage of a cease fire and withdrawal of forces resolution had irresistible support both in the Security Council and in the General Assembly. Apparently most members can be moved to unite behind such a resolution lest they one day find themselves at the receiving end of a war. As a result the relevant resolution, moved jointly by the United States and China seeking a cease fire secured a clear majority in the Security .Council Its passage was only frustrated by a Soviet veto.

To circumvent the veto a similar resolution was brought before the General Assembly where the members are even more forthcoming in support of any resolution seeking a cease fire. Such a resolution was thus assured an overwhelming majority. I subsequently analysed all the speechs made on this debate on the floor of the Assembly, and found that very few of the countries who voted for the resolution did so out of positive support for Pakistan, but voted more as supporters of peace as a general principle of conduct in international affairs.

We Bangladeshis were spectators to this drama in the UN which we witnessed from the galleries. Our efforts in the lobbies of the United Nations brought us much private Sympathy for the cause of Bangladesh but little support on the floor of the Assembly. There most speakers were inclined to forget the 9-month agression and genocide by the Pakistan army on the People and land of Bangladesh and were inclined to concentrate on the immediate outbreak of war between India and Pakistan.

Apart from my shared efforts at lobbying the delegates to the Security Council I was invited to appear in New York public television, a channel which is distinguished by the fact that it is the only one to feature the proceedings of the General Assembly and Securtiy Council. Our programme was designed to coincide with the debate on the General Assembly. There were two panels, one was made up of Americans. If I remember this included Tom Dine, Arnold de Borchgrave of Newsweek Magazine and one other well known personality. They were followed by what was meant to be a three-cornered discussion between the Consul-General for Pakistan in New York, Najmus Saqib Khan, the Consul General for India, and myself speaking for Bangladesh. The Pakistani Consul-General was instructed to decline to appear on the same platform with me so that he and his Indian counterpart went on the screen together ahead of me. Thus when I came on screen it turned out to be a solo appearance. By a strange coincidence I came on screen just as the counting of the vote at the General Assembly was being announced. Just as I had launched myself into my statement the cameras switched from the studio to the General Assembly to report on the massive vote there in favour of an immediate cease fire and withdrawal of forces across national boundaries. The cameras then switched back to me and the interviewer invited me to give an instant reaction to what was clearly an event which did no service to the cause of a liberated Bangladesh. To my recollection, I had to improvise very rapidly and state that 'Bangladesh which was the centre of this war as a result of the genocidal action of the Pakistan army, was not invited to participate in this debate in the General Assembly. The people and government of Bangladesh were therefore not party to these resolutions and would continue our war of liberation until such time as the Pakistani agression on the people of Bangladesh had been defeated.' My statement and subsequent observations on the situation arising out of the U. N. debate and the situation in Bangladesh appeared to be well received. For days after that I was stopped on the streets of New York by strangers who had heard my piece on the subject and complimented for my forthright statement.

The role of TV celebrity was however ephemeral. The real drama was going on in Bangladesh and more peripherally in the United Nations. We had learnt that Mr. Zulfiquar Ali Bhutto, who had at the eleventh hour been inducted into the government by Yahya Khan, was coming to New York to argue the Pakistani case before the Security Council. However Bhutto's flight to New York was being overtaken by events on the ground in Bangladesh. The spectacular advance of the Indian

and Bangladesh forces and the imminent collapse of Pakistani defenses, were setting their own seal on the debate in the U. N. From a Bengali cypher clerk, who had on instructions stayed on in the Pakistan U. N. Mission, we learnt that top secret cyphers had come in reporting that General Niazi had sought permission to surrender to the advancing forces. We also learnt that Paul Marc Henri the U N representative in Dhaka had relayed a message from Rao Farman Ali to the Secretary General seeking his good offices in securing a surrender which guaranteed the safe withdrawal of Pakistani forces from Bangladesh.

Bhutto was greeted at the airport with this, for him, alarming piece of news. His promised coup de theatre in the Security Council was thus immediately in danger of being upstaged. Being quite unprepared for this development Bhutto went to ground and spent the next few days in close confabulation with the United States Representative to the U. N. George Bush, now Vice-President in the Reagan administration and with the newly designated Chinese representative to the U. N., Huan Huang. It is not clear what was discussed by them in these conclaves but for a while we heard no more of talks of surrender. It appears that Niazi and Farman Ali had been overruled by Islamabad and were advised that new help was on the way. This suggested that China from the north and the U. S. from the sea may have held out promise to Yahya and Bhutto of such an intervention, Suddenly we found that another session of the Security Council had been convened which was to be addressed by Bhutto.

Again the Bangladesh U. N. delegation remained spectators in the galleries of the Security Council to Bhutto's antics in the Security Council. We spent our time trying to get through to delegates from the member countries of the Security Council, to pursuade them to moderate their position against demanding a cease fire and impressing them with the inevitibility of Bangladesh. In the lobbies most of the spokesman conceded that Bangladesh was a fact and that the best solution was the rapid victory of the allied forces leading to the early surrender of the Pakistan army. They conceded that the Security Council was a sideshow staged by the Americans and Chinese to create the impression that they were doing all they could in support of their friend Yahya Khan. In these meetings, another Oxford contemporary of mine from the Japanese delegation, regularly met me and kept us informed of the mood and developments within the Security Council.

I witnessed the debate in the Council on the eye of the surrender of the Pak army. Whilst Bhutto was putting on his act in the Security Council

there were reports that the U. S. Seventh Fleet had been ordered by Nixon to move to the Bay of Bengal for as yet unspecified objectives. The U. S. administration had become more strident in its denunciations of India and it was not beyond imagination to visualise a last minute intervention by the United States to bolster the fast depreciating position of the Pakistani forces in Bangladesh. The assumption was that had Niazi held out long enough such an intervention could have been engineered and used as a basis for enforcing a cease fire and settlement which preserved the integrity of Pakistan. The Security Council drama was thus a sideshow to the bigger drama around Bangladesh.

The possibility of an intervention or a diversion by the Chinese in the North Eastern sector of India was also held out as an ancillary hope. We had heard of Bhutto's airdash to Peking with a number of leading Generals of the Pakistan army to solicit such an intervention, I myself had been given some insight into this possibility. In late October I had held a secret rendezvous in Paris with K M. Kaiser who was Pakistan's ambassador to Beijing. Kaiser had come to Geneva for a conference of Pakistani Ambassadors convened by the Pakistani Foreign Minister. He had secretly flown to Paris to meet me and pass on the intelligence that China was not going to intervene militarily to save Pakistan. They would give them arms and diplomatic support but had secretly counselled for a political settlement with the Awami League whatever bluster they may make publicly in support of Pakistan. I was asked to convey all this information to the Bangladesh government. I duly did this. As I gathered later I was not the only channel of such information since some of the Bengalis in the Pakistan embassy in Beijing had also been asked to pass on this information via the Indian embassy there. To what extent subsequent military strategies in the region were planned on this intelligence I cannot say.

Given these tactics both within and without the Security Council concerted by the U. S., China and Pakistan, the resolution of the tension rested on the capacity of the allied forces to secure a rapid surrender of the Pakistan army. This had been imminent around 10 December but had at the last minute been countermanded on orders from Islamabad in order to buy time for the outside manouvres to be played out. When I left New York for London on my way home, the atmosphere was surcharged with high tension. The possibility of a new dimension to the war being opened up by the U. S. Seventh Fleet was no longer in the realn of fantasy.

I was in Oxford when we heard the exhilerating news of the surrender of the Pakistan army and witnessed on television the spectacle of General

Niazi laying down his arms before Lt. General Jagjit Singh Aurora at the Dhaka race course. It is as yet unrevealed whether the U. S. Seventh fleet would have intervened had the armies of Gen. Niazi held out a bit longer or this was another exercise in public relations by Nixon to impress upon Pakistan that he was their true ally. Certainly domestic political support within the United States for such an intervention was totally lacking. The media had been quite vocal on this issue and Jack Anderson had already published his much quoted expose of the leaked minutes of the National Security Council where Kissinger had reported on Nixon's instructions for the U. S. State Department to take a strong stand against India, Members of Congress, led by Church, Kennedy and other friends of Bangladesh, had of course been active in mobilising Congressional opinion against such an intervention It may thus be speculated that had the U. S. public, media and Congressional opinion been less sympathetic or even indifferent to the Bangladesh cause the Nixon administration may well have gone much further in their support of Pakistan. To this extent the intensive campaign to go over the head of the unsympathetic Nixon administration to the American people was not without significance to the Bangladesh cause.

We had to the end maintained communication with the donors to see that they did not reopen the question of fresh aid pledges to Pakistan. This had meant a final visit by me to Paris in early November for a meeting of the Pakistan Consortium. Another breakfast meeting with Cargill had confirmed that inspite of considerable U. S. pressure the members of the Consortium were neither inclined to extend new pledges of aid or to commit themselves to a rescheduling of Pakistan's debt servicing ability. This stand had elicited a threat from Pakistan to declare a unilateral default on their debt service obligations. Such a development would ofcourse have immediately invoked a total cut off in aid in the pipeline by such countries as Japan who were bound by strong legislative constraints in responding to the threat of default. The World Bank at this stage felt that they may have gone too far and were active in trying to work out a compromise between Pakistan and the Consortium which would have averted any overt default by Pakistan.

Here again an assessment of the campaign to pursuade donors to cut off aid to Pakistan must be viewed as a moderate gain for Bangladesh. From the initiation of the campaign by me in May, to the liberation of Bangladesh on 16 December 1971, none of the members of the Consortium actually pledged any new aid to Pakistan. There were however pledges of relief

supplies in the way of food and transport equipment which was presented by donors as a humanitarian gesture to avert famine in Bangladesh. In actual practise however, Pakistan had a full pipeline of aid, its current import programme into the Bangladesh area had been drastically cut down, it had been eating into its foreign exchange reserves and it had slowed, down on its debt service payments even before it had threatened an over default. With resort to these expedients it was clear if Pakistan had as yet come to the point where their capacity to sustain an acceptable level of current imports and consumption at least into West Pakistan had indeed addressed itself to blocking the pipeline as well as witholding new aid pledges. But our attempts to convince donors to cut off already pledged aid was less successful since it was claimed by donors that this raised various legal problems with potential suppliers.

Thus the impact of our campaign on Pakistan was more political and psychological than a tangible restraint on their actions. But they were all along kept on a fairly tight leash on the economic front and made to feel that the noose around their neck was drawing tight as the days went by without any further aid pledges. Had the liberation war been further prolonged there is little doubt that Pakistan would have faced a sufficiently severe economic crisis to have had a direct impact on the economy and people of West Pakistan.

In my last visit to Paris in November to monitor the final consortium meeting held there to service the 'old' Pakistan, I had the special privilage of meeting with the distinguished French Nobel Laureate, Andre Malraux. We had earlier on read in the press that Malraux had publicly proclaimed his support for the Bangladesh cause and had pledged that he would mobilise some of his former colleagues from the French war of resistance against the Germans, to join him in extending their services to the Mukti Bahini. Malraux was himself over 70 and not in good health so it was not clear how far this offer had any practical possibilities. But Daniel Thorner felt that as an official representative of the Bangladesh government I should at least call on him to communicate our appreciation for his gesture.

Daniel took me to Malraux's residence on the outskirts of Paris where I had the privilage of meeting this great man for the first time. Malraux spoke with great passion, He indicated that since the Spanish civil war, where he was a pilot who flew in the service of the Republic, he had never been so strongly moved over the affairs of a country other than his own. He felt so committed to the justice of the Bangladesh cause that

inspite of his advanced years and ill health he was willing to draw upon the services of ex-resistance fighters who had responded to his call to join him in fighting for Bangladesh. He indicated that they could provide valuable skills in matters of explosives and communications which were an essential element in any guerilla war. He was willing to take out such a team, fully equipped with explosives and communications equipment, to serve with the Mukti Bahini. He then involved me in an extensive down to earth technical discussion on the needs of the Mukti Bahini in this area and the practical problems of his involvement in the war. In this area I was regretably somewhat underqualified to advise him. But I extended the sincere gratitude of the people and government of Bangladesh for his gesture and promised to convey his commitment to the Bangladesh government. Apart from his pledge to intervene directly he also promised to speak with his former colleagues in the Gaullist cabinet to use his influence in seeing that France supplied no further arms to Pakistan. This had indeed been suspended because of Pakistan's failure to service its debt. It would appear that in the matter of arms sales the French were more likely to be moved by pressure on their pocket book rather than on political grounds.

As indicated earlier, I was in Oxford when the news of the surrender of the Pakistan army on 16 December came through. I had earlier in the year been awarded a fellowship by Queen Elizabeth House, Oxford, which was quite helpful in supporting my family in Oxford. I had myself done very little academic work in the service of this fellowship, having spent my entire time in the service of the Bangladesh liberation struggle. I therefore gave some thought to staying on in Oxford with my family and using the fellowship to write a book on the background and events leading to the liberation of Bangladesh. However the sense of exhileration and anticipation of the new dawn which had been ushered in for Bangladesh on its liberation made it inconceivable for me to stay back. I therefore set off home for Bangladesh via Calcutta since as yet no flights were going into Dhaka.

In to Calcutta I met up with Prof. Mosharaf Hossain, Dr. Swadesh Bose and Dr. Anisuzzaman who had in the last months been much more active in drawing up policy papers on the rehabilitation of the refugees and reconstruction of the war devastated economy of Bangladesh.

Mosharaf had already been into Dhaka with the Bangladesh Cabinet and had come back to organise the return of his family. On 31st December 1971, Mosharaf and myself, in the company of Mr. Qamruzzaman and his

family and Begum Zohra Tajuddin and her family, flew into Dhaka airport in an ancient DC—3 of the Indian airforce. We were met at the airport by Tajuddin Ahmed, the first Prime Minister of Bangladesh. I had last seen him in April in those critical days when I had drafted his historic statement to the world. It was a cold winter's morning but the sun was shining. At that sstage it seemed to us that the new year held out promise for a new world of hope and opportunity for the long deprived and war devastated people of Bangladesh.

রেহমান সোবহান
ডিসেম্বর, ৮৩।

শাহ জাহাঙ্গীর কবীর

আমার নির্বাচনী এলাকা ছিল রংপুর জেলার গাইবান্ধা মহকুমার গবিন্দগঞ্জ থানা। আমি ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭১ সাল পর্যন্ত রংপুর কারমাইকেল কলেজ ক্যাম্পাসে অবস্থান করেছি। এরপর পলাতক অবস্থায় রংপুর ও বগুড়ার বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছি। আমি ভারতে যাইনি।

আমার এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলগুলোর মাঝে সাইপাল, সাতারপাড়া, কাঁটাখালী, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মহিমাগঞ্জ নামক বিখ্যাত বন্দর এলাকাটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এখানকার বিভিন্ন পাটের গুদাম পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল।

কাঁটাখালী ব্রিজের কাছে ছিলো পাক-বাহিনীর ক্যাম্প। সেখান থেকে তারা বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে লোকজন ধরে এনে হত্যা করতো। আমার এলাকায় প্রায় এক থেকে দেড় হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছিলো। ছাত্রনেতা লতিফ, আমজাদ নামক জনৈক ব্যক্তি, মাসুম চৌধুরী, প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা, বাতাসু, এমদাদুদ্দিন, কাদের সরকার প্রমুখ অনেক লোকই পাক-বাহিনীর দ্বারা নিহত হয়েছেন।

২৮শে মার্চ পাক-বাহিনী প্রথম আক্রমণ করে কাঁটাখালী ব্রিজের আশপাশ এলাকা। গ্রামের প্রায় কয়েক হাজার লোক ব্রিজটিকে অকেজো করে দেবার জন্যে এলে বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাক-বাহিনী খবর পেয়ে এগিয়ে আসে। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে তারা ব্যাপক গুলী চালায়। এতে অকুস্থলেই প্রায় ৬ জন শহীদ হন। এই শহীদদের মাঝে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা মান্নানের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। পাক-বাহিনী চলে গেলে এ এলাকা আবার মুক্ত এলাকায় পরিণত হয়। এরপর ১৭ই এপ্রিল রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে একদল পাকসৈন্য ট্যাঙ্ক ও মর্টার নিয়ে এই এলাকা দখল করার জন্যে এগিয়ে

আসে। মুক্তিবাহিনী, ই পি আর বাহিনী প্রবল মর্টার আক্রমণের মুখে পশ্চাদপসরণ করে।

এরপর থেকেই মুক্তিবাহিনী বিচ্ছিন্ন অথচ সুপরিকল্পিত ভাবে পাক-বাহিনীকে আক্রমণ করেছে। মুক্তিবাহিনীর লক্ষ্য ছিলো রেলওয়ে সেতু, সড়ক সেতু, অকেজো করে দেয়া। এই তৎপরতায় মুক্তিবাহিনী ব্যাপক সফলতা অর্জন করে। ডিসেম্বরের প্রথমেই আমার এলাকা মুক্ত হয়। হিলি পুনর্দখল করে মুক্তি ও মিত্রবাহিনী এগুতে থাকলে পাক-বাহিনী ফাঁসিতোলা নামক স্থানে তাদের গতিরোধ করে। সেখানে তুমুল ট্যাঙ্ক যুদ্ধ হয়। পাক-বাহিনী বগুড়ার দিকে পশ্চাদপসরণ করার ফলে সম্পূর্ণ এলাকাটি মুক্ত হয়।

উল্লেখিত কাঁটাখালী ব্রিজের কাছে পাক-বাহিনীর যে ঘাঁটি ছিলো সেখানে তারা বিভিন্ন এলাকা থেকে ধরে এনে মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করতো। এই এলাকায় প্রায় শ'খানেক মেয়ে নির্যাতিতা হয়েছে বলে জানা গেছে।

মাসুম চৌধুরীকে হত্যার ঘটনাটিই আমার কাছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মনে হয়। এই প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা আমাদের এলাকার সবচেয়ে সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। কামাদিয়া হাট থেকে পাক-বাহিনী তাঁকে ধরে। হাটের লোকদের জড়ো করে পাক-বাহিনী মাসুম চৌধুরীকে নির্দেশ দেয় এদের মাঝ থেকে আওয়ামী লীগ কর্মীদের খুঁজে বের করে দিতে। বহু লোককে চেনা সত্ত্বেও এই জনদরদী ব্যক্তি কাউকেই আওয়ামী লীগ কর্মী হিসেবে চিহ্নিত করেননি। এরপর পাক-বাহিনী তাঁকে নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট চলে যায়। স্বাধীনতার পর ক্যান্টনমেন্টের মাটি খুঁড়ে তাঁর লাশ আবিষ্কার করা হয়। এবং আশ্চর্য হয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, দীর্ঘ সময়েও তাঁর লাশে কোন রূপ পঁচন ধরেনি। সম্পূর্ণ অবিকৃত লাশটিকে তুলে এনে আমরা তাঁর পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করি।

শাহ জাহাঙ্গীর কবীর
(সাবেক গণপরিষদ সদস্য, রংপুর)
৭ জুন, ১৯৭৩।

সাঈদ-উর রহমান

১৯৭১ সালের ১লা মার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে আমার শেষ দিন। ঐদিন এম,এ, শেষ পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষা। পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে বার বার শুনছিলাম করিডোরে ও রাস্তায় ছাত্রদের মিছিলের শ্লোগান। পরীক্ষা শেষে হল ছেড়ে দেবার কথা ছিল, ভাবলাম আরো সপ্তাহ খানেক

থেকে পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ি ফিরব। সাত তারিখে শেখ মুজিবের ইতিহাস সৃষ্টিকারী বক্তৃতা ও নয় তারিখে মওলানা ভাসানীর পল্টন ময়দানের সভায় অংশ নিয়ে দশ তারিখে বাড়ি প্রত্যাবর্তন করলাম। পুনরায় পঁচিশ তারিখে ঢাকা আসব ও একেবারে হল ছেড়ে দেব, সেধরণের চিন্তা মাথায় ছিল।

ছাব্বিশ তারিখের সকালে ইয়াহিয়ার বক্তৃতা বিমূঢ় করে দিল, সাহস ফিরে পেলাম পরদিন মেজর জিয়ার ঘোষণা শুনে। পরবর্তী একমাস বাড়িতে কাটা-লাম। আমাদের বাড়ি কুমিল্লা শহর থেকে দুই মাইল উত্তরে, ভারত-সীমান্ত থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে এবং রেল লাইনের একেবারে লাগোয়া। সুতরাং পাকি-স্তানী সেনাদের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া প্রতিদিন দেখতাম।

মে মাসের প্রথম দিকে বুঝলাম, আমাদেরও বাড়ি ছাড়তে হবে। আমা-দের বাড়ির মাইল খানেক উত্তরে ফকিরহাট রেল স্টেশন। ওখানে ঘাঁটি পেতেছে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী। তারা কুমিল্লা শহরে আসা-যাওয়া করে বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে। দেশে থাকা আর নিরাপদ মনে হলনা। মে মাসের শেষ দিকে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে যাই।

দেশত্যাগ করে প্রথমে ওঠলাম আত্মীয়ের বাড়িতে। ওখানে ছিলাম সপ্তাহ-খানেক। নিকটস্থ বক্সনগর যুবশিবিরে প্রতিদিন যেতাম ও দেখতাম মুক্তিযোদ্ধাদের শারীরিক কসরৎ। ক্যাম্পের পরিচালকমণ্ডলীর সঙ্গে পরিচয় হল। শিবির প্রধান অধ্যাপক আবদুর রউফ আমার পুরোনো পরিচিত। আমি চিন্তা করলাম আগরতলা যাবার। একদিন যুবশিবির থেকে পরিচয় পত্র সংগ্রহ করে ভোর-বেলা রওয়ানা হলাম আগরতলার উদ্দেশে। পার্বত্য ঘন জঙ্গলের মধ্যে আদি-বাসীদের অধ্যুষিত এলাকার ভেতর দিয়ে প্রায় পনের মাইল হেঁটে দুপুরের দিকে শহরে উপনীত হলাম। আগেই জেনেছিলাম যে, কলেজের মধ্যে পূর্বাঞ্চলীয় যুদ্ধ-ক্ষেত্রের সমন্বয়কারীদের কয়েকজনের অফিস আছে--তাদের একজন ছিলেন আবদুল মান্নান চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও আমার পুরোনো বন্ধু। বিকেলের দিকে মান্নান ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাত হল এবং তিনি আমাকে পাঠা-লেন সোনামুড়ায়, রাজনৈতিক যুবকর্মীদের কেন্দ্রস্থলে। সেখানকার প্রধান ছিলেন সৈয়দ রেজাউর রহমান—তিনিও ছিলেন আমার পূর্বপরিচিত। তিনি এবারে আমাকে পাঠালেন হাতীমারা যুবশিবিরে, শিবির প্রধানের কাছে চিঠি দিয়ে। সোনামুড়ায় একরাত কাটিয়ে পরদিন দুপুর বেলা আমি হাজির হলাম শিবিরে। যথারীতি অন্তর্ভুক্ত হলাম শিবির সদস্যরূপে। শুরু হল নতুন জীবন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় রাজনীতির প্রত্যক্ষ কার্যকলাপে আমার কোন যোগ ছিলনা; তবে বিশেষ ভাবে উৎসাহী ছিলাম মিছিলে, মিটিংয়ে। বিভিন্ন সংগঠনের মতপার্থক্য সম্বন্ধে জানলেও তার তীব্রতা আগে বুঝিনি।

হাতিমারা পার্বত্য ত্রিপুরার একটি পরিচিত অঞ্চল। জঙ্গল বেশ ঘন ও গভীর। উঁচু নীচু টিলা, মধ্যে প্রবাহিত ছোট নালা, মাঝে মাঝে টিলায় পার্বত্য উপজাতি টিপরাদের বসতি। নিকটেই একটি বাজার ও প্রাইমারী বিদ্যালয়।

রাস্তার সামান্য দূরে শিবির। প্রথমে শিবিরের প্রধান ফটক। ভেতরে সারি সারি ব্যারাকসমূহ। শাল গাছের খুঁটি, বাঁশের বেড়া ও শনের ছাউনি দিয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ ব্যারাকসমূহ তৈরী। চারপাশে ছোট ছোট ঘর। কোনটি শিবির প্রধানের, কোনটি গুদাম। এসবে থাকেন বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়োজিত পরিচালকবৃন্দ।

সুপারভাইজার হান্নান সাহেব গোড়া থেকে সংশ্লিষ্ট। তিনি প্রথম শিবিরটি চালু করেন। শিবির প্রধান আফজাল খান আসেন আগস্টের মাঝামাঝি। তিনি কুমিল্লার সুপরিচিত ছাত্রনেতা। ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন ইমাম আবু জাহিদ সেলিম। আমি এসে পেলাম আমার এক পুরোনো সহপাঠিকে—খায়রুল আলম বাদল। সামরিক প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন হাবিলদার মেজর আইউব।

শিবিরের প্রধান আকর্ষণ তরুণ মুক্তিফৌজেরা। প্রতিদিন এরা আসছে। আর নাম লিখাচ্ছে মুক্তিবাহিনীতে। কেউ আসে সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা থেকে, কেউ আসে ঢাকা-ফরিদপুরের মত দূরের এলাকা থেকে। এদের মধ্যে পনের বছরের কিশোর আছে, আবার পয়ত্রিশের যুবকও নজরে পড়ে।

হাতীমারা একটি যুবশিবির। দেশত্যাগী তরুণরা প্রথমত এসবে আশ্রয় নেয়ও প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে। রাইফেল, স্টেনগান ও গ্রেনেড ছোঁড়া সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান দেয়া ও শরীরকে কষ্টসহিষ্ণু করে সামরিক শিক্ষার জন্যে উপযোগী করে তোলাই এসবের লক্ষ্য। ছেলেরা সর্ববিধ কাজ নিজেরা করে। পানি আনা, রান্না করা, জ্বালানী সংগ্রহ, শিবির প্রহরা সবই নিজেদের করতে হয়।

কঠোর পরিশ্রমের সাথে সাথে খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রামের ব্যাপারে যথেষ্ট কঠোরতা পালন করা হয়। সকাল বেলায় নাশতা একটা আটার রুটি, সাথে কোনদিন সবুজ চা, বা অল্প ভাজি। দুপুরে বা সন্ধ্যায় এক বাসন ভাত, সাথে সামান্য ডাল বা তরকারী। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে মাসান্তে অর্দ্ধেক ডিম বা দু-এক টুকরা মাংস বা মাছ পাওয়া যায়।

ছেলেরা থাকে বাঁশের মাচায়। কেউ এর ওপর সতরঞ্চি বা চাদর বিছায়। বালিশ অনেকের নেই। বালিশের অভাবে কেউ কেউ মাথার নীচে কাপড়ের পুটুলি রাখে বা খাওয়ার প্লেটটি উপুর করে দেয়। মশারী অধিকাংশের নেই। পানি খাওয়ার জন্যে তারা ব্যবহার করে মগ, কেটলি, বাঁশের চোঙগা বা মর্টারের খোল। টিলার নীচে একটি টিউবওয়েল আছে। স্নান করে নালাতে। এতে পানি থাকে কখনো এক বিঘত, কখনও এক হাঁটু। বৃষ্টির দিনে নালার জল কর্দমাক্ত, অন্য সময় নির্মল।

সকাল সাতটায় শিবিরের কাজ শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীতের পর ব্যায়াম শিক্ষক ক্লাশ নেন। পুরো এক ঘন্টা চলে প্যারেড ও দৈহিক অনুশীলন। তারপরে সামান্য বিরতি ও নাশতা। নাশতার পর আগ্নেয়াস্ত্র চালানোর শিক্ষাদানের ক্লাশ। বেলা দশটায় রাজনীতির ক্লাশ, এগারোটার দিকে পূর্ণ বিরতি।

বিকেলের দিকে শিবির পুনরায় জেগে ওঠে। বেলা চারটে হতে প্যারেড ও দৈহিক ব্যায়াম করে খেলাধুলা শুরু হয়। শিবিরে আছে দুটো ভলিবল। সন্ধ্যার দিকে ছেলেরা আসর জমায় অফিসের সামনে খোলা জায়গায়। দুটো জারুল গাছকে ঘিরে বাঁশের মাচা তৈরী হয়েছে। তার ওপর তারা বসে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুরু হয় সন্ধ্যা সাতটা থেকে। অনেকেই অপেক্ষা করে চরম পত্রের জন্যে। এরপরে ক্যাম্প নির্জন ও নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে।

শিবিরের কাজকর্মে চাঞ্চল্য আসে যেদিন কোন বিখ্যাত অতিথি আসেন বা রিক্রুটের জন্যে সামরিক কর্তার আগমন ঘটে। এম পি, বা এম এন এ-রা আসেন, ছেলেদের সঙ্গে কথা বলেন, আশ্বাসের কথা শোনান। রিক্রুটিং অফিসার আসেন, ট্রেনিং-এর জন্য ছেলে নির্বাচন করেন। দল বেঁধে ওরা চলে যায় আসামে বা দিল্লীতে। বাকি ছেলেরা অশ্রুসজল চোখে তাদের বিদায় জানায় আর ভাবে কবে নিজেদের সুযোগ আসবে।...

ক'দিন পরে আমি সেলিম ভাইয়ের কাছে বললাম আমার প্রশিক্ষণের কথা। এমনিতেই কর্মহীন জীবনে বিরক্ত হয়ে ওঠেছিলাম। তিনি আমাকে একটি বড় আশা দিলেন। সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে আরো বড় একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে বিশেষ কারো কারো ক্ষেত্রে। দেরাদুনে জেনারেল ওভানের নেতৃত্বে তাদের ট্রেনিং দেয়া হয়। এদের নাম বেঙ্গল লিবারেশন আর্মি। যুদ্ধান্তে এদের মধ্য থেকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা হবে। তিনি ভরসা দিলেন যে আমাকে ঐ দলে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ তিনি এনে দিবেন। আমি আশায় আশায় থাকি।

হাতীমারা এলাকায় যুদ্ধের দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন দিদারুল আলম। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল। প্রায়ই তিনি বাদল ও আমাকে ডেকে পাঠাতেন তাঁর তাবুতে। তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের ভক্ত ও মওলানা ভাসানীর অনুসারী। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতাম বাংলা সাহিত্যে. সাম্প্রতিক অবস্থা সম্পর্কে। রাতটা ওখানে কাটিয়ে ফিরতাম পরদিন।

কিছুদিন পরে ফজলুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও আমার জ্ঞাতি ভাই ফিরে এল দেরাদুন ট্রেনিং নিয়ে। আমাদের ক্যাম্পেই উঠল। সে জানতে চাইল বাড়ীর খবরা খবর, আমি জানতে চাইলাম তার ট্রেনিং-এর খবর। আমি ঐ ট্রেনিং-এ যেতে চাই শুনে সে আতংকিত হল। বলল এই ট্রেনিং শুধুমাত্র

বিশ্বস্ত বাছাই করা মুজিব ভক্তদের জন্যে। স্বাধীনতার পর মুজিব-রাজত্ব নিরঙ্কুশ করার কাজে এদের ব্যবহার করা হবে। আপনি যেহেতু ভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী, সেজন্যে আপনার যাওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা। দেরাদুনে যেতে পারলেও, কোনভাবে আপনার মতিগতি জানতে পারলে পরিণতি বিপজ্জনক হবে। সুতরাং এখনে আছেন ভাল। চুপচাপ থাকেন ও সময় কাটান।

কিন্তু সময় আর কাটেনা। ঠিক করলাম একবার বাড়িতে যাব। ক'দিন ধরে শুনছিলাম, এই শিবির পার্বত্য ত্রিপুরার আরো ভেতরে সরিয়ে নেয়া হবে। তাহলে বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সেজন্যে একদিন সকালবেলা রওয়ানা হলাম দেশের দিকে।

বারোটার দিকে বাংলাদেশের ভেতর ঢুকলাম। গ্রামের পর গ্রাম নির্জন, পরিত্যক্ত। উঠোনে ঘাস গজিয়েছে, বাইরের উনুনগুলো ভেঙ্গে পড়েছে। কলা-গাছে পাকা কলা, খাবার লোক নেই। একটি বাড়িতে ডাব গাছ দেখে প্রবল তৃষ্ণা পেল। আমার সঙ্গী ছিল আমাদের পাশের বাড়ির রহিম। সে গাছে ওঠার উপক্রম করতে বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক শীর্ণকায় বৃদ্ধ। তিনি ঘর থেকে ডাব ও বটি এনে দিলেন। পরিতৃপ্তি সহকারে তৃষ্ণা নিবারণ করে আমরা যাত্রা করলাম। আছরের নামাজের সময় বাড়িতে পৌঁছলাম। মা তাড়া-তাড়ি ভাত বেড়ে দিলেন, আমি গেলাম পুকুরঘাটে গোছল করতে। হঠাৎ চীৎকার উঠল মিলিটারী আসছে। ফকিরহাট ঘাঁটি থেকে রওয়ানা দিয়ে তারা আমাদের গ্রামে এসে গেছে। দিলাম দৌড় পশ্চিম দিকে—মাঠ পেরিয়ে রেল লাইন অতিক্রম করে যেতে পারলে জানে বাঁচা যাবে।. মাঠে পৌঁছে দেখলাম মাঠভর্তি লোক। সবাই দিগ্বিদিকে ছুটছে। বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নারী-পুরুষ সবাই ছুটছে। আমার সাত বছরের ছোট বোন নুরুন্নাহারও কাপড়ের একটি পুটুলি নিয়ে মা ও চাচীদের পেছনে দৌড়ুচ্ছে।

মাইল দুয়েক দৌড়ুনোর পর আপাতত নিরাপদ স্থানে পৌঁছা গেল। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ক্ষুধায় ও পরিশ্রমে এত অবসন্ন ছিলাম যে, ধান ক্ষেতের আলের ওপর শুয়ে পড়লাম। অনেক পরে, রাতের অন্ধকারে সন্তর্পণে ফিরলাম বাড়িতে। তার দুদিন পর আবার হাতীমারা।

সম্ভবত আগস্ট মাসের শেষাশেষি আমাদের শিবির সরিয়ে নেওয়া হয় পদ্মনগরে—আরো পনের বিশ মাইল অভ্যন্তরে। পূর্বোল্লিখিত বক্সনগর ক্যাম্পও একই জায়গায় নিয়ে আসা হয়। ইতিমধ্যে আমি ট্রেনিং-এর আশা ছেড়ে দিয়ে-ছিলাম, সুতরাং কর্তৃপক্ষ আমাকে Political Motivator হিসেবে কাজ করার সুযোগ দেন। প্রতি সপ্তাহে আমাকে একটি করে বক্তৃতা দেয়ার কথা বলা হল—উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের রাজনৈতিকভাবে দীক্ষিত করা। এ কাজ করার জন্যে আমি ছোট একটি গ্রন্থাগার তৈরী করলাম এবং নিজেও পড়াশোনায় মন

দিলাম। শিবিরের বাইরে একটি স্থান নির্বাচন করে নিলাম—প্রায় দুপুর কাটত সেখানে। বক্তৃতায় আমি বলতাম মুক্তির কথা—'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম'—ঐ কথার উল্লেখ করে। ছেলেরা বেশ আগ্রহের সঙ্গে শুনত। কোন কোনদিন হয়ত বলতাম সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কথা—চারু মজুমদারের ও চে গুয়েভারার রণকৌশলও আলোচনায় আসত। সমাজতন্ত্র মানে, ইতিহাসের বিকাশ, শোষণ-মুক্তি প্রভৃতি সরল ভাষায় বলার চেষ্টা করতাম।

সেপ্টেম্বর মাসে বাড়ির দুটো দুঃসংবাদ পাই। আমাদের গ্রামটি পুড়িয়ে দিয়েছে মিলিটারীরা, বিশেষ করে পুড়িয়েছে চাচার বছর খানেক আগে নির্মিত সুদৃশ্য বাড়িটি। আমাদের ঘরগুলো অধিকাংশ পুড়ে গেছে—একটি ঘর শুধু রক্ষা পেয়েছে। জ্ঞাতি ভাই ফজলু ও নুরুদের সব ভষ্মীভূত হয়ে গেছে। (এরা মুক্তিযোদ্ধা ছিল) দ্বিতীয়টি হল যে, আব্বাকে, চাচাকে ও চাচাতো ভাইদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল। প্রচুর নির্যাতন করেছে, তবে কেন জানিনা প্রাণে মারেনি। আমাদের বাড়ির লোকেরা অন্যত্র কোথাও আশ্রয় নিয়েছে।

অক্টোবর মাস থেকে ভাল খবর পেতে লাগলাম। বাড়ি থেকেও সুসংবাদ পেলাম। ফকিরহাটের ঘাঁটি ছেড়ে পাকিস্তানী বাহিনী চলে গেছে। গাঁয়ের সবাই বাড়িতে ফিরেছে। যুদ্ধেরও নাটকীয় মোড় ফেরা লক্ষণীয় হয়ে উঠল। রাজনৈতিক নেতাদের আলাপে-সালাপে মনে হল শুভদিন সন্নিকটে। চট করে মনে পড়ল ক্যাপ্টেন দিদারুল আলমের তাঁবুতে এক ভারতীয় মেজরের কথা। তিনি বলেছিলেন যে আমরা ডিসেম্বরের মধ্যে দেশে ফিরতে পারব বলে তিনি আশা করেন।

তারপরে শুরু হল চূড়ান্ত যুদ্ধ। ডিসেম্বরের সাত তারিখে আমাদের শিবির বন্ধ বলে ঘোষিত হল। ছেলেরা রওয়ানা হল যার যার দেশে। আমি যাত্রা করলাম নয় তারিখে। সোনামুড়ার চৌকি দিয়ে কুমিল্লা প্রবেশ করলাম। সন্ধ্যায় হাজির হলাম নিজের বাড়িতে। পৌষের প্রসন্ন ভোরবেলায় আবার জমজমাট হয়ে উঠল অগ্নিদগ্ধ বাড়ির ভিটে।

সাঈদ-উর রহমান
(সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
জানুয়ারী, ১৯৮৪।

অধ্যাপক সারওয়ার মুর্শেদ

প্রথমে স্বায়ত্বশাসন আন্দোলনের একজন পর্যবেক্ষক এবং পরে এ আন্দোলনে একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে, সেই সংগে বংগবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ছয়দফা ভিত্তিক খসড়া গঠনতন্ত্র প্রণয়নকারী গ্রুপের একজন সদস্য হিসেবে

২৫শে মার্চের বেশ আগেই উপলব্ধি করেছিলাম রক্তপাত হবেই, পাকিস্তানের কাঠামোতে স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার গঠনতন্ত্র প্রণয়ন সম্ভব হলেও তা' কাগজের নক্সা হয়েই থাকবে, এবং স্বাধীনতাযুদ্ধ অনিবার্য। বংগবন্ধুর 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম,' 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' যখন ঘোষিত হল তখন পাকিস্তানীদের বাংলাদেশে genocide-এর পরিকল্পনাও সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। জাহাজ বোঝাই সমর সম্ভার এবং সাদা পোষাকে বিমানযোগে পাকিস্তান থেকে অতিরিক্ত সৈন্য আমদানী, ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহে মেশিনগান ও কামানের নগ্ন উপস্থিতি। মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনার সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ বাংগালীদের বিরুদ্ধে একটি সর্বাত্মক অভিযান আসন্ন, এ ধারণাকে আমার মনে দৃঢ়মূল করেছিল।

এ সময়ে একটি চিন্তা আমার মনকে বিশেষ জিজ্ঞাসাসঙ্কুল করেছিল: বাঙালী জাতি উদ্বেলিত প্রত্যয় ও প্রচণ্ড আবেগে ঐক্যবদ্ধ এবং অগ্নিগর্ভ, কিন্তু একটি সশস্ত্র সংগ্রাম এবং প্রতিরোধের জন্য, সংগঠন এবং আয়োজনের দিক থেকে তৈরী কি? মার্চের মাঝামাঝি সময়ে এ প্রশ্নের ইতিবাচক জবাব দেয়া সহজ ছিল না। চূড়ান্ত সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্যে তথা কৌশলগত কারণে সাময়িকভাবে ছ'দফার দাবীকে কিছু নমনীয় করা কি তাহলে যুক্তিযুক্ত নয়? কিন্তু একই সংগে এও বুঝেছিলাম যে আন্দোলনের রাশ টেনে ধরার কঠিন ঝুঁকি নেয়া হলেও সেই মুহূর্তে ইতিহাস তার গতি মন্থর করবে, স্বাধীন বাঙালী সত্তার শত্রুরা বাঙালীদের সময় দেবে, এমন চিন্তার নিশ্চিত কোনও ভিত্তি নেই।

সুতরাং গঠনতান্ত্রিক আলাপ আলোচনার আড়ালে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী বাংলাদেশে যে একটি মৃত্যুযজ্ঞের আয়োজন করছিল এ বিষয়ে বিশ্বজনমতকে অবহিত করার প্রচেষ্টা আমার কাছে প্রাধান্য পেল। ফরাসী দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্রে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশ্রুত অর্থনীতিবিদ জন কেনেথ গলব্রেথ, সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী এবং টাইমস ও নিউইয়র্ক টাইমস-এর সম্পাদকসহ আরও অনেকের কাছে এ বিষয়ে আমি তারবার্তা পাঠাই। এ বিষয়ে আরও উল্লেখ্য যে কিসিঞ্জার-নিক্সন এর পাকিস্তান সমর্থনের নীতি এবং বাংলার মাটিতে পরাশক্তি সমূহের অস্ত্রের উপস্থিতি এবং পাকিস্তানী শাসকদের বাংলার নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে তা' ব্যবহারের ক্রূর সম্ভাবনা কিভাবে বাংলার মানুষকে বিপন্ন করেছিল তা' জানাবার জন্য পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে প্রফেসর হেনরী কিসিঞ্জারকে আমি ১৬ই মার্চ একখানা চিঠি লিখি। চিঠিটির অনুলিপি নীচে সন্নিবেশিত হল:

"I am writing to you at a moment of grave peril to my people. President Yahya has moved in guns and Tanks apparently to reinforce his and Mr. Bhutto's Constitutional arguments. There has already been a good deal of wanton killing and move is promised by the situation. The holocaust that seems all but inevitable will destroy many Bengali lives and much

else. It is clear to us that this country cannot survive the application of force and that the resulting chaos and instability in wide areas in the subcontinent will benefit neither our friends nor our enemies.

"We want the world to know that a military solutions to our constitutional problem is not only liable to be barren and disastrous, but it is unnecessary. A political settlement is possible, provided the Bengali demand for changing the present colonial pattern of the relationship between the two wings was accepted by writing a constitution for the country which would give them complete control over their economic resources. But of course, Mr. Bhutto, backed by the army and the economic interests responsible for the deprivation of the Bengalis for the post twentythree years, continued to oppose this.

"The situation therefore has the elements of a sophoclean tragedy, with this difference that its denoument would affect the fate of real human beings who number seventy five million. What looms large in one's mind at the moment of the bristling array of weapons to be seen in Bangladesh today and what they augur. These weapons, American, Russian and Chinese in origin, are to be used against an unarmed people. Bengalis are united as never before in their history in their resolve to replace the old system of relationships in the country. Paradoxically, this makes the threat of massive use of force by Islamabad more real, for it has no other way of imposing its will on the Bengalis, although every dictate of sanity is against it.

"I should like to appeal to all men of goodwill, and you are a man of goodwill in high office in America, to do all they can to help avert this cruel possibility involving fellow human beings.

"I am writting this letter to you as a teacher and as one who had the great good fortune and honour of knowing you and feel sure that you could sympathise with the human aspect of our crisis. You would earn our eternal gratitude if you would exert your influence and help prevent the threatened mass slaughter of men, women and children in East Pakistan."

(The weekly wave, 25 March 1973)

চীন-আমেরিকা সম্পর্ক পুণনির্মাণের সেতু হিসেবে পাকিস্তানকে ব্যবহারের নীতির অন্যতম স্থপতি হেনরী কিসিঞ্জার যে বাংলাদেশের ঘটনাক্রমের ওপর কোনও শুভ প্রভাব বিস্তার করেননি তা' আজ বলার অপেক্ষা রাখেনা। তবে আমার এ চিঠির একটি Sequel আছে যার উল্লেখ প্রাসংগিক। এ চিঠির কয়েকমাস পর কিসিঞ্জার নয়া দিল্লীতে এলে আমি তাঁকে পশ্চিম বাংলায় আমাদের শরণার্থী শিবিরগুলোতে এসে আমেরিকার পাকিস্তান নীতির ফলাফলের একটি দিক স্বচক্ষে

দেখে যেতে আমন্ত্রণ জানাই। মানবিক বা নৈতিক প্রশ্নে সম্পূর্ণ উদাসীন এ ধুরন্ধর কূটনীতিক এবার আমার চিঠির জবাব দিলেন এবং সবিনয়ে সময়াভাবহেতু আমার আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারলেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

২৫শে মার্চের কালো রাত্রির পর যখন ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলাম তখন সিদ্ধান্ত নিলাম সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য নিজের শক্তি অনুযায়ী স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেব।

বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা ছেড়ে কিছু দিন বিভিন্ন জায়গায় আত্মগোপন করে থাকার পর যখন দেখলাম আশ্রয়দানকারীর সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে তখন একদিন নরসিংদীর পথে ভারত সীমান্তের দিকে রওয়ানা হই। ৪ঠা এপ্রিল কি ছিল সেদিনটি? তিতাসের ওপারে এক মেঘাচ্ছন্ন সকালে যখন আমি পরিবারসহ সিংগারবিল যাওয়ার পথ খুঁজছি দৈবক্রমে আমার এক প্রাক্তন ছাত্র আমাকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে কবি সানাউল হকের বাংলোয় নিয়ে আশ্রয় দেয়। এবং নদীর ওপারে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ওপর যেদিন পাকিস্তানী প্লেন থেকে কয়েকদফা গুলি বর্ষিত হয় সেদিন সন্ধ্যায় স্ত্রী এবং চার পুত্র কন্যা নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে আগরতলার দিকে রওয়ানা হই। সম্ভবতঃ সেদিনটি ছিল ১৪ই এপ্রিল।

ভারতে অবস্থানকালে আমার তৎপরতাকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে: (১) পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যের দায়িত্ব পালন, (২) অস্থায়ী সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতের অভ্যন্তরে নানা সমাবেশে এবং সেমিনারে বাংলাদেশ আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা, (৩) বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির প্রথমে আহবায়ক, পরে কোষাধ্যক্ষ হিসেবে প্রয়োজনমত মুক্তি সংগ্রামের লক্ষ্যে সমিতির স্বতন্ত্র কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ। এছাড়াও এই সময়ে অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদের কোন কোন বক্তৃতা ও নীতিবিষয়ক প্রতিবেদনের খসড়া ইংরেজীতে তৈরী করে দিয়েছি যা প্রয়োজনমত বাংলায় রূপান্তরিত করতেন ডক্টর আনিসুজ্জামান।

বাংলাদেশ আন্দোলনের পটভূমি এবং তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমার কয়েকটি জায়গায় কিছু স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এখানে তা' উল্লেখ করব। আসামের বুদ্ধিজীবীরা 'স্বাধীন বাংলাদেশের তাৎপর্য' বিষয়ে শিলং সরকারী কলেজের মিলনায়তনে একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন। এতে সভাপতিত্ব করেছিলেন আসাম সরকারের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী শ্রী ত্রিপাঠী। আমি সে উপলক্ষে যা বলেছিলাম তা' সংক্ষেপে এই: "উপমহাদেশের দুটি দেশ, ভারত এবং বাংলাদেশ, খুব স্বাভাবিক কারণে পরস্পরের বন্ধু হবে। ভারত বিভক্ত হওয়ার পর ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ভূগোলের দিক দিয়ে যথেষ্ট নৈকট্য সত্ত্বেও, ভারত এবং পাকিস্তান স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেনি। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী

ও সমরবাদীরা ভারত বিদ্বেষকে তাদের স্বৈর শাসন এবং অর্থনৈতিক শোষণের স্বার্থে জিইয়ে রেখেছে। স্বাধীনতার পর নতুন বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং ভারতের মধ্যেকার সম্পর্কের ভিত্তি হবে পরিণত কাণ্ডজ্ঞান প্রবুদ্ধ স্বার্থচেতনা এবং পারস্পরিক সম্ভ্রম, এবং এই প্রক্রিয়ায় ইতিহাসের একটি বড় রকমের বিকৃতি দূর হবে। দুদেশের যৌথ নদনদী। সহজ যাতায়াতের প্রয়োজন, অর্থনৈতিক আদান প্রদান ও সহযোগিতার প্রশ্নাতীত যৌক্তিকতাও তা'ই দাবী করে। বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামে ভারতের সহায়তা, আমাদের বিপুল সংখ্যক শরণার্থীদের ভারতে আশ্রয় দান, একটি বড় গণতান্ত্রিক দেশের অন্য একটি গণতন্ত্রকামী মানবগোষ্ঠির প্রতি এ মহানুভব সমর্থন। এই নতুন সম্পর্কের শুভসূচনা। শুধু একটি কথা ঃ ভারত আয়তনে, সম্পদে, শক্তিতে একটি বড় দেশ আর বাংলাদেশ সেসব দিক থেকে ক্ষুদ্র। এ অসমতা যেন দু'দেশের স্বাভাবিক বন্ধুতার পথে কোনদিনও অন্তরায় সৃষ্টি করতে না পারে সে বিষয়ে দুদেশকে সজাগ থাকতে হবে।" বক্তৃতা শেষ হলে মন্ত্রী মহোদয় আসন ছেড়ে এসে আমায় অভিনন্দন জানিয়ে আমার কর-মর্দন করলেন এবং আমার শ্রোতৃবৃন্দও আমার বক্তব্য ও তার আন্তরিকতা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন এক আজব কাণ্ড করে বসে। তারা তাদের কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো রিপোর্টে দাবী করে যে, বাংলাদেশ থেকে আগত এক নরাধম অধ্যাপক ভারতকে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে হাঙ্গেরী রূপে কল্পনা করে ভারতকে একটি প্রতিবেশী দমনেচ্ছু আগ্রহী শক্তি রূপে চিত্রিত করেছে। পশ্চিম বংগের কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি যাঁরা আমাকে জানতেন, আশ্রয়দানকারী সর-কারের বিরাগ থেকে সেযাত্রা আমায় রক্ষা করেন।

আরেকটি অন্য ধরণের স্মরণীয় অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল অন্ধ্র প্রদেশের এক দরিদ্র মুসলিম পল্লীতে বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামের কথা বলতে গিয়ে। এই স্বল্প শিক্ষিত গরীব মুসলমানদের কাছে পাকিস্তান ছিল একটা বিশ্বাস এবং কল্পনার স্বর্গ, তারা সেখানে কোনদিন যেতে পারবে না, তবুও সে স্থানটি তাদের মনের মধ্যে লুকোন একটি আশ্বাস ও নিরাপত্তা। অনেকক্ষণ বক্তৃতার পরও দেখলাম মানুষগুলো পাহাড়ের মত নীরব নিরুত্তাপ, তাদের চোখে শীতল ক্রোধের কাঠিন্য। কিন্তু এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল যখন আমি তাদের দিকে সঙী-নের মত কয়েকটি প্রশ্ন উদ্যত করলাম এবং জানতে চাইলাম ইসলামের কোন্ নির্দেশে আছে ধর্মের নামে কোনও মুসলমান সৈনিক পিতার সামনে কন্যাকে ধর্ষণ করতে পারে, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নারী ও শিশুহত্যা করতে পারে? প্রশ্নের পর পাকিস্তানী বর্বরতার কিছু বর্ণনা, তারপর আবার প্রশ্ন করলাম, এরই নাম কি ইসলাম? এই পাকিস্তানই কি আপনাদের প্রিয় পাকিস্তান? 'না' ভঙ্গিতে অনেকগুলো হাত এক সংগে উঠে গেল। আমার সে সন্ধ্যার বক্তৃতা শেষ হও-

য়ার আগেই পাথর গলেছিল, সেই সরল বিশ্বাসী মুসলমানরা বুঝেছিল, কেন বাঙালীরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল।

স্বাধীনতাযুদ্ধের সপক্ষে কার্যক্ষেত্রে মুজিব নগর সরকারের সংগে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং সরকার-সংশ্লিষ্ট তৎপরতার বাইরেও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির কাজের সংগে যুক্ত ছিলাম. এ কথা আগেই উল্লেখ করেছি। শুধু একটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কাজ করেছি - সেটা হল সংবাদ মাধ্যমের আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের সংগে সহযোগিতা।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রফেসর, শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁদেরকে বুদ্ধিজীবী বলেও আখ্যায়িত করা হয়, ভারতে অবস্থানকালে বাংলাদেশ আন্দোলন ভিত্তিক তাঁদের একটা আলাদা অস্তিত্ব বা তাঁদের মধ্যে স্বতন্ত্র রকম সংহতি ছিল বৈ কি—বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি স্বতন্ত্র সংহতির একটি দৃষ্টান্ত।

দিল্লী আন্তর্জাতিক সেমিনারে পাঠ করার জন্য The Nature of Bengali Nationalism শিরোনামে আমাকে একটি Paper তৈরী করার অনুরোধ জানানো হয়েছিল, তবে সে সেমিনারে আমি যোগ দিতে অসমর্থ হই। কিন্তু প্রবন্ধটির জন্য যে কাজ শুরু করেছিলাম তা' বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি অনুমোদিত একটি গবেষণা প্রকল্পের রূপ নেয়। Perspectives on Bengal শিরোনামে রচিত এই গবেষণা প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি ও উৎস নিরূপণ করা।

মুজিব নগর সরকার একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেছিলেন। একটি Long term একটি Mid term এবং Short term প্ল্যান তৈরী করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এই কমিশনকে। আমি এই কমিশনের একজন সদস্য ছিলাম। কোন Long term বা mid term প্ল্যান নিয়ে কমিশন সদস্যদের মধ্যে কোনও গভীর বা ধারাবাহিক আলোচনা বা বিতর্ক হয়নি। তবে কিছু Short term প্ল্যান নিয়ে মত বিনিময় হয়েছে—যেমন যুদ্ধশেষে বিধ্বস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন বিষয়টি এবং এর কোনও কোনওটি নীতিগতভাবে গৃহীত হয়েছিল। (মনে পড়ে তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন সমস্যা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি সমীক্ষা আমার তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছিল।) অস্থায়ী সরকার আওয়ামী লীগের পুরো আদর্শগত বর্ণালীর ধারক হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধ জয়ের শেষে এক কোটি শরণার্থীসহ গৃহে প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যকেই প্রাধান্য দিয়েছিল। তার কাছ থেকে কোন দীর্ঘ মেয়াদী, এমন কি মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা তৈরীর ভিত্তিগত দিক নির্দেশ পাওয়া সম্ভব ছিলনা। কার্যতঃ তা' পাওয়াও যায়নি। মৌলিক বিষয়ে, আমার বিশ্বাস, কমিশনের সদস্যরাও একমত পোষণ করতেন না। স্বাধীন বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক হবে এমন একটি সাধারণ ধারণা প্রচলিত ছিল কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্র ও মিশ্র অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে সে সমাজ-

তন্ত্র সীমাবদ্ধ থাকবে, না ভূমির ব্যক্তি মালিকানা বাতিল বা পুনর্বন্টনের পথে আরও সুদূরগামী হবে, এ জাতীয় প্রশ্নের মীমাংসা আমাদের যুদ্ধরত অস্থায়ী সরকার দেননি। সুতরাং কতকগুলো অবিতর্কমূলক স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনাতে কমিশন নিজের কাজকে সীমাবদ্ধ রেখেছে। তার অর্থ এই নয় যে আলাদাভাবে কমিশনের সদস্যরা কোনও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার রূপরেখা বিবেচনা করেননি— কিন্তু তা সহজবোধ্য কারণেই সরকারের দরবার পর্যন্ত পৌঁছেনি।

বিজয়ের পর কবে এবং কিভাবে আমি দেশে ফিরে আসি তার সঠিক তারিখ কিছুতেই মনে করতে পারছিনা—একাত্তরের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে জেনারেল অরোরার সৌজন্যে তাঁর বিমানে করে ঢাকায় ফিরি। প্রায় দু'দিন বিমানবন্দরে অপেক্ষা করেও যখন ঢাকাগামী কোনও বিমানে জায়গা পেলাম না জানতে পারলাম জেনারেল অরোরা ঢাকায় যাচ্ছেন, তাঁকে অনুরোধ জানান মাত্র তিনি আমাকে তাঁর সংগে নিতে রাজী হন। ভারত-বাংলাদেশ মিত্র বাহিনীর অধিনায়কের সংগে কয়েকঘন্টা কাটাবার এবং কথা বলার একটি অমূল্য সুযোগ আমার এভাবে দৈবাৎ মিলে গিয়েছিল। মনে পড়ে সিলেটের ভারতীয় ছাউনীতে অফিসারদের সংগে জেনারেল অরোরা তাঁদের মেসে এক মধ্যাহ্ন ভোজে যোগ দেন। তাঁর মেহমান হিসেবে আমিও এই ভোজে শরিক হই। এ উপলক্ষে আমার কয়েকজন জেনারেল এবং অন্ততঃ একজন এ্যাডমিরালের সংগে আলাপ হয়। তাঁদের কিছু কথা এবং ইঙ্গিত আমাকে বিস্মিত করে ছিল। স্মরণযোগ্য যে স্বাধীনতা লাভের আগের মুহূর্তে 'আল বদর' পৈশাচিক নিপুণতা ও নিষ্ঠুরতার সংগে বাংলাদেশের অনেক ক'জন বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছিল। জাতির হৃদয়ে অনেক শোকের মধ্যে এ শোকটি বড় বেশীরকম আঘাত হেনেছিল। ভারতীয় অফিসারদের কথাবার্তা থেকে আমার মনে হয়েছিল—তাঁদের ধারণায় আগেই এ ব্যাপারটি ঘটেনি এবং এ বাঙালীদের গুজব সৃজন কুশলতার আরেকটি প্রমাণ। আমি মরিয়া হয়ে অফিসারবৃন্দকে বলেছিলাম যে দীর্ঘ নিহতদের তালিকায় আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং প্রিয় অন্ততঃ চারজন অধ্যাপক ছিলেন এবং আমি নিশ্চয় করে জানি তাঁরা পাকিস্তান পরিচালিত 'আল বদরের' হাতে নৃশংসভাবে প্রাণ হারিয়েছেন।

বিমান ভ্রমণের সময় জেনারেল অরোরার সংগে আমার নানা বিষয়ে আলাপ হয়। তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, মিত্রবাহিনীর হাতে পাকিস্তানের এত দ্রুত পরাজয়ের কারণ কি। জবাবে তিনি তিনটি প্রধান কারণের উল্লেখ করেছিলেন ঃ

1. The command structure of the Pakistanis had collapsed.
2. The Mukti Bahini had worked havoc on their communication lines and sapped their morale in a war of attrition.

3. The Pakistanis were surrounded by a sea of hostility while the allied forces had the spontaneous support of the people of Bangladesh.

খান সারওয়ার মুর্শেদ
৯ নভেম্বর, ১৯৮৪।

সিরাজুর রহমান

১৯৭১ সালে বিবিসিতে কতকগুলি সমস্যা ছিল। আমাদের শ্রোতাদেরকে সঠিক তথ্য পরিবেশন করতে হবে, সর্বশেষ এবং সঠিক খবর তাদের জানাতে হবে কিন্তু সেই খবরগুলো আমরা পাই কোথায়। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সংবাদপত্রের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ থাকার ফলে সংবাদ সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। এই অসুবিধার ভেতর দিয়ে যথাসাধ্য আমাদের সংবাদ সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এরূপক্ষেত্রে যা হয়, যেখানে সত্যিকারের সংবাদ পাওয়া কঠিন হয়ে যায় সেখানে মিথ্যা সংবাদ অজস্র আসতে থাকে, গুজবগুলো সংবাদের আকার নেয়। আমাদের পক্ষে আরো বড় সমস্যা ছিল যে, বাংলাদেশ-ভারতের বাংলাভাষী শ্রোতারা, যাদের নিয়ে আমাদের কাজ কারবার, বরাবরই তাদের জন্য আমাদের সংবাদ পরিবেশন করতে হবে। কিন্তু যদি কখনো অজান্তে গুজবের বেসাতি করে আমরা এমন একটি ধারণা সৃষ্টি করে ফেলি যে আমরা দুনিয়ার অন্যান্য অঞ্চল সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ দিয়ে থাকি তাহলে ভবিষ্যতে কখনো শ্রোতারা আমাদের বিশ্বাস করবেন না। একদিকে যাতে কেউ বলতে না পারে যে আমরা খবর অন্যান্যদের পরে দিচ্ছি, দ্বিতীয়ত, আবার কেউ যাতে অভিযোগ করতে না পারে আমরা মিথ্যা খবর দিচ্ছি আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হয়েছে দু'কূল বজায় রেখেই সর্বশেষ ও সঠিক সংবাদ পরিবেশন করতে। এই ছিল আমাদের মূল সমস্যা। এছাড়া আমাদের অনুষ্ঠানের সময় ছিল খুব কম, বেশী খবর দেয়ার খুব একটা সুযোগ ছিলনা। অবশ্য পরবর্তীকালে আমাদের অনুষ্ঠানের সময় বাড়ানো হয়েছিল।

আমরা বাংলা বিভাগে যারা ছিলাম সংখ্যায় অত্যন্ত কম ছিলাম। আমাদের পক্ষে সবকিছু সামলানো মুশকিল হয়ে যাচ্ছিল। সৌভাগ্যবশতঃ তখন আশে পাশে কিছু ছাত্র ছিলেন, তাঁরা এদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্যে এসেছিলেন। তাঁরা আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। আমার মনে আছে আমার সহকর্মী শ্যামল লোধ, কমল বোস সহ কোন কোন সময়ে দিনের পর দিন আমরা সকাল ৯টার সময় অফিসে এসেছি আবার রাত ২/৩ টার সময় ট্রান্সমিশানগুলোর কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরেছি

এর মধ্যে আবেগেরও বহু ব্যাপার ছিল। দেশ থেকে অবিরাম খবর আসছে। দেশের জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা, বৃহত্তর ভোগান্তি ইত্যাদি নানা কাহিনী শুনে আমাদের মন আবেগে আপ্লুত হয়ে যেত। সে দিকটিতো ছিলই। তার ওপর আর একটা বড় সমস্যা ছিল—আমাদের হাজার হাজার বাঙ্গালী যারা পাকিস্তানে আটকা পড়েছিলেন। দেশের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার কোন উপায় ছিলনা তাদের। দুই তরফ থেকে তারা আমাদের স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন। তখনই আমরা বুঝতে পারলাম বিবিসি বাংলা বিভাগের প্রতি তাদের ভালোবাসা কতটুকু। কারণ বেপরোয়া হয়ে তারা আমাদের সাহায্য কামনা করেছিলেন। প্রথমত আমরা বাংলাদেশ থেকে পাওয়া কিছু চিঠি পাকিস্তানের আত্মীয় স্বজনের অথবা পাকিস্তানে আটকে পড়াদের চিঠি বাংলাদেশে তাদের আত্মীয় স্বজনদের পাঠানোর চেষ্টা করেছি। বেশ কয়েক হাজার চিঠি-পত্র এভাবে এদিক ওদিক গিয়েছিল। আমাদের পর্যাপ্ত জনবল ছিলনা এগুলো দেখাশুনা করার জন্য। শেষ পর্যন্ত আমরা 'সেতু বন্ধন, সাগর পাড়ের বাণী' অনুষ্ঠানে তাদের খবরাখবর বিনিময় শুরু করলাম। অজস্র চিঠি আমরা সে সময় পেয়েছি। এর ভেতর দিয়ে আমাদের শ্রোতারা কত একাত্মবোধ করেছেন সেই প্রমাণ আমরা সেই সময়ে পেয়েছি।

আরো মনে পড়ে, যখন ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে আমরা টের পেয়ে গেলাম যে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পাকিস্তান বাহিনী ঢাকায় আত্মসমর্পণ করবে তখন আমরা নতুন একটা বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করছিলাম। আমার মনে আছে যখন আমরা সেই অনুষ্ঠানটি প্রচার করি ঠিক সেই সময়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণ দিচ্ছিলেন। আমি কানে ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণ শুনছিলাম এবং মুখে আমাদের শ্রোতাদের খবর দিয়ে যাচ্ছিলাম যে ইয়াহিয়া খান তখন কি করছেন -একই টেইপে। অর্থাৎ ইয়াহিয়া খান যে মুহূর্তে বেতার ভাষণ দিয়ে যাচ্ছিলেন ইংরেজীতে সেই মুহূর্তে ভারত-বাংলাদেশে আমাদের বাংলা অনুষ্ঠানের শ্রোতারা এই বিশেষ অনুষ্ঠানটির মারফতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের খবরটা শুনতে পেরেছিলেন। আবেগে তখন মনটা এরকম হয়ে পড়েছিল যে কান্না চাপাটাই খুব অসুবিধাজনক হয়ে গিয়েছিল। অথচ আমি জানি বেতার সাংবাদিকদের পক্ষে আবেগ-অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেয়া অত্যন্ত অযোগ্যতার পরিচয়। কিন্তু তবুও সেদিন কান্না চেপে রাখা কষ্টকর ছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে এদেশের প্রবাসী বাঙ্গালীরা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন এটা বলতে হবে। এখানে আমার কিছু বাঙ্গালী বন্ধু ছিলেন, তাঁরা একটা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুললেন এবং আমার সাহায্য চাইলেন। সাব্যস্ত হলো আমি তাদের সাহায্য করবো জনসংযোগ ও তথ্যসরবরাহের ক্ষেত্রে। তাঁদের

মধ্যে ছিলেন ওয়ালী আশরাফ, মাহমুদ হোসেন মঞ্জুর, মোশারফ হোসেন, বুলবুল মাহমুদ, মানিক চৌধুরী, শামসুদ্দীন প্রমুখ। সুরাইয়া খানমও ছিলেন তাঁদের সঙ্গে। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিশ্বের জনসাধারণকে তাঁরা অবহিত করবেন। আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হলো সাংবাদিক, বেতার-সাংবাদিক শিক্ষাব্রতী এবং বিশেষ করে দেশের বাইরে যাঁরা আছেন তাঁরা বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট সদস্য ও অন্যান্যদের বুঝাবেন। একটা উপায় স্থির করা হলো যে, তথ্য বুলেটিন বের করা হবে। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি তাদের সে ব্যাপারে সাহায্য করতে। আমরা নিজেরা প্রচুর তথ্য বুলেটিন লিখেছি। আমার পুরো মনে নেই, মনে হয় হাজার পাঁচেক প্রতিনিধির বাড়ীতে, বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, অধ্যাপক, সংবাদপত্র-সম্পাদক, বেতার-টেলিভিশন, বিভিন্ন দেশের সংসদ সদস্য, রাষ্ট্রপ্রধান—এঁদের কাছে এবং লণ্ডনে বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের প্রত্যেকের কাছে পাঠানো হতো। আমরা নিজেরা যা লিখতাম তাতো বটেই অন্যান্যরা বাংলাদেশের সপক্ষে যা লিখতেন সেগুলোও আমরা তাঁদের কাছে তুলে ধরতাম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলতে পারি, একদিন এক বন্ধু আমাকে আমেরিকা থেকে টেলিফোন করে জানালেন যে, হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন জন অধ্যাপক বাংলাদেশের দাবীকে সমর্থন করে ৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি তথ্য দলিল বের করেছেন। আমি বললাম সেটি আমি চাই। ডঃ শামসুল হক স্বয়ং নিয়ে এসেছিলেন সেই দলিলটি। আমার মনে আছে সে দিনের মধ্যেই ৩২ পৃষ্ঠার দলিল আমরা ৫ হাজার কপি বিতরণ করেছি। পরবর্তীকালে কলকাতা থেকে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার যে তথ্য পুস্তকটি বের করেছিলেন তাতে এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এভাবে এই অবস্থা হয়েছিল যে, পত্র পত্রিকাগুলো প্রায়ই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে কোন খবর পেলে তার বিশ্লেষণের জন্য আমাদের কাছে ফোন করতেন রাতে বিরাতে। বহুবার তাঁরা ফোন করেছেন। এ ব্যাপারে অনেক কিছু করা হয়েছিল।

আমার ব্যক্তিগত দিক থেকে একটা বিশেষ সন্তুষ্টির ব্যাপার ছিল। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তখন বাংলাদেশ আন্দোলনের পক্ষে এখানে কাজ করছিলেন। তবে তাঁর কাজের ধারা ছিল স্বতন্ত্র। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারদের সঙ্গে এবং আন্তর্জাতিক আইনজীবী সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলেন। কারণ, তিনি বিচারপতি ছিলেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারও ছিলেন। টেলিফোনে কয়েকদিন ধরে কথাবার্তা হলো। আমি তাঁকে বুঝাতে চেষ্টা করছিলাম যে তাঁর প্রকাশ্যে কাজ করা উচিত। তিনি তখন ভাবছিলেন, তাঁর আত্মপরিচয় না দিয়ে যদি তিনি শিক্ষাব্রতী এবং বিচারকমণ্ডলীদের মধ্যে কাজ করেন ভাল কাজ হবে। এসময়ে তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট-এর সদস্যদের কমিটির বৈঠকে বাংলাদেশ প্রশ্ন তুলে ধরেন। ইতিমধ্যে দেখা গেল যে, বৃটেনে বাংলাদেশ আন্দোলনের সপক্ষে কাজ করার

জন্য, বিশেষ করে ২৫শে মার্চ তারিখের পর থেকে, আমাদের কর্মীর অভাব নেই, কিন্তু তাদের নেতৃত্ব দেয়ার লোকের অভাব আছে। যাহোক বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সাথে আমি এ বিষয়ে অনেক কথাবার্তা বলেছি। শেষ পর্যন্ত তিনি স্থির করলেন যে, তাঁর আত্মপ্রকাশ করার প্রয়োজন আছে। বোধ হয়, এই স্বাধীনতা অন্দোলনের সপক্ষে আমার সবচাইতে বড় আত্ম সন্তুষ্টির কারণ, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী আমার যুক্তির সাথে একমত হয়েছিলেন। আমার মনে আছে, তারপরে তিনি আত্মপ্রকাশ করে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, আমার সাংবাদিক বন্ধু পিটার গিল (পরবর্তীকালে যিনি উপমহাদেশের "ডেলি টেলিগ্রাফ" পত্রিকার সংবাদদাতা হয়েছিলেন), আমার এখানে বসে বিচারপতি চৌধুরীর সাথে কথাবার্তা বলেছিলেন এবং তাঁর সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন। আমার মনে আছে, টেলিভিশনে তাঁর একটি আধ ঘণ্টা ব্যাপী সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম আমি।

আমার ব্যক্তিগত দিক থেকে আর একটা সন্তুষ্টির কারণ এই যে, টেলিফোনে তৎকালীন পাকিস্তানের বাংলাদেশী কূটনীতিকরা, যাঁরা বিভিন্ন দূতাবাসে ছিলেন, আমি তাঁদের নাম বলতে চাইনা। তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছিল। আমার মনে হয় তাঁরা সেই সময় বাংলাদেশের পক্ষে চাকরী ছাড়তে রাজী ছিলেন এবং পরে ছেড়েছিলেন।

আমার মনে আছে, বিভিন্ন সময় লণ্ডনে যখন র‍্যালী করা হত, পার্লামেন্টে লবী করা হত, টেলিফোন করলে আমাদের বাংলাদেশীরা জিজ্ঞেস করতেন কত লোক দরকার। কখনও কোথাও পাঁচ হাজার, কোথাও তিন হাজার—আগে থেকেই আমরা ঠিক করে নিতাম কোথায় কত লোক পাঠানো হবে এবং সেই পরিমাণ লোক তাঁরা সংগ্রহ করে পাঠাতেন—দু'একদিনের নোটিশে।

সেই সময় বাংলাদেশ মহিলা সমিতি এখানে খুব কাজ করছিল। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং মহিলা সমিতির সদস্যারা পার্লামেন্টের অধিবেশনের সময় নিয়মিত গিয়ে পার্লামেন্ট ভবনে বসে থাকতেন। সদস্যদের কাছ থেকে অবশেষে তারা শতাধিক পার্লামেন্ট সদস্যের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিলেন—বাংলাদেশের দাবী সমর্থন করে পার্লামেন্টে একটা প্রস্তাব আনার ব্যাপারে। সেখানে আবার আর একটা সংশ্লেষ আছে, তখন মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা ছিলেন আমার স্ত্রী সুফিয়া রহমান।

সিরাজুর রহমান
বিবিসি, বাংলা বিভাগ
১৯৮০।

অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান

একাত্তরের মার্চ মাসে যখন অসহযোগ আন্দোলন তুমুলভাবে চলছে এবং ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনার প্রহসনলীলা তুংগে উঠেছে সেসময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা নিষ্ক্রীয় ছিলামনা। আমি অনুভব করছিলাম যে একটি দুর্যোগ আসছে। সুতরাং আমার ছেলেমেয়েদের সকলকে আমি আমার সন্নিকটে আনতে চেয়েছিলাম। ঢাকায় আমার বড় মেয়ে মোহাম্মদপুরে তার নিজের বাড়ীতে থাকত। এলাকাটি অবাঙালীদের। তাদের বাড়ীতে ঢিল পড়ত রাত্রে। কখনো কখনো সরাসরি হুমকীও তাদের দেয়া হয়েছে। এখবর পেয়ে আমি ১৯৭১ সালের ২২শে মার্চ আমার গাড়ী নিয়ে ঢাকায় চলে আসি। পথে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি তবে বিকেলের দিকে মোহাম্মদপুর এলাকায় আমার মেয়ের বাড়ীর কাছে মোড় ঘুরতে গিয়ে একটি অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। একটি কাক তড়িতাহত হয়ে মাটিতে মরে পড়ে আছে। আর এক তলা বাড়ির কার্ণিশে এক সারি কাক বসে আছে। একটি কাক কা কা করে মৃত কাকটির শরীর প্রায় ছুঁয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে। এভাবে সবকটি কাক একটি অর্ধবৃত্তের মতো আবর্ত রচনা করে একে একে উড়ে চলে গেল। কাকগুলো তাদের মৃতের প্রতি শেষ বেদনা নিবেদন করলো। দৃশ্যটি দেখেই আমার ছেলেকে গাড়ি থামাতে বলেছিলাম। আমি গাড়ীতে সম্পূর্ণ দৃশ্যটি দেখলাম। সে দৃশ্যের কুশীলবরা হচ্ছে কাক এবং রংগমঞ্চ হচ্ছে বাড়ির কার্ণিশ এবং গাড়ি চলাচলের রাস্তা। আমি হঠাৎ কেন যেন শংকিত হলাম। শুনেছি ইতর প্রাণীরা পূর্বাহ্নেই অনুভব করে যে সংকট আসছে। আমার তখন মনে হল যে হয়তবা বিপদ শীগগীরই আসবে। সেদিন ছিল ২২শে মার্চ। আমি চট্টগ্রাম থেকে গাড়ী করে ঢাকায় এসেছিলাম আমার বড় মেয়ে, জামাই, এবং তাদের দুটি সন্তানকে নিয়ে যেতে।

মোহাম্মদপুরে মেয়ের বাসায় পৌঁছে মুনীর চৌধুরী এবং মোফাজ্জাল হায়দার চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম মনে আছে। মুনীর চৌধুরী রাত্রে দেখা করতে এসেছিলেন। পরদিন সকালে সবাইকে নিয়ে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের পথে যাত্রা করলাম। এবারেও কোন বিঘ্ন ঘটেনি। শুধুমাত্র ব্রীজে ডাইভারশনের কাছে এসে কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলাম। আমাদের গাড়ী ডাইভারশনের পথে নেমে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় যখন এসেছে তখন উল্টোদিক থেকে আমাদের মুখো মুখি হর্ণ বাজিয়ে একটি আর্মী জীপ উপস্থিত হল। আমরা সঙ্গে সঙ্গেই পিছিয়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু জীপটি না এগিয়ে সেও পিছিয়ে গেল এবং আমাদের এগুতে বলল। আমরা যেই একটু এগিয়েছি জীপটা তখন আবার নেমে এসে আমাদের মুখোমুখি দাঁড়ালো। আমরা তখন পেছনে চালিয়ে একেবারে বড় রাস্তায় উঠে অপেক্ষা করতে লাগলাম। জীপটিও পেছনে গিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো আমাদের এগিয়ে আসতে বললো কিন্তু আমরা ভয়ে এগুলামনা। তখন

জীপটি এগিয়ে এল, বড় রাস্তায় পড়ল এবং আমাদের গাড়ীর পাশ দিয়ে চললো। আমাদের গাড়ী পেরুবার সময় জীপের মধ্যে কয়েকজনের অট্টহাসি শুনলাম এবং হঠাৎ একটি শূন্য মদের বোতল রাস্তায় এসে পড়ে ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেল। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের গাড়ীতে কোন আঘাত লাগেনি। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পৌঁছে দেখলাম, সারাদেশে একটা কিছু যেন ঘটবে সকলেই তার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। বিভিন্ন লোক, শিক্ষক এবং ছাত্র যুথবদ্ধ হয়ে নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। কথাবার্তা চলছে। আশা এবং আশঙ্কা এ উভয়ের মিলন ঘটলে যে এক রহস্যময়তার সৃষ্টি হয় তখনকার সময়ে সেই রহস্যময়তা ছড়িয়ে ছিল। শুনলাম পরের দিন ২৪ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র এবং শিক্ষক সম্মিলিতভাবে একটি সভা আহবান করেছে যে সভায় ছাত্ররা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করবে।

পরের দিন বিকেলে শহরে মিটিং ছিল আমরা সবাই সেখানে গেলাম। বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হল। বক্তৃতা করলেন অনেকে। সভা চলাকালে হঠাৎ খবর এলো সমুদ্র বন্দরে পাকিস্তান থেকে আগত জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নামানো হচ্ছে এবং বাঙ্গালী শ্রমিকদের সঙ্গে পাকিস্তানী সেনাদের সংঘর্ষ বেধেছে। আমরা খবর পেলাম যে জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নামাতে আপত্তি করায় বাঙ্গালী শ্রমিকদের উপর গুলি চালানো হয়েছে এবং অনেক নিরীহ লোক নিহত হয়েছে। মাঝপথে আমাদের সভা ভেঙ্গে গেল। আমার ছোট মেয়ে এবং জামাতা দেব পাহাড়ে থাকত। আমি গাড়ী নিয়ে সেখানে গেলাম এবং তাদেরকে আমার সঙ্গে ক্যাম্পাসে নিয়ে এলাম। দুর্ঘটনা একটা ঘটবে এটা আমরা সকলে অনুমান করেছিলাম। এই দুর্ঘটনার মুহূর্তে আমি আমার ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে চাইনি। সবাইকে তাই একত্রিত করেছিলাম। বড় মেয়েকে তো আগের দিনই ঢাকা থেকে নিয়ে এসেছিলাম। পরের দিন ছোট মেয়েকে। যাহোক সেদিন শহর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ফেরা খুব সহজ হয়নি। আমাদের যাবার পথে ক্যান্টনমেন্ট পড়ে। সেসব রাস্তায় চলাচল বন্ধ ছিল। বড় বড় গাছ কেটে এবং আড়াআড়িভাবে কিছু ট্রাক সাজিয়ে রাস্তার চলাচলকে বিঘ্নিত করা হয়েছে। আমরা বাধ্য হয়ে গ্রামের কাঁচা মাটি এবং খোয়া ফেলানো পথ দিয়ে অনেক সময় নিয়ে রাত প্রায় ১২ টার দিকে ক্যাম্পাসে ফিরলাম। রাত্রিবেলা গ্রামের পথ দিয়েই গিয়েছিলাম। সুতরাং আশে পাশের জঙ্গল এবং বন্যফুলের সমারোহ চোখে পড়েনি কিন্তু তাদের গন্ধ পেয়েছিলাম। একজন ইংরেজ কবি এরকম অবস্থার বর্ণনা করেছেন এভাবে, শংকিত পথে অন্ধকারে ফুলগুলো কোন আশ্বাস আনেনা তাদের সুগন্ধ ক্রমশঃ হারিয়ে যায় পৃথিবীর পূব থেকে পশ্চিমে।

পঁচিশ তারিখ সারাদিন মানুষের আনাগোনা চলছিল বিভিন্ন এলাকায়। শহর থেকে রাজনৈতিক নেতাদের কেউ কেউ কেউ এসেছিলেন, সন্ধ্যার দিকে ইন্ট

বেঙ্গল রাইফেলস-এর একটি প্লাটুন বর্ডারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান নিল। গ্রামের লোকেরা এদের জন্য প্রচুর খাবারের ব্যবস্থা করল। তখন আমাদের সকলের মধ্যে একটি মাত্র বিশ্বাস সমুচ্চারিত যে আমরা বাংলা ভাষাভাষি এক ও অভিন্ন। যারা বাংলায় কথা বলে তাদের সকলেই এখন একত্রিত হবে একটি বিশ্বাসের সচলতায় যে এদেশ আমার। আমার মনে হয় তখন এই বিশ্বাসটি নির্মাণ করতে হয়নি, স্বতঃস্ফূর্তভাবে আবেগের অন্তঃসার হিসেবে উৎসারিত হয়েছে। আমরা তখন চিন্তা করছিলামনা ভবিষ্যত আমাদের কি হবে। আমরা একটি প্রবল আন্তরিক ভাবাবেগের প্রবাহকে আশ্রয় করেছিলাম। সারাদিন বিভিন্ন সময় আমরা ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। যোগাযোগের স্থান ছিল দুটো— ইত্তেফাক অফিস ও বঙ্গবন্ধুর বাড়ী। কিন্তু সন্ধার একটু পরে ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ একদম বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখনই ভয় হয়। কিছু একটা ভয়ানক ঘটতে যাচ্ছে এটা অনুভব করছিলাম কিন্তু তা যে কত ভয়াবহ এবং প্রচণ্ড হতে পারে তা আমাদের অনুমান করার সাধ্য ছিলনা। বিপদের সম্ভাবনা আমরা ব্যাখ্যা করি ঝড় আসবে বলে। এদেশে আমরা প্রকৃতির তাণ্ডবকে দেখেছি তাই প্রকৃতির উপমা আনি। আমরা বলি ঝড় আসবে, প্রচণ্ড ঝড়, প্রকাণ্ড সব বৃক্ষ উৎপাটিত হবে, লোকালয় ধুলায় আচ্ছাদিত হবে, বন্যায় গৃহাঞ্চল প্লাবিত হবে। আমরা প্রকৃতির উপমা একারণেই দেই যে, প্রকৃতির তাণ্ডবের মুখে মানুষ সম্পূর্ণ অসহায়। সে বিপদকে রোধ করতে পারেনা। সে ভেসে যায় এবং ধ্বংসের লীলা নৈপুণ্যে সে নিশ্চিহ্ন হয়। আমার এক বিদেশী বন্ধু সব সময় বিপর্যয়ের সঙ্গে পাহাড় ভেঙ্গে পড়ার উপমা দিতেন। তিনি ছিলেন জার্মান, হাইডেলবার্গের লোক, চতুর্দিকে সবসময় পাহাড় দেখতেন তাই পাহাড়ের কথাটি তার অনিবার্যভাবে মনে পড়ত। তিনি বলতেন, পাহাড় যখন ভেঙ্গে পড়ে তখন প্রস্তর খণ্ডগুলো প্রচণ্ডবেগে নিম্নাভিমুখে ছুটতে থাকে তার গতিরোধ করার সাধ্য কারো থাকেনা। পাথরগুলো প্রচণ্ড গতিতে সম্মুখের সমস্ত কিছুকে নিশ্চিহ্ন করে ছুটে চলে, ধ্বংসের অনিবার্যতা তো একেই বলে।

২৫শে মার্চ দিবাগত রাত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আমরা প্রায় সারা রাত জেগেই কাটিয়েছিলাম। রাত ১টা পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন জনের বাড়ীতে বসে আলাপ আলোচনা করেছি কর্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য। কিন্তু সুস্পষ্টভাবে কিছুই নির্দ্ধারণ করতে পারিনি। একটি প্রধান চিন্তা ছিল ক্যাম্পাসে অবস্থানরত বিভিন্ন পরিবারকে কিভাবে রক্ষা করা যায়। এখনো তো সম্ভাব্য ভয়াবহতার চিত্র উদঘাটিত হয়নি। তাই আমরা দ্রুত রাত্রির অবসান চাচ্ছিলাম। এবং দিনের আলোয় কর্তব্যের কথা চিন্তা করব ভেবেছিলাম। সে সময়, রূপক করে বলা যায়, আমাদের দক্ষিণ দিকে নিস্তব্ধতা, বাম দিকে নিস্তব্ধতা, আমাদের সম্মুখ ও পশ্চাতে নিস্তব্ধতা। শুধু আমাদের মাথার উপর আকাশে বাংলা বর্ণমালায় সব-

কটি অক্ষর ছড়িয়ে আছে। সেখান থেকেই বেদনা এবং প্রতিবাদের শব্দগুলো সংগ্রহ করতে হবে।

রাত্রি কাটলো সুগভীর নিদ্রায় নয়, তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়। প্রায়ই জেগে উঠেছি আশংকায় এবং বিমূঢ়তায়। সকালে শয্যাছেড়ে মাঠে কবুতরের খাঁচার দিকে এগিয়ে গেলাম। এটা আমার রোজকার অভ্যাস। খাঁচার দরজা খুলে গম অথবা ধান মাঠে ছিটিয়ে দেই। কবুতরগুলো প্রচুর পবিত্র শুভ্রতায় শেফালী ফুলের মতো খাদ্যকণার উপর ছড়িয়ে পড়ে। সেদিন কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। কবুতরের ঘরের দরোজা খুলে দিয়ে মাঠের মধ্যে ধান ছড়িয়ে আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম কিন্তু কবুতরগুলো খাবারের দিকে এগিয়ে এলনা। ওরা খাঁচার সামনে একটু ঘুরে ওদের ঘরের ছাদের ওপর বসলো। ১২টির মত কবুতর ছিল, সবকটি প্রায় সাদা, একটি দুটি খয়েরী রঙের। হঠাৎ কবুতর কটি এক-সঙ্গে উড়তে লাগলো। পাখা ঝাপটিয়ে প্রথম একটি উড়লো, পরে দোতলা বাড়ীর ছাদ পর্যন্ত উড়লো। পরে সবকটি পাহাড়ের মধ্যে ক্রমশঃ সম্পূর্ণ হারিয়ে গেল। আমি আমার জীবনে এ কম দৃশ্য কখনো দেখিনি। সে মুহূর্তে আমি জানলাম যে, ঢাকায় ভয়ানক কিছু ঘটেছে এবং আমাদের জীবনেও আমরা একটি সংকটের সম্মুখীন হচ্ছি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ দিকে প্রায় লাগোয়া ছিল ক্যান্টনমেন্ট। আমরা রোজই দেখতাম যে হেলিকপ্টার উড়ে ক্যান্টনমেন্টে যাচ্ছে। এবং যাবার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর বার কয়েক ঘুরে যাচ্ছে। তাছাড়া কুমিরার দিক থেকে পাকিস্তানী সৈন্য চলাচলের সংবাদও পাওয়া যাচ্ছিল। যদিও প্রথম কয়েক-দিন চট্টগ্রাম শহর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কবলিত হয়নি এবং মেজর জিয়া নামক একজন সৈনিকের নাম তখন আমরা শুনছিলাম যিনি কালুরঘাটে ঘাঁটি স্থাপন করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করছিলেন। কালুরঘাট ট্রান্সমিশন ষ্টেশন থেকে জিয়ার কণ্ঠে আমরা স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী শুনতে পেয়েছিলাম। সেই মুহূর্তটি আমাদের জীবনের আশা এবং উদ্দীপনার একটি তীব্রতম মুহূর্ত ছিল। যখন চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা এবং সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের অভাব ঠিক সেই মুহূর্তে জিয়ার কণ্ঠস্বরে স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণার দাবী একটি বিস্ময়কর মানসি-কতার সৃষ্টি করেছিল। আমরা তখনই ভাবতে পেরেছিলাম যে, কোন কিছুই হারিয়ে যায়নি, আবার সবকিছু ফিরে পাবার সম্ভাবনা আছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাংগনে অনবরত মানুষের আনাগোনা হচ্ছিল। উপাচার্য ডঃ মল্লিককে কেন্দ্র করে একটি প্রতিরোধের ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গড়ে তোলা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের বাসগৃহগুলোকে অরক্ষিত রেখেই ৩০শে মার্চ সরে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম কুণ্ডেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ে। কুণ্ডেশ্বরী রাউজান থানার অন্তর্গত। কুণ্ডেশ্বরীর মালিক বাবু নতুন চন্দ্র সিংহ

আমাদের সবার জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে আনন্দিত হয়েছিলেন। কুণ্ডেশ্বরী বিদ্যালয়টি একেবারেই বড় সড়কের পাশে সম্পূর্ণ অরক্ষিত। রাত্রি বেলা প্রায়ই নানাবিধ শঙ্কায় আমাদের জেগে উঠতে হতো। এদিক ওদিক সৈন্য চলাচলের সংবাদ শুনতাম। কখনো বিদ্যালয় গৃহটি আক্রান্ত হবে এমন আশঙ্কার খবরও আসতো। শেষ পর্যন্ত সকলের পরামর্শে আমরা কুণ্ডেশ্বরী পরিত্যাগ করে প্রথমে নাজিরহাট এবং পরে কাটাখালি হয়ে রামগড়ে উপস্থিত হলাম। আমরা কুণ্ডেশ্বরী ছাড়লাম ৭ই এপ্রিল তারিখে। সেসময় একটি সিদ্ধান্তে আমাদের আসতে হয়েছিল। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম কোন গ্রামে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকব কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিবেচনা করা হয় যে সীমান্ত এলাকায় যাওয়াই ভাল। কেননা সেনাবাহিনী আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করছে এবং গ্রামাঞ্চলে গিয়েও আমরা রক্ষা পাবনা। কিন্তু সীমান্তে যদি যাই তাহলে প্রয়োজনবোধে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে পৌঁছে যাওয়ার সম্ভবপর। রামগড় তখন মেজর জিয়ার প্রতিরোধ পরিচালনার কেন্দ্র ছিল। তিনি কালুরঘাট থেকে সরে এসে রামগড়ে অবস্থান নিয়েছিলেন। রামগড়ে পৌঁছে জিয়াকে প্রথম চাক্ষুষ দেখলাম। তাঁর চোখে কালো চশমা ছিল এবং মুখ ছিল শ্মশ্রুমণ্ডিত। তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন এবং কখনো কখনো কাউকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছিলেন। আমাদের কারো সঙ্গেই তিনি বিশেষ কোন কথা বলেননি।

পহেলা বৈশাখ তারিখে আমরা সীমান্ত অতিক্রম করার নির্দেশ পেলাম। জিয়াউর রহমান আমাদের জানালেন যে, কোন সিভিলিয়ানের তখন আর রামগড় থাকা নিরাপদ নয়। কেননা অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই পাকিস্তান বাহিনী সেখানে এসে পড়বে। আমাদের পরিবার পরিজনদের জন্য বাসের ব্যবস্থা করে আমি, ডঃ মল্লিক, তৌফিক ইমাম এবং আরো কয়েকজন রামগড়ের সীমানা পেরিয়ে আমরা আগরতলার দিকে রওয়ানা হলাম। এ সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে, সাবরুমের রাস্তায় একদল ভারতীয় স্কুলের ছাত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ছাত্ররা আমাদের জীপ থামিয়ে জীপের চারদিকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গান করতে লাগল, "আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবে"। সিকান্দার আবু জাফর এই গানটি লিখেছিলেন কিছুদিন আগে তখন এই গানটির তাৎপর্য বুঝতে পারিনি। কিন্তু অপরিচিত পরিমণ্ডলে শঙ্কিত সময়ের পদক্ষেপে গানটির বাণী আমার কাছে অসাধারণ তাৎপর্যবহ মনে হলো। আমার মনে হলো ঠিক এমন করে হৃদয়ের সর্বস্বদিয়ে কেউ হয়ত তার জাতির বেদনাকে রূপ দিতে পারেননি। সে মুহূর্তে ইমোশন প্রবল ছিল। তাই হয়ত গানটিকে অসাধারণ মনে হয়েছিল। তবে অসাধারণ তো বটেই তার কারণ, আমাদের সংকটের মুহূর্তে এ গানটি আমাদের জন্য সমর্থন ও সহায়তা এনেছিল। আগরতলায় আমাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় এম, আর সিদ্দীকীর সঙ্গে। তিনি এবং মাহবুব আলম চাষী আগরতলায়

একটি বাংলাদেশ মিশন খুলেছিলেন। আমাদের পরিজনবর্গ আগরতলায় এসে পৌঁছোয় বিকেলবেলা। প্রথম রাতের জন্য আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম আগরতলা গ্রাণ্ড হোটেলে। নামটি গ্রাণ্ড কিন্তু কর্মব্যবস্থা অত্যন্ত সাধারণ এবং মলিন। হোটেলটি ছিল আগরতলার রাজপরিবারের। সেরাতেই আমাদের সংগে দেখা করেন মওদুদ আহমদ এবং সাদেক খান। একটু বেশী রাতে এম আর সিদ্দিকী সাহেবও হোটেলে এলেন এবং পরের দিন তিনি কলকাতায় যাবেন বললেন। আমাদের প্রস্তুত থাকতে বললেন। আমরা এক রাতই গ্রাণ্ড হোটেলে ছিলাম। পরের দিন আগরতলার সরকার নরসিংগড়ে একটি পলিটেকনিক স্কুলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

আগরতলায় আমরা অবর্ণনীয় অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলাম। ব্যক্তিগত-ভাবে আমাদের অধিকাংশের কাছে বিশেষ টাকা পয়সা ছিলনা। পাকিস্তানী মুদ্রার বিনিময় হার দাঁড়িয়েছিল ১০০ টাকার স্থলে ভারতীয় ৪০ টাকা। অন্ততঃ পক্ষে পোদ্দারদের কাছ থেকে আমরা এ হারই পাচ্ছিলাম। সে সময় আমার চিন্তা হল কি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ যাঁরা দেশত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়েছেন, এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবী, তাঁদের জন্য অর্থনৈতিক সংগতির কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা। প্যারিসে আমার কিছু পরিচয়ের সূত্র ছিল। আকাডেমী ফ্রাঁস এর সদস্য এবং বিখ্যাত ফরাসী বুদ্ধিজীবী এবং কবি পীয়ের ইমানুয়েলকে আমি চিনতাম। তাঁর কাছে আমি একটি দীর্ঘ পত্র লিখি। আমার চিঠি পীয়ের ইমানুয়েল পান ১৭মে তারিখে। ১৯মে তারিখে ইমানুয়েলের পক্ষ থেকে একখানা টেলিগ্রাম পাই। টেলিগ্রামের ভাষা ছিল নিম্নরূপ: 'পীয়ের ইমানুয়েল আপনার চিঠি পেয়েছে। চিঠির অংশ বিশেষ প্যারিসের সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশের অনুমতি চাচ্ছি। আশা করি ভবিষ্যতে অবস্থার উন্নতি ঘটবে"। পরবর্তী চিঠিতে প্যারিস থেকে ষ্টিফেন স্পেনডারের ঠিকানা আমার কাছে পাঠানো হয়। তখন তিনি কানেকটিকাটে ইংরেজী বিভাগে অধ্যাপনা করছিলেন। বিখ্যাত স্পেনীয় দার্শনিক সালভাদর মাদারিয়াগার ঠিকানাও আমি এভাবে পাই। এদের দুজনের কাছেও বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আমি চিঠি লিখি এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁদের সহানুভূতি কামনা করি। পীয়ের ইমানুয়েল বিভিন্ন সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের জন্য আবেদন জানান। অবশেষে International Association for Cultural Freedom-এর সভাপতি মিঃ শেফার্ড স্টোন আমাকে জানান যে ফোর্ড ফাউন্ডেশন আমাদের সাহায্যের জন্য পঁচিশ হাজার ডলার অনুমোদন করেছে। এটাকা "Thy Writers, Scholars, and Intellectuals who have been forced out of their land into India" তাদের জন্য ব্যয় করতে হবে।

মে মাসের শেষে আমি কোলকাতায় যাই এবং পাম এভিনিউতে ব্যারিষ্টার এ সালামের বাড়ীতে অবস্থান করতে থাকি। সালাম সাহেবের ওখানে বাংলা-

দেশের তিনজন ছিলাম। আমি, মওদুদ আহমদ এবং সাদেক খান। কোলকাতায় আমার সংগে যোগাযোগ করেন আমার পুরনো বন্ধু বোম্বের এ বি শাহ। এ বি শাহ Secularist পত্রিকার সম্পাদক এবং Quest পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন। এ বি শাহ কলকাতায় আসেন ৮ই জুন। সে তারিখে রাত্রে গ্রান্ড হোটেলে তাঁর সংগে আমার যোগাযোগ হয়। ফোর্ড ফাউন্ডেশনের প্রদত্ত টাকা যথাযথভাবে বন্টনের ব্যবস্থা করবার জন্য আমরা একটি কমিটি গঠন করি। কমিটির সভাপতি হন জাস্টিস এস এম মাসুদ এবং সদস্য থাকেন অন্নদা শঙ্কর রায়, আমি, ডঃ মল্লিক, সুশীল ভদ্র এবং সুশীল মুখার্জী। জাস্টিস মাসুদ কর্তৃক অনুমোদিত ২৫শে জুন তারিখের বুদ্ধিজীবীদের যে তালিকা আমার কাছে আছে তার মধ্যে জুন মাস থেকে দেশ স্বাধীন হবার সময় পর্যন্ত প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে যাঁরা সাহায্য পেয়েছেন তাঁদের নাম আছে। এ নামগুলি হচ্ছে ডঃ এ আর মল্লিক, প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান, ডঃ সারওয়ার মুর্শেদ, ডঃ মোহাম্মদ শামসুল হক, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ মাহমুদ শাহ কোরায়শী, ডঃ মোশাররফ হোসেন, ডঃ কাজী আবদুল মান্নান, মিঃ ওসমান জামাল, মিঃ আলী আশরাফ মাসুদ, মিঃ আবু জাফর, অনুপম সেন, ডঃ মোতিলাল রায়, ডঃ বেলায়েত হোসেন, শওকত ওসমান, বুলবুল ওসমান, গোলাম মোর্শেদ, আবদুল হাফিজ, ডঃ ফারুক আজিজ খান, ডঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ, কামরুল হাসান, বদরুল হাসান, দেবদাস চক্রবর্তী, মাহবুব তালুকদার, সাদেক খান, ডঃ স্বদেশ বোস, ডঃ মযহারুল ইসলাম, মোস্তফা মনোয়ার। এই তালিকায় পরে আরো অনেক নাম যুক্ত হয়েছিল যারা জুন মাসের পর কোলকাতায় এসেছিলেন। সে নামগুলো আমার কাছে নেই। এদের মধ্যে ডঃ মুসলিম হুদার নাম মনে পড়ছে। আরো ক'জনের নাম মনে পড়ছে তাঁদের মধ্যে একজন ডঃ মফিজউদ্দিন আহমদ, আরেকজন ডঃ সফর আলী আকন্দ এবং ডঃ সালেহ আহমদ।

২৫শে জুন এ সাহায্য সম্পর্কে যে বিজ্ঞপ্তি International Association for Cultural Freedom-এর ভারতীয় শাখার director of programme এ, বি, শাহ কর্তৃক পত্রিকায় প্রেরীত হয়েছিল তার হুবহু প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হলো।

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR CULTURAL FREEDOM

June 25, 1971

For the favour of Publication

Tha International Association for Cultural Freedom has made a special grant of $ 25,000 to provide assistance to emigre scholars, intellectuals and writers from Bangladesh. The grant has been made from the Fund for Intellectuals that the Association created in 1968 in the wake of Soviet occupation of Czechoslovakia.

The grant will be operated by a Committee for Assistance to Bangladesh Intellectuals formed for the purpose by the IACF office in India. The Committee consists of Mr. Justice S. A. Masud of Calcutta High Court, Mr. Annada Sanker Ray, the eminent writer, Dr. A.R. Mullick, Vice-Chancellor of Chittagong University, Professor Syed Ali Ahsan, Head of the Department of Bengali in Chittagong University and former Director of the Bengali Academy in Dacca, Professor A B Shah, Director of Programmes of the IACF in India, Mr. Sushil Bhadra, Mr. Sushil Mukherjea, social workers from Calcutta.

The Committee has already provided ad hoc financial assistance to about 25 scholars from Bangladesh and is preparing a comprehensive list of others who have emigrated to India. The Committee is also trying to persuade some of the Indian Universities to offer temporary assignments to Bangladesh scholars and secure the cooperation of Indian publishers to facilitate the publication of their manuscripts.

The Committee is also sponsoring a special issue of Quest, the well-known intellectual and cultural journal, to be edited by Dr. A R. Mullick and Professor Syed Ali Ahsan.

Scholars, writers and intellectuals from Bangladesh are requested to contact Mr. Sushil Mukherjea at the Committee's office at P 542 Raja Basanta Roy Road, Calcutta 29.

Sd/-A.B. Shah
Director of Programmes, India

এ সময় মিসেস লী, থ (Lee Thaw) নামক এক ভদ্র মহিলা কোলকাতায় আসেন এবং ওবেরয় গ্রাণ্ড হোটেলে অবস্থান করেন। তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু সমিতির (International Refugee Organisation) প্রতিনিধি। তিনি লোকদের জন্য কিছু সাহায্য এনেছিলেন। তার অর্থদানের পাত্র ছিল সৃষ্টিধর্মী লেখক, শিল্পী এবং সাংবাদিক। ৫-৭-৭১ তারিখে আমি মিসেস থ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে লেখক এবং সাংবাদিকদের একটি তালিকা তাকে প্রদান করি। সে তালিকা অনুসারে যারা পূর্বের সাহায্য সংস্থা থেকে কিছু পাননি এবং যারা সৃষ্টিধর্মী লেখক, শিল্পী এবং সাংবাদিক তাদের মধ্যে এ অর্থ বিতরণ করা হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে ১১জন লেখক শিল্পী এবং সাংবাদিককে ৫ হাজার ৮শত টাকা দেয়া হয়েছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে ২২ হাজার ৫শত টাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল। যারা সাহায্য পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে শিল্পী কামরুল হাসান, জহীর রায়হান, অভিনেত্রী সুমিতা এবং আরো অনেকে ছিলেন। তবে একটি কথা এখানে না বললে অন্যায় হবে তা হচ্ছে লেখক ও সাংবাদিক

ফয়েজ আহমদ প্রথমে সাহায্য নিয়েছিলেন কিন্তু পরে তার চেয়েও দুঃস্থ কোন লেখক বা সাংবাদিকের আনুকুল্যে অর্থ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

এ সময়ে আরেকটি আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা কোলকাতায় উপস্থিত হয়। উক্ত সংস্থা বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হোসেন আলীর সংগে যোগাযোগ করেন। এই সংস্থার নাম ছিল International Rescue Committee সংক্ষেপে I.R.C। উক্ত প্রতিষ্ঠান মুলতঃ ইহুদীদের প্রতিষ্ঠান ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপ থেকে যে সমস্ত ইহুদী পালিয়ে আমেরিকায় আশ্রয়ের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন মুলতঃ তাদের সাহায্যের জন্য এ সংস্থাটি গড়ে ওঠে। আমাদের দুর্দশার সময় সংস্থাটি যখন কোলকাতায় আসে তখন এদের পশ্চাদভূমি সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা ছিলনা। যাই হোক, জনাব হোসেন আলী এ সংস্থার সংগে ডঃ মল্লিকের যোগসূত্র ঘটিয়ে দেন এবং তিনি বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবী সকলের সংগে পরামর্শ করে এই অর্থ বরাদ্দ করবার ব্যবস্থা করেন। এই অর্থ সাহায্য পাবার ফলে আমরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সকল প্রকার সংবাদ সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ আর্কাইভ্‌স্ নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্ষম হই। আর্কাইভ্‌স এর পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন ডঃ মল্লিক এবং আমি সভাপতি হয়েছিলাম। মোট ১৬ জন ব্যক্তি আর্কাইভ্‌স-এর কর্মপরিচালনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের ছাত্র এবং আমার সহকারী হিসেবে আর্কাইভ্‌স-এর প্রধান দায়িত্বে ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক আবু জাফর (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)। আর্কাইভ্‌স ভারতীয় এবং বিদেশী সংবাদ পত্রে বাংলাদেশ সংক্রান্ত যে সমস্ত খবর প্রকাশিত হত তা সংগ্রহ করতো। এই সংগৃহীত তথ্যাদি নথিবদ্ধ করে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি বাংলাদেশ সরকারের আর্কাইভস-এ দিয়ে দিয়েছি। আর্কাইভস-এর পক্ষ থেকে একটি রেফারেন্স লাইব্রেরী সার্ভিস প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নেয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্থের অভাবে এ পরিকল্পনাটি কার্যকর হয়নি। ডঃ মাযহারুল ইসলাম আই আর সি-র কাছ থেকে একটি অনুদান নিয়েছিলেন বাংলাদেশ থেকে আগত এবং বিভিন্ন ক্যাম্পে অবস্থানরত বিবিধ আঞ্চলিক জনগোষ্ঠির কাছ থেকে "লোকলোর" সংগ্রহের জন্য। এই লোকলোর সংগ্রহের কাজে মযহারুল ইসলামকে সাহায্য করেছিলেন অধ্যাপক সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়।

এ সময় কোলকাতায় বিখ্যাত ভারতীয় ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার বাংলাদেশ তথ্যানুসন্ধান কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটির সম্পাদক ছিলেন শ্রী শৈবালকুমার গুপ্ত। মুলতঃ এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল এটা প্রমাণ করা যে, বাংলাদেশে পাকিস্তান যে নির্যাতন করছে তা ছিল সাম্প্রদায়িক। অর্থাৎ মূল উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে উক্ত

দেশকে পুরোপুরি ইসলামী দেশ বানানো। তাঁর মুদ্রিত প্রশ্নাবলীর একটি প্রশ্ন ছিল "বাছিয়া বাছিয়া হিন্দুদের নির্বিচারে হত্যা, গৃহদাহ, ও লুন্ঠনের পরিকল্পনা ছিল এমন অনুমান করিবার সংগত কারণ আছে কি? হিন্দু সম্পত্তি লুঠ হইয়া থাকিলে কাহারা করিয়াছে"? আমার সংগে সে সময় ডঃ রমেশ মজুমদারের যোগাযোগ হয় এবং আমি তাঁর এই তথ্যানুসন্ধান ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করি। সৌভাগ্যের বিষয় বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে যারা চলে এসেছিলেন এমন সব হিন্দুরাও ডঃ মজুমদারের সাম্প্রদায়িক অনুসন্ধানের প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁরা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা অত্যাচারিত হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে তারা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, তারা বাংলাদেশী এবং সকল বাংলাদেশী সম্মিলিতভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িত। শেষ পর্যন্ত ডঃ রমেশ মজুমদার তাঁর সাম্প্রদায়িক অনুসন্ধান তৎপরতা বন্ধ করতে বাধ্য হন। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল যে, ডঃ মজুমদারের লোকেরা ক্যাম্পে অবস্থানরত সাধারণ হিন্দুদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন, তারা বুদ্ধিজীবীদের কাছে আসেন নি এবং এই সাধারণ হিন্দুরাই সম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্য রেখেছিলেন।

২৩শে জুলাই আমি বাঙালোর শহরের গান্ধী স্মারক নিধির আমন্ত্রণক্রমে বাঙালোরে যাই এবং সেখানে চার দিন অবস্থান করি। বাঙালোর এবং মহীশুরে আমি বাংলাদেশের সংস্কৃতি এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর মোট দশটির মত বক্তৃতা করি। বাঙালোরে গান্ধী স্মারক নিধির প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ রিলিফ কমিটি গঠিত হয়েছিল এবং তারা বাংলাদেশের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করেছিলেন।

১লা আগষ্ট তারিখে ইন্দো-সোভিয়েত কালচারাল সোসাইটি বাংলাদেশের ওপর একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে আমি প্রধান অতিথি ছিলাম এবং ঔপন্যাসিক নরেন্দ্র নাথ মিত্র সভাপতি ছিলেন।

১৪ থেকে ১৬ই আগষ্ট দিল্লীতে জয়প্রকাশ নারায়ণ বাংলাদেশের ওপর আন্তর্জাতিক সেমিনার আহবান করেন। উক্ত সন্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার যাথার্থ্য বিশ্ববাসীর কাছে প্রমাণিত করা। উক্ত সন্মেলনে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ডঃ মল্লিকের নেতৃত্বে দশজন সদস্য দিল্লীতে এসেছিলেন। এদের মধ্যে আমি ছিলাম, ডঃ সারওয়ার মুর্শেদ ছিলেন, ডঃ স্বদেশ বোস, ডঃ মতিলাল পাল, মিঃ ওসমান জামাল, মিঃ সাদেক খান মিঃ মওদুদ আহমদ মিঃ আলমগীর কবীর ছিলেন।

সেপ্টেম্বর মাসের ১১ তারিখে বিখ্যাত আমেরিকান অর্থনীতিবিদ এবং ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত প্রফেসর গলব্রেইথ বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরই অনুরোধক্রমে এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়। সার্কাস এভিনিউতে বাংলাদেশ মিশনে সাক্ষাৎকারটি

ঘটে। উক্ত অনুষ্ঠানে ডঃ মল্লিক, ডঃ সারওয়ার মুর্শেদ, ডঃ আনিসুজ্জামান এবং আমি উপস্থিত ছিলাম। সম্ভবতঃ আরো কয়েকজন ছিলেন আমার এখন তাঁদের নাম স্মরণ নেই। গলব্রেইথ সাহেব বাংলাদেশ থেকে আগত বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্রদের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা পেশ করেন। আমরা বিনয়ের সংগে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি। আমরা তাঁকে সবিনয়ে কিন্তু দৃঢ়তার সংগে জানাই যে, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাধীনতাযুদ্ধে জয়লাভ করা এবং স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করা, আমাদের উদ্দেশ্য স্থায়ীভাবে বিদেশে পুনর্বাসন নয়। যখন গলব্রেইথ সাহেব আমাদের সামনে এ প্রস্তাব উপস্থিত করেছিলেন সে সময় আমেরিকার হারভারড বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ বিষয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটির নাম ছিল HARVARD SUMMER SCHOOL COMMITTEE FOR EAST PAKISTAN REFUGEES। এ খবরটি প্রকাশিত হয় The Harvard Crimson নামক পত্রিকার ৩০শে জুলাই সংখ্যায়।

২৯ আগষ্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোলকাতায় মহাজাতি সদন ভবনে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহ-এর লোকগাঁথা অবলম্বনে কবি চন্দ্রবতী নামক একটি নৃত্য-নাট্য পরিবেশিত হয়। এ অনুষ্ঠানে অবনীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীও অনুষ্ঠিত হয়। আমি প্রধান অতিথি হিসেবে ২৯ আগষ্ট বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন উদ্বোধন করি। উক্ত সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন আনন্দ বাজার পত্রিকার সম্পাদক এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন উপাচার্য ডঃ অম্লান দত্ত।

এ সময় হার্ভার্ড গ্রুপ-এর পক্ষ থেকে অর্থনীতিবিদ গুস্তাভ পাপানেক কোলকাতায় আমার সংগে যোগাযোগ করেন এবং কয়েকদিন বিস্তারিত আলোচনার পর একটি প্রস্তাব ফোর্ড ফাউণ্ডেশন-এর কাছে পেশ করেন। প্রস্তাবটি একটি মেমোরেণ্ডাম আকারে ছিল এবং নাম ছিল "The longer term problem of Bengali refugee Intellectuals"। মেমোরেণ্ডামে পাপানেকের সাক্ষরের তারিখ হচ্ছে ১লা জুলাই ১৯৭১। পাপানেকের এই প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। শুধু উচ্চতর গবেষণার জন্য বাংলাদেশের দু'জন শিক্ষককে তিনি আমেরিকায় অধ্যয়নের বৃত্তি দিতে সক্ষম হন। পাপানেক তাঁর মেমোরেণ্ডাম ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের জর্জ জাইগেনষ্টাইন-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন।

কোলকাতায় ওরিয়েণ্ট লংগম্যানস এসময় 'বাংলাদেশ স্টোরি' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। তারা আমার সংগে যোগাযোগ করে এবং আমি তাদের সংগে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হই কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। আমার সাথে মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জন টি মেলবুনি আমাকে অস্ট্রেলিয়ায় আমন্ত্রণ জানান। এই আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দিনের সংগে আমার আলোচনা হয়। ১১ নভেম্বরে আমি অস্ট্রেলিয়ায় যাবার জন্য প্রস্তুত

হই। কিন্তু অবশেষে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় আমি যাত্রা স্থগিত রাখি। শেষ পর্যন্ত আমার যাওয়া হয়নি। এ ক্ষেত্রে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার যে, প্রফেসর মেলবুনি অস্ট্রেলিয়ার মেলবর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ স্টাডিজ বলে একটি ইনস্টিটিউট স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন। এই ইনস্টিটিউট শেষ পর্যন্ত হয়নি।

বিখ্যাত ফরাসী সংবাদপত্র Le Monde (লা মঁদ) এ সময় আমার সংগে যোগাযোগ করে এবং জানায় যে তারা বাংলাদেশের কবিতার ওপর একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করবে। ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালের সংখ্যায় লা মঁদ বাংলাদেশের কিছু কবিতার অনুবাদ এবং আলোচনা পত্রস্থ করেন। সেখানে আমার 'প্রতিদিনের শব্দ' কবিতার ফরাসী অনুবাদ মুদ্রিত হয়েছিল। বোম্বাই-এর Quest পত্রিকা বাংলাদেশ সংখ্যা প্রকাশ করে। উক্ত সংখ্যায় আমার একটি আলোচনা ছিল এবং একটি কবিতা ছিল। আমার প্রবন্ধটি ছিল মুক্তিযুদ্ধের ওপর এবং বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতার আগ্রহ এবং তাৎপর্যের ওপর।

সবশেষে স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্রের কথা না বললে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকবে। আমি স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্রে নিয়মিতভাবে 'ইসলামের দৃষ্টিতে' এই নামে কতকগুলি কথিকা প্রচার করি। উক্ত কথিকাগুলোর মধ্যে আমি কোরান শরীফ এবং হাদীস থেকে উদাহরণ উপস্থিত করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলাম যে, বাংলাদেশের জনগণের প্রতি পাকিস্তানীদের আচরণ সর্বতোভাবে ইসলামবিরোধী। আমার আলোচনাগুলো জনপ্রিয় হয়েছিল বলে শুনেছি এবং বাংলাদেশের মানুষ সেগুলো শুনেছেন এবং উৎসাহিত বোধ করেছেন। স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে আমি কবিতাও পাঠ করেছি। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই বেতার কেন্দ্রের দান যথেষ্ট। শুধুমাত্র উচ্চারিত বাণীর সাহায্যে মানুষের চৈতন্যকে যে উদ্বুদ্ধ করা যায় তার প্রমাণ স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র দিয়েছিল।

আমি স্বাধীনতার সংগে সংগে দেশে ফিরতে পারিনি। তখন সকলেই দ্রুতগতিতে দেশমুখী হচ্ছিলেন তাই ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স-এ পর্যায়ক্রমে সকলের ব্যবস্থা হয়েছিল। আমি জানুয়ারী মাসের ১১ তারিখে দেশে ফিরেছি। দেশে ফিরে মনে হয়েছিল একটি নতুন প্রত্যুষে আমি যেন নতুন সূর্যোদয় দেখছি। ঠিক সেই মুহূর্তের মানসিক অবস্থার কথা ব্যাখ্যা করতে পারবনা। একটি নতুন চৈতন্যের প্রান্তরে আমি নিজেকে উপস্থিত দেখে অভিভূত হয়েছিলাম।

সৈয়দ আলী আহসান
১৯ এপ্রিল, ১৯৮৪।

ডঃ অজয় রায়

২৫শে মার্চের কাল রাত্রিতে ইয়াহিয়ার সামরিক চক্রের চাতুরিতে ঢাকার শিল্পী কামরুল হাসান অঙ্কিত ইয়াহিয়া'র জানোয়ার মুখ উন্মোচিত হল। শুরু হল অপারেশন সার্চলাইট, হল নয়মাসব্যাপী গণহত্যাযজ্ঞের উদ্বোধন—বাংলার রক্তে, বাঙালীর রক্তে।

কামান, মোর্টার আর মেশিন গানের বিকট কানফাটা গর্জনে সে রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। প্রচণ্ড শব্দে ভেঙ্গে গিয়েছিল জানালার কাঁচ। আর্ত-মানুষের অসহায় চীৎকারকে ছাপিয়ে সারারাত ধরে শুনেছিলাম আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ, ট্রাক ও ট্যাঙ্কের পদচারণ ধ্বনি। শঙ্কিত চিত্তে আমরা অপেক্ষা করছিলাম যে কোন মুহূর্তে পৈশাচিক বাহিনীর উপস্থিতি। বুঝতে কষ্ট হয়নি সারারাত ধরে কিসের হোলি উৎসব কাদের রক্তে ঢাকার রাজপথ পরিণত হচ্ছে রক্ত নদীতে।

যা আমরা আশঙ্কা করেছিলাম অবশেষে তাই ঘটল। সারাদেশের সাথে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজও অপেক্ষা করছিলাম উদ্বেগব্যাকুল চিত্তে ইয়াহিয়া-মুজিবের আলোচনার ফলাফল। অসহায়ভাবে লক্ষ্য করছিলাম ইয়াহিয়া সরকারের সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি। আমরা আশঙ্কা করছিলাম এ ধরণের এক ভয়ংকর পরিস্থিতির, অনুমান করেছিলাম আসন্ন গণহত্যার পূর্বাভাষ। তাই মার্চের ২২/২৩ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ ও দেশের বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে গণহত্যার পূর্বাভাষ জানিয়ে আমরা প্রেরণ করেছিলাম জরুরী বার্তা—ইউ, এন, ও-র সেক্রেটারী জেনারেল ও বিশ্বের অন্যান্য নেতৃবর্গের কাছে আমাদের আশঙ্কা অমূলক ছিল না।

সে রাত্রে পাকিস্তানের বীর জোয়ানেরা কত বাঙালীকে হত্যা করেছিল তার সংখ্যা হত্যাকারীরাও বলতে পারবে না। শুধু এটুকু জানি রাজারবাগে শত শত পুলিশ প্রতিরোধ যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে নীলক্ষেত কমলাপুর এলাকার শত শত বস্তিবাসী, আত্মাহুতি দিয়েছে জগন্নাথ হল ও ইকবাল হলের অসহায় ছাত্ররা, রাস্তার অসহায় নিরস্ত্র মানুষ আর রাস্তায় রাস্তায় বেরিকেড্ তৈরীরত শত শত সাধারণ মানষ ও অকুতোভয় শ্রমিকেরা।

সব রাতের শেষ আছে। ২৫শে মার্চের কালরাত্রিও এক সময় পোহাল। দূরাগত আজানের ধ্বনি ভেসে আসল। না–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ থেকে সেদিন আজানের ধ্বনি উচ্চারিত হয়নি–সাহস পাননি নামাজের আহবান জানাতে ধর্মপ্রাণ মুয়াজ্জিন। যেন মনে হল দূরাগত ঐ আজানের ধ্বনির মধ্যে সারা বাংলাদেশের কান্না ঝরে পড়ছে। এমন বিষাদ আর ক্রন্দনময় আজান ধ্বনি জীবনে শুনি নি।

রাত পোহাল, সকাল হল, ২৬শে মার্চের সকাল। সূর্যদেব কি সেদিন আমাদের সাথেও কেঁদেছিল, না, রোষে গর্জন করে ছড়িয়েছিল দাবাগ্নি। পর্দা

সরিয়ে দেখলাম আমাদের এলাকায় বেশ কিছু সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের উপস্থিতি। দেখলাম মাঠের এককোণে জড়করা কয়েকটি মৃতদেহ, চোখের সামনে টেনে নিতে দেখলাম পাশের ভবনে একতলার অধিবাসী মুক্তাদিরের মৃতদেহ। কর্কশ কণ্ঠে নির্দেশ এল এলাকাবাসীদের প্রতি—অবিলম্বে কালপতাকা আর বাংলাদেশের পতাকা নামিয়ে ফেলার। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম জনৈক সৈনিক আমাদের ভবন-শীর্ষ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। ভবনটি কেঁপে উঠল। মনে পড়ে গেল আমাদের ভবন শীর্ষেও বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে, ছেলেরা ২৩ মার্চ তারিখে উত্তোলন করেছিল আর নামায়নি। অতি সন্তর্পণে মিলিটারির চক্ষু এড়িয়ে ছাদে উঠে হামাগুড়ি দিয়ে পতাকাকে ধীরে নামিয়ে আনলাম। মুহূর্তে চিত্ত বেদনায় উদ্বেলিত হয়েছিল। ভেবেছিলাম এই পতাকা কি আবার কোনদিন তুলতে পারব।

দেখলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক ডঃ মূর্তজাকে দিয়ে ও আরও কয়েক-জনকে দিয়ে আমাদের ভবনের দিকে এল। আতঙ্কে অপেক্ষা করছিলাম যে কোন মুহূর্তে মৃত্যুদূতের আগমন। নীচের তলায় লোকজন ছিলনা—কিছুক্ষণ দরজায় লাথি মারল, সৌভাগ্য ওরা চারতলা পর্যন্ত উঠে এলনা। একটু পরে লাশগুলি নিয়ে আমাদের উদ্দেশে পুনরায় সাবধানবাণী উচ্চারণ করে ওরা স্থান ত্যাগ করল। আমরা বাঁচলাম।

রেডিওতে ঘোষিত হল, অবাঙালী কণ্ঠে, কর্কশ আর ভাংগা বাংলায়, সারাদেশে কঠোরভাবে সান্ধ্য আইন বলবৎ করা হয়েছে; রাস্তায় বা ঘরের বাইরে দেখা মাত্র গুলি করা হবে। পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী প্রতি-রোধ আন্দোলনকে ভেংগে গুড়িয়ে দিয়েছে। ম্লান মুখে সহধর্মিনী পাশে এসে দাঁড়াল। উদ্বেগ ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞেস করল 'বংগবন্ধুর' খবর কি? কি জবাব দেব। আমিও ভাবছিলাম তাঁর কথা। পেরেছেন কি নিজেকে বাঁচাতে? নিরাপদ স্থানে সরে গিয়েছেন কি। ভাবছিলাম অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কথা, ছাত্র নেতাদের কথা। পরে সন্ধ্যায় শুনলাম পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার রেডিও ভাষণ—সমগ্র পরিস্থিতির জন্য বাংগালী, আওয়ামী লীগ ও বংগবন্ধুকে দায়ী করে কুৎসিৎ ও অশালীন ভাষায় আক্রমণ করলেন। সেদিন বংগবন্ধুকে দেশদ্রোহী, বিশ্বাস-ঘাতক আখ্যাদিয়ে স্বয়ংসিদ্ধ প্রেসিডেন্ট কর্কশ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন— The man and his party are the enemies of Pakistan. · · · He had attacked the solidarity and integrity of Pakistan – this crime will not go unpunished." সেই কণ্ঠ এতদিন পরে আজও আমার কর্ণে ধ্বনিত হয়।

এত নিরাশার মধ্যেও আশার আলোর ঝলকানি বয়ে আনল 'আকাশবাণী'—ভেসে এল রেডিও তরংগে মধুর আশ্বাসবাণী—"সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি"। আকাশবাণী জানাল পূর্ব পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ঢাকার আশেপাশে, রংপুর, দিনাজপুরে, কুষ্টিয়া, যশোর, চট্টগ্রামে পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে বাঙালী মুক্তিফৌজের যুদ্ধ চলছে। রাত্রে বিবিসি ও ভয়েস অব

আমেরিকাও শুনাল একই বার্তা। এত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও আশ্বস্ত হলাম, না, বাঙালী রুখে দাঁড়িয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

পরদিন ২৭শে মার্চ। কয়েক ঘণ্টার জন্য সান্ধ্য আইন শিথিল। ভীত সন্ত্রস্ত চিত্তে ছুটে গেলাম জগন্নাথ হলে—ছোট ভাই বাবুর খোঁজে। বাবু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র—ছাত্রলীগের একজন সক্রিয় কর্মী। সারা হল এলাকা জনশূন্য---হল ভবনগুলি বিধ্বস্ত, অগ্নিদগ্ধ, রক্তাপ্লুত। নরমেধ যজ্ঞের সাক্ষ্য হিসেবে তখনও সিঁড়িতে, ছাদে, বিভিন্ন কক্ষে—এখানে সেখানে পড়ে রয়েছে গুলিবিদ্ধ, বেয়োনেট বিদ্ধ অসংখ্য ছাত্রদের লাশ। রক্ত, মৃতদেহ আর বারুদের গন্ধে বাতাস ভরপুর। সামনে মাঠে সদ্যখোদিত এক গণকবর—অনেকেরই হাত পা বেরিয়ে রয়েছে। তখনকার মনোভাব আজ আর বুঝাতে পারবো না, কেমন একটা আচ্ছন্ন ও মোহগ্রস্ততার মধ্য দিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম বাবুর দোতলার ঘর পর্যন্ত। সারা ঘর বিপর্যস্ত, রক্তাক্ত। পেলামনা তার মৃতদেহের সন্ধান। বুঝলাম বাবু আরও অনেকের সাথে গণকবরের অভ্যন্তরে শায়িত।

দেখা করলাম তখনও জীবিত গুহ শিক্ষকদের সাথে -রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক গোপাল কৃষ্ণ নাথ, জগন্নাথ হলের নরমেধ যজ্ঞের একজন নীরব সাক্ষী, দেখা হল সংস্কৃতির অধ্যাপক রবীন্দ্র ঘোষ ঠাকুরের সাথে। মুখে কারও কথা নেই, এঁরা সবাই দিশেহারা, স্তব্ধ, জীবন্মৃত। দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বলে পথে নেমে পড়লাম। ঐ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা—জগন্নাথ হল, শহীদ মিনার এলাকা, ইকবাল হল, নীলক্ষেত এলাকা ঘুরে দেখলাম। খবর সংগ্রহ করলাম যথাসাধ্য। সব এলাকা অত্যাচারক্লিষ্ট। রমনা কালীবাড়ী, আনন্দ-ময়ী আশ্রম, শিববাড়ী, কোন এলাকাই রেহাই পায়নি। রেহাই পায়নি রোকেয়া হল সংলগ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর আবাস এলাকাও। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাব ভবনও শক্তির দাপটের সাক্ষ্য বহন করেছে।

পথে পথে মিলিটারী---চোখে চোখে তাদের দানবীয় দৃষ্টি। দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে ঘৃণা। তার মধ্য দিয়ে ক্লান্ত-ম্লান-বিষন্ন মুখে ফিরে এলাম বাসায়। এলাকা প্রায় জনশূন্য। সহকর্মীরা চলে গেছেন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। উদ্বিগ্না মাতা, উৎকণ্ঠিতা স্ত্রী জানতে চাইলেন আমরা কোথায় যাব? বুঝতে পারছিলাম নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়া উচিত, কিন্তু কোথায় যাব? ঢাকার, বাংলাদেশের কোন্ স্থান আজ নিরাপদ? একবার ভাবলাম নদীর ওপারে জিঞ্জিরার দিকে যাওয়ার, যেদিকে সবাই যাচ্ছে। কিন্তু মিলিটারী চক্রব্যূহ ভেদ করে হাঁটা পথে সদরঘাট পর্যন্ত যাওয়ার ঝুঁকি অনেক, আর সেদিকেরও যে কি অবস্থা কে জানে। পরে শুনেছিলাম পলায়নপর নিরস্ত্র জনতার ওপর সদর-ঘাট এলাকায় নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেছে অসংখ্য নরনারী---এই পিশাচ বাহিনী।

বেলা বারোটার দিকে এলেন সহকর্মী অধ্যাপক রফিকুল্লাহ্ আমাদের খোঁজে। জানালেন তারা আশ্রয় নিয়েছে ওর বড় ভাইয়ের ওখানে—আমাদেরকেও সেখানে নিয়ে যেতে এসেছেন। আর আধঘন্টার মধ্যেই পুনরায় কার্ফিউ জারী হবে, অতএব আর দ্বিধা না করে একরকম এক বস্ত্রেই গৃহত্যাগ করলাম।

সেই কাল রাত্রিতে ও পরদিন জগন্নাথ হল ও তার আশে পাশের এলাকায় যে নির্মমতম হত্যাকান্ড ঘটেছিল তার প্রত্যক্ষদর্শী জগন্নাথ হলের তৎকালীন ছাত্র কালীরঞ্জন শীল হলে থেকেও সেদিন অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন।

শ্রী শীল সেই রাত্রে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হলেও পরদিন সকালে মিলিটারীর হাতে ধরা পড়ে যায়। তাকে ও অন্যান্য অনেককে দিয়ে জগন্নাথ হল ও আশেপাশের এলাকা থেকে লাশ বহন করানো হয়েছিল। মিলিটারীর আনাগোনা কমলে তিনি সুইপারদের বস্তিতে একটি বাথরুমে লুকিয়েছিলেন। পরে জনৈক ব্যক্তি সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করে বুড়িগংগার তীরে পৌঁছে দেয়। জগন্নাথ হলে আক্রমণের আর একজন সাক্ষী ঐ হলের গৃহশিক্ষক শ্রী গোপাল কৃষ্ণনাথ।

সেদিন পঁচিশে মার্চের রাত্রিতে 'অপারেশন সার্চ লাইটের' মেঠোকর্মিরা ও অধিনায়কগণ অপারেশন সম্পর্কে অয়্যারলেসের মাধ্যমে কথোপকথন করেছিলেন তা জনাব জামিল চৌধুরী (বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার একাডেমীর পরিচালক) ও আরও কয়েকজন রেকর্ড করেন।

২৭শে মার্চ থেকে শুরু হল আমার পলাতক জীবন, আত্মগোপনের পালা। ঢাকার নানা স্থানে---কখনও একা, কখনও সপরিবারে একস্থান থেকে অন্যস্থানে পালিয়ে বেড়িয়েছি। পরে জেনেছি বিশ্ববিদ্যালয় আবাসে একাধিকবার মিলিটারী আমার সন্ধানে গিয়েছিল। বহুবার বিপদের মধ্যে পড়েছি। তবু সাহস করে ঢাকার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেছি সে সময়, দেখেছি ওদের অত্যাচারের নানারূপ অসহায়ভাবে। ওদের নারকীয় কান্ডকারখানা আর অত্যাচার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছি। সেই দুঃসময়ে ঢাকায় আত্মগোপনে যারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও আমাকে এবং আমার পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছিল, নানাভাবে সাহায্য করেছিল তাদের কথা কোনদিন ভুলবনা। ভুলবনা ডঃ আজাদের কথা, ডঃ ওবাইদুল হকের কথা, ডঃ মুর্তজার কথা, অধ্যাপক এ, বি, এম হাবিবুল্লাহর কথা।

অনেকবার বিপদের মধ্যে পড়েছি। একদিনের কথা বলি---দিনটি ছিল ১১ই এপ্রিল। ধানমন্ডী আবাসিক এলাকায় এক পরিচিত বন্ধু পাট ব্যবসায়ীর ওখানে সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছিলাম কয়েক দিন আগে। বিকেল সাড়ে তিন বা চারটার দিকে একটি মিলিটারী জীপ কয়েকজন সেপাই ও অফিসার সহ বাসায় এল। আমরা উৎকণ্ঠিত ও শঙ্কাকুল চিত্তে অন্দরমহলে অপেক্ষা করছি। এই বুঝি ধরা পড়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে ওরা চলে গেল। গৃহকর্তা জানালেন

ওরা জানতে চাইল এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অধ্যাপক আশ্রয় নিয়েছে কিনা। গৃহকর্তা অনেক কষ্টে তাদের বিদায় করতে সমর্থ হয়েছেন অন্ততঃ সাময়িক-ভাবে। তিনি আরও জানালেন আমাদের সেখানে আর থাকাটা নিরাপদ নয়। ভাবলাম আবার যদি তারা ফিরে আসে তবে সবাই বিপদে পড়ব। এদিকে বিকেল ৫টায় আবার কারফিউ বলবৎ হবে, নূতন আশ্রয় স্থল খোঁজার সময় নেই। বন্ধুকে জানালাম যে আজ রাতের জন্য আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসই হবে সব চাইতে নিরাপদ স্থান কেননা, যদি ওরা আমার সন্ধানেই এসে থাকে তাহলে নিশ্চয় তারা ওখানে প্রথম খোঁজ করে এসেছে। ৫টার একটু আগে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসায় এসে আশ্রয় নিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় তখন শ্মশানের নীরবতা, জন প্রাণী নেই, দু'একটা কুকুর কেবল ইতস্তত: ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন বাতি না জ্বালিয়ে সেই রাত আমরা কাটালাম ভয়ে ভয়ে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কোন বিপদ ঘটেনি। পরদিন আবার নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। আর একদিনের কথা---আজিমপুর এলাকায় একটি গলির ভেতর একটি মেসে আশ্রয় নিয়েছি একা। রাত এগারটার দিকে বেশ হৈ চৈ---চারিদিকে ছুটাছুটি, বন্দুকের গুলি। কিছুক্ষণ পর বুঝা গেল সমস্ত এলাকা মিলিটারী কর্ডন করেছে। ঘরে ঘরে তল্লাসী চলছে। মেসের অধিবাসী আমরা ক'জন আতঙ্কিত হয়ে অপেক্ষা করছি। কখন দুশমনদের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু আমাদের মেসে ওদের পদার্পণ ঘটেনি। পরদিন সকালে জানা গেল আশে পাশের এলাকা থেকে বেশ কয়েকজন যুবক ও ছাত্রকে তারা ধরে নিয়ে গেছে। ভাবলাম এদের মধ্যে ক'জন জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারবে।

২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় বিবিসি রেডিও অস্ট্রেলিয়ার বরাত দিয়ে জানাল যে, বংগবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এবং তিনি চটগ্রামে রয়েছেন। অপরদিকে রেডিও পাকিস্তান ক'দিন ধরেই বলে চলেছে শেখ সাহেবকে ২৬শে মার্চ তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ২৮শে মার্চ বিকেলে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণার কথা (শেখ সাহেবের পক্ষে) আমরা শুনলাম। এই দু'টি ঘোষণাই আমাদের বন্দী অসহায় জীবনে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল বলাই বাহুল্য।

প্রায় প্রতিদিন কোন কোন এলাকায় নরহত্যা সংঘটনের খবর পেতে থাক-লাম। শুনলাম ২৯শে মার্চ রাত্রে শাঁখারী বাজার ও তাঁতী বাজার এলাকায় হিন্দু নরনারীদের শেয়াল কুকুরের মত হত্যা করা হয়েছে। এপ্রিলের মাঝামাঝিতে একদিন সাহস করে একা তাঁতী বাজার এলাকায় গেলাম। সেখানে আমার পূর্ব পরিচিত জগন্নাথ কলেজের প্রধান ইতিহাসের অধ্যাপক নারায়ণ সাহা থাকেন তাঁর সন্ধানে। দেখলাম সারা এলাকা নিস্তব্ধ। ওর বাড়ী ফাঁকা। গলির

মোড়ে এক পান বিড়ির দোকানে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম ওদের কথা। জানাল—ওরা জিঞ্জিরায় চলে গেছে। নদীর ওপারে। সে আরও জানাল যে, তাঁতী বাজার আর শাঁখারী বাজার এলাকা এখন অবাঙালীদের দখলে, অধিকাংশ হিন্দুদের পরিত্যক্ত বাড়ী ওদের দখলে। আমাকে ওদিকে যেতে নিষেধ করল। শাঁখারী বাজার এখন 'টিক্কা খান রোড'।

২৮শে মার্চ রাত্রে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারকে তোপ দেগে গুড়িয়ে দেয়া হল। আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনার প্রতীক—আমাদের সংগ্রামের প্রতীক এখন মসজিদে রূপান্তরিত। রিক্সা করে একদিন ঐ পথ দিয়ে যাওয়ার কালে দেখলাম—কারা যেন সবুজ রঙে বাংলা ও উর্দু বড় বড় হরফে লিখে রেখেছে "মসজিদ-মসজিদ"। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে এক রাত্রে ডিনামাইট দিয়ে ঐতিহাসিক রমনা কালী মন্দির উড়িয়ে দেয়া হল—ধূলিস্যাৎ করা হল আনন্দময়ী আশ্রম। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে খবর পেলাম মুহম্মদপুর এলাকায় অনেক বাঙালীকে হত্যা করা হয়েছে। শোনা যেতে লাগল প্রতি রাত্রেই কোন না কোন অঞ্চল থেকে লোক নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—এর সাথে চলছে লুটপাট, আর নারী নির্যাতন। শিশুরাও বাদ পড়ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ-স্কুলের ছাত্রীরাও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। সারা ঢাকা শহর ক্রমশঃ পরিণত হচ্ছে একটি বন্দিশালায়।

এর মধ্যে আর একটি বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছিল। অবাঙালীদের পাশাপাশি প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলসমূহ প্রতিদিনই মিছিল ও শোভাযাত্রা বের করতে শুরু করেছে পাক-বাহিনী ও সরকারের সমর্থনে। এদের অনেকেই চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে সংঘটিত নৃসংশভাবে তথাকথিত অবাঙালী হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে অতিরঞ্জিত খবর পরিবেশন ও বক্তৃতা, বিবৃতি দিতে শুরু করল। এর প্রতিক্রিয়া ঢাকাতে অনুসৃত হল আরও বাঙালী নিপীড়ন, হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে। শোনা যাচ্ছিল নারায়ণগঞ্জে শীতলক্ষা, ধলেশ্বরী নদীতে, ঢাকায় বুড়িগংগা নদীতে প্রতিদিনই অসংখ্য লাশ একত্রে বাঁধা অবস্থায় ভেসে যায়। ঢাকা অবরুদ্ধ, বাংলাদেশ বাইরের জগত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। স্থির করলাম বাংলাদেশের প্রকৃত শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি সম্পর্ক, গণহত্যা সম্পর্কে বহির্বিশ্বকে যে করেই হোক জানাতে হবে। নরহত্যা ও নির্যাতন সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যের একটি প্রতিবেদন তৈরী করলাম উপরোক্ত মেসের একজন রুমমেটকে দিয়ে। তার অফিস থেকে গোপনে কয়েক কপি টাইপ করলাম। যে করেই হোক এই প্রতিবেদন বাইরে পাঠাতে হবে। ডঃ আজাদের সাথে যোগাযোগ করলাম—তাঁর প্রতিষ্ঠানে তখনও ২/১ জন বিদেশী রয়েছেন যারা এখনও ঢাকা ত্যাগ করেননি, তবে শীঘ্রই করবেন। একদিন বিকেলে ওদের একজনের সাথে ডঃ আজাদ সহ দেখা করলাম। সবকিছু জানালাম এবং এ ব্যাপারে তার সহায়তা কামনা করলাম। তিনি সানন্দে রাজী হলেন এবং

আমার প্রতিবেদনের এক কপি রাখলেন। জানালেন তিনি নিজেও একটি প্রতিবেদন তৈরী করেছেন এবং কিছু ছবিও তুলেছেন। এসবই তিনি অমেরিকায় পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন এবং যাওয়ার সময় আরও তথ্য প্রদান করলে নিয়ে যাবেন সেখানে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টির সহায়তায়। এ ভাবেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আমাদের প্রথম কাজ শুরু হল। তিনিও জানালেন যে তিনি চলে গেলেও একজনকে বলে যাবেন আমাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য।

এদিকে ২৬শে মার্চ থেকেই নরহত্যার পাশাপাশি বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্ব শুরু হয়ে গেছে। ঢাকা ছাড়া বাংলাদেশের সর্বত্র পাক-বাহিনী প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে। ইপিআর, পুলিশ, ইবিআর, প্রাক্তন সৈনিক, ছাত্র, জনতার মধ্য থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্থানীয়ভাবে মুক্তি-ফৌজ গড়ে উঠেছে। স্বাধীন বাংলা বেতার মারফত স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। চট্টগ্রাম ও পারিপার্শ্বিক এলাকায় মেজর জিয়াউর রহমান ও ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর সীমান্তে মেজর ওসমানের নেতৃত্বে; ময়মনসিংহে মেজর শফিউল্লাহর নেতৃত্বে; ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আখাউড়া এলাকায় মেজর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে; সিলেট অঞ্চলে মেজর দত্তের নেতৃত্বে প্রতিরোধ যুদ্ধ চলছে। এই নামগুলি সেদিন অবরুদ্ধ ঢাকাবাসীর কাছে ছিল প্রেরণার উৎস। তখনই স্থির করেছিলাম পাকিস্তানী অধিকৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর চাকুরী নয়, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যে কোন কাজ করাই হবে পবিত্রতম কর্তব্য। প্রথম দিকে স্থির করেছিলাম ঢাকাতেই আত্মগোপন করে অবস্থান করে স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে কাজ করার চেষ্টা করব সীমিত সাধ্য নিয়ে। কেননা এটি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে আমাদের প্রাথমিক প্রতিরোধ টিকবে না, ভেঙ্গে পড়বে। গেরিলা যুদ্ধই হবে আমাদের ভরসা, আর এজন্যে প্রয়োজন দেশের অভ্যন্তরে জীবনের ঝুকি নিয়েও থেকে যাওয়া। তাই সেই দুর্যোগকালেও কয়েকজনের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম—ঢাকায় থেকে প্রতিরোধের সপক্ষে কোন কিছু করা যায় কিনা। কিন্তু অবস্থা ক্রমশ: খারাপ হতে লাগল। কারও সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছিল না। ঢাকায় অবস্থান করাও অসম্ভব হয়ে উঠছিল। প্রতিরাতেই ঢাকার কোন কোন এলাকা পাকিস্তানী হামলার শিকার হচ্ছিল।

বুঝতে পারছিলাম সপরিবারে ঢাকায় আর থাকা নিরাপদ নয়। শুভানুধ্যায়ীরা বিশেষ করে ড: আজাদ পরামর্শ দিলেন ঢাকা ছেড়ে মুক্তাঞ্চলে চলে যাওয়ার। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অসুস্থা স্ত্রী আর বৃদ্ধা মাতাকে নিয়ে। ১১ই এপ্রিল আকাশবাণীর মারফৎ জানলাম মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার কথা। ইতিমধ্যে স্বাধীনতার কথা ঘোষিত হয়েছে—যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। পরে আগরতলায় আমার এক ছাত্র মুক্তিযোদ্ধা—সঞ্জয়ের সাথে দেখা হওয়ায় তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তারা নোয়াখালী শহরে কিভাবে স্বাধীনতার কথা

জানতে পারে। সে আমায় জানিয়েছিল যে ২৭শে মার্চ সকাল থেকে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এ সম্পর্কে মাইক যোগে প্রচার করতে থাকে এবং বঙ্গবন্ধুর বাণী সম্বলিত একটি হ্যাণ্ডবিল জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তার মতে বঙ্গবন্ধুর এই বাণীটি টেলিগ্রাফ অফিসের কর্মচারীরা পান এবং তারা নেতৃবৃন্দকে জানান। এ ঘটনা থেকে আমার মনে হয় বঙ্গবন্ধুর বাণীটি চট্টগ্রামে ধৃত হওয়ার পর টেলিগ্রাফ ও অয়ারলেসের কর্মচারীবৃন্দ বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন। তারা আবার অন্যান্য স্থানের সাথে যোগাযোগ করে। এই বাণী এ ভাবেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচারিত হয়। আরও অনেকের কাছ থেকে একই ধরণের কথা শুনতে পাই।

২২শে এপ্রিল। অধ্যাপক হাবিবুল্লাহ যোগাযোগ করলেন—একটি দুঃস্থ অসহায় হিন্দু পরিবারের জন্য আশ্রয় খুঁজতে হ.ব। ভদ্রলোক একজন সরকারী চাকুরে। তাঁকে কয়েকদিন হল মিলিটারী ধরে নিয়ে গেছে। আর ফিরে আসেননি। সকন্যা মহিলা বিপদে পড়েছেন। কন্যাটির প্রতি মিলিটারীর নজর পড়েছে। মিলিটারীর লোকজন প্রতিদিনই আগাগোনা করছে, আর ভয় দেখাচ্ছে। টাকা দাবী করছে বাবাকে ছেড়ে দেবে এই বাবদে। মিসেস আব্বাসের সাথে যোগাযোগ করে ওদের একটি আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলাম। আজিমপুরায় আমার এক পরিচিত হিন্দু সরকারী কর্মচারী—পালাতে পারেন নি, সরকারী নির্দেশে আবার কাজে যোগ দিয়েছেন। কয়েকজন অবাঙ্গালী তাকে ভয় দেখাচ্ছে, তারও কলেজে পড়ুয়া কন্যা রয়েছে। সেই সূত্রে কয়েকজন মিলিটারী অফিসার তার বাসায় যাতায়াত করে বৈকালিক চা-পানের উদ্দেশ্যে। খবর পাঠিয়েছেন মেয়েটির জন্য কিছুদিনের জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের। সুলতানার সাথে যোগাযোগ করলাম। ও রাজী হল মেয়েটির একটি সুব্যবস্থা করার। আজিমপুরায় যে মেসে থাকতাম সেখানকার একজন একদিন সন্ধ্যেয় জানালেন—তাকে তার অফিসে জনৈক অবাঙ্গালী কর্মচারী ভয় দেখাচ্ছে যে তিনি মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগ রাখছেন— টাকা চাইছে। স্থির করেছেন মুক্তাঞ্চলে চলে যাবেন, মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবেন। সব ঠিকঠাক করে ফেলেছেন। পরদিন সকালেই চলে যাবেন। সকালে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলাম। তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

স্থির হয়েছিল এপ্রিলের শেষে ঢাকা ত্যাগ করব। পুরানো এক রাজনৈতিক কর্মীবন্ধু মেসেজ পাঠিয়েছেন অবিলম্বে মুক্তাঞ্চলে সরে যাওয়ার জন্য। আমার জন্য ঢাকায় থাকা আর কিছুতেই নিরাপদ নয়। বার্তাবাহক সব ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু উদ্যোগ ব্যর্থ হল। মিলিটারী ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হলনা। অর্ধপথ থেকে ফিরে এলাম আবার ঢাকায়। এবার অন্য সূত্র ধরলাম। দাউদকান্দি থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে ভিতরে একগ্রামে আমার স্ত্রীর দূরসম্পর্কের এক মামা থাকেন। সেখানে যাওয়া স্থির করলাম। ডঃ ওবায়দুল

হকের অফিসে ঐ অঞ্চলের একজন কর্মচারীর সন্ধান পাওয়া গেল। সে খবর নিয়ে জানাল আমাদের আত্মীয়রা গ্রামে আছেন--ওদিকে মিলিটারীর দৌরাত্ম নেই। মুক্তাঞ্চল বলা চলে। সে আমাদের ওখানে নিয়ে যেতে রাজী হল। ওর নাম-নুরুল ইসলাম। স্থির হল নারায়ণগঞ্জ থেকে লঞ্চ বা নৌকায় আমরা ঐ গ্রামের দিকে যাব। ডঃ আজাদ পরামর্শ দিলেন হিন্দু পরিচয়ে কিছুতেই যাওয়া যাবে-না। যেতে হলে মুসলমান পরিচয়ে। কিন্তু বিপত্তি হল মাকে নিয়ে। মা কিছুতেই প্রথম জিজ্ঞাসাতে মুসলমান নাম বলতে পারেন না, মুখ দিয়ে আসল নাম বেরিয়ে আস। অতএব স্থির হল আমরা রাস্তায় জিজ্ঞাসাবাদের পাল্লায় পড়লে নেটিভ ক্রিশ্চিয়ান পরিচয় দেব। নাম স্থির করার প্রয়োজন নেই। ক্রিশ্চি-য়ানরা বাংলা নামেই পরিচয় দেয়। হলিক্রস কলেজের পরিচিত এক সিস্টারের কাছ থেকে 'ক্রুশ', কিছু বাংলা ও ইংরেজী বাইবেল ও অন্য পুস্তক যোগাড় হল। মা ও স্ত্রী 'ক্রুশ' ঝুলালেন গলায়। স্থির হল ১৫ই মে আমরা ঢাকা ত্যাগ করব। ডঃ আজাদ ওর প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী হিসেবে পরিচয় পত্র জোগাড় করে দিলেন।

ঢাকা ত্যাগের কয়েকদিন আগে চক্ষু চিকিৎসক ডঃ আলিম চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করলাম। তিনি পূর্ব পরিচিত--অসহযোগ আন্দোলনের সময়েই তার সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। তাঁকে সব জানালাম। তিনি সেদিন বলেছিলেন যে তাঁর প্রকাশ্য রাজনৈতিক কোন পরিচয় নেই উপরন্তু তিনি চিকিৎক, কাজেই ঢাকায় থাকা তাঁর জন্য অতটা বিপদজনক নয়। স্থির হল তিনি ঢাকায় আগত গেরিলাদের যোগাযোগকারী ব্যক্তি হিসেবে কাজ করবেন। তাদের আশ্রয়, প্রয়োজনে চিকিৎসা ও ঔষধ পত্রাদি যোগানোর ব্যাপারে—অন্যান্য-দের সহায়তায়। ডঃ আজাদের সাথে যোগাযোগ রাখার কথাও তাঁকে বললাম। আরও কয়েক জনের সাথে এ ব্যাপারে দেখা করলাম। সরকার ঘোষণা করেছে ১লা জুলাই'র মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের জন্য। যাওয়ার কয়েকদিন আগে বিভাগীয় প্রধান ইন্নাস আলীর সাথে দেখা করলাম তাঁর আজিমপুরস্থ অস্থায়ী বাসভবনে। তিনি পাকিস্তানীদের গুলিতে আহত হয়েছিলেন, তখন নিরাময়ের পথে। সাশ্রুনেত্রে বিদায় জানালেন, মাথায় হাত রেখে আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন।

বিদায়ের মুহূর্ত এগিয়ে এল। ডঃ আজাদ ও ডঃ হক নিবিড় আলিঙ্গনে বিদায় জানাল—আশার বাণী উচ্চারণ করল আবার দেখা হবে--হয়তো মুক্তদেশে। ডঃ আজাদকে আর একটি প্রতিবেদন হস্তান্তরিত করলাম বাইরে পাঠাবার জন্য। দেশ মুক্ত হবার পর অনেকের সাথে দেখা হয়েছিল কিন্তু এই নীরব দেশকর্মীর সাথে আর দেখা হলনা। চিরতরে তিনি হারিয়ে গেলেন। পথে কোন বিপদ হয়নি। কেবল পাগলার ওখানে আমাদের গাড়ী আটকিয়ে জনৈক মিলিটারী অফিসার আমার পরিচয় ও কোথায় যাচ্ছি জিজ্ঞেস করেছিল। মাকে দেখিয়ে

বলেছিলাম ওঁকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় আনিয়েছিলাম--গ্রামে ফিরে যাচ্ছেন। আমরা মুক্তি পেলাম। নদীর ধারে গেলাম অসংখ্য লাশ পড়ে রয়েছে। চারিদিকে শুকুনের উল্লাস। অনেকগুলি নারায়ণগঞ্জ অভিমুখী বাস আটকানো--যাত্রীরা পথের পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো। শেষ পর্যন্ত ওদের কি হয়েছিল জানিনা।

অবশেষে নারায়ণগঞ্জ থেকে লঞ্চ ও নৌকাযোগে আমরা আমাদের উদ্দিষ্ট গ্রামে পৌঁছালাম নুরুল ইসলামের সহায়তায়। আসবার সময় শীতলক্ষ্যা ও ধলেশ্বরীতে ভেসে যেতে দেখলাম অসংখ্য মৃতদেহ। নুরুল ইসলাম জানাল দিন কয়েক আগে নারায়ণগঞ্জ ও আশেপাশের এলাকায় মিলিটারী অপারেশন হয়েছে—এ তারই ফলশ্রুতি।

আমাদের আত্মীয়রা আমাদের গ্রহণ করল সাদরে। অনেকদিন পর মার মুখে দেখলাম আশ্বস্তির ঝিলিক। দাউদকান্দি থেকে বেশ কয়েকমাইল গভীরে গ্রামটি। যাতায়াতের সুবিধা নেই--তাই আপতদৃষ্টিতে নিরাপদ। অন্যদিকে মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের একটি ভাল আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। গ্রামবাসীদের অনেকে এবং আশে পাশের গ্রামসহ বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থেকে পলাতক এবং স্থানীয় ছাত্র আমার সাথে যোগাযোগ করল—ঢাকার অবস্থা জানতে চাইল। ওরা জানাল যে আশে পাশের গ্রাম মিলে ওরা একটি ছোটখাট মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রের বড্ড অভাব। পরামর্শক্রমে ঠিক হল আপাততঃ সশস্ত্র প্রতিরোধ সম্ভব নয়। এখন কেবল সংগঠন গড়ে তোলা আর চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা—বিশেষ করে দাউদকান্দিতে ঘাঁটি স্থাপন করা পাক-বাহিনীর গতিবিধির ওপর। স্থির হল ১০/১২ জনের একটি ছোটদল ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র নিয়ে চলে আসবে। ওরা ফিরে এলে আর একটি দল যাবে এবং ক্রমান্বয়ে এই প্রক্রিয়া চলবে যতদিন না স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা যায়।

কয়েকদিন গ্রামে কাটালাম। একদিন রাতে দাউদকান্দি-কুমিল্লা মহা সড়কের দু'পাশের কয়েকটি গ্রামে মিলিটারী অপারেশন চালাল। এর ঢেউ আমাদের গ্রামেও এসে লাগল। গ্রামবাসীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। বিশেষ করে হিন্দু জনসাধারণ। আমার আত্মীয়রাও স্থির করল ওরা ভারতে চলে যাবে কিছু দিনের মধ্যেই। তাই স্থির করলাম ভারতে গিয়েই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার। স্থির করলাম ২২শে মে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করব। স্থানীয় মুক্তিবাহিনীর একটি ছোট দলও আমাদের সাথে যাবে তবে ওরা ভিন্ন পথে, আমরা মিলিত হব সি এণ্ড বি রোড পার হয়ে গোমতী নদীর ওপারে। গভীর রাত্রে একজন পথ প্রদর্শক সাথে নিয়ে আমরা আবার পথে নামলাম। দীর্ঘপথ কখনও হেঁটে, কখনও নৌকাযোগে পেরিয়ে আশ্রয় নিলাম চান্দিনার কাছে এক গরীব নাতিতের বাসায়। পরদিন রাত্রে আমরা অতিক্রম করলাম সবচাইতে বিপদজনক পথ

চান্দিনা-কুমিল্লা রোড এবং পরে সি এণ্ড বি রোড। অতিক্রম করলাম গোমতী নদী, ওপারে মুক্তিবাহিনীর দলটির সাথে দেখা হল। আমরা সেখান থেকে বুড়িচং হয়ে নয়নপুরের কাছ দিয়ে ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করলাম। প্রণাম জানালাম দেশের মাটিকে। চোখে জল এল। ভাবছিলাম আবার কি ফিরে যেতে পারব জন্মভূমির কোলে। দুপুরে আমরা পৌঁছলাম সীমান্ত শহর সোনামূড়ায় ২৪শে মে। ছোট শহর। ভরে গেছে বাংলাদেশ থেকে আগত হাজার হাজার শরণার্থীতে। আপাততঃ আশ্রয় পেলাম স্ত্রীর দূর সম্পর্কের বোনের বাসায়। দেখা হল আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক সংসদ সদস্য অধ্যাপক খুরশীদ আলমের সাথে। তিনি পূর্বপরিচিত। মুক্তিবাহিনীর ছোট দলটির আগমনের উদ্দেশ্য ওকে জানালাম, ওরা আশ্রয় পেল যুবশিবিরে। কয়েকদিন অধ্যাপক আলমের সাথে কাজ করলাম রিক্রুটিং সেন্টারে। দলে দলে যুবকরা আসছে সীমান্ত পেরিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য। এদের রাজনৈতিক মতবাদ ভিন্ন, কিন্তু মাতৃভুমি উদ্ধারে দৃপ্ত শপথে সকলেই বলীয়ান। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সদাসতর্ক যেন উদ্বাস্তুদের সাথে পাকিস্তানী চর বা গোয়েন্দা অনুপ্রবেশ না করতে পারে। একদিনের ঘটনা—বিকেলে থানা থেকে জনৈক পুলিশ এসে আমাকে জরুরী প্রয়োজনে থানায় নিয়ে এল। থানা অফিসার জানালেন যে তারা গোয়েন্দা সন্দেহে কয়েকজনকে আজ আটক করেছে-- সবাই পরিচয় দিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলে। আমি সনাক্ত করতে পারি কি না। সন্দেহের কারণ ওদের সাথে রয়েছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরের রাস্তাঘাট ও নদী পথের মানচিত্র। আমার সাথেও এ ধরণের কিছু ম্যাপ ও কাগজপত্র ছিল। ডঃ আজাদ অন্যান্যদের সহযোগিতায় জোগাড় করে ঢাকা ত্যাগের সময় আমাকে দিয়েছিলেন মুক্তিবাহিনীর লোকজনদের কাজে লাগতে পারে এই ভরসায়। ছাত্রদের সাথে থানা হাজতে কথা বলে সন্দেহমুক্ত হলাম, ওরা প্রকৃতই ছাত্র। কয়েকজন আমাকে চিনতেও পারল। ওরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে এসেছে। অফিসারকে বলায় ওরা মুক্তি পেল কিছুক্ষণ পরে।

মুক্তিযুদ্ধে আরো সক্রিয়ভাবে কাজ করতে চাই। তাই পরদিন আমরা চলে এলাম আগরতলায়। সপরিবারে আশ্রয় নিলাম আগরতলা কলেজের উদ্বাস্তু শিবিরে। কলেজের হোস্টেলের একটি কামরায় আমাদের স্থান করে দিলেন সুপার শ্রী সত্য ভট্টাচার্য। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে এবং উদ্বাস্তুদের দেখাশুনার ব্যাপারে শ্রী ভট্টাচার্য যে অমূল্য অবদান রেখেছেন তা আমি আজও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। হাজার হাজার শরণার্থী---সাধারণ মানুষ, ছাত্র, শিক্ষক। দেখা হল ছাত্রনেতা আবদুল কুদ্দুস মাখন সহ বেশ ক'জন ছাত্রনেতার সাথে, দেখা হল জনাব জিল্লুর রহমান ও কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে। নেতাদের জানালাম যে আমি ভারতে এসেছি উদ্বাস্তু হিসেবে থাকার জন্য নয়, মুক্তিযুদ্ধে কাজ করতে।

সেদিন বিকেলে ভারতীয় চলচ্চিত্র, ডকুমেনটেশন বিভাগ আমার একটি সাক্ষাৎকার চিত্রায়িত করল। ঢাকা ও বাংলাদেশে যে গণহত্যা চলছে তার একটি বিশদ বিবরণ দিলাম। এই চিত্রায়ন পরে ভারতের নানাস্থানে প্রদর্শিত হয়েছিল। পরদিন ছিল নজরুল জয়ন্তী, সত্যবাবুর উদ্যোগে উদ্বাস্তু ও যুবশিবিরের ছাত্ররা অনুষ্ঠান করল। আমরা অনেকেই বক্তৃতা করলাম। দেখা হল চট্টগ্রামের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা এম আর সিদ্দিকীর সাথে। তাঁকে সব জানালাম। তিনি পরামর্শ দিলেন কোলকাতায় চলে যাওয়ার জন্য। সেখানে মুজিব নগরস্থ বাংলাদেশ সরকার ও ডঃ এ আর মল্লিকের সাথে দেখা করার জন্য। সেখানে আমাদের মত লোকের নাকি বিশেষ প্রয়োজন।

স্থির করলাম কোলকাতা চলে যাওয়ার। কয়েকদিন শরণার্থী শিবির ও যুবশিবিরে ঘুরে ঘুরে বাংলাদেশ থেকে আগত বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজনদের কাছ থেকে পাক-বাহিনীব অত্যাচার সম্পর্কিত বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করলাম। দেখা হয়েছিল দেবদাস চক্রবর্তী ও ডঃ এস আর বোসের সাথে। সমস্যা দেখা দিল অসুস্থা স্ত্রী ও মাকে নিয়ে। ওঁদেব চিকিৎসা ও বিশ্রামের প্রয়োজন। স্থির হল আসামে শিবসাগরে কর্মরত বড় ভাইয়ের কাছে মা ও স্ত্রীকে রেখে আমি কোলকাতা চলে যাব। চিঠি লিখলাম কোলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনে ডঃ এ, আর মল্লিকের কাছে আমার আসামের ঠিকানা জানিয়ে। প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় আসামে পৌঁছলাম কয়েকদিন পরে। কিন্তু আসামে এসে বিপদে পড়লাম—আসাম কর্তৃপক্ষ আদেশ জারী করেছেন উদ্বাস্তুদের সবরকম চলাচল নিষিদ্ধ করে। বড় ভাই চেষ্টা করতে লাগলেন আমার কোলকাতা যাওয়াব অনুমোদন লাভের। দেরী হচ্ছিল। এরই মধ্যে ডঃ আনিসুজ্জামান এবং ডঃ মল্লিকের পক্ষ থেকে তাঁর কন্যা আমার ছাত্রী সেলিনার চিঠি পেলাম। ত্বরিত কোলকাতা যাওয়ার কথা দু'জনেই লিখেছেন। অনেক নাকি কাজ। আসাম সরকারেরও অনুমতি পাওয়া গেল।

কোলকাতার পথে গৌহাটিতে একদিন অবস্থান করলাম। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালী শিক্ষকদের সাথে দেখা করলাম। ওদের আসামে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টির প্রয়াসে কাজ করার আবেদন জানালাম। তড়িঘড়ি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরা একটি সভারও আয়োজন করল—বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বক্তব্য রাখলাম, আসামবাসীদের সহযোগিতা কামনা করলাম। আসাম থেকে এলাম উত্তর বংগে। শিলিগুঁড়ি, জলপাইগুড়ি, রামগঞ্জ প্রভৃতি সীমান্তে অবস্থিত শরণার্থী শিবির ও মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ইত্যাদি ঘুরে দেখলাম। যতদূর পারি বিভিন্ন অঞ্চলের তথ্য সংগ্রহ করতে চেষ্টা করলাম। বিভিন্ন শরণার্থী শিবির ঘুরে দেখার আর একটি উদ্দেশ্য ছিল পিতৃদেবের সন্ধান। মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথেই তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ২৫শে মার্চে তিনি ছিলেন দিনাজপুরে, আর আমরা ঢাকায়। কোথাও তাঁর সন্ধান মিললনা। অবশেষে

দিনাজপুর সীমান্তের কাছাকাছি মুক্তিযোদ্ধাদের এক শিবিরে তাঁর সন্ধান পেলাম। দিনাজপুর শহরের কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা জানাল যে বাবা গ্রামের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছেন। তারা আরো জানাল যে সেই গ্রামটি বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ভাল আশ্রয়স্থল—বাবা মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয় দান ইত্যাদি কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন।

অবশেষে কোলকাতা পৌঁছলাম জুন মাসের মাঝামাঝিতে। আশ্রয় পেলাম মাসীমার ভবানীপুরস্থ বাসায়। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের সাথে দেখা করলাম তিনি আমাকে বাংলাদেশ সরকারের প্ল্যানিং সেলের সাথে যুক্ত থেকে কাজ করার নির্দেশ দিলেন। যোগাযোগ হল ডঃ এ আর মল্লিক, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ খান সারওয়ার মুর্শিদ, অধ্যাপক আলী আহসান ও অন্যান্য অনেকের সাথে। মুক্তিযুদ্ধের কাজে সর্বাত্মকভাবে নেমে পড়লাম। ডঃ আনিসুজ্জামান সরকারের বিশেষ কাজে জড়িয়ে পড়ায় মে মাসে গঠিত বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সম্পাদকের দায়িত্ব আমার উপর বর্তাল।

অবরুদ্ধ ঢাকায় অবস্থানকালে ও বিভিন্ন শরণার্থী শিবির থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নারকীয় হত্যার একটি প্রতিবেদন আমরা তৈরী করেছিলাম। তার সংক্ষিপ্ত সার এখানে উল্লেখিত হল। এই প্রতিবেদন আমরা পাকিস্তান সহ বিভিন্ন দেশে বহু ব্যক্তি, সংগঠন ও সরকারের কাছে প্রেরণ করি।

ঢাকার ঘটনা: ২৫শে মার্চ জগন্নাথ হল ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় সংঘটিত হয় সবচাইতে বড় নরহত্যা। জগন্নাথ হলের যে সব নিহত ছাত্র ও কর্মচারীর নাম সংগ্রহ করা হয়েছিল—সর্বশ্রী স্বপন চৌধুরী (ছাত্রনেতা) গণপতি হালদার, সুশীল দাস (সহ-সাধারণ সম্পাদক), রমণীমোহন ভট্টাচার্য, রণদা রায়, সুভাষ চক্রবর্তী, প্রবীর পাল, কিশোরী মোহন সরকার, ভবতোষ ভৌমিক, বরদা কান্ত তরফদার, সত্যদাস, কার্তিক শীল, পল্টন দাস, কেশব চন্দ্র হালদার, নির্মল কুমার রায়, সুজিত দত্ত, রবীন্দ্র রায়, বিধান ঘোষ, মৃনাল বোস (ছাত্রনেতা), শিব কুমার দাস, শিশুতোষ দত্ত চৌধুরী, উপেন রায়, সন্তোষ রায়, জীবন সরকার, নিরঞ্জন সাহা, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, অজিত রায় চৌধুরী, সত্যনাগ, রুপেন্দ্র সেন, মুরারী বিশ্বাস, বিমল রায়, প্রদীপ নারায়ণ রায় চৌধুরী, নিরঞ্জন চন্দ্র, সুব্রত সাহা, প্রিয়নাথ (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী), দুখী রাম (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী), সুনীল দাস (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী), শংকর মোদক (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী), শিবু মোদক (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী), সুশীল চন্দ্র দাস (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী), খগেন্দ্র চন্দ্র দে (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী), মতিলাল দে (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী), বোধিরাম (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী), দাঁওরাম (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী), ভীরুরাম (৪র্থ শ্রেণীর কমচারী), মনভরন রাম (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী), জহরলাল (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী), মনিলাল (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী, রাজভর (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী), লতিফুর রহমান (অতিথি ছাত্র), বদরুদ্দোজা (অতিথি ছাত্র), মাহতাব উদ্দিন (অতিথি ছাত্র), এবং আরও বহু ছাত্র যাদের নাম সংগ্রহ করা আর কোনদিনই হয়ত সম্ভব হবে না।

এছাড়া ইকবাল হলেও বেশ কিছু ছাত্র-কর্মচারী এবং আশ্রয়প্রার্থী বস্তি-এলাকার অসংখ্য নরনারী।

এই গণহত্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও যে সব কর্মচারী নিহত তারা হলেনঃ মধুদে—সকলের মধুদা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনের মালিক ও তার স্ত্রী, বড় ছেলে এবং পুত্র বধু, ননী রাজভর, রোকেয়া হলের দারোয়ান ও স্ত্রী, ও সকল সন্তান সন্ততি; খগেন দে, দর্শন বিভাগের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী, শামসুল মোল্লা ইকবাল হলের দারোয়ান, রোকেয়া হলের দারোয়ান মইনুদ্দিনের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও পুত্র বধু, চুনু মিয়া, রোকেয়া হলের মালী, আবদুল খালেক, রোকেয়া হলের মালী, সিরাজ মোহাম্মদ, রেজিস্ট্রার অফিসের পিওন ২৭শে মার্চ ঢাকা থেকে পালাতে গিয়ে রাস্তায় নিহত হয়।

এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাবভবনে পাঁচটি মৃতদেহ পাওয়া যায়। এদের ৪ জন হল ক্লাবের বেয়ারার, অন্যজনের পরিচয় পাওয়া যায়নি—সম্ভবতঃ ওদের কারও আত্মীয়ঃ আবদুল মজিদ, সিরাজুল হক, সোহরাব হোসেন, আলী হোসেন।

২৫শে মার্চ থেকে ২৯শে মার্চের মধ্যে যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হত্যা বা আহত করা হয়েছিল ঃ

প্রফেসর গোবিন্দ চন্দ্র দেব, উপমহাদেশের প্রখ্যাত দার্শনিক ও দর্শন বিভাগের প্রধান। ২৬শে মার্চ প্রাতঃকালে প্রার্থনারত অবস্থায় প্রথমে বন্দুকের গুলিতে পরে সঙিনের খোঁচায় হত্যা করা হয়। তাঁর মুসলিম পালক পুত্রকেও হত্যা করা হয় একই সাথে। মুহাম্মদ মুনিরুজ্জামান, পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান, তাঁকে তাঁর ভাই, এক ছেলে ও ভাইপো সহ ২৬শে মার্চের সকালে হত্যা করা হয়। মুহাম্মদ মুকতাদির, ভূতত্ত্ব বিভাগের সিনিয়ার লেকচারার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফুলার রোড আবাসিক এলাকায় তাঁর বাসভবনে ২৬শে মার্চ সকালে হত্যা করা হয়। শ্রী অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, লেকচারার ফলিত পদার্থ বিদ্যা-বিভাগের, গৃহ শিক্ষক, জগন্নাথ হল। হলের মধ্যে তাঁর বাস ভবনের বাথরুমে লুকিয়ে ছিলেন, ২৫শে মার্চ রাত্রে সেনাবাহিনীর লোকজন ওখানে তাঁকে হত্যা করে। ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, রীডার ইংরেজী বিভাগ, প্রভোস্ট জগন্নাথ হল; ২৫শে মার্চ ভোর রাত্রে বাসা থেকে ডেকে এনে বাসার সামনে গুলি করা হয়। পরে অধ্যাপক রাজ্জাক ও মিসেস গুহ ঠাকুরতা তাঁকে বাসায় নিয়ে আসেন। তিনি জীবিত ছিলেন—২৭শে মার্চ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, ২৯শে মার্চ হাসপাতালে মারা যান। মুহাম্মদ সাদেক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরী স্কুলের শিক্ষক, ফুলার রোড এলাকায় তাঁর বাসভবনে তাঁকে হত্যা করা হয়। ২৭শে মার্চ সকালে তাঁকে বাসভবনের পিছনের মাঠে কবরস্থ করা হয়। ডঃ ফজলুর রহমান, মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের সিনিয়ার লেকচারার, তাঁকে এবং তাঁর এক

ভাইপোকে নীলক্ষেত এলাকায় তাঁর বাসভবনে হত্যা করা হয়। একই সাথে ঐ ভবনের ছাদে আশ্রয় নেয়া অসংখ্য বস্তিবাসীকেও হত্যা করা হয়। ঐ সব লাশ দীর্ঘদিন ধরে ছাদেই পড়ে ছিল। জনাব এ, আর, খান খাদিম, পদার্থবিদ্যা বিভাগের লেকচারার, ঢাকা হল (শহীদুল্লাহ হল) সংলগ্ন কর্মচারীদের আবাসস্থলে তাঁকে ২৬শে মার্চ হত্যা করা হয়। জনাব শরাফত আলী, লেকচারার, গণিত বিভাগ, একই স্থানে একই সময় তাঁকেও হত্যা করা হয়। এছাড়া এই স্থানে আরও তিনজনকে হত্যা করা হয় যাদের সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। ডঃ মুহাম্মদ শাহাদত আলী, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সিনিয়ার লেকচারার, ২৬শে এপ্রিল ঢাকা থেকে তাঁর বাড়ী নরসিংদী যাওয়ার পথে বর্বর পাক ফৌজের হাতে নিহত হন।

ঐ কাল রাত্রিতে এবং তৎপরবর্তী সময়ে নিম্নলিখিত শিক্ষকগণ মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলেনঃ

প্রফেসর এম, ইন্নাস আলী, পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী; অধ্যাপক ও তদীয় পুত্র ফিরোজ আলীকে পাক-বাহিনীর একটি দল ২৫শে মার্চ রাত্রে নীলক্ষেতস্থ বাসভবনে প্রবেশ করে তাঁদের প্রতি লক্ষ্য করে গুলি করে। এর ফলে তারা উভয়েই আহত হন। পরে তাঁদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেখানে আরোগ্য লাভ করেন। অধ্যাপক এ কে রফিকুল্লাহ, রীডার পদার্থবিদ্যা বিভাগ; ৩১শে মার্চ জিঞ্জিরা থেকে সপরিবারে নৌকাযোগে পলায়ন কালে পাক বাহিনীর গুলিতে স্ত্রী ও পুত্রসহ আহত হন। এছাড়া অধ্যাপকের ভ্রাতা জনাব এন, হামিদুল্লাহর স্ত্রী তৎক্ষণাৎ বন্দুকের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন। প্রফেসর এম, এন, হুদা, অর্থনীতির অধ্যাপক, ২৫শে মার্চ রাত্রে জগন্নাথ হলের নিকট তাঁর বাসভবনে ঢুকে তাঁর প্রতি গুলি ছোঁড়া হয়—সৌভাগ্যবশতঃ তিনি রক্ষা পান। প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর, ইতিহাসের অধ্যাপক ও সলিমুল্লাহ হলের প্রভোস্ট, শহীদ মিনারের নিকট তাঁর বাসভবনে ২৫শে মার্চ গভীর রাত্রে সেনাবাহিনীর সদস্যরা প্রবেশ করে লুন্ঠন চালায়—অধ্যাপক বাসার পশ্চাতে লাকড়ির গাদার মধ্যে সপরিবারে আত্মগোপন করে রক্ষা পান। অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক; ২৫শে মার্চ রাত্রে শহীদ মিনারের নিকটস্থ তাঁর বাসভবনের একটি কক্ষে আত্মগোপন করে অলৌকিকভাবে রক্ষা পান।

সে সময় ঢাকায় আর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি নিহত হয়েছিলেনঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, তথাকথিত আগরতলা মামলার ২ নং আসামী। ২৫শে মার্চ কাল রাত্রিতে তাঁকে তাঁর বাসভবনে থেকে টেনে বের করে এনে উন্মুক্ত রাজপথে গুলি করে মারা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনা উদ্দীপনায় কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের অবদান অমূল্য। অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, বিখ্যাত সাধনা ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা; ৩১শে মার্চ গেণ্ডারিয়ায় তাঁর বাসভবনে

এই অশিতীপর বৃদ্ধকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ডঃ এস দে, বি,সি,এস.আই আর প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী; এপ্রিল মাসে গেণ্ডারিয়ার বাসভবনের কাছে তাঁকে হত্যা করে তাঁর মৃতদেহ লোহার পুলের কাছে ফেলে রাখা হয়। ডঃ শৈলেন ভদ্র, শল্যচিকিৎক, শাঁখারী বাজারের নিকটে তাঁর বাসভবনে ৩১শে মার্চ পাক বাহিনী তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। দানবীর রনদা প্রসাদ সাহা মির্জাপুর হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা, সম্ভবতঃ এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে তাঁকে ও তাঁর পুত্রকে গভর্ণর ভবনে ডেকে আনা হয়। সেখান থেকে বের হবার পর সেনাবাহিনীর লোকজন ওদের ধরে নিয়ে যায়—সম্ভবতঃ ক্যান্টনমেন্টে পিতা-পুত্র উভয়কে হত্যা করে। শহীদ সাবের, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক কিছুদিন যাবৎ মানসিক রোগে ভুগছিলেন। ৩১শে মার্চ সকালে সংবাদ অফিস ভবনে অগ্নি-সংযোগ করে পাক-বাহিনীর সদস্যরা তাঁকে পুড়িয়ে মারে। জহিরুল ইসলাম, ঔপন্যাসিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক, জিঞ্জিরায় ২রা এপিল তারিখে পাক-বাহিনী যে বর্বর নরহত্যাকাণ্ড চালায় তাতে তিনি অন্যান্য অনেকের সাথে নিহত হন। মেহেরুন্নেছা, কবি ও রেডিও মেকানিক, ২৭শে মার্চ তাঁকে বর্বর পাক-বাহিনীর সদস্যরা মা ও ছোটভাই সহ নির্মম অত্যাচারের পর হত্যা করে। আবু তালিব দৈনিক ইত্তেফাকের সাংবাদিক, ২৯শে মার্চ মীরপুর এলাকায় পাক-বাহিনীর কতি-পয় অবাঙ্গালী অনুচরদের হাতে মৃত্যু বরণ করেন। ডঃ আজহার আলী, রেডিওলজিস্ট, নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে খুব সম্ভব ১৬ই নভেম্বর তাঁকে পাক-বাহিনীর অনুচরেরা বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। তাঁর মৃতদেহ ফকিরা-পুলের কাছে পাওয়া যায়। ডাঃ হুমায়ুন কবীর, সদ্য পাশকরা ডাক্তার, ডাঃ আজহার আলীর সাথে একই সময়ে তাঁকে হত্যা করা হয়। এদুটি হত্যার খবর আমরা কলকাতায় পাই—ঢাকায় যোগাযোগ রক্ষাকারী গেরিলা ইউনিটের কাছ থেকে নভেম্বরের শেষে। ২৮শে মার্চ থেকে ৩১শে মার্চ এর মধ্যে ইত্তে-ফাক, পিপলস ও সংবাদ অফিস ভবন পাক বাহিনীর আক্রমণের শিকার হয়। বেশ ক'জন লোক এইসব অফিসে নিহত হয়। ঢাকা থেকে আগত লোক মার-ফত খবর পাওয়া গেল নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে-ঘোড়াশাল ন্যাশনাল জুট মিলের বেশ ক'জন বাঙ্গালী কর্মচারীকে পাকিস্তানী সৈন্যরা গুলি করে মেরেছে।

অন্যান্য অঞ্চলে অনুষ্ঠিত গণহত্যার স্বাক্ষর ঃ নানাসূত্র থেকে আমরা বাংলা-দেশের অন্যান্য অঞ্চলে অনুষ্ঠিত নারকীয় হত্যাকাণ্ডের সংবাদ সংগ্রহ করি ঃ

চট্টগ্রাম ও আশেপাশের অঞ্চল ঃ শ্রী পি,সি বর্মন, লোকহিতৈষী চট্টগ্রাম শহরের অধিবাসী, চট্টগ্রামে মার্চের শেষের দিকে সশস্ত্র সংগ্রামের সময় তাঁর বাসভবনে পাক-বাহিনী তাঁকে নিমর্মভাবে হত্যা করে। তাঁর পুত্রও সম্ভবতঃ নিহত হয়। জনাব আলী ইমাম, চট্টগ্রাম স্টেট ব্যাংক শাখার কমচারী; মার্চ-এপ্রিলে পাক-বাহিনীর হাতে নিহত হন। কাজী হাসান, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র;

প্রতিরোধ যুদ্ধকালে লালখাঁ বাজারে স্বীয় বাসভবনে পাক হানাদারদের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। শ্রী নতুন চন্দ্র সিংহ, কুণ্ডেশ্বরী ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা; একই সময়ে স্বীয় প্রতিষ্ঠানে এই সত্তর বছর বয়স্ক বৃদ্ধকে বর্বরভাবে হত্যা করা হয়। মুজাফফর আহমদ, প্রাক্তন রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী; চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়। কাওসার আহমেদ, চট্টগ্রাম পি,আই,এ অফিসের তরুণ কর্মচারী। বর্বর পাক বাহিনীর সদস্যরা বিমান বন্দর থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। সঠিক সময় জানা যায়নি। শ্রী বীরেন্দ্র লাল চৌধুরী, প্রবর্তক সংঘের নিবেদিতপ্রাণ বৃদ্ধ পুরুষ; এপ্রিল-মে মাসে এই সংসারত্যাগী বৃদ্ধ সন্যাসীকে পাক বাহিনীর জল্লাদেরা নির্মমভাবে হত্যা করে। শ্রী শান্তিময় খাস্তগীর, কানুনগোপাড়া কলেজের অধ্যক্ষ, কলেজের অফিসে কর্মরত অবস্থায় পাক বাহিনীর নির্মম জল্লাদদের গুলিতে শহীদ হন। ঘটনাটি ঘটে ৩১শে জুলাই। শ্রী অবণীমোহন দত্ত, চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের দর্শনের অধ্যাপক, অবরুদ্ধ অবস্থায় চট্টগ্রাম শহরে আটকা পড়ে গিয়েছিলন। পালান নি, বা পালিয়ে যেতে পারেন নি। বাসা থেকে তাঁকে ও তাঁর ভাইপোকে জল্লাদেরা ধরে নিয়ে যায়, আর ফিরতে পারেন নি। চিরতরের জন্য হারিয়ে গেছেন। শামসুদ্দিন আহমদ, ইঞ্জিনিয়ার, কাপ্তাই জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান কর্মকর্তা, সম্ভবতঃ জুলাই-আগস্ট মাসে বর্বর পাক সৈন্যের হাতে মৃত্যু বরণ করেন। জনাব শামসুল হক, চট্টগ্রামের এস,পি; স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রথম দিকে চট্টগ্রামে তাঁকে পাক সৈন্যেরা হত্যা করে। শ্রী খগেন্দ্রনাথ সিংহ, চট্টগ্রাম সিগনেট লাইব্রেরীর মালিক। এপ্রিল-মে মাসের দিকে তিনি পাক বাহিনীর ঘাতকদের হাতে মৃত্যু বরণ করেন। জনাব আবদুল খালেক, চট্টগ্রাম কোতোয়ালীর তরুণ ও,সি, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। ই,পি, আর বাহিনী পশ্চাদাপসরন করলে তিনি চাচার বাসায় আশ্রয় নেন গ্রামে। সেখান থেকে ১৬ই এপ্রিল ধরে নিয়ে এসে অত্যাচারের মাধ্যমে তাঁকে ২২শে এপ্রিল হত্যা করা হয়। শ্রী সুধাংসু ভট্টাচার্য; তরুণ সাংস্কৃতিক কর্মী, এপ্রিলের দিকে তাঁকে পাক বাহিনী ধরে নিয়ে যায়, আর কোন দিন ফিরে আসেন নি। শামসুল আবেদীন, চট্টগ্রাম হাবিব ব্যাংক শাখার একজন অফিসার; তাঁকেও ধরে নিয়ে গিয়েছিল পাক বাহিনীর সৈন্যরা এপ্রিল মে-মাসের দিকে। ফিরতে পারেন নি। ডাঃ শফি, দন্ত চিকিৎসক, মার্চ-এপ্রিলে পাক বাহিনীর জল্লাদেরা তাঁর জীবন প্রদীপ নির্বাপিত করে দেয় বন্দুকের গুলিতে।

অবরুদ্ধকালে কুমিল্লা শহরে যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি পাক-বাহিনীর হাতে নিহত হন তাদের মধ্যে সে সময় আমরা যাদের নাম সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম তাঁরা হলেনঃ

শ্রী বীরেন্দ্র নাথ দত্ত, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ; মার্চ মাসে তাঁকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। শ্রী অতীন্দ্র ভদ্র, শহরের বিশিষ্ট

আইন ব্যবসায়ী; একই সময়ে তাঁকেও ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে হত্যা করা হয়। শ্রী অসীম রায়; কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের ল্যাব শিক্ষক, প্রবীণ রাজনীতিবিদ অতীন রায়ের পুত্র; একই সময়ে পাক বাহিনীর হাতে ধৃত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। শোনা গিয়েছে কুমিল্লার তৎকালীন পুলিশ সুপার ও ডি,সি নিহত হন সে সময়ে।

অন্যান্য অঞ্চলে নিহত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গঃ অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের প্রধান, ১৬ই এপ্রিল তাঁকে সেনাবাহিনীর লোকজন ধরে নিয়ে যায়। আর ফিরে আসেননি। শ্রী সুখরঞ্জন সমাদ্দার, সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; ১৪ই এপ্রিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় স্বীয় বাসভবন থেকে তাঁকে চিরকালের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। জনাব মামুন মাহমুদ, ডি,আই,জি, রাজশাহী, ২৬শে মার্চ তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে পাক জল্লাদ বাহিনী তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। জনাব নজমুল হক সরকার, রাজশাহী বারের এ্যাড্‌ভোকেট, জিলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি, ২৫শে মার্চের পরে কোন এক সময় পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে নিহত হন। লেঃ কঃ মজুরুর রহমান, অধ্যক্ষ ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ; ১৮ই এপ্রিল তারিখে তাঁর কলেজের বাংলোর সামনে মাঠের মধ্যে তাঁকে বর্বর পাক বাহিনী হত্যা করে। জনাব হালিম খান, অধ্যাপক ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, একই তারিখে একই স্থানে এই অধ্যাপককেও হত্যা করা হয়। এ সময় একই সাথে কলেজের কয়েকজন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে হত্যা করা হয়। জনাব মাশুকুর রহমান, গণিতজ্ঞ, চট্টগ্রামে একটি বীমা কোম্পানীর পদস্থ অফিসার ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনকালে যশোরের বাড়ীতে চলে যান; মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে সশস্ত্র সংগ্রামে শহীদ হন। জনাব আবদুল জব্বার, বগুড়া শহরের এ্যাড্‌ভোকেট; ১৭ই মে তাঁকে পাক-হানাদার বাহিনী তাঁর গ্রামের বাড়ীতে হত্যা করে। ডাঃ জিকরুল হক, সৈয়দপুর শহরবাসী, সংস্কৃতিবান, আওয়ামী লীগ সদস্য; এপ্রিল মাসে তাঁকে আরও কয়েকজন সহকর্মীর সাথে পাক হানাদার বাহিনী সৈয়দপুর সেনানিবাসে বন্দী করে রাখে, ১২ই এপ্রিল এদের সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। লেঃ মোহাম্মদ আনোয়ারুল আজীম, উত্তরবঙ্গ গোপালপুর সুগার মিলের প্রশাসক; ৫ই মে, ঐ মিলে ত্রিশতাধিক শ্রমিক ও কয়েকজন অফিসার সহ তাঁকেও পাক বাহিনীর বর্বর সদস্যরা হত্যা করে। ডাঃ শামসুদ্দিন, সিলেট মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসর; ৯ই এপ্রিল আরও কয়েকজন হাসপাতাল কর্মীর সাথে তাঁকে পাক-বাহিনীর ঘাতকরা হত্যা করে। এদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ শ্যামলকান্তি লালা। ডাঃ লেঃ কঃ জিয়াউর রহমান, সিলেট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, জুলাই মাসের শেষ দিকে পাক-হানাদার বাহিনী তাঁকে তার বাসভবন থেকে ধরে নিয়ে যায়, আর ফিরে আসেননি। ডাঃ লেঃ কঃ নুরুল

ব্যবসায় মোঃ জাহাঙ্গীর ; ৩০শে মার্চ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বাসা থেকে তাঁকে ধরে নিয়ে যায় পাক সৈন্যরা, আর ফিরে আসেননি। খুব সম্ভব তাঁকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে হত্যা করা হয়। মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়া, রংপুর শহরবাসী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের সদস্য ; ৩০শে মে আরও কয়েকজন পারিবারিক সদস্যদের সাথে তিনি পাক-বাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন। এছাড়া এপ্রিল মাসে শহরের ১১জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে একত্রে বেঁধে হত্যা করে নরপিশাচেরা। জনাব মশিউর রহমান, যশোরের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ; ৪ঠা এপ্রিল তিনি পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। বেশকিছুদিন তাঁকে যশোর ক্যান্টনমেন্টে অমানুষিক অত্যাচারের পর সম্ভবতঃ ২৮/২৯শে এপ্রিল নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। যশোর শহরের পলিটেকনিক স্কুলের প্রিন্সিপালকে ৬/৭ই এপ্রিল হত্যাকরে। একই সাথে তার বন্ধু ডঃ ওবাইদুল হককেও গুলিকরে মারে পাক জল্লাদেরা। জেলা জজ সাহেবের নাজির ; তাঁকে একই সময়ে পথিমধ্যে পাক বাহিনীর সৈন্যরা হত্যা করে। জনাব আহসানুল্লাহ, খেজুরা গ্রাম, সম্ভ্রান্ত কৃষক, এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ঐগ্রামে প্রবেশ পরে পাক সৈন্যরা সস্ত্রীক আহসানুল্লাহকে হত্যা করে এবং তার বাড়ী লুঠ করে। যশোরের কসবা এলাকায় পোস্টাল সুপারিনটেণ্ডেন্টের পুত্র সহ সাত জনকে একই সাথে গুলি করে মারে পাক সৈন্যরা এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে। জনাব এ, করিম, সাব ইন্সপেক্টর অব পুলিশ, যশোর ; এপ্রিল মাসে তাকে কোর্টের সামনে গুলি করে হত্যা করা হয়। একই সময়ে জনৈক বৃদ্ধ উকিলকেও নিহত করে পাক সেনারা। বসন্ত কুমার দাস, সাবজজ, যশোর; ১লা মে তারিখে আরও ১১ জন ব্যক্তির সাথে পাক বাহিনীর জনৈক ক্যাপ্টেন তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। এছাড়া যশোর শহরের আরও ১৭ জন বিশিষ্ট নাগরিককে হত্যা করে এপ্রিল-মে মাসের মধ্যে। জনাব আহসান আলী, জামালপুরবাসী, ন্যাপ নেতা ও সাংবাদিক; ২৮শে জুলাই পাক বাহিনীর কুখ্যাত অনুচর আলবদরের হাতে তিনি নির্মমভাবে নিহত হন। অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসেন, বাগেরহাট পি,সি, কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক ; মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ২৮শে অক্টোবর নিহত হন পাক-বাহিনীর অনুচরদের গুলিতে। অধ্যাপক ফজলুল হক, গণিতের অধ্যাপক, রাজশাহী সরকারী মহাবিদ্যালয়; ২৫শে এপ্রিল তাঁর নওগার বাসভবনে পাক হানাদার বাহিনীর হাতে মৃত্যুবরণ করেন। জল্লাদেরা একই সাথে তাঁর মা, বোন ও ভাইকে নির্মমভাবে হত্যা করে। জনাব আবদুল কাইয়ুম, মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; নভেম্বর মাসে তাঁকে পাক-হানাদার বাহিনীর নরপশুরা বাসা থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, দর্শনের অধ্যাপক, কুষ্টিয়া কলেজ ; ২৮শে জুন তারিখে তাঁকে পাকিস্তানী সৈন্যরা গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। আর কোনদিন ফিরে আসেননি। জনাব মহসীন আলী দেওয়ান, বগুড়া-শেরপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ; ৩রা জুন বগুড়ার

বাসভবন থেকে বর্বর পাক সেনারা তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় আর ফেরেননি। শ্রী সুমঙ্গল কুণ্ডু, দিনাজপুর বারের এডভোকেট, ৯/১০ই এপ্রিল দিনাজপুর শহরে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিকের সাথে তাঁকে পাক বাহিনীর অনুচরেরা নির্মমভাবে হত্যা করে। এছাড়া দিনাজপুর শহরের আশেপাশে অনেক গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং অসংখ্য নারী পুরুষকে মেশিনগানের গুলিতে সারিবদ্ধভাবে হত্যা করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশের সর্বত্র হাজার হাজার লোক ঐ সময় পাকিস্তানী বর্বর সেনাবাহিনীর গুলির শিকার হয়েছেন, বহু নারী নির্যাতিতা ও ধর্ষিতা হয়েছেন' এই হিসাব হয়তো আর কোন দিনই পাওয়া যাবেনা।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির কর্ম তৎপরতা ঃ "বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি" একাত্তরের মে মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং এ সর্বস্তরের দেশত্যাগী শিক্ষকদের সমাবেশে গঠিত হয়। সে সভায় একটি কার্যকরী সংসদও নির্বাচিত হয়। সভাপতি ঃ ডঃ এ আর মল্লিক, উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। কার্যকরী সভাপতি ঃ জনাব কামরুজ্জামান, ঢাকা জুবিলি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং সংসদ সদস্য। সহ সভাপতি ঃ ডঃ ফারুক খলিল, অধ্যাপক গণিত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ও অধ্যক্ষ দেওয়ান আহমেদ। সম্পাদকঃ ডঃ আনিসুজ্জামান, রীডার বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। পরে জুলাই মাস থেকে—ডঃ অজয় রায়, রীডার, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সহ সম্পাদক ঃ জনাব গোলাম মুর্শিদ, শ্রী রাম বিহারী ঘোষ ও জনাব এস, এম আনোয়ারুজ্জামান। কোষাধ্যক্ষ: ডঃ খান সারওয়ার মুর্শেদ, অধ্যাপক ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সদস্য ১২ জন।

এই সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল : (১) মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক শক্তি হিসেবে সর্বস্তরের শিক্ষক সমাজকে সংগঠিত করা এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যে নিয়োজিত করা। (২) ভারতবর্ষ সহ দেশবিদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা। (৩) মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ সম্পর্কিত তথ্যমূলক রচনা, পুস্তকাদি প্রকাশ করা ও অন্য সংগঠনকে প্রকাশ করতে সহায়তা করা। (৪) শরণার্থী শিক্ষকদের অস্থায়ীভাবে পুনর্বাসনের চেষ্টা ও সম্ভাব্য আর্থিক অনুদান প্রদান। (৫) প্রয়োজনে মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সহায়তা দান, এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনীয় বেসামরিক উপকরণ সংগ্রহ ও বিভিন্ন রণাঙ্গণে প্রেরণ করা। (৬) প্রচারণা ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে সহায়তা করা।

ইতিপূর্বে এপ্রিল মাসে 'কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি' কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের উদ্যোগে গঠিত হয়। এই সমিতির প্রধান কর্মকর্তারা ছিলেন : সভাপতি : অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ, উপাচার্য, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কার্যকরী সভাপতি : অধ্যাপক পি কে, বোস, উপ-উপা-

চার্য (একাডেমিক) কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কোষাধ্যক্ষঃ শ্রী এইচ, এম, মজুমদার, উপ-উপাচার্য (অর্থ সংক্রান্ত), কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সম্পাদক: অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী, অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ, সিটি কলেজ, কোলকাতা। এখানে উল্লেখ্য যে, এই দুই সহযোগী প্রতিষ্ঠান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একত্রে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করে যায়। প্রায় একই সাথে সকল স্তরের বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন "বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল অব ইন্টেলিজেন্টশিয়া" গড়ে তোলা হয়। এর সভাপতি ছিলেন ডঃ খান সারওয়ার মুর্শেদ, সম্পাদক ও সহ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে চলচ্চিত্র পরিচালক জহির রায়হান ও ডঃ বেলায়েত হোসেন। এখানে উল্লেখ্য যে, এই সংগঠনের প্রযোজনায় জহির রায়হান "Stop Genocide" ছবিটি নির্মাণ করেন। তরুণ লেখক ও সংস্কৃতিসেবীদের উদ্যোগে গঠিত হয় "বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সংগ্রাম শিবির"—এর সভাপতি ডঃ অজয় রায়, সম্পাদক আহমদ ছফা। এছাড়া চিত্রশিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী, অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস প্রমুখ অনেকেই এর সাথে যুক্ত ছিলেন। এই সংগঠন মূলত: কাজ করেছে—যেসব স্থানে শরণার্থীরা আশ্রয় নিয়েছেন তাদের সাথে স্থানীয় জনগণের শান্তি, সম্প্রীতি ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য বজায় রাখার লক্ষ্যে, তারা নানাস্থানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা প্রচার করত। এছাড়া গঠিত হয় 'সাংবাদিক সমিতি' 'চলচ্চিত্র শিল্পী ও কুশলী সমিতি' 'বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার্স কোর' প্রভৃতি।

শিক্ষক সমিতি গঠিত হওয়ার সাথে সাথেই সমিতির প্রতিনিধিরা শরণার্থী শিবির সমূহে ঘুরে এবং ঘোষণার মাধ্যমে শরণার্থী শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ করতে থাকে। যারা সমিতির সাথে যোগাযোগ করেছেন এবং তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন এদের মধ্যেঃ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ৬৫০; কলেজ শিক্ষক ১০৫০; স্কুল শিক্ষক ৫০০০। সমিতি গঠিত হওয়ার সাথে সাথেই দুটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সরকার ও ভারতীয় প্রধান মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে। ভারতীয় প্রধান মন্ত্রীর সাক্ষাৎ কামনা করে সমিতির সভাপতি প্রধান মন্ত্রীকে একটি চিঠি প্রেরণ করেন।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতকারী প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেনঃ বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির পক্ষে ডঃ এ আর মল্লিক ও ডঃ আনিসুজ্জামান; আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির পক্ষে ডঃ অনিরুদ্ধ রায়, অধ্যাপক অনিল সরকার, সৌরিন্দ্র ভট্টাচার্য ও বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী। প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দিনের সাথে যে প্রতিনিধি দলটি সাক্ষাৎ করেন এতে ছিলেন: ডঃ এ আর মল্লিক, ডঃ আনিসুজ্জামান ও জনাব কামরুজ্জামান।

বিশ্বব্যাপী শিক্ষকদের সহযোগিতা কামনা করে সমিতি একটি ছাপানো আবেদনপত্র বিভিন্ন দেশের শিক্ষকদের ও শিক্ষক সংগঠনের কাছে প্রেরণ করে। আবেদনটি ছিল নিম্নরূপ:

BANGLADESH SIKSHAK SAMITI
(Bangladesh Teachers Association)
Darbhanga Building, Calcutta University, Calacutta-12, India

July 1, 1971.

Dear Friend,

Perhaps you are aware that in the face of unparallaled atrocities committed by the Pakistan Army on the people of East Pakistan, now Bangladesh, a large number of teachers of all levels has crossed into India. Since the communities of teachers had played a significant role for over two decades in the movement for democracy, secularism and a just social order in the country, its members became naturally enough a special target of the Pakistan Army. Many teachers have been killed, others who are trapped in the occupied zones are being harassed and persecuted, a few have been forced at gun point to issue statements in support of the action of the Pakistan Army. As a result, members of this harassed community are treking into India everyday. The teachers from Bangladesh, now in temporary exile in India, have formed an association of their own, on whose behalf we are writing you today.

About 100 University teachers, 1000 College teachers, and 3000 school teachers have registered their names with us, Several thousand others in different bordering state of India are yet to make contact with the Association. Most of these teachers have come with their families and all are without any means to support themselves.

Having regard to the contribution that this community has made in the past and their expectant role in the reconstruction of society as and when the country achieves freedom, it is felt that we make all efforts to save it from impending doom. We have drawn up a number of schemes for providing the teachers with temporary academic occupation—research Publication and teaching the evacuee children in the refugee camps. The execution of this programme will require financial assistance from non-Government sources, in addition to what the Government of India and the Government of Bangladesh may be in a position to make.

In the circumstances we appeal to you the members of the academic community the world over to contribute generously to the funds of our association. Contributions may be sent to the Bangladesh Sikshak Samiti, Darbhanga Building, Calcutta University, Calcutta 12, India.

Sincerely yours,
Dr A R Mallik
Vice-chancellor,
University of Chittagong
&
Bangladesh Sikshak Samiti.

সমিতি বিভিন্ন সময়ে ভারতের নানাস্থানে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি ও সহায়তা কামনায় বিভিন্ন প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ জুনমাসে প্রেরিত উত্তর ভারত প্রতিনিধিদল। ড: এ আর মল্লিক, ডঃ আনিসুজ্জামান ও জনাব সুবিদ আলী এম পিএ। এই দলটি এলাহাবাদ, আলিগড়, দিল্লী, আগ্রা ও লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি অঞ্চল সফর করে। জুলাই মাসে প্রেরিত মধ্যপ্রদেশ-প্রতিনিধিদল : মজহারুল হক, ড: অজয় রায়, অধ্যাপক সামসুল আলম সায়িদ। এঁরা জব্বলপুর, ভুপাল, উজ্জয়িনী, রেয়া, রায়পুর প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। সেপ্টেম্বর মাসে প্রেরিত মহারাষ্ট্র প্রতিনিদল : ডঃ এ, আর, মল্লিক ও অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহ্সান বম্বে সহ মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। এছাড়া ঐ মাসে অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম কেরালা ভ্রমণ করেন। এ ছাড়াও বাংলাদেশ সম্পর্কিত নানা সভা ও সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষক সমিতি প্রতিনিধি প্রেরণ করে। বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘে যে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন এতে সমিতির ড: এ আর মল্লিক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

শরণার্থী শিক্ষকদের অস্থায়ী পুনর্বাসনের জন্য সমিতি কিছু প্রকল্প গ্রহণ করে ঃ

(১) শরণার্থী শিবির সমূহে ক্যাম্প স্কুল স্থাপন ঃ আগরতলাসহ মেঘালয়, আসাম ও পশ্চিম বংগের সমগ্র সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত শরণার্থী শিবির সমূহে সমিতি বেশ কিছু ক্যাম্প স্কুল স্থাপন করে এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্কুল ও কলেজ শিক্ষকের অস্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়। এই প্রকল্পের পরিচালক ছিলেন জনাব কামরুজ্জামান। এছাড়া প্রতি এলাকায় একজন করে উপ-পরিচালকও ছিলেন। সার্বিক দায়িত্ব ও সমন্বয় সাধনের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি ছিল যার সদস্য ছিলেন : ডঃ অজয় রায়, জনাব নুর মোহাম্মদ মিঞা এবং শ্রীমতী সুচন্দ্রিমা রায়।

(২) যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প : এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল উদ্বাস্তুদের সমস্যা সংক্রান্ত তথ্য আহরণ ও যুদ্ধশেষে উদ্বাস্তুদের ত্বরিত পুনর্বাসনে সহায়তা দানের জন্য কর্মপন্থা নির্ধারণ। এই প্রকল্পের পরিচালক ছিলেন প্রফেসর মোশাররফ হোসেন।

(৩) উদ্বাস্তু ও যুবশিবির সমূহে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতিময়তা (Socio-Cultural Dynamics) : এর পরিচালক ছিলেন ড: এ আর মল্লিক এবং উপ-পরিচালক ছিলেন শ্রী অনুপম সেন।

(৪) বাংলাদেশে স্কুল ও কলেজ স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষাদান সমস্যা ঃ পরিচালক ছিলেন ড: অজয় রায়।

(৫) উদ্বাস্তু শিবির সমূহ থেকে লোকসাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ : পরিচালক ড: মযহারুল ইসলাম।

বাংলাদেশ সরকারের প্লানিং সেলের সহযোগিতায় এই সব প্রকল্প তৈরী করা হয়। এই সব প্রকল্পের মধ্য দিয়ে সমিতি বিপুল সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুল শিক্ষকদের অস্থায়ীভাবে পুনর্বাসন করতে সক্ষম হয়। আমাদের এই সব কর্মসূচীতে আর্থিক ও উপকরণ দিয়ে সহযোগিতা করেছিল : ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি (IRC) যার স্থানীয় প্রতিনিধি ছিলেন শ্রী তরুণ মিত্র, শ্রী জয় প্রকাশ নারায়ণ, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি, পশ্চিম বংগ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, মধ্য প্রদেশের বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি সার্ভিসের ভারতীয় জাতীয় শাখা।

এতদ্ব্যতীত সমিতি ভারতবর্ষে ও বিদেশে কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষককে অস্থায়ীভাবে নিযুক্তিতে সহায়তা করে। সমিতি মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনায় বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা দানের জন্য বেশকিছু স্কুল ও কলেজের শিক্ষকের নাম সরকারের কাছে প্রেরণ করে। এদের অনেকেই মুক্তাঞ্চলে গিয়ে প্রশাসনিক কার্যে অংশ গ্রহণ করেছিল।

দেশ বিদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি ও বাংলাদেশ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সমিতি কতিপয় প্রকাশনা বের করে এবং অন্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশনার ব্যাপারে তথ্য সরবরাহ করে। এই সব প্রকাশনায় বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় অংশ গ্রহণ করে। কতিপয় প্রকাশনার নাম এখানে উল্লেখিত হল।

(১) Bangladesh : A Reality, (২) Report On Bangladesh, (৩) মুক্তি-যোদ্ধাদের প্রতি। এই তিনটি বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত। (৪) Bangladesh—The Truth (৫) Conflict in East Pakistan (৬) মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ (৭) আমাদের বাঁচার দাবী ৬ দফা কর্মসূচী—শেখ মুজিবুর রহমান (৮) Bangladesh-Throes Of A New Life (৯) Pakistanism and Bengali Culture (১০) Bangladesh—Through the lens (১১) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (১২) Bleeding Bangladesh। এই ক'টি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি প্রাকাশিত। (১৩) Bangladesh : The Background, পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত, (১৪) রক্তাক্ত বাংলা, মুক্তধারা (স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ) কর্তৃক প্রকাশিত; (১৫) জাগ্রত বাংলাদেশ---আহমদ ছফা, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সংগ্রাম শিবিরের উদ্যোগে মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত; (১৬) এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম---গাজিউল হক, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং কোলকাতা, প্রকাশিত। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে সমিতি বাংলাদেশ সম্পর্কিত তথ্য ও মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতি ও গণহত্যা সম্পর্কিত প্রতিবেদন বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সংবাদ পত্র ইত্যাদিতে প্রেরণ করে। আমাদের এই কর্মতৎপরতার ফলে বিশ্বব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে উঠে।...

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির সক্রিয় সহযোগিতা ও উদ্যোগে আমরা কতিপয় প্রতিনিধিদল বিদেশেও প্রেরণ করি বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন পাওয়ার উদ্দেশ্যে। এই দুই সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত শিবনাথ ব্যানার্জী (১৯২২ সালে কাবুলে 'মকতব-ই-হাবিবিয়ার' শিক্ষক ছিলেন) আফগানিস্তান গমন করেন '৭১ এর অক্টোবর মাসে। তিনি সেখানে বাদশা খান ও তদীয় পুত্র ন্যাপ নেতা ওয়ালী খানের সাথে, আফগান পার্লামেন্টের সদস্যদের সাথে, বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠির নেতৃবৃন্দের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনায় মিলিত হন এবং বাংলাদেশের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন লাভে চেষ্টা করেন। এছাড়া তিনি কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সাথে আলোচনায় বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য ও মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা ও চিত্র তুলে ধরেন। এই দুই সমিতির পক্ষ থেকে শ্রী বংশীভাই মেহতা ও শ্রীমতী সুশীলা মেহতা ইউরোপ, এবং অন্য একজন প্রতিনিধি শ্রী পুর্নেন্দু নারায়ণ রায় ইউরোপ-আমেরিকা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রচারণার কাজে পরিভ্রমণ করেন। এছাড়া কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউরোপীয় ভাষাসমূহের বিভাগের প্রধান ফাদার পি ফার্লো (P. Fallon) আমাদের দুই সমিতির পক্ষ থেকে জুন মাসে ভ্যাটিকান শহরে মহামান্য পোপের সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের সাবিক পরিস্থিতি সম্পর্কে পোপকে জ্ঞাত করান এবং আমাদের সমর্থনে বক্তব্য তুলে ধরেন; পরে তিনি একই উদ্দেশ্যে ইউরোপের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেন।

সমিতি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য, পুস্তক, দলিল ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য 'বাংলাদেশ আর্কাইভস্ কমিটি' গঠন করে। এর পরিচালক ছিলেন অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহ্সান। এছাড়া কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির উদ্যোগে ও সহযোগিতায় আমরা 'বাংলাদেশ তথ্য ব্যাঙ্ক' গঠন করি। এই ব্যাঙ্ক দেশী বিদেশী দৈনিক পত্রিকা, জার্নাল প্রভৃতি থেকে বাংলাদেশ মক্তিযুদ্ধ ও আনুসংগিক তথ্য সংগ্রহ করার কাজে ব্যস্ত থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ জন ছাত্র-ছাত্রীকে এই কার্যে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন জনাব জামিল চৌধুরী। পরে ডঃ এ, আর মজুমদারকে এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই প্রকল্পে আমরা প্রবীণ ভারতীয় সাংবাদিক শ্রী দুর্গাদাস তরফদার এবং শ্রী রামরায়ের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পাই। যুদ্ধশেষে ব্যাঙ্ক সংগৃহীত সমগ্র তথ্যাবলী ঢাকা যাদুঘরকে হস্তান্তর করা হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশ আর্কাইভ্স সংগৃহীত কাগজ পত্রাদি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

অন্যান্য সহযোগী সহায়ক সংগঠনের সহায়তায় আমরা মুক্তিযুদ্ধে তিন প্রকার সহায়তা দানের চেষ্টা করি।

(১) সীমিত সাধ্যে কিছু কিছু মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক অনুদান। (২) মুক্তিযুদ্ধে প্রয়োজনীয় বেসামরিক উপকরণ যেমন কম্বল, শীতবস্ত্র, পোষাক, জুতা ইত্যাদি সংগ্রহ ও বিভিন্ন রণাঙ্গণে মুক্তিযোদ্ধা যুবশিবিরসমূহে প্রেরণের ব্যবস্থা। (৩) যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনীয় জীবন রক্ষাকারী ঔষধপত্র ও চিকিৎসা সামগ্রী সংগ্রহ ও বিভিন্ন রণাঙ্গণে প্রেরণ। এ ব্যাপারে আমরা 'বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার্স কোর'-এর সাথে একসঙ্গে কাজ করেছি। এ প্রসঙ্গে ঐ সংগঠনের পরিচালক জনাব আমিরুল ইসলাম ও উপ-পরিচালক জনাব মামুনুর রশীদের কর্মতৎপরতার কথা স্মরণযোগ্য।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির উদ্যোগে গঠিত 'মেডিক্যাল ইউনিট' এ ব্যাপারে আমাদের সর্বাধিক সহায়তা করে। শ্রীমতী মৃন্ময়ী বোসের নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত এই ইউনিট ভারতীয় রেড ক্রসের সহযোগিতায় এবং শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অব্যাহতভাবে ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। শিক্ষক সমিতির পক্ষে এই প্রচেষ্টায় নিরলসভাবে কাজ করেন বেশ কিছু সদস্য—এদের মধ্যে নিত্যগোপাল সাহা, সুকুমার বিশ্বাস, ইমরুল কায়সার প্রভৃতির নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে।

সমিতি গোপনে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টাতেও সহযোগিতা করেছে। যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যাপক লতিফ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সহায়ক সমিতি যে অর্থ সংগ্রহ করে তা অস্ত্র সংগ্রহের কার্যে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে। এই উদ্দেশ্যে ঐ সংগঠনের একজন প্রতিনিধি কোলকাতায় আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। আমরা মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধির সাথে তার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেই এবং স্থির হয় যে, বাংলাদেশ সরকারের আমেরিকায় প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ করে এ ব্যাপারে সঠিক কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি সহায়তা প্রদানের জন্য ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির ভারতীয় জাতীয় কমিটির কার্যকরী সম্পাদক শ্রী ভি, এন, থিয়াগ রাজন আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি ও মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমরা তার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেই। তিনি এ ব্যাপারে সর্বাত্মক ও কার্যকরী সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন।

উপরিল্লিখিত কর্মতৎপরতা ও প্রচেষ্টায় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতি ছাড়াও—পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ সংগ্রাম সহায়ক সমিতি, ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি ফর বাংলাদেশ, শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু পরিচালিত বাংলাদেশ এইড্ কমিটি আমাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে।

শিবির কর্মাধক্ষ্যদের অনুরোধে শিক্ষক সমিতি মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু স্কুল ও কলেজের শিক্ষককে আমরা প্রেরণ করি। নিযুক্ত

শিক্ষকগণ নিষ্ঠার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া মাঝে মাঝেই সমিতির প্রতিনিধিরা বিভিন্ন রণাঙ্গণ পরিদর্শন করে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের কাজও করেছেন। এ ব্যাপারে অধ্যাপক আবদুল হাকিমের নাম শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ্য। আমি নিজেও সমিতির সম্পাদক হিসেবে সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত মুক্তিযোদ্ধা শিবির পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ করেছি। একদিনের ঘটনা আমার বেশ মনে পড়ে। শিবিরটি ছিল মুর্শিদাবাদের লালগোলা সীমান্তে। আমারা ক'জন কিছু ঔষধ ও অন্যান্য বেসামরিক উপকরণ সরবরাহ করতে গিয়েছিলাম। দিনটি ছিল ২২শে নভেম্বর। শিবিরে শোকের ছায়া। রাজশাহীর নবাবগঞ্জ থেকে তিন মাইল দূরে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। আমরা হারিয়েছি ৭ জন মুক্তিযোদ্ধাকে---আর আমাদের বাহিনী ২৫টি বাঙ্কার ধ্বংস করেছে ও অসংখ্য পাক সৈন্যকে হত্যা করেছে, আর ১২জন রাজাকারকে ধরা হয়েছে। বন্দী রাজাকারদের দেখলাম। এর দিন কয়েক আগে নায়েক কাসেম শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান সহ দু'জন রাজাকারকে গ্রেফতার করে। ক্যাপ্টেন গিয়াস এই সেক্টরে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। নায়েক কাসেম ঐদিন বাঙ্কারে অবস্থিত পাক বাহিনীর একজন মেজর ও ক্যাপ্টেনকে ধরতে গিয়ে নিহত হন। এছাড়া ঐ দিনের যুদ্ধে আমাদের পক্ষে আর যারা শাহাদৎ বরণ করেছিলেন তাঁরা হলেন—মোহর আলী (ইপি আর), নিযামউদ্দিন (ইপিআর), জিল্লুর রহমান (মুজাহিদ), আবদুল হক (ছাত্র) এবং আরও দু'জন ছাত্র। বেশ ক'জন আহত হয়েছেন। আমরা আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করলাম। একজন ছাড়া আর কারও মৃতদেহ নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। আমরা অভিবাদন জানালাম সেই বীর শহীদদের।

মনস্তাত্বিক যুদ্ধ ও প্রচারণা কাজেও সমিতির সদস্যগণ বাংলাদেশ সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে। ড: বেলায়েত হোসেন একাজের সাংগঠনিক দিকের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।

সরাসরি মুক্তিযুদ্ধেও বেশ কিছু শিক্ষক যোগ দিয়েছিলেন। সে সময় আমরা যাদের নাম সংগ্রহ করেছিলাম তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম মনে পড়ছে। অধ্যাপক আবদুল মান্নান (কমার্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), আবুল কালাম আজাদ (সমাজ বিজ্ঞান, ঢা, বি), গৌরাঙ্গ মিত্র (নটরডাম কলেজ), নূরুন্নবী (ফার্মেসী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) মোয়াজ্জেম হোসেন (বাগেরহাট কলেজ), আবু বকর সিদ্দিকী (আয়ুব ক্যাডেট কলেজ, রাজশাহী) হামিদুল হক (কুটুয়া হাই স্কুল) এবং অধ্যাপক হান্নান প্রমুখ। এদের মধ্যে জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন ও জনাব আবু বকর সিদ্দিকী শাহাদৎ বরণ করেছিলেন আমরা সে সমস্ত সংবাদ পেয়েছিলাম।

মুক্তিযুদ্ধে ও সরকার পরিচালনায় সহায়তা দানের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্ল্যানিং সেল মুখ্যত: বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের

দ্বারাই পরিচালিত হয়। এই সেলের সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক)। অন্যান্য সদস্যরা হলেন: অধ্যাপক খান সারওয়ার মুর্শেদ (ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক মোশাররফ. হোসেন (অর্থনীতির অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), ডঃ আনিসুজ্জামান (বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়) ও ড: এস আর বোস। বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে আমি সেলের শিক্ষা-বিভাগের সাথে সংযুক্ত ছিলাম। আমাদের বিভাগের (Education and Social Service Division) অন্তর্ভুক্ত ছিল: (1) Formation of Education policy for Secular-democratic Socialist Bangladesh (2) Collection of data and views in connection with reform of the examination system (3) Preparation of a report on the problems of Primary and Secondary Education in Bangladesh (6) Preparation of a report on the problems of Scientific and Technical Education in Bangladesh (5) Estimating the damage caused to educational Institutions in Bangladesh and studying the Socio-Psychological Problems of educational restoration and rehabilitation (6) Studying the problems of demobilised freedom fighters, students, non-students and permanently disabled in the liberation war.

আগষ্ট মাসে পাকিস্তানের কারাগারে অবরুদ্ধ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচার প্রহসন সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথেই শিক্ষক সমিতি এবং বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল অব ইন্টেলিজেন্টশিয়া যৌথ উদ্যোগে কোলকাতায় এক জন-সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে (১৩ই আগষ্ট)। সেদিন শহরের বেশ কিছু অংশ প্রদক্ষিণ করে আমরা এই বিচার প্রহসন বন্ধ করার দাবীতে কোলকাতার সকল বিদেশী দূতাবাসে আমাদের স্মারকলিপি প্রদান করি। এর পর পরই পৃথিবীর নানা স্থানে শেখ মুজিবের বিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হতে থাকে এবং পাকিস্তানী সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ হতে থাকে বিশ্বের বিভিন্ন মহল থেকে।

আগষ্ট মাসে সিনেটর এড্‌ওয়ার্ড কেনেডী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা জানতে ও উদ্বাস্তুদের অবস্থা পরিদর্শনে এলে বাংলাদেশের বুদ্ধি-জীবীদের ও শিক্ষকদের পক্ষ থেকে ড: এ আর মল্লিকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি-দল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে। এই স্মারকলিপিতে বাংলাদেশের অবস্থা জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ও সরকারের সমর্থন কামনা করা হয়। এই স্মারকলিপির একটি প্রতিলিপি আমরা যুক্ত-রাষ্ট্রের দূতাবাসের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে প্রেরণ করি।

সেপ্টেম্বর মাসে তদানীন্তন ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিম বংগের সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত শরণার্থী শিবিরসমূহ পরিদর্শনে এলে আমরা পুনরায় তাঁর সাথে সাক্ষাত করি এবং বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দানের

জন্য আহবান জানাই। শ্রীমতী গান্ধী আমাদের আশ্বাস দেন যে তা যথাসময়েই করা হবে।

এছাড়া জুলাই-আগষ্ট মাসের দিকে ডঃ হেনরী কিসিঞ্জার দিল্লী আগমন করলে আমাদের প্রতিনিধি ডঃ মযহারুল হক দিল্লী গমন করে তাঁর সাক্ষাৎ কামনা করেন এবং আমাদের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বাংলাদেশ নীতি পরিবর্তনের দাবীতে একটি স্মারকলিপি তাঁকে প্রদান করেন।

এতদসত্ত্বেও আমেরিকান সরকারের বাংলাদেশ বিরোধী নীতি অব্যাহত থাকে এবং পাকিস্তান সরকারকে নানাভাবে সহায়তা দান চলতে থাকে। এই নীতির প্রতিবাদে সমিতির পক্ষ থেকে আমরা পুনরায় কোলকাতায় যুক্তরাষ্ট্রীয় কনসাল জেনারেলের মাধ্যমে নিকসন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

নয়মাসব্যাপী যুদ্ধকালে বিভিন্ন শ্রেণীর বহু পরিদর্শক আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং নানাভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রাণিত করেছেন :

আন্তর্জাতিক উদ্ধার কমিটি (International Rescue Committee) : জুনমাসে এই কমিটির পক্ষে অ্যাম্বেস্যাডার অ্যাঞ্জিয়ার বিড্‌ল ডিউক (Ambassador Angier Biddle Duke), মর্টন হামবুর্গ (Morton Hamburg, General Counsel—IRC) মিসেস লী থ (Mrs. Lee Thaw -Director, IRC), ডঃ দানিয়েল এল, ওয়াডনার (Dr. Daniel L. Wadner---Prof. of Surgery, Albert Einst College of Medicine N. Y), এবং মিঃ টমাস ডব্লিউ ফিপ্‌স (Mr. Thomas W. Phipps--an author) আমাদের সাথে আলোচনায় মিলিত হন। IRC আমাদের বিভিন্ন প্রকল্পে বিশেষ করে ক্যাম্প-স্কুল প্রকল্পে সহায়তা দানে সম্মত হয়।

জাপানে গঠিত 'বাংলাদেশ সলিডারিটি ফ্রন্ট'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সেৎসুরে সুরুসিমা (Setsure Tsurushima), 'জাপান-বাংলাদেশ ফ্রেণ্ডশীপ অ্যাসোসিয়েশন' এর কার্যকরী সংসদের একজন সদস্য মিঃ টি, সুশুকি (T. Susuki), এবং মিঃ তেমিসুকা (Temisuka---a TV. Cameraman) আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত করান হয়।

ইতিহাসবিদ অধ্যাপক এ, এল, বাসাম (অষ্ট্রেলিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি) জুনমাসের দিকে আমাদের সাথে আলোচনায় মিলিত হন এবং আমাদের সমস্যা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করান হয়। তিনি অষ্ট্রেলিয়ায় আমাদের হয়ে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন।

'ওয়ার্লড্ কাউন্সিল অব ওয়ার্লড্ ফেডারেলিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভাপতি অধ্যাপক ন্যুড নেইলসন (Knud Neilson) এবং WSCE, (Geneva)-এর মিঃ জ্যাক ল্যাকশির্ক (Jack Laksirch) সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে আমাদের সাথে এক আলোচনায় মিলিত হন। তাঁদেরকে কয়েকটি শরণার্থী শিবির ঘুরিয়ে দেখান হয়।

স্ক্যাণ্ডেনেভীয় দেশগুলির কয়েকজন সাংবাদিক এস এ নেলসন (ষ্টকহোম), এ এম স্কিপার (A. M. Skipper--Denmark), ভি এস বি বলকার্ট (V. S. B. Balkert -Denmark), এম, আই, ওজহা (M. I. Ojha---Sweden) আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সার্বিক পরিস্থিতি জানতে চান। তাঁরা মুক্তাঞ্চল পরিদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁদের মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়া হয়।

নভেম্বর মাসের ৩০ তারিখে নিউজিল্যান্ড ইয়ুথ ইন্টারন্যাশনাল কমিটির সম্পাদক ও সহসভাপতি যথাক্রমে অ্যালভিন এফ, আর্নল্ড (Alvin F. Arnold) ও ট্রেভন জে, ওয়াল্টন (Trevon J. Walton) আমাদের সাথে দেখা করেন এবং মুক্তি-যুদ্ধে তাঁদের একাত্মতা প্রকাশ করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোয় গঠিত Friends of the Bangladesh Movement এর পক্ষ থেকে মিসেস এভেলিন চৈৎকিন (Evelyn Chaitkin) কোলকাতায় এলে তাঁকে আমাদের বিভিন্ন ক্যাম্পস্কুল ঘুরিয়ে দেখান হয়। তিনি এই প্রকল্পে আমা-দের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

সুদীর্ঘ নয়মাসব্যাপী যুদ্ধে বহু সহায়ক সংগঠন আমাদের সাথে নানাভাবে সহযোগিতা করেছে—তাদের সকলের নাম লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও তার ভূমিকার কথা আজ সবারই জানা। শরণার্থী প্রায় সকল শিল্পীই এই কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছেন। বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষকরাও এই কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করেছেন।

অবরুদ্ধ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে: নানা অসুবিধার মধ্যে থেকে এবং বিপদকে মাথায় নিয়ে বুদ্ধিজীবীরা নানাভাবে দেশের অভ্যন্তরেও প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন। বিভিন্নভাবে গেরিলা ইউনিটের সহায়তায় আমরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছি ও তথ্য সংগ্রহ করি।

ঢাকায় ডঃ আজাদ ও অন্যান্যদের সাথে আমাদের যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। সংবাদ পাচ্ছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ ক'জন শিক্ষক প্রতিরোধ-আন্দোলনে যুক্ত রয়েছেন। শত বিপদের মধ্যেও তাঁরা একটি কাগজ গোপনে বের করছেন। নাম 'প্রতিরোধ'। ঢাকায় আমার আর একটি যোগাযোগ বিন্দু সুলতানা (ছদ্ম নাম)। তিনি আমাদের লণ্ডন যোগাযোগ বিন্দুর মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের খবর নিয়মিত পাঠাতেন। তাঁর প্রেরিত খবরে জানা গিয়েছিল ১লা জুলাই তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল শিক্ষককে যোগদান করতে বলা হলেও বেশকিছু শিক্ষক ঐ আদেশ উপেক্ষা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র উপস্থিতি খুব কম। তাঁর মাধ্যমে ও অন্য সূত্র থেকে তখন যে খবর আমরা পেয়েছিলাম: অনুপস্থিত শিক্ষকদের একটি তালিকায় মত শহীদ শিক্ষকদেরও অনুপস্থিত হিসেবে

দেখান হচ্ছে। ভারতে আশ্রয়প্রার্থী শিক্ষকদের তালিকার সাথে মিলিয়ে দেখা গেল বেশ ক'জন শিক্ষক দেশের অভ্যন্তরে আত্মগোপন করে আছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন : ডঃ আহমদ শরীফ, ড: মনিরুজ্জামান ও অধ্যাপক আকরাম হোসেন (বাংলা বিভাগ); শহীদুল হক মুন্সি ; অধ্যাপক নুরুন্নবী ও অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন।

নতুন উপাচার্য হয়েছেন ডঃ সাজ্জাদ হোসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রায় প্রতিদিনই চলছে গেরিলা অপারেশন। সাথে সাথে পাকিস্তানীদের অত্যাচার।

রশীদুল হাসান ও আহ্সানুল হক (ইংরেজী বিভাগ), সাদউদ্দিন আহমদ (সমাজবিজ্ঞান), ডঃ আবুল খায়ের (ইতিহাস), রফিকুল ইসলাম (বাংলা), আ ন ম শহীদুল্লাহ (গণিত)—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ'কজন শিক্ষক ও বেশ ক'জন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী করে রাখা হয়েছে। সরকারী পদস্থ অফিসারদের মধ্যে রয়েছেন লোকমান হোসেন (টেলিফোন বিভাগ), জনাব ইউসুফ (শিক্ষা বিভাগ)। বহু শিক্ষক ও ঢাকার বিশিষ্ট নাগরিককে পাকবাহিনীর অনুচরেরা প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে চিঠি প্রদান করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত কয়েকজন শিক্ষককে চাকুরী থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে : অধ্যাপক এ বি এম হাবিবুল্লাহ (ইসলামের ইতিহাস); অধ্যাপক মুহম্মদ এনামুল হক (অতিরিক্ত শিক্ষক বাংলা বিভাগ); ড: মুহম্মদ মনিরুজ্জামান (বাংলা বিভাগ)। আর নীচের কয়েকজন শিক্ষককে সাবধান করে দেয়া হয়েছে : অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ডঃ নিলীমা ইব্রাহীম (বাংলা); ড: সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (ইংরেজী)। এছাড়া ১লা জুলাই থেকে অনুপস্থিত সকল শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়েছে।

নভেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে তিনদিন তিনরাত্রি ধরে ঢাকার আশে পাশের গ্রামে বুড়িগঙ্গার ওপারে কামরাঙ্গীর চর, নান্দাইল, কামার খাঁ, রুহিলা, বইৎপুর প্রভৃতি এলাকায় অংসখ্য নরনারী, শিশু ও বৃদ্ধকে হত্যা করা হয়। হত্যাকাণ্ডে অংশ নেয় পাক সৈন্যরা ও তাদের অনুচর রাজাকার বাহিনী। সাথে সাথে চলে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ। সংবাদদাতার মতে প্রায় হাজার খানেক নরনারীকে হত্যা করা হয়েছে।

খবর পাওয়া গেল ঢাকা বাসীরা বিশেষ করে নিম্ন আয়ের জনগণ পশ্চিমপাকিস্তানী দ্রব্য বর্জন করেছে, ঢাকার 'জয়বাংলা বাজার' বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেছে।

অন্যান্য অঞ্চল থেকে খবর :---আমরা নিয়মিত ভাবে খবর পাচ্ছিলাম যে, টাংগাইল এলাকায় বিরাট মুক্তাঞ্চল গড়ে তুলেছে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গরি-

চালিত মুক্তিবাহিনী। আগস্টের শেষে খবর এল যে, এই বাহিনী সিরাজকান্দি ঘাটে একটি অস্ত্র জাহাজ দখল করেছে। আমরা জানতে পেরেছিলাম এই বাহিনীর সাথে অধ্যাপক নূরুন্নবী ছাড়াও আরও কয়েকজন অধ্যাপক সঙ্গে রয়েছেন। এরা হলেন কাগমারী কলেজের অধ্যাপক নূরুল আমীন ও অধ্যাপক রফিক আজাদ।

বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা খবর পাচ্ছিলাম সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর আবার নতুন করে অত্যাচার শুরু হয়েছে তথাকথিত সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরও। তথাকথিত ক্ষমা ঘোষণায় বিশ্বাস করে যে সব সংখ্যালঘু সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে তাদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। এছাড়া যেসব সংখ্যালঘু বিশিষ্ট নাগরিক পালিয়ে আসতে পারেনি তাদের ওপর নানাবিধ অত্যাচার করা হচ্ছে, তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হচ্ছে, জমিজমা-বাড়ীঘর দখল করা হচ্ছে, জোর করে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টাও চলছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর পাওয়া গেল যে নিম্নলিখিত কয়েকজন ব্যক্তি বাধ্য হয়েছেন সপরিবারে মুসলমান নাম গ্রহণ করতে :

শ্রী জয়ন্ত চক্রবর্তী, অধ্যাপক (পদার্থবিদ্যা), ময়মনসিংহ এ এম কলেজ, শ্রী রবীন্দ্র চক্রবর্তী, অধ্যাপক, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজ, ময়মনসিংহ, শ্রী পূর্ণ চন্দ্র দত্ত, প্রভাষক (মনস্তত্ত্ব), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রী সুখেন্দু সোম, অধ্যাপক (গণিত), বরিশাল কলেজ, শ্রী নিত্যগোপাল, অধ্যাপক (বাণিজ্য), নাসিরাবাদ কলেজ ময়মনসিংহ।

খবর এল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষক---জনাব মুজিবুর রহমান (গণিত) এবং জনাব সালেহ্ আহমেদ (সংখ্যাতত্ত্ব) কে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং মাসের পর মাস ধরে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালান হচ্ছে।

ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভূমিকা : ২৩শে এপ্রিল (১৯৭১) পর্যন্ত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উড়েছিল স্বাধীন বাংলার পতাকা। সেদিন হানাদার বাহিনী রুখতে ছাত্র ও সৈনিকদের সাথে এগিয়ে এসেছিলেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ। উপাচার্য ডঃ কাজী ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে তারা গড়ে তুলেছিলেন সংগ্রাম পরিষদ। এই পরিষদ একদিকে মেজর সফিউল্লাহর নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছে, অন্যদিকে অরক্ষিত অসহায় অবাঙ্গালী নাগরিকদের রক্ষার দায়িত্ব পালন করেছে। সেদিন এই প্রতিরোধ যুদ্ধে ছাত্র ছাড়াও যেসব শিক্ষক কর্মচারী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন : ডঃ শামসুল ইসলাম, ডঃ আব্দুল ওয়াদুদ, মোস্তফা হামিদ হোসেন, ডঃ আব্দুল লতিফ মিঞা, জনাব শামসুজ্জামান খান; আর কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন মোহাম্মদ হোসেন, শরিয়তউল্লাহ, চাঁন মিয়া, সৈয়দ নাজমুদ্দিন হোসেন। কিন্তু প্রতিরোধ

ভেঙে পড়ল—২৩শে এপ্রিল পাক বাহিনী প্রবেশ করল ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। হামাদার বাহিনী যে সব শিক্ষককে লাঞ্ছিত ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করেছিল তাঁরা হলেন : ১। উপাচার্য ডঃ কাজী ফজলুর রহমান ২। ডীন ডঃ শামসুল ইসলাম, ৩। ডঃ শামসুদ্দিন, ৪। জনাব আহম্মদ শফি, ৫। ডঃ আমির হোসেন তালুকদার ৬। ডঃ শফিকুর রহমান ৭। ডঃ মুস্তফা হামিদ হোসেন ৮। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক জনাব জাহিদুর রহিম, ৯। কর্মচারী জনাব জলিল ও মিঃ ডেভিড।

আর অধিকৃত আমলে যে সব শিক্ষক ও কর্মচারী জল্লাদ বাহিনীর হাতে সেদিন নিহত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন :

জনাব আশরাফুল ইসলাম ভূঁইয়া, শিক্ষক ; মুহাম্মদ আব্বাস আলী, ছাত্রাবাস কর্মচারী, মধুসূদন, মৎস্যবিভাগের কর্মচারী, মুহাম্মদ নুরুল হক, ছাত্রাবাস কর্মচারী, গাজী ওয়াহিদুজ্জামান, কর্মচারী, মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন ১৫ই নভেম্বর, মুহাম্মদ হাসান আলী, কীটতত্ত্ব বিভাগের ল্যাব অ্যাসিস্টেন্ট, গিয়াসউদ্দিন, ছাত্রাবাস কর্মচারী।

কিন্তু এতেও পেছপা হননি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ। গোপনে সহযোগিতা ও প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন অবরুদ্ধ এলাকা থেকে। এর ফলে চাকুরিচ্যুতির নির্দেশ আসে অনেক শিক্ষকের প্রতি। চাকুরিচ্যুত হন উপাচার্য স্বয়ং। শিক্ষকদের মধ্যে— : অধ্যাপক মোস্তফা হামিদ হোসেন (পদার্থবিদ্যা) জনাব আলী নেওয়াজ (বাংলা), জনাব শামসুজ্জামান খান (বাংলা) জনাব আবদুর রাজ্জাক (বাংলা), এ আর এম মাসুদ (পদার্থবিদ্যা), নূরুল ইসলাম নাজমী (ইংরেজী), আবদুল বাকী (উদ্ভিদ বিদ্যা), আবদুল হক (উদ্ভিদ বিদ্যা) আবদুল হালিম (কৃষি শিক্ষা), মুহাম্মদ হোসেন (পরীক্ষা সমূহের নিয়ন্ত্রক)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীদের গ্রেপ্তারের সংবাদে বিচলিত হয়ে পড়লাম। ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটির (IRC) স্থানীয় প্রতিনিধি শ্রী তরুণ মিত্র, আমেরিকান মহলের সাথে বেশ জানাশুনা তাঁর। তাঁর সাথে দেখা করে সহকর্মীদের নাম দিলাম। অনুরোধ করলাম আই আর সি-র কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ঢাকা কর্তৃপক্ষকে চাপ দিতে- অন্ততঃ তাদের জীবন যেন নিরাপদ থাকে। কথা দিলেন যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। মেসেজ ত্বরিত পাঠাবেন আই আর সি-র হেড অফিসে। তাছাড়া যোগাযোগ করবেন আমেরিকার দূতাবাসের সংগেও। সমিতির সম্পাদক হিসেবে বিভিন্ন দূতাবাসে ও বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে (জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল সহ) জরুরী বার্তা পাঠালাম।

জয়নুল আবেদীন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক, ঢাকা থেকে চলে এসেছেন। ওঁর কাছ থেকে ঢাকার বিস্তারিত খবর পাওয়া গেল। ঢাকায় গেরিলাদের

কর্মতৎপরতার কথা জানা গেল। খবর পাওয়া গেল মুনীর চৌধুরীর, অধ্যাপক হাবিবুল্লাহর, কবি শামসুর রহমানের, হাসান হাফিজুর রহমানের। তিনি আরও জানালেন--ঢাকার কয়েকজন বুদ্ধিজীবী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন সাহসিকতার সাথে।

ঢাকা থেকে আমার ছাত্র ও সহকর্মী ড: একরামুল ইসলামের কাছ থেকে বার্তা এসেছে। ও জামালপুরের একটি স্থানীয় গেরিলা ইউনিটের সাথে কাজ করছে। ঢাকা থেকে টাকা পয়সা ঔষধ পত্র সরবরাহ করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু অস্ত্রের বেশী প্রয়োজন। যথাস্থানে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দেয়া হল।

অবশেষে এল সেই দিন ৩রা ডিসেম্বর। সন্ধ্যে সাতটায় এলগিন রোডে নেতাজীভবনে সম্বর্ধনা সভা—উত্তর ইউরোপীয় কয়েকটি দেশের ডেমোক্রেটিক সোস্যালিস্টদের একটি প্রতিনিধিদলের আগমন উপলক্ষে। বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অবহিত করান হচ্ছে তাদের। হঠাৎ শিক্ষক সমিতির জনৈক কর্মী সভা থেকে আমাকে ডেকে নিয়ে এল। জানাল, পাকিস্তানী বিমান ভারতের গভীরে নানাস্থানে হামলা চালিয়েছে। আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিলাম সেদিন। আমাদের স্বাধীনতা আসন্ন। যুদ্ধ শুরু হল। ভারতীয় বাহিনী যোগ দিলেন আমাদের সাথে মিত্র বাহিনী রূপে।

তারপর সাফল্য আর সাফল্য। প্রতিদিনই পতন হতে লাগল বিভিন্ন শহর। ঐ স্বাধীনতা। ঢাকা আর কতদূর। যশোর মুক্ত। মুক্ত দিনাজপুর ঠাকুরগাঁও। মুক্ত জামালপুর ময়মনসিংহ। ঢাকা অবরুদ্ধ। মুক্তিবাহিনী ঢাকার উপকণ্ঠে। গেরিলারা অভ্যন্তরে। বিজয় আসন্ন।

কিন্তু এরই মধ্যে হৃদয় বিদারক খবর এল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১৩ই ডিসেম্বর পাকসৈন্য ও তাদের অনুচরেরা হত্যা করেছে ৪০ জন বিশিষ্ট নাগরিককে। বিচলিত হয়ে পড়লাম, আশঙ্কা করলাম হয়তো ঢাকাতেও অনুরূপ ঘটেছে বা ঘটতে চলছে। কোলকাতায় মিত্র বাহিনীর সদর দপ্তরের সাথে, বি এস এফ এর সাথে যোগাযোগ করে আবেদন জানালাম, যে করেই হোক, ঢাকাস্থ বুদ্ধিজীবীদের, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জীবন রক্ষা করতে হবে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ঘন ঘন আবেদন জানান হল--নাগরিকদের নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার। কিন্তু আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। স্বাধীনতার প্রাকমুহূর্তে আমরা হারালাম শ্রেষ্ঠ সন্তানদের ---চরম মূল্য দিতে হল স্বাধীনতার।

তবু এর মধ্য দিয়ে এল স্বাধীনতা। মুক্তি। বিজয়। আত্মসমর্পণ করল পাকিস্তানী বাহিনী, বিনাশর্তে, যৌথ কম্যাণ্ডের কাছে। দিনটি ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১।

বিনাদ্বিধায় স্বীকার করব মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিই ছিল আমার জীবনের স্বর্ণোজ্জল দিন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার যে সুযোগ ঈশ্বর আমায় দিয়ে-

ছিলেন সেজন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। নানা স্মৃতিতে ভাস্বর এই দিনগুলি—কখনও মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছি, কখনও হতাশায় ভুগেছি, আবার কখনও আনন্দউদ্বেল চিত্তে শিহরিত হয়েছি। নানাজনের কাছে নানাভাবে সহায়তা লাভ করেছি, এ জীবনের জন্য নানাজনের কাছে কৃতজ্ঞ। নাম করতে গেলে-তালিকা হবে দীর্ঘ, তাই কারও নাম করব না, সকলের কাছে ক্ষমা চাইব। কিন্তু তবু চান্দিনার কাছে একটি ছোট খালের ধারে, ঝোপের আড়ালে অবস্থিত পর্ণকুটিরে যে বৃদ্ধা মহিলা আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন মায়ের স্নেহে, নিঃসঙ্কোচে, তাঁর কথা কি কোনদিন ভুলতে পারব ?

ডঃ অজয় রায়

ই

উ

এ

ক্ষ

খ

গ

ঘ

চ

ছ

জ

ট

ঠ

ড

ধ

ন

প

ফ

ব

ভ

ম

য

র

INDEX

A

B